অবনীন্দ্র রচনাবলী

3

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবনীন্দ্র রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড
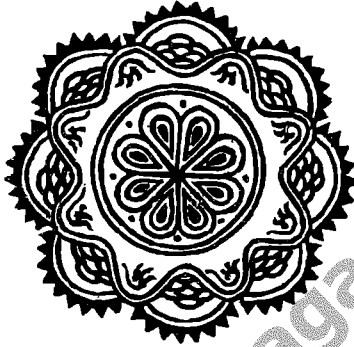
প্রকাশ ভবন

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

বিজ্ঞপ্তি

ভাষাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য জগতের এক অতুলনীয় ব্যতিক্রম। তাঁর সমগ্র রচনা কয়েকখণ্ডে সম্পূর্ণ হবে। পূর্বে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডে তাঁর স্মৃতিকথা মূলক রচনাগুলি সংকলিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে শিশু সাহিত্যমূলক রচনা। তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হল শিশুদের জন্য লেখা আরও অনেকগুলি রচনা। পূর্বে গ্রন্থভুক্ত হয়নি, সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত এমন কয়েকটি রচনাও এখানে সংযোজিত হয়েছে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীশঙ্খ ঘোষ, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির সহায়তা ছাড়া এ বই প্রকাশ সম্ভব হত না। তাছাড়া শ্রীসনৎকুমার গুপ্তর কাছে নানাবিধ আনুকূল্য পাওয়া গেছে। বইয়ের শেষ অংশে গ্রন্থ-পরিচয় রচনা করেছেন শ্রীপার্থ বসু। বিশ্বভারতীর সৌজন্যে নন্দলাল বসু চিত্রিত 'আলোর ফুলকি'-র প্রচ্ছদ ব্লকটি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। এঁদের সকলের কাছেই আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই।

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় আমরা বিশেষ কুণ্ঠিত। আশা করি পরবর্তী খণ্ডগুলি দ্রুত প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

আলোর ফুলকি

আলোর ফুলকি

দূরে একটা মহা বন, সেখানে বসন্ত-বাউরি 'বউ-কথা-কও' বলে থেকে থেকে ডাক দেয় ; কাছে পাহাড়তলির আবাদের পশ্চিমে, ঢালু মাঠের ধারে, পুরোনো গোলাবাড়ির গায়ে মাচার উপর কুঞ্জলতার বেড়া-দেওয়া কোঠাঘর ; সেখানে একটা ঘড়ি বাজবার আগে পাপিয়ার মতো 'পিয়া পিউ' শব্দ করে। যার বাড়ি তার পাখির বাতিক ; পোষা পাখি, বুনো পাখি, এই গোলাবাড়ির আর কোঠাবাড়ির ফাঁকে ফাঁকে কত যে আছে ঠিক নেই, কেউ দরজা-ভাঙা খাঁচায়, কেউ ছেঁড়া ঝুড়িতে, চালের খড়ে, দেয়ালের ফাটলে বাসা বেঁধে সুখে আছে। ও-পাড়ার ডালকুত্তো তম্মা মাঝে মাঝে মুরগির ছানা চুরি করতে এদিকে আসে, কিন্তু পাখিদের বন্ধু পাহাড়ী কুত্তানি জিম্মার সামনে এগোয়, তার এমন সাহস নেই। বাড়ি যার, সে যখন বাইরে গেল, পাহারা দিতে রইল জিম্মা, আর রইল মোরগ-ফুল-মাথায়-গোঁজা কুঁকড়ো—সে এমন কুঁকড়ো যে সবার আগে চোখ খোলে, সবার শেষে ঘুমে ঢোলে।

এই কুঁকড়োর চার রঙের চার বউ। সাদি, মেমসাহেবের মতো গোলাপী ফিতে মাথায় বেঁধে সাদা ঘাগরা পরে ঘুর-ঘুর করছেন ; কালি, চোখে কাজল আর নীলাম্বরী শাড়ি-পরা, মাথায় সোনালী মোড়া বেনে খোঁপা, যেন কালতে ঠাকরুন ; সুরকি, তিনি ঠোঁটে আলতা দিয়ে, গোলাপী শাড়ি প'রে যেন কনে বউটি ; আর খাকি, তিনি ধূপছায়া রঙের সায়া জড়িয়ে বসে রয়েছেন, যেন একটি আয়া।

বেলা পড়ে আসছে, গোলাবাড়ির উঠোনে বিকেলের রোদ এসেছে। সফেদি, সিয়াঈ, সুরকি, খাকি, গুলবাহারি সব মুরগি মিলে জটলা করছে। বাচ্ছারা এক দিকে একটা কেঁচো নিয়ে টানাটানি মারামারি চেঁচামেচি বাধিয়ে দিয়েছে ; ঘরের মধ্যে ঘড়ি

সাড়া দিলে, 'পিয়া পিউ।' সফেদি বলে উঠল, 'ওই পাপিয়া ডাকল।' খাকি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললে, 'পাপিয়া লো কোন্ পাপিয়া? বনের না ঘরের? ঘড়ির ভিতরে যার বাসা, সে কি ডাক দিলে।' সফেদি তখন ধান খুঁটে খুঁটে গালে দিচ্ছিল; এবার খুব দূর থেকে শব্দ এল, 'পিউ পিউ।' সফেদি বললে, 'এ যেন বনেরই বোধ হচ্ছে। শুনছিস, কত দূর থেকে ডাক দিয়ে গেল।' ঘড়ির মধ্যে থেকে যে 'পিয়া' বলে থেকে থেকে দিনে রাতে অনেকবার ডাক দেয়, খাকি একবার আড়াল থেকে তার চেহারাখানি দেখে নেবার জন্যে থাকে-থাকে কুঠিবাড়ির দিকে ঘুরে আসে; 'পিউ' বলে যেমন ডাকা, অমনি সে সোনার মন্দিরের মতো সেই ঘড়িটার কাছে ছুটে যায়, খুট করে দরজা বন্ধ হবার মতো একটা শব্দ শোনে, তখন চক্ষুশূল দুটো ঘড়ির কাঁটাই সে দেখতে পায়। পাখি, যে 'পিয়া পিউ' বলে ডাকলে, তার আর দেখা পায় না, এমনি নিত্য ঘটে বারে বারে। ঘড়ির মধ্যে যে পাখি, সে এখনো ডাকে নি, ডেকে গেল বনের পাখিটা। শুনে খাকি বললে, 'আঃ, তবু ভালো, এই বেলা গিয়ে ঘুলঘুলিতে আড়াসি পেতে বসে থাকি, আজ সে পিউ-পাখির দেখা নিয়ে তবে অন্য কাজ, রোজই কি ফাঁকি দেবে।'

খাকি কেন যে ঘন ঘন ঘড়ি দেখে আসে, সফেদির কাছে আজ সেটা ধরা পড়ে গেল। খাকির মন-পাখি যে কোন্ পাখির কাছে বাঁধা পড়েছে, সবার কাছে সেই খবরটা জানিয়ে দেবার জন্যে সফেদি চলেছে, এমন সময় চালের উপর থেকে কে একজন ডাক দিলে, 'সাদি, ও দিদি, ও সফেদি।' 'কে রে, কে রে।'—বলে সাদি চারি দিক চাইতে লাগল। উত্তর হল, 'আমি কবুত গো কবুত।' সফেদি রেগে বললে, 'আরে তা তো জানি। কোথায় তুই?'

'ছাতে গো ছাতে।'

সাদি দেখলে, এক গাঁ থেকে আর-এক গাঁয়ে নীল আকাশের খবর বয়ে চলে যে নীল পায়রা, তারি একটা একটুখানি জিরোতে আর একটু গল্প করে নিতে কোঠাবাড়ির আলসেতে বসেছে।

গোলাবাড়ির কুঁকড়োকে একটিবার চোখে দেখতে, তার একটুখানি খবর শুনে জীবনটা সার্থক করে নিতে পায়রা অনেক দিন ধরে মনে আশা করে আসছে ; সাদা মুরগির কাছে ঠিক খবর পাবে মনে করে পায়রা তাকে শুধোতে যাবে, এমন সময় উঠোনের কোণে একটা মাসকলাই চোখে পড়তেই সাদি সেদিকে 'রও' বলেই দৌড়ে গেল। সাদিকে কলাই খুঁটতে দেখে সুরকি ছুটে এল, কালি বালি গুলজারি সবাই এসে সাদিকে ঘিরে শুধোতে লাগল, 'দেখি, কী পেলি। দেখি, কী খেলি। দেখি দেখি, কী কী।' সাদি টুপ করে মাসকলাইটা গালে ভরে ফিক করে হেসে বললে, 'কট্ কট্ কলাট, মা-স ক-লা-ই।' বলেই সাদি কোঠাবাড়ির ঘুলঘুলির ধারে যেখানে খাকি চুপটি করে বসে ছিল, সেখানে চলে গেল।

সাদি বললে, 'ওলো, ঘুলঘুলিটা খোলা পেলি কি।'

খাকি সাদিকে দরমার ঝাঁপে একটা ইঁদুরের গর্ত দেখিয়ে বলছে, 'যেমনি ঘণ্টা পড়বে, আর অমনি সে ওই গর্তটায় চোখ দিয়ে…'

এমন সময় পায়রা ডাক দিলে, খুব নরম করে, মিষ্টি করে, 'দুধি-ভাতি সাদি সাহাজাদী, ও সফেদি।'

এবার সাদি সাড়া দিলে, 'নীলের বড়ি, নীল পোখরাজ। কী বলবে বলো।'

পায়রা খুব খানিক গলা ফুলিয়ে গদগদ স্বরে বললে, 'যদি একবার, একটিবার, বলব তবে—শুধু একটিবার যদি দেখাও…'

খাকি, সুরকি, গুলজারি সব মুরগি ইতিমধ্যে সেখানে জুটেছিল। তারা সবাই সাদির সঙ্গে বলে উঠল, 'কী, কী, কী, কী দেখাব?'

পায়রা অনেকখানি ঢোক গিলে বললে, 'তাঁর মাথার মোরগফুলটি যদি একটিবার…'

সব মুরগি হেসে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ে বলতে লেগেছে, 'চায় লা, চায় লা, দেখতে চায়, দেখতে চায়।'

পায়রা বলছে, 'দেখবই দেখব, দেখবই দেখব', আর আলসের উপর গলা ফুলিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

সাদা মুরগি তাকে ধমকে বললে, 'অত ব্যস্ত কেন? আলসেটা ভাঙবে নাকি!'

পায়রা ডানা চুলকে বললে, 'না, না, তবে কিনা আমরা তাঁকে ছেরেদ্ধা করে থাকি···'

সাদি বুক ফুলিয়ে বলে উঠল, 'ছেরেদ্ধা কে না করে।'

খোপ ছেড়ে আসবার সময়, কবুতনিকে সে ফিরে এসে যে জগদ্‌বিখ্যাত পাহাড়তলির কুঁকড়োর রূপ-বর্ণনা শুনিয়ে দেবে, দিব্যি করে এসেছে, সাদিকে পায়রা সে কথা বলে নিলে। সাদি ইতিমধ্যে আবার ধান খুঁটতে লেগেছিল, সে পায়রার কথার উত্তর দিলে, 'চমৎকার, দেখতে চমৎকার, এ কথা সবাই বলবে।'

পায়রা বলছিল, কতদিন খোপের মধ্যে বসে তারা তুটিতে তাঁর ডাক শুনেছে, নীল আকাশ ভেদ করে আসছে, সোনার সূচের মতো ঝকঝকে সেই ডাক, আকাশ আর মাটিকে যেন বিনি সুতোর মালাখানিতে বেঁধে এক করে দিয়ে।

কুঞ্জলতার আড়ালে বেড়ার গায়ে ভাঙা খাঁচায় তাল-চড়াই এদিক-ওদিক করছিল, হঠাৎ বলে উঠল, 'ঠিক ঠিক, সবারি প্রাণ তার জন্যে ছটফটায়।'

এক মুরগি বলে উঠল, 'কার কথা হচ্ছে, আমাদের কুঁকড়োর নাকি?'

চড়াই বলে উঠল, 'কুঁকড়ো কি শুধু তোদেরই না তোরাই শুধু তার। তুই মুই সেই, তোরা মোরা তারা, তোদের মোদের তাদের, সবাই তার, সে সবার।'

কিছু দূরে গোবদামুখো পেরু বসে বসে এই-সব কথা শুনছিল, এখন আস্তে আস্তে পায়রার কাছে এসে, কুঁকড়ো যে এল ব'লে এবং এখনি যে সে তার চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে কুঁকড়োকে দেখে জীবন সার্থক করতে পারবে, এই কথা খুব ঘটা করে জানিয়ে দিলে। পায়রা বললে, 'পেরু মশায়, আপনিও তাঁকে চেনেন?'

পেরু গলার থলিটা দুলিয়ে বলে উঠল, 'আমি চিনি নে! কুঁকড়োকে জন্মাতে দেখলেম, সেদিন!'

কুঁকড়োর জন্মস্থানটা দেখবার জন্যে পায়রা ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠল। পেরু তাকে একটা পুরোনো বেতের পেঁটরা দেখিয়ে বললে, 'এইখানে কুঁকড়োর জন্ম হয়, কর্কট রাশিস্থ ভাস্করে, মুক্তোর মতো এক ডিম থেকে।' যে মুরগি এই ডিমে তা দিয়ে দিলেন, তিনি এখনো বর্তমান কিনা, শুধোলে পেরু পায়রাকে বললে, 'এই পেঁটরার মধ্যেই তিনি আছেন, এখন বৃদ্ধা হয়েছেন, বড়ো একটা বাইরে আসেন না, কেবলই ঝিমোচ্ছেন, কুঁকড়োর কথা হলেই যা এক-একবার চোখ মেলেন।' বলেই পেরু সেই পেঁটরার কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'শুনছ গিন্নি, তোমার কুঁকড়োর এখন খুব বাড়-বাড়ন্ত' বলতেই পেঁটরার ডালা ঠেলে বুড়ি মুরগি হেঁয়ালিতে জবাব দিলে, 'পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে গো, ভাতে বাড়ে।' জবাব দিয়েই বুড়ি পেঁটরার মধ্যে মুড়িসুড়ি দিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

পেরু বলে উঠল, 'আমাদের গিন্নি হেঁয়ালি বলতে খুব মজবুত, মুখে মুখে হেঁয়ালি জুগিয়ে বলতে এঁর মতো দুজন দেখা যায় না। কলির বিষ্ণুশর্মার অবতার কিংবা চাণক্য পণ্ডিতাও বলতে পারো।' অমনি পেঁটরার মধ্যে থেকে জবাব হল, 'ময়ূর গেলেন লেজ গুড়িয়ে, পেরু ধরলেন পাখা!' 'দেখলে, দেখলে' বলতে বলতে পেরু সেখান থেকে সরলেন।

পায়রা সাদা মুরগিকে শুধোলে, 'শুনেছি নাকি, সুখেও যেমন দুখেও তেমনি, শীতে-বর্ষায় কালে-অকালে তাঁর গলার সুর সমান মিঠে।'

মুরগি উত্তর দিলে, 'ঠিক, ঠিক।'

'শুনেছি তাঁর সাড়া পেলে শিকরে বাজ আর একদণ্ড আকাশে তিষ্ঠে থাকতে পায় না, সবার মন আপনা হতেই কাজে লাগে।'

'ঠিক, ঠিক'।

'শুনেছি, ডিমের মধ্যে যে কচি কচি পাখি তাদেরও রক্ষে করে তাঁর গান, বেজি আর তার বাসার দিকে মোটেই আসে না।'

অমনি চড়াই বলে উঠল, 'তাওয়ায় চড়ানো ডিমসিদ্ধ খেতে।'

'ঠিক, ঠিক।'

পায়রা এবার আলসে থেকে একেবারে মুখ ঝুঁকিয়ে বললে, 'আর শুনেছি নাকি তিনি কী গুণগান জানেন, যার গুণে তিনি নাম ধরে ডাক দিলেই পৃথিবীর রাঙা ফুল, তারা শুনতে পায়, আর অমনি চারি দিকে ফুটে ওঠে, রাজ্যের অশোক শিমূল পারুল পলাশ জবা লাল পারিজাত গোলাপ আর গুল্-আনার?'

'এও ঠিক সত্যি, ঠিক সত্যি।'

'আর নাকি যার গুণে এমন হয়, সে-মন্তর জগতে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।'

সাদা মুরগি উত্তর দিলে, 'না। শুনেছি, তাঁর পিয়ারী যে পাখি, সেও জানে না, কী সে-মন্তর।'

'তাঁর পিয়ারী পাখিরা জানে না বল।'

সাদা মুরগি উত্তর করলে না।

পায়রার একটিমাত্র পিয়ারী—কপোতনী; কাজেই কুঁকড়োর অনেক পিয়ারী শুনে সে একটু চমকে গেল। চড়াই বলে উঠল, 'অবাক হলে যে? কুঁকড়োর পিয়ারী অনেক হবে না তো কি তোমার হবে। তুমি তো বল কেবল ঘু ঘু, আর তিনি যে নানা ছন্দে গান করেন।'

পায়রা বললে, 'কী আশ্চর্য। তাঁর সব চেয়ে পিয়ারী মুরগি, সেও জানে না তবে কী সে মহামন্ত্র।'

অমনি সুরকি খাকি কালি সাদি গুলজারি যে যেখানে ছিল, সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, না গো না, জানি না তো, জানি না তো।'

এই-সব কথা হচ্ছে, ইতিমধ্যে দেখা গেল একটি মনুয়া কুঞ্জলতার পাতার উপর এসে বসেছে আর একটা সরু আটাকাঠি আস্তে আস্তে মনুয়াটির দিকে বেড়ার ওধার থেকে এগিয়ে আসছে—কাঠির মাথায় সাপের চক্করের মতো দড়ির ফাঁস।

তাল-চড়াই মনুয়াটিকে দেখছে কিন্তু সেই একটুখানি মনুয়াকে ধরবার জন্যে অত বড়ো ফাঁস-লাগানো আটাকাঠিটা যে এগিয়ে আসছে, সেটা তার চোখে পড়ে নি। সে আপনার মনেই বকে যাচ্ছে, 'মন-মনুয়া, বনের টিয়া।' হঠাৎ দূর থেকে কুঁকড়োর সাড়া এল, খবরদারি···। অমনি চমকে উঠে মনুয়া-পাখি ডানা মেলে উড়ে পালাল, আটাকাঠিটা সাঁ করে একবার আকাশ আঁচড়ে বেড়ার ওধারে আস্তে আস্তে লুকিয়ে পড়ল।

চড়াইটা অমনি ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, 'দেখলে কুঁকড়োর কীর্তি। এইবার কর্তা আসছেন।'

কুঁকড়ো আসছেন শুনে সবাই শশব্যস্ত। পায়রা এদিক-ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে, তালচড়াই সেটা সইতে না পেরে বললে, 'এমনি কী অদ্ভুত কুঁকড়োর চেহারাখানা। পাকা ফুটিতে দুটি শজনেখাড়া গুঁজে দাও, মাথার দিকে একটা বিটপালং কিংবা কতকটা লাল পুঁইশাক, চোখের জায়গায় দুটো পাকা কুল, কানের কাছে ঝোলাও লাল দুটো পুলি-বেগুন, লেজের দিকে বেঁধে দাও আনারসের মুকুটি —বস্, জলজ্যান্ত কুঁকড়োটা গড়ে ফেলো।'

পেরু এই কুঁকড়োর রূপ-বর্ণনা খুব মন দিয়ে শুনছিল, আর তাল-চড়াইয়ের বুদ্ধির তারিফ করছিল। পায়রা গলা ফুলিয়ে বললে, 'চড়াই ভায়া, তোমার কুঁকড়ো যে সাড়া দেয় না, দেখি।' চড়াই বললে, 'ওই ডাকটুকু ছাড়া আর সবখানি ঠিক কুঁকড়ো হয়েছে, না।'

পায়রা রেগে গলা ফুলিয়ে বলে উঠল, 'বোকো না, বোকো না, মোটে না, মোটে না, বোকো না।' ঠিক সেই সময় বেড়ার উপরে ঝুপ করে এসে কুঁকড়ো বসলেন। পায়রা দেখলে মানিকের মুকুট আর সোনার বুক-পাটায় সেজে যেন এক বীরপুরুষ এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। সন্ধ্যার আলো তাঁর সকল গায়ে পলকে পলকে রাম-ধনুকের রঙ ধরে ঝিকমিক ঝিকমিক করছে, দৃষ্টি তাঁর আকাশের দিকে স্থির। মিষ্টি মধুর সুরে তিনি ডাকলেন, 'আ-লো। আ-লো। আ-লো।' তার পর তাঁর বুকের মধ্যে থেকে যেন সুর উঠল,

'অতু-ল ফু-উ-ল। আলোর ফুল! আলো —প্রাণের ফুলকি আলো, চোখের দৃষ্টি আলো, এসো ফুলের উপর দিয়ে, শিশির মুছে দিয়ে, এসো পাতায়-লতায় ফুলে ঝিক্‌মিক। আলোতে ঝিক্‌মিক —দেখা দিক, সব দেখা দিক, ভিতরে যাক তোমার প্রভা, বাইরে থাক্ তোমার আভা, একই আলো ঘিরে থাক্ শত দিক শতধারে, অনেক আলোর এক আলো, অনেক ছেলের এক মা। তোমার স্তুতি গাই আলোকবাদিন, আলোকের স্তোতা। তোমায় দেখি ছোটো হতে ছোটো, বড়ো হতে বড়ো, নানাতে, নানা কালে —কাচে, মানিকে, মাটিতে, আকাশে, জলে-স্থলে ; সকালে জ্বলজ্বল, সন্ধ্যায় ঝিলমিল, মন্দিরে, কুটিরে, পথে বিপথে। ভিখারীর কাঁথার শোভা, রাজার পতাকায় প্রভা —আলো। বনের তলায় সোনার লেখা, সবুজ ঘাসে সোনার চুমকি, আলোর ফুলকি, আলপনা অ-তু-উ-ল অমূল আলো।'

আর সব পাখি যে-যার কাজে ব্যস্ত ছিল, কেউ ধান খুঁটছিল কেউ গা ঝাড়ছিল, গুলজারি করছিল কিচমিচ, সুরকি মাখছিল ধুলো, খাকি ঘাঁটছিল ছাইপাঁশ, কালি খুঁড়ছিল গর্ত, সাদি মাজছিল গা, পেরু বকছিল বকবক, চড়াই বলছিল ছি-ছি, কেবল সেই আকাশের মতো নীল পায়রা অবাক হয়ে শুনছিল—

জয় জয় আলোর জয়।

পায়রা আর স্থির থাকতে পারলে না, গলা কাঁপিয়ে দুই ডানা ঝটপট করে বলে উঠল, 'সাধু সাধু।' কুঁকড়ো আঙিনায় নেমে পায়রাকে দেখে বললেন, 'ধন্যবাদ হে অচেনা পাখি, এখনি কি যাওয়া হবে।'

পায়রা বললে, 'আপনার দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি, এখন ঘরে গিয়ে কপোতীকে আপনার আশীর্বাদ দিয়ে চরিতার্থ হই।' কপোতীর প্রবালের মতো রাঙা পায়ে নমস্কার জানিয়ে কুঁকড়ো কবুতকে বিদায় করলেন। পায়রা তাল-চড়াইয়ের ভাঙা খাঁচায় ডানার এক ঝাপটা মেরে গাঁয়ের দিকে উড়ে গেল।

চড়াইটা গজগজ করতে লাগল, 'সুঁড়ির জয় মাতালে কয়।'

কুঁকড়ো ডাক দিলেন, 'কাজ ভুলো না, কাজ ভুলো না।' আর অমনি রাজহাঁস সে আর চুপচাপ বসে রইল না, পাতিহাঁস, চিনেহাঁস, সব হাঁসগুলোকে দিঘির পাড়ে জল খাইয়ে আনতে চলল। কুঁকড়ো হুকুম দিলেন, যত কুঁড়ে হাঁসের ছানা সবাইকে বেলা পড়বার আগে অন্তত বত্রিশটা করে গুগলি সংগ্রহ করে আনা চাই। একটা বাচ্ছা মোরগ, তাকে পাঠালেন কুঁকড়ো বেড়ার উপর দাঁড়িয়ে চারশো'বার 'ককুর-কু' বলে গলা সাধতে, এমন চড়া সুরে, যেন ওদিকের পাহাড়ে ঠেকে তার গলার আওয়াজ এদিকের বনে এসে পরিষ্কার পৌঁছয়।

বাচ্চা মোরগ গলা সাধতে একটু ইতস্তত করছে দেখে কুঁকড়ো তাকে আস্তে এক ঠোকর দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে তার বয়েসে তাঁকেও প্রতিদিন ঠিক এমনি করেই গলা সাধতে আর পড়া মুখস্থ কণ্ঠস্থ পাঠ করতে হয়েছে। বাচ্চা মোরগের মা গুলজারি ছেলের হয়ে কুঁকড়োর সঙ্গে একটু কোঁদল করবার চেষ্টা করতেই "যাও, জালার মধ্যে ডিমগুলোতে তা দাও সারারাত।"—গুলজারির উপর এই হুকুম-জারি করে আর-সব মুরগিদের সবজি বাগানে যে-সব পোকা শাক-পাতা কেটে নষ্ট করছে, তার সব কটিকে বেছে সাফ করতে পাঠিয়ে দিয়ে কুঁকড়ো পেঁটরার মধ্যে তাঁর মায়ের কাছে উপস্থিত। কুঁকড়োর মা তাঁকে ধমকে বলে উঠল, 'এইটুকু বয়েসে তোর এই বিদ্যে হচ্ছে। কেবল টো টো করে ঘুরে বেড়ানো।' কুঁকড়ো একটু হেসে বললেন, 'মা আমি যে এখন মস্ত এক কুঁকড়ো হয়ে উঠেছি।' 'যাঃ, যাঃ, বকিস নে। 'বেঙাচি বলাতে চান তিনি কোলা ব্যাং, ওরে বাপু সময়েতে সব হয়, চিল হন চ্যাং।' আজ না হয় হবে কাল।' বলেই কুঁকড়োর মা পেঁটরার ডালাটা বন্ধ করলেন।

সাদি, কালি, সুরকি, খাকি কুঁকড়োর মার চার বউ। কুঁকড়ো আসতেই তারা বলে উঠল, 'ঘরে কুঁড়োটি নেই যে, তার কী করছ।' 'চরে খাওগে' বলেই কুঁকড়ো গা-ঝাড়া দিয়ে বসলেন। একদল বসে-বসে খাবে আর পরচর্চা করবে, আর অন্যদল তাদের খোরাক

জোগাবার জন্যে খেটে মরবে, কুঁকড়োর পরিবারে সেটি হবার জো নেই, তা তুমি উপোসই কর, আর না-খেয়েই মর। কাজেই কালি সাদি সবাই যেখানে যা পায়, হুমুঠো খেয়ে নিতে চলল। কিন্তু খাকি —সে নড়তে চায় না, সাদিকে চুপিচুপি বললে, 'তোরা যা না, আমি সেই ঘড়ির মধ্যেকার পিউ-পাখির সন্ধানে রইলেম।' বলে খাকি একটা ঝাঁপির আড়ালে লুকোল। আর সব মুরগি গেছে, কেবল সুরকি বসে-বসে নখে মাটি খুঁড়ছে মুখ ভার করে, দেখে কুঁকড়ো শুধোলেন, 'তোর আজ হল কী।'

সুরকি ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলে বললে, 'কুঁ-ক বলি—'

কুঁকড়ো গম্ভীর মুখে বললেন, 'বলেই ফেল্ না। বনিতার ভনিতার কবিতার কোন্‌টা বাকি?' উত্তর হল, 'বল তো ভালোবাস, কিন্তু—'

'কথাটা চেপে যাও ছোটো বউ, চেপে যাও।' কুঁকড়ো উত্তর করলেন।

ছোটো বউ ছাড়বার পাত্রী নয়, কান্না ধরলে, 'না আমি শুনবই।' কুঁকড়ো বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'আর ছাই শুনবে কি-ই-ই।' কুঁকড়োকে সুরকি একলা পেয়ে কিছু মতলব হাসিলের চেষ্টায় আছে, সব মুরগিই সেটা এঁচেছিল। তারা খাবারের চেষ্টায় কেউ যায় নি। এখন সাদি এক-কোণ থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে বললে, 'তোমার পাঠরানী আমি, সাদি।' কুঁকড়ো বিষম গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কে বললে —না।' সাদি একটু গলা চড়িয়ে বললে, 'আমায় বলতেই হবে।' ইতিমধ্যে একদিক থেকে কালি এসে বলছে, খুব বিনিয়ে বিনিয়ে, 'কও, আমি তোমার সু-ও-রা-নী।' কুঁকড়ো ঠিক তেমনি সুরে উত্তর করলেন, 'কি —না —বল —গা।' কালি সুর ধরলে 'বল না, বল না...' অমনি সাদি বলে উঠল, 'মন্তরটা কী? যার গুণে তুমি গুণীর মতো গান গাও?' কাছে ঘেঁষে সুরকিও সুর ধরলেন, 'হ্যাঁগা, শুনেছি তোমার গলার মধ্যে একটা পিতলের রামশিঙে পরানো আছে, আর তাতেই নাকি লোকে তোমার নাম দিয়েছে আম-পাখি।'

কুঁকড়ো ব্যাপার বুঝে খুব খানিকটা হেসে মাথা হেলিয়ে বললেন, 'আছে তো আছে। এ গলার একেবারে টুঁটির ঠিক মাঝখানে খুব শক্ত জায়গায় সেটা লুকোনো আছে, খুঁজে পাওয়া শক্ত।' বীজ-মন্তরটা মুরগিদের কানে দেবার জন্যে কুঁকড়ো মোটেই ব্যস্ত ছিলেন না, তবু চুপিচুপি তাদের প্রত্যেকের কানের কাছে মুখ নিয়ে নিয়ে বললেন, 'দেখো, মাঠের মধ্যে যখন চরতে যাচ্ছ, তখন খবরদার ঘাসের ফুল মাড়িয়ো না, ফুলের পোকা খেয়ো কিন্তু ফুল যেন ঠিক থাকে। খবরদার, যা-ও।'

মুরগিরা চলে যাচ্ছিল, কুঁকড়ো তাদের ডেকে বললেন, 'জানো, যখন যাবে চরতে---'

এক মুরগি পাঠ বললে, 'বাগিচায়।' কুঁকড়ো বললেন, 'পয়লা মুরগি' ইস্কুলের মেয়েদের মতো সব মুরগি একসঙ্গে বলে উঠল, 'আগে যায়।' কুঁকড়ো হুকুম দিলেন, 'যা—ও।' মুরগিরা যাচ্ছিল, কুঁকড়ো তাড়াতাড়ি তাদের ডেকে সাবধান করে দিলেন, 'সড়ক পার হবার সময় রাস্তায় কী আছে, তা খুঁটে নেবার চেষ্টা করা ভুল, গাড়িচাপা পড়তে পার।'

মুরগিরা ভালোমানুষের মতো বেড়ার ফাঁকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কুঁকড়ো চারি দিক দেখে বললেন, 'দুই তিন চার, সিধে হও পার।' ঠিক সেই সময় দূরে মটরগাড়ির ভেঁপু বাজল, 'হাউ মাউ—খাউ।' কুঁকড়োর অমনি সাড়া পড়ল —ভেঁপুর চেয়ে জোর আওয়াজ—'স-বু-উ-উ-র'। বেড়ার ধার দিয়ে সাঁ-করে খানিক ধুলো আর ধোঁয়া গড়াতে গড়াতে চলে গেল। মিনিট কতক পরে যখন সব পরিষ্কার হল, তখন কুঁকড়ো মুরগিদের যাবার পথ ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন। একে একে মুরগিরা চলল, সাদি খাকি গুলজারি। সুরকি সব-শেষে। সে কুঁকড়োকে বলে গেল, 'কাব্যাৎ, যা-খাই তাতেই আজ তেল-তেল গন্ধ করছে, যেন তেলাকুচোর তেলফুলুরি।' ঝাঁপির আড়ালে খাকি মুরগি, সে মনে মনে বললে, 'রক্ষে, তিনি আমাকে দেখেন নি, বাঁচলেম বাপু।'

২

সাদি, কালি, গুলজারি —এরা সবাই সেটা জানবার জন্যে ধরাধরি করছে। পায়রা থেকে চড়াই এমন-কি টিকটিকি পর্যন্ত পাহাড়গুলির এ-পাড়া ও-পাড়ার ছেলেবুড়ো যে যেখানে আছে, সবাই যে লুকোনো জিনিসের কথা বলাবলি করছে, কুঁকড়ো সেই লুকোনো জিনিসের খবরটা বুকের মধ্যে নিয়ে বসে আছেন; কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারেন না, অথচ না বললেও বুক যে ফেটে যায়। অতি গোপনীয় বীজমন্ত্রটি যার কানে চুপিচুপি বলে দেওয়া চলে, এমন উপযুক্ত পাত্র —সে কোথা। এ যে অতি গোপন কথা, অতি নিগূঢ় রহস্য। মেয়েরা তো এ কথা একটি দিন চেপে রাখতে পারবে না। বিশেষত সাদি কালি সুরকি আর খাকি এমনি সব গুলবাহারি গুলজারি, যাঁদের মুখ চলছেই, তাঁদের এ কথা একেবারেই বলা যেতে পারে না, শোনবার জন্যে তাঁরা যতই ইচ্ছুক থাকুক না কেন। নাঃ, বুক ফেটে যায় যাক, মনের কথা মনেই থাক্, গুপ্ত মন্তর, অন্তরের ভাবনা মন থেকে দূর করে যেমন আর সবাই, তেমনি আমিই বা কেন না থাকি —দিব্যি আরামে, পাহাড়তলির রাজবাহাদুর কুঁকড়ো। এইটুকুই যথেষ্ট, আর এইটুকুতেই আমার আনন্দ, কিমধিকমিতি। মনে মনে এই তর্কবিতর্ক করতে করতে বুক ফুলিয়ে কুঁকড়ো ধানের মরাইটার চারদিকে পা-চালি করছেন, আর এক-একবার নিজের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে নিজেকে নিজে তারিফ করছেন, ক্যা খপ্-সু র তি ই-ই'। তাঁর মাথায় মোরগফুলটা আর চোখের কোল থেকে ঝুলছে যে দাড়ি, তার মেহেদি রংটা যে বনের টিয়া থেকে আরম্ভ করে লাল তুতির লালকেও হার মানিয়েছে, এটা কুঁকড়োকে আর বুঝিয়ে দিতে হল না। তিনি খড়ের গাদার উপরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে একবার, মাঠের দিকে একবার, তাকিয়ে দেখলেন; সোনা আর মানিকের আভায় জল স্থল আকাশ রাঙিয়ে সন্ধ্যাটি কী

চমৎকার সাজেই সেজে এসেছে। 'আজকের মতো দিনের শেষ কাজ সাঁঝি-আলপনা দেওয়া হল, আজ করবার যা, তা সারা হয়েছে, কালকের চিন্তা কাল হবে, এখন আর কী, দুমুঠো যা জোটে, খেয়ে নিতে ছু-টি-ই-ই।' বলেই কুঁকড়ো একটিবার ডাক দিয়ে চালাঘরের মটকা থেকে নেমে বাসার দিকে দৌড়ে যাবেন, ওদিক থেকে শব্দ এল, 'রও-ও-ও'! উঠানের মধ্যে শুকনো ঘাসের বোঝাটা একবার খসখস করে উঠল, আর তার তলা থেকে জিম্মা কুত্তানী খড় আর কুটোয় ঝাঁকড়া মাথাটা বের করে জুলজুল করে কুঁকড়োর দিকে চাইতে লাগল।

কুঁকড়ো আর কুকুরের চেহারায় মিল না হলেও নামে নামে যেমন অনেকটা, কাজেও তেমনি অনেকটা মিল ছিল। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন দুজনেরই জীবনের ব্রত। কাজেই দুজনে যে ভাব খুবই হবে, তার আশ্চর্য কী। তা ছাড়া স্বর্গ আর মাটি দুয়েরই পরশ দুজনেরই ভালো লাগে। এই আকাশের আলো আর পৃথিবীর উপর ভালোবাসা এই দুটি জীবকে যেন একসূত্রে বেঁধেছে। সূর্যের দিকে মুখ করে মাটির কোলে দুই পা রেখে না দাঁড়ালে কুঁকড়োর গান মোটেই খোলে না; আর কুকুর তার আনন্দই হয় না, রোদে মাটির উপরে এক-একবার না গড়িয়ে নিলে। জিম্মা প্রায়ই বলে, 'সূর্যকে ভালোবাসে বলেই না সে চাঁদ দেখলেই তাড়া করে যায়, আর মাটিকে ভালোবাসে বলেই না সে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে মুখটি দিয়ে চুপটি করে থাকে।' ভালোবাসার বশে জিম্মা বাড়ির বাগানটায় এত গর্ত করে রাখত যে এক-একদিন বুড়ো ভাগবৎ মালি কর্তার কাছে কুকুরের নামে নালিশ জুড়ত। কিন্তু জিম্মার সব দোষ মাপ ছিল, গোলাবাড়ির সব জানোয়ারের খবরদারি, ক্ষেতে না গোরুবাছুর ঢোকে তার দিকে নজর রাখা, এমনি সব পাহারার কাজে জিম্মার মতো আর কেউ জুড়ি ছিল না। তা ছাড়া জিম্মার জিম্মায় অমন যে কুঁকড়ো এমন কি তাঁর অত্যাশ্চর্য সুরটি পর্যন্ত রাত্রে না রাখলে চলে না; কাজেই কুকুর হঠাৎ যখন বললে, 'রও' তখন যে একটা বিপদের

সম্ভাবনা আছে, সেটা জানা গেল। কিন্তু এমন কী বিপদ হতে পারে। কুঁকড়ো দেখলেন, অন্যদিন যেমন আজও সন্ধ্যাবেলা ঠিক তেমনি চারি দিক নিরাপদ বোধ হচ্ছে, অন্তত তাঁর এই গোলাবাড়ির রাজত্বের বেড়ার মধ্যে কোনো যে শত্রু আছে, তা তো কিছুতেই মনে হয় না। সে যে মিছে ভয় পাচ্ছে সেটা তিনি জিম্মাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। ভয় কাকে বলে কুকুরের জানা ছিল না; কিন্তু মিথ্যুক আর মিছে নিন্দে রটাতে গোলাবাড়িতে আর পাড়াপড়শীর ঘরেতে যারা, তাদের সে ভালোরকমই জানত। কুঁকড়ো না জানলেও ওই বোঁচা-ঠোঁট চড়াই আর ডিগডিগে-পা ময়ূর যে কুঁকড়োর দুই প্রধান শত্রু, সেটা জিম্মা কুঁকড়োকে জানিয়ে দিতে বিলম্ব করলে না। তালচড়াই, যার নিজের কোনো আওয়াজ নেই, হরবোলার মতো পরের জিনিস নকল করেই চুলবুল করে বেড়ায়, পরের ধনে পোদ্দারি যার পেশা, আর ওই ময়ূর, জরি-জরাবৎ আর হীরে-মানিকের ঝকমকানি ছাড়া আর কোনো আলো যার ভিতরে বাহিরে কোথাও নেই, দরজি আর জহুরির দোকানের নমুনো-ঝোলাবার আলনা ছাড়া আর কিছুই যাকে বলা যায় না, এই অদ্ভুত জানোয়ার তাঁর প্রধান শত্রু শুনে কুঁকড়ো একেবারে 'হাঃ হাঃ' করে হেসে উঠলেন। জিম্মা বললে, 'কারো সঙ্গে খোলাখুলি শত্রুতা করবার সাহস আর ক্ষমতা না থাকলেও এরা সবাইকে হেয় মনে করে, এমন-কি কুঁকড়োর নিন্দেও সুবিধা বুঝে করতে ছাড়ে না। এবং খাওয়া-পরা-সাজগোজের দিক দিয়েও এরা পাড়ার মধ্যে নানা বদ চাল ঢোকাচ্ছে। এদের দেখাদেখি অন্যেরাও বেয়াড়া বেচাল বে-আদব হয়ে ওঠবার জোগাড়ে আছে। সাদাসিধেভাবে খেটেখুটে পাড়াপড়শীকে ভালোবেসে আনন্দে থাকতে চায় যে-সব জীব, তাদের এই-সব সাজানো পাখিরা বলে, 'ছা-পোষার' দল। আর নিষ্কর্মা বসে-থাকা পালকের গদীতে কিম্বা মাথায় পালক গুঁজে হাওয়া খেয়ে ঘুরঘুর করাকেই এরা বলে চাল। সেটা রাখতে চালের সব খড় উড়ে গেলেও এরা নিজের বুদ্ধির প্রশংসা নিজেরাই করে থাকে, আর অনেক সুবুদ্ধি পাখির মাথা

ঘুরিয়ে দেয় দুর্বুদ্ধি এই দুই অদ্ভুত জানোয়ার, কথা-সর্বস্ব হরবোলা আর পাখা-সর্বস্ব চালচিত্র।'

কুঁকড়ো কাজে যেমন দড়ো, বুদ্ধিতে তেমনি; চড়াই আর ময়ূরের চেয়ে অনেক বড়ো, দিলদরিয়া, কাজেই পৃথিবীতে অন্তত এই গোলাবাড়িতে যে তাঁর কেউ গোপনে সর্বনাশের চেষ্টায় আছে, এটা বিশ্বাস করা কুঁকড়োর পক্ষে শক্ত। তিনি বললেন, 'জিম্মা নিশ্চয়ই একটু বাড়িয়ে বলছে, অন্যের সামান্য দোষকে সে এত যে বড়ো করে দেখছে, সে কেবল তাঁকে সে খুবই ভালোবাসে বলে। চড়াই হল তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু আর ময়ূরটা লোক তো খুব মন্দ নয়। আর যদিই বা তাঁর শত্রু সবার হয়, তাতেই বা ক্ষতি কী। তিনি তাঁর গান এবং মুরগিদের ভালোবাসা পেয়েই তো সুখী, নেইবা আর কিছু থাকল।'

জিম্মা অনেকদিন এই গোলাবাড়িটায় রয়েছে, এখানকার কে যে কেমন, তা জানতে তার বাকি ছিল না। কুঁকড়োর উপরে মুরগিদেরও যে খুব টান নেই, তারও প্রমাণ অনেকবার পাওয়া গেছে। 'বিশ্বাস কাউকে নেই।' বলেই জিম্মা এমনি এক হুংকার ছাড়ল যে পাঁচিলের গায়ে চড়াই পাখির খাঁচাটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। 'ব্যাপার কী!' বলে চড়াই কুঞ্জলতার মাচা বেয়ে নিচে উপস্থিত। জিম্মা চড়াইকে সাফ জবাব দেবার জন্যে চেপে ধরলে। আড়ালে একরকম আর কুঁকড়োর সামনে অন্যরকম ভাব দেখানো আর চলছে না। বলুক সে চড়াইটা সত্যিই কুঁকড়োকে পছন্দ করে কিনা, না হলে আজ আর ছাড়ান নেই। চড়াই মনে মনে বিপদ গুনলে। কিন্তু কথায় তার কাছে পারবার জো নেই। সে অতি ভালোমানুষটির মতো উত্তর করলে, 'কুঁকড়োকেও টুকরো-টুকরো ক'রে দেখলে বাস্তবিকই আমার হাসি পায়; আর তার খুঁটিনাটি এটি-ওটি নিয়েই আমি তামাশা করে থাকি। কিন্তু সবখানা জড়িয়ে দেখলে কুঁকড়োকে আমার শ্রদ্ধাই হয় বলতে হবে। শুধু তাই নয়, কুঁকড়োর খুঁটিনাটি নিয়ে আমি যে ঠাট্টা-তামাশাগুলো করে থাকি, সেগুলো সবাই যে পছন্দ করে না, সে তো তুমিও জানো জিম্মা।'

জিম্মা ভারি বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'শোনো একবার, কথার ভাঁওরাটা শোনো। বাইরের বনে সোনার আলো, ফুলের মধু থাকতে যে পাখিটা দরজা-ভাঙা খাঁচায় বসে বাসি ছাতু খেয়ে পেট ভরাচ্ছে, তার কাছে পরিষ্কার জবাব আশা করাই ভুল।'

চড়াই বলে উঠল, 'সাধ করে কি আমি খাঁচায় বাসা বেঁধেছি। বাইরে সোনার আলো আর সোনালি মধু সময়ে সময়ে যে সীসের গরম-গরম ছররা গুলি হয়ে দেখা দেয় দিদি।'

জিম্মা ভারি চটেছিল। উত্তর করলে, 'আরো মুখখু, কোন্‌দিন কবে একটা-আধটা কার্তুজের খোলা ঢেলার মতো খুরে লাগল বলে বনের হরিণ সে কি কোনোদিন বনের থেকে তফাত থাকতে চায়, না আকাশে বাজ আছে বলে কেউ আকাশের আলোটা আর আকাশে ওড়াটা অপছন্দ করে। ভাঙা খাঁচার পুষ্যিপুত্তর হরবোলা। ফুলে-ফলে আলোতে-ছায়ায় অতি চমৎকার বনে-উপবনে যে মুক্তি, তুই তার কী বুঝবি।'

চড়াই উত্তর দিলে, 'বেঁচে থাক্ আমার ভাঙা খাঁচার দাঁড়খানি। কাজ নেই আমার মুক্তিতে। রাজার হালে আছি, পরিষ্কার কলের জল খাচ্ছি, মস্ত সাবানদানিতে দুবেলা গরমের দিনে নাইতে পাচ্ছি, দোলনা চৌকি, চানের টব, বনে এ-সব পাই কোথা, বলো তো দিদি।'

জিম্মা এমন রেগেছিল যে, গলার শিকলিটা খোলা পেলে সে আজ চড়াইটার গায়ের একটি পালকও রাখত না, মেরেই ফেলত।

এই ব্যাপার হচ্ছে, এমন সময় বাড়ির মধ্যে ঘড়ি বাজল, 'পি-উ'।

যেমন 'পিউ' বলা, অমনি খাকি মুরগি ঝুড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে সেদিকে দৌড়। গর্তের মধ্যে মুখ দিয়ে সে কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না; এবারও তার আশা পুরল না, সময় উতরে গেছে, পিউ-পাখি পালিয়েছে।

চড়াই খাকিকে বললে, 'কী দেখছ গো। এক-পহরের ঘড়ি পড়ল নাকি।'

কুঁকড়ো খাকিকে গোলাবাড়িতে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'তুই যে চরতে যাস নি?'

খাকি চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে ডানার ঘোমটায় মুখ ঝাঁপলে।

কুঁকড়ো শুধোলেন, 'গর্তটার মধ্যে মুখ গুঁজড়ে হচ্ছিল কী, শুনি।'

খাকি আমতা-আমতা করে বললে, 'এই চোখ আর ঘাড়টা টনটন করছিল—'

'কাকে দেখবার জন্যে।' কুঁকড়ো শুধোলেন। খাকি বললে, 'কাকে আবার।' কুঁকড়ো বললেন, 'হাঁ, শুনি, কাকে।'

খাকি কান্নার সুর ধরলে, 'তুমি বল কী গো।' কুঁকড়ো ধমকে বললেন, 'চোপরাও, সত্যি কথা বল্।' খাকি বিনিয়ে-বিনিয়ে বললে, 'পিউ পাখিকে।'

কুঁকড়ো খাকির দিক থেকে একেবারে মুখ ফেরালেন, খাকি আস্তে আস্তে পগার পারে দৌড় দিলে।

কুঁকড়ো কুকুরকে বললেন, 'একটা ঘড়িকে ভালোবাসা, এমন তো কোথাও শুনি নি। এ বুদ্ধি খাকিকে দিলে কে বলো তো।'

'ওই ছিটের মেরজাই-পরা চিনে মুরগিটার কাজ।' কুকুর উত্তর দিলে।

কুঁকড়ো শুধোলেন, 'কোন্ মুরগিটি, বলো তো। ওই যেটা বুড়ো বয়েসে ঠোঁটে আলতা দিয়ে বেড়ায় সেইটে নাকি।'

কুকুর উত্তর করলে, 'হাঁ হাঁ, সেই বটে। তিনি যে আবার সবাইকে বৈকালি পার্টি দিচ্ছেন।'

'কোথায় সেটা হচ্ছে।' কুঁকড়ো শুধোলেন।

চড়াই উত্তর দিলে, 'ওই কুল গাছটার তলায় যেখানে পাখি তাড়াবার জন্যে একটা খড়ের সাহেবি কাপড়-পরা কুশোপুতুলের কাঠামো মালী খাড়া করে রেখেছে, সেইখানে। খুব বাছা বাছা নামজাদা পাখিরাই আজ যাবেন। কাঠামোর ভয়ে ছোটোখাটো পাখিরা সেদিকে এগোতেই সাহস পাবে না।'

কুঁকড়ো আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বল কী, চিনে মুরগির বৈকালি!'

চড়াই ঠিক তেমনি সুরে উত্তর দিলে, 'হাঁ মশায়, প্রতি সোমবার পাঁচ হইতে ছয় ঘটিকা পর্যন্ত মুরগি গিন্নির ঘোরো মজলিস হইয়া থাকে।'

'তা হলে আজ বৈকালে—' কুঁকড়ো আরো কী শুধোতে যাচ্ছিলেন, চড়াই বলে উঠল, 'না, আজ ভোরবেলায়।'

'ভোরবেলায় বৈকালি তো কখনো শুনি নি হে।' কুঁকড়ো আশ্চর্য খুবই হলেন। চড়াই তখন কুঁকড়োকে বুঝিয়ে দিলেন, 'ভোর পাঁচটায় বাগানে মালী তো থাকে না, তাই বিকেল ৫টা না করে সকাল ৫টাই ঠিক হয়েছে।'

'একী বিপরীত কাণ্ড।' বলে কুঁকড়ো 'হো হো' করে হেসে উঠলেন। চড়াই অমনি বলে উঠল, 'বিপরীত বলে বিপরীত।' জিম্মা তাকে ধমকে বললে, 'তোমার আর খোশামুদিতে কাজ নেই, তুমি নিজে তো কোনো সোমবারে পার্টিগুলো কামাই দাও না দেখি।'

চড়াই উত্তর করলে, 'সত্যি যাই বটে, সবাই আমাকে খাতির করে কিনা।'

জিম্মা গজগজ করে খানিক কী বকে গেল। জিম্মা কী বকছে শুধোলে কুঁকড়োকে সে জবাব দিলে, 'কোন্‌দিন হয়তো তোমাকেও কোন্‌-এক মুরগি এই পার্টিতে নিয়ে হাজির করেছে, দেখব।'

কুঁকড়ো হেসে বললেন, 'আমাকে হাজির করে দেবে, চা-পার্টিতে, কোনো এক মুরগি!'

জিম্মা বললে, 'হাঁ মশায়, এমনি হাজির করা নয়, মাথার ঝুঁটিটি ধরে টানতে টানতে না হাজির করে।'

কুঁকড়ো একটু চটেই জিম্মাকে বললেন, 'এ সন্দেহটা তোমার করবার কারণটি কী।'

জিম্মা জবাব দিলে, 'কারণ নতুন মুরগির দেখা পেলে মশায়ের মাথা সহজেই ঘুরে যায় এখনো।'

চড়াই বলে উঠল, 'জিম্মা-দি ঠিক বলেছে, নতুন মুরগি যেমন দেখা, অমনি কুঁকড়ো-মশায় এমনি করে ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে 'কুক কুক' বলে নৃত্য করতে থাকেন, মুরগিটির চারি দিকে।' বলে চড়াইটা একবার কুঁকড়োর চলনবলন হুবহু দেখিয়ে দিলে।

কুঁকড়ো হেসে বললেন, 'আচ্ছা বেকুফ পাখি যাহোক।'

চড়াইটা তখনো ডানা কাঁপিয়ে লেজ দুলিয়ে কুঁকড়োর মতো তালে তালে পা ফেলে মোরগ মুরগির নকল দেখাচ্ছে, ঠিক সেই সময় ওদিকে দুম করে বন্দুকের আওয়াজ হল। চড়াই অমনি কাঠের পুতুলের মতো এক পা তুলেই দাঁড়িয়ে গেল। কুঁকড়ো গলা উঁচু ক'রে, আর কুকুর কান খাড়া করে নাক ফুলিয়ে শুনতে লাগল। আর-এক গুলির আওয়াজ। চড়াইটা গিয়ে মুরগি গিন্নির ভাঙা পেঁটরার আড়ালে লুকিয়েছে, এমন সময় উহু-উ-উ-উ বলতে বলতে সোনার টোপর সোনালিয়া বন-মুরগি কুঞ্জলতার বেড়ার ওপার থেকে ধপাং করে উড়ে এসে উঠোনের মধ্যে পড়ল।

কুঁকড়ো বলে উঠলেন, 'একী। এ কে! কে এ।'

সোনালিয়া কুঁকড়োর কাছে ছুটে গিয়ে বললে, 'পাহাড়তলির 'সা মোরগ', আপনি আমায় রক্ষে করুন।' আবার দুম করে আওয়াজ। সোনালিয়া চমকে উঠেই অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়লেন, পালাবার আর শক্তিই ছিল না। কুঁকড়ো অমনি একখানি ডানা বাড়িয়ে সোনালিয়াকে তুলে ধরে আর-এক ডানার ঝাপটা দিয়ে গামলা থেকে জলের ছিটে আর বাতাস দিতে থাকলেন খুব আস্তে আস্তে। তাঁর ভয় হচ্ছিল পাছে পাতার সবুজ, ফুলের গোলাপি, সোনার জল আর সন্ধ্যাবেলার আলো দিয়ে গড়া বাসন্তী শাড়িপরা এই আশ্চর্য পাখিটি জল পেয়ে গলে যায়, কি বাতাসে মিলিয়ে যায়। একটু চেতন পেয়ে সোনালিয়া আবার কুঁকড়োকে মিনতি করতে লাগল, 'ওগো একটু আমায় লুকোবার স্থান দাও, আমাকে পেলে তারা মেরেই ফেলবে।'

চড়াই সোনালিয়ার গায়ে টকটকে লাল সাটিনের কাঁচুলি দেখে

বললে, 'এতখানি লালের উপর থেকে শিকারীর বন্দুকের তাগ কেমন করে ফসকাল, তাই ভাবছি।'

সোনালিয়া বললে, 'সাধে কি গুলি ফসকেছে, চোখে যে তাদের ধাঁধাঁ লেগে গেল। তারা মনে করেছিল, ঝোপের মধ্যে থেকে ছাই রঙের একটা তিতির-মিতির কেউ বার হবে, কিন্তু আমি সোনালি যখন হঠাৎ বেরিয়ে গেলুম সামনে দিয়ে দিয়ে তখন শিকারী দেখলে খানিক সোনার ঝলকা, আর আমি দেখলেম একটা আগুনের হলকা। গুলি যে কোন্‌দিকে বেরিয়ে গেল কে তা দেখবে। কিন্তু ডালকুত্তোটা আমায় ঠিক তাড়া করে এল। কুকুরগুলো কী বজ্জাত।' এমন সময় জিম্মাকে দেখে 'অন্য কুকুর নয়, ওই ডাল-কুত্তোগুলোর মতো বজ্জাত দেখিনি, বাপু।' এই বলে সোনালিয়া একটু লুকোবার স্থান দেখিয়ে দিতে কুঁকড়োকে বারবার বলতে লাগল। কুঁকড়ো একটু সমিস্যায় পড়লেন। আগুনের ফুলকি এই সোনালিয়া পাখি, একে কোন্ ছাইগাদায় তিনি লুকোবেন। তিনি দু একবার এ-কোণ ও-কোণ দেখে, এখানটা-ওখানটা দেখে বললেন, 'না, এঁকে আর রামধনুককে লুকোতে পারা কঠিন।'

জিম্মা বললে, 'আমার ওই বাক্সটার মধ্যে লুকোতে পারা যেতে পারে, ইনি যদি রাজি হন।'

'ভালো কথা।' বলেই সোনালি গিয়ে বাক্সে সেঁধোলেন, কিন্তু অনেকখানি সোনালি আঁচল বাক্সের বাইরে ছড়িয়ে রইল, জিম্মা সেটুকু ঢেকে চেপে গম্ভীর হয়ে বসল।

জিম্মা বেশ বাগিয়ে বসেছে, এমন সময় বেড়ার ওধার থেকে ঝোলা-কান গালফুলো ডালকুত্তো 'তম্মা' উঁকি দিলেন। জিম্মা যেন দেখতেই পায় নি এই ভাবে রুটিই চিবচ্ছে। তম্মা বললে, 'উঃ কিসের খোসবো ছাড়ছে।' জিম্মা সামনের থালাখানা দেখিয়ে বললে, 'আজ একটু বনমুরগির ঝোল রাঁধা গেছে।'

ডালকুত্তো এবার পষ্ট করে শুধোলে, জিম্মা এদিকে একটা সোনালিয়া পাখিকে আসতে দেখেছে কিনা। কুঁকড়ো সে কথা

চাপা দিয়ে বলে উঠলেন, 'তম্মার মুখটা কেমন গোমসা দেখাচ্ছে-না, জিম্মা।'

জিম্মা ধীরে সুস্থে উত্তর করলে, 'একটা সোনালী টিয়ে মাঠের উপর দিয়ে উড়ে গেল দেখিছি, ওই ওদিকে—।' তম্মাটা আকাশে নাক তুলে কেবলি শুকতে লেগেছে, বনমুরগির গন্ধটা সত্যিই জিম্মার থালা থেকে আসছে কি না। কুঁকড়োর বুকের ভিতরটা বেশ একটুখানি গুরগুর করছে, এমন সময় দূর থেকে শিকারী সিটি দিয়ে তম্মাকে ডাক দিলে। তম্মা চলল দেখে কুঁকড়ো আর জিম্মা 'রাম বলো' বলে হাঁফ ছাড়তেই চড়াইটা ডাক দিলে, 'বলি তম্মা।'

'করো কী।' বলে কুঁকড়ো তাকে এক ধমক দিলেন, কিন্তু চড়াইটা আরো চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বলি, ও তম্মা।' তম্মার গোমসা মুখ আবার বেড়ার উপর দিয়ে উঁকি দিলে। কুঁকড়ো রেগে ফুলতে লাগলেন, চড়াই তম্মাকে বললে, 'খুঁজে খুঁজে নারি যে পায় তারি।'

তম্মা শুধোলে, 'কী খুঁজে দেখি, বলো তো ভাই?'

'চটপট তোমার ফোগলা গালের চির-খাওয়া দাঁতটি।' বলেই চড়াই সট করে নিজের খাঁচায় ঢুকল; 'চোপরাও' বলে তম্মা সে তল্লাট ছেড়ে চোঁচা চম্পট।

৩

ডালকুত্তোটা মাঠের ওপারে চলে গেছে। কুঁকড়ো সবাইকে অভয় দিয়ে ঘরের মটকা থেকে হাঁক দিলেন, 'ত-ত-তফাত গিয়া।' অমনি সে-মোনালিয়া বাক্সের মধ্যে থেকে বেরিয়ে উঠোনময় নেচে বেড়াতে লাগল যেন আলোর চরকিবাজি। কুঁকড়ো তার সেই ঝকঝকে রূপ দেখে ভারি খুশি হয়ে মনে মনে বললেন, 'আহা এমন পাখিকেও কেউ গুলি করে। এর দিকে বন্দুক করা, আর একটি মানিকের পিদুমে তাগ করা একই।' মোনালির কাছে আস্তে

আস্তে এসে কুঁকড়ো শুধোলেন, 'সূর্যের আলোর মতো কোন্ পুব-আকাশের সোনার পুরী থেকে তুমি এলে সোনালিয়া বনমুরগি।'

মোনালি মাখমের মতো নরম সুরে বললে, 'আমি ওই বনে আছি বটে কিন্তু ওটা তো আমার দেশ নয়।' কুঁকড়ো তাঁর সবচেয়ে মিষ্টি সুরে শুধোলেন, 'তবে কোথায় তোমার দেশ সোনালিয়া বিদেশিনী।' মোনালি উত্তর করলে, 'তা তো মনে নেই। শুনেছি বরফের পাহাড়ের ওপারে যে-দেশ, সেখানকার মাটি ফুল-কাটা গালচেতে একেবারে ঢাকা, সেইখানের কোন্ অশোক বনের রানীর মেয়ে আমি। আমার একটু একটু স্বপ্নের মতো মনে পড়ে—চমৎকার নীল আকাশের তলায় বড়ো বড়ো গাছের ছাওয়ায় সখীদের সঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছি অশোক বনের দুলালী। আমাদের ঘরের চারি দিকে কত রঙের ফুল ফুটেছে, ভোমরা সব উড়ে উড়ে পদ্মের মধু খেয়ে যাচ্ছে। কেবল পাখি আর প্রজাপতি আর ফুল। একটাও শিকারী ডালকুত্তো নেই। মানুষরা পর্যন্ত সেখানে আমাদের মতো চমৎকার সব রঙিন সাজে সেজে রাজা-রানীর মতো বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। নন্দন-কাননে আনন্দে ঘুরে বেড়াতেই আমি জন্মেছি, ডালকুত্তোর তাড়া খেয়ে ছুটোছুটি করে মরতে তো নয়। আহা, সেখানকার সূর্যের লাল আভা রক্ত-চন্নন আর কুসুম-ফুলের রঙে মিশিয়ে বুকে মেখে রেখেছি, এই দেখো।' বলে সোনালিয়া কুঁকড়োর গা-ঘেঁষে দাঁড়াল। কুঁকড়ো আনন্দে ডগমগ হয়ে ঘাড় দুলিয়ে ডানা কাঁপিয়ে তালে-তালে পা ফেলে সোনালিয়ার চারি দিকে খানিক নৃত্য করে আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে বললেন, 'মনো মোনালিয়া। শোনো সোনালিয়া বিদেশিনী বনের টিয়া—' হঠাৎ মোনালি বলে উঠল, 'ইস্।'

কুঁকড়ো একটু থতমত খেয়ে গেলেন। বুঝলেন সোনালিয়া সহজে ভোলবার পাত্রী নয়। যে-কুঁকড়ো তাদের দিকে একটিবার ঘাড় হেলালে সাদি কালি গোলাপি গুলজারি সব মুরগিই আকাশের চাঁদ হাতে পায় মনে এমনি করে, সেই জগৎবিখ্যাত কুঁকড়োকে

মোনালি মুখের সামনে শুনিয়ে দিলে যে জগতের সবাই যাকে ভালোবাসে এমন কুঁকড়োয় তার দরকার নেই ! সে বেছে বেছে সেই কুঁকড়োকে বিয়ে করবে যার নাম-যশ কিছুই থাকবে না ; থাকবার মধ্যে থাকবে যার মনমোনালিয়া বনের টিয়া একমাত্র মুরগি ।

কুঁকড়ো খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'একবার গোলাবাড়ির চার দিক দেখে আসবেন চলুন ।' বলে তিনি সোনালিয়াকে খুব খাতির করে সব দেখাতে লাগলেন । প্রথমেই, যেটা থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়লে সোনালিয়ার মুখে চোখে জল ছিটিয়ে কুঁকড়ো তাকে বাঁচিয়েছিলেন সেই টিনের গামলাটা আর যে কাঠের বাক্সটায় সোনালিয়াকে লুকিয়ে রেখে তম্মার চোখে ধুলো দিয়েছিলেন সেই দুটো জিনিস দেখিয়ে বললেন, 'এগুলো নতুন কিনা, কাজেই কুচ্ছিৎ ; কিন্তু পুরোনো দেয়াল, ভাঙা বেড়া, ফাটা দরজা, পুরোনো ওই মুরগির ঘরটি আর কতকালের ওই লাঙল, ধানের মরাই আর ওই শেওলায় সবুজ খিড়কির দুয়োর আর পানাপুকুর আর ওই কুমড়োলতার থোকা-থোকা ফুল, কী সুন্দর এগুলি ।'

সোনালিয়া কোনোদিন তো ঘরকন্নার ব্যাপার দেখে নি, সে কেবলি কুঁকড়োকে শুধোতে লাগল, 'এ-সব নতুন জিনিসের মধ্যে থাকায় কোনো ভয় নেই তো ।' কুঁকড়ো তাকে বললেন, 'আমরা বেশ নির্ভয়ে আছি —মোরগ মুরগি হাঁস এবং মানুষ । কেননা, এ-বাড়ির কর্তা —তিনি নিরামিষ খান, কাজেই আণ্ডা বাচ্ছা নিয়ে আমাদের সুখে থাকবার কোনো বাধা নেই । ওই দেখুন-না, বেড়াল পাঁচিলের উপর ঘুমিয়ে আছে, আর ঠিক তার নিচেই আমার সব-ছোটো বাচ্ছাটা খেলে বেড়াচ্ছে গাঁদা গাছটার তলায় ।' ইতিমধ্যে চড়াইটা চট করে কখন্ চিনে-মুরগিকে সোনালিয়ার খবরটা দিয়ে ফুড়ুৎ করে উঠোনে এসে বসল । সোনালিয়া শুধোলেন, 'ইনি ?' চড়াই অমনি উত্তর দিলে, 'ইনি একমাত্র চিনে-মুরগিকে আপনার শুভ আগমন জানিয়ে এলেন । তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলেন বলে ।' কুঁকড়ো পরিচয় দিলেন, 'ইনি তল-চটকমশায়, সর্বদা

কাজে ব্যস্ত। সোনালিয়া শুধোলে, 'কী কাজ।' চড়াই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলে, 'বড়ো কঠিন কাজ, নিজের ধন্ধায় ফিরছেন ইনি, পাছে কেউ উপর-চাল চেলে টেক্কা দেয়।'

সোনালিয়া বললে, 'হ্যাঁ কাজটা শক্ত বটে, কিন্তু অতি ছোটো।'

কুঁকড়ো অন্য কথা পেড়ে সোনালিয়াকে চুনখসা দেয়ালের ধারে পুরোনো জাঁতাটা দেখিয়ে বললেন, 'ওই পাঁচিলটার উপরে দাঁড়িয়ে আমি যখন গান করি তখন সোনালী রঙের গিরগিটিগুলো দেয়ালের গায়ে চুপ করে বসে শোনে। মনে হয় যেন ওই জাঁতার মোটা পাথর দুখানাও দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে-বসে আমার গান শুনছে। এইখানটিতে আমি গান গাই, এইখানের মাটি আমি পরিষ্কার করে আঁচড়ে রেখেছি। আর এই যে পুরোনো লাল মাটির গামলা, গানের পূর্বে ও পরে প্রতিদিন এরি থেকে এক চুমুক জল না খেলে আমার তেষ্টাও ভাঙে না, গলাও খোলে না।' সোনালিয়া একটু হেসে বললে, 'তোমার গলা খোলা না-খোলায় বুঝি খুব আসে যায় তোমার বিশ্বাস।'

'অনেকটা আসে যায় সোনালি।' গম্ভীরভাবে কুঁকড়ো বললেন।

'কী আসে যায় শুনি?' সোনালিয়া নাক তুলে বললে।

কুঁকড়ো বললেন, 'ওই গোপন কথাটা কাউকে বলবার সাধ্য আমার নেই।'

'আমাকেও না?' কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে এসে অভিমানের সুরে সোনালিয়া বললে, 'আমি যদি বলতে বলি, তবুও না?'

কুঁকড়ো কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে সোনালিকে এক বোঝা কাঠ দেখিয়ে বললেন, 'আমাদের প্রিয়বন্ধু, রান্নাঘরে শ্মশানে চ, ইনি চালা কাঠ।' 'এ যে আমার বন থেকে চুরি করা দেখছি।' বলে সোনালিয়া আবার শুধোলে, 'তবে তোমারও একটা গুপ্ত মন্তর আছে।'

'হ্যাঁ বন-মুরগি।' এই কথাটা কুঁকড়ো এমনি সুরে বললেন যে সোনালিয়া বুঝলে গোপন কথাটা জানবার চেষ্টা এখন বৃথা।

কুঁকড়ো সোনালিকে নিয়ে গোলাবাড়ির বাইরের পাঁচিলে উঠলেন। সেখান থেকে তিনি দেখালেন দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে জলের মতো সাদা একটা সরু সাপ কতদিন ধরে যে নামছে তার ঠিক নেই।

সব দেখে শুনে সোনালিয়া কুঁকড়োকে বললে, 'এইটুকু জায়গা, তাও আবার নেহাত কাজ-চলা-গোছের জিনিসপত্তরে ভরা, এখানে একঘেয়ে দিনগুলো কেমন করে তোমরা কাটাও বুঝি না। আকাশ দিয়ে যখন পাখিরা উড়ে চলে তখন তোমার মন নতুন দেশ বড়ো-পৃথিবীটা দেখবার জন্যে একটুও আনচান করে না?'

কুঁকড়ো বললেন, 'একটুও নয়। পৃথিবীতে একঘেয়ে দিনও নেই, পুরোনোও কিছু হয় না। আমি এইটুকু জায়গাকেই প্রতিদিন নতুন নতুন ভাবে দেখতে চাই। কিসের গুণে তা জান? আলোর গুণে।'

সোনালি অবাক হয়ে বললে, 'আলোর গুণে। সে আবার কী রকম।'

'দেখো'সে।' বলে কুঁকড়ো একটি স্থলপদ্মের গাছ দেখিয়ে বললেন, 'দিনের আলোর সঙ্গে এই ফুলের রং ফিকে থেকে গাঢ় লাল হবে দেখবে। এই খড়ের কুটিগুলো আর এই লাঙলের ফলাটা আলো পেয়ে দেখো কত রকমই রং ধরছে। ওই কোণে মইখানার দিকে চেয়ে দেখো ঠিক মনে হচ্ছে নাকি এটা যেমন দাঁড়িয়ে ঘুমচ্ছে আর ধানখেতের স্বপ্ন দেখছে। আর মানুষ যেন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, ঠিক তেমনি করে ওই পিঁপড়েগুলো দেখো এই চিনেমাটির জালাটার চারি দিক প্রদক্ষিণ করে আসছে আট পল এক বিপলের মধ্যে। পলকে পলকে এখানকার সব জিনিসই নতুন নতুন ভাব নিয়ে দেখা দিচ্ছে নতুন আলোতে। আর আমিও কুঁকড়ো ওই মইখানার মতো আপনার কোণটিতে দাঁড়িয়ে রোজ রোজ কত আশ্চর্য ব্যাপারই দেখছি। দেখে দেখে চোখ আর তৃপ্তি মানছে না; চোখের দৃষ্টি আমার নতুনের পর নতুন, ছোটো এই গোটাকতক

জিনিসের অফুরন্ত শোভা, এই ক-টা সামান্য জিনিসের অসামান্য রূপ দেখতে দেখতে দিন দিন খুলেই যাচ্ছে, বেড়েই চলেছে, ডাগর হয়ে উঠছে মহা বিস্ময়ে। ওই কুঞ্জলতার কুঁড়িটি ফুটতে দেখে যে আনন্দ পাই মুরগির ডিমগুলি যখন ফোটে বাচ্ছাগুলির চোখ যখন ফোটে তখনো আমি তেমনি আনন্দ পেয়ে গেয়ে উঠি। একটুকু জায়গা, এখানে কী যে সুন্দর নয় তা তো আমি জানি নে।'

কুঁকড়োর কথা শুনতে শুনতে সোনালিয়া ক্রমেই অবাক হচ্ছিল। ছোটোখাটো সব সামান্য জিনিসের উপরে আলো ধরে এমন চমৎকার ক'রে তো কেউ তাকে দেখায় নি। আপনার ছোটো কোণটিতে চুপচাপ বসে থেকেও যে সবই খুব বড়ো করে দেখা যায় আজ সোনালি সেটি বুঝে অবাক হল।

কুঁকড়ো বললেন, 'সব জিনিসকে যদি তেমন করে দেখতে পার তবে সুখ দুঃখের বোঝা সহজ হবে; অজানা আর কিছু থাকবে না। ছোটো একটি পোকার জন্ম মরণের মধ্যে পৃথিবীর জীবন আর মৃত্যু ধরা রয়েছে দেখো, একটুখানি নীল আকাশ ওরি মধ্যে কত কত পৃথিবী জ্বলছে নিভছে।'

মুরগি-গিন্নি অমনি পেঁটরার মধ্যে থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে, 'কুয়োর তলে পানি, আকাশকেই জানি।' পেঁটরার ডালা আবার বন্ধ হবার আগেই কুঁকড়ো সোনালিকে মায়ের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। মুরগি-গিন্নি চোখ মটকে চুপি চুপি বললেন, 'বড়ো জবরদস্ত কুঁকড়ো, না?'

সোনালি মিহি সুরে বললে, 'হুঁ, উনি খুব বিদ্বান বুদ্ধিমান।'

এদিকে কুঁকড়ো জিম্মাকে বলছিলেন, 'সোনালিয়ার সঙ্গে দুদণ্ড কথা কয়ে আরাম পাওয়া যায়, সব-বিষয়ে সে কেমন একটু উৎসাহ নিতে জানতে চেষ্টা করে দেখেছ।'

এমন সময় কিচমিচ চেঁচামেচি করতে করতে মাঠ থেকে দলে-দলে হাঁস মুরগি ধাড়ি বাচ্ছা সবাইকে নিয়ে চিনে-মুরগি উপস্থিত। এসেই সবাই সোনালিয়াকে ঘিরে 'আহা কী সুন্দর' 'ক্যাবাৎ' 'বাহবা'

'বেহেতর' এমনি সব নাম্মা কথা বলতে লাগল। কুঁকড়ো একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে এই ব্যাপার দেখছিলেন। কী সুন্দর দেখাচ্ছে সোনালিয়াকে। তার চলন বলন সবই বেশ কেমন একটু ভদ্দর রকমের। গোলাবাড়ির কোনো মুরগিই এমন নয়। চিনে-মুরগিরও সোনালি বউ করবার সাধ একটু যে না হয়েছিল তা নয়; সে তাড়াতাড়ি নিজের ছেলের সঙ্গে সোনালিয়ার ভাব করে দিতে দৌড়ল।

কুঁকড়ো এইবার তাঁর সব মুরগিদের ঘরে যেতে হুকুম দিলেন। সোনালিয়া আরো খানিক তাদের সঙ্গে গল্প করবার ইচ্ছে করায় কুঁকড়ো বললেন, 'ওদের সব সকাল সকাল ঘুমনো অভ্যেস।' মুরগিরা একটু বিরক্ত হয়ে সব শুতে চলল মই বেয়ে নিজের নিজের খোপে। সোনালিয়া শুধলে, 'কোথায় যাচ্ছ ভাই।'

এক মুরগি বললে, 'বাড়ি চলেছি। এই যে আমাদের ঘরে যাবার সিঁড়ি।'

মই বেয়ে মুরগিদের উঠতে দেখে সোনালিয়া অবাক হয়ে গেল। বনের মধ্যে তো এ-সব কিছুই নেই।

চিনে-মুরগি সোনালিয়ার সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টায় আছেন, সোনালিয়া তাকে বললে যে, এখনি তাকে আবার বনে ফিরে যেতে হবে, গোলাবাড়িতে সে কেবল দুদণ্ডের জন্যে এসেছে বৈ তো নয়। ঠিক সেই সময় দূরে দুম করে আবার বন্দুকের আওয়াজ হল। এখনো শিকারীগুলো বন ছেড়ে যায় নি, কাজেই সোনালিকে কিছুতেই বনে একলা পাঠাতে কুঁকড়োর একটু ইচ্ছে নেই। গোলাবাড়ির সবাই তাকে আজকের রাতটা কোনোরকমে সেখানে কাটাতে অনুরোধ করতে লাগল। জিম্মা নিজের বাক্সটা রাতের মতো সোনালিকে ছেড়ে দিয়ে বাইরে শুতে রাজি হল। বন্ধ ঘরের মধ্যে সোনালি কোনোদিন শোয় নি; কিন্তু কী করে। প্রাণের দায়ে তাতেই সে রাজি হল। চিনে-মুরগির আহ্লাদ আর ধরে না, সে সোনালিকে তার সকালের মজলিসে যাবার জন্যে আবার ধর-

পাকড় করতে লাগল। এমন সময় অন্ধকার হয়ে আসছে দেখে কুঁকড়ো ডাক দিলেন, 'চুপ রহ। চুপ রহ।' তার পর মইটা বেয়ে মটকায় উঠে তিনি চারি দিকটা একবার বেশ করে দেখে নিলেন, হাঁস মোরগ মুরগি কাচ্ছা বাচ্ছা সবাই আপনার আপনার খোপে যে যার মায়ের কোলে ডানার নিচে সেঁধিয়েছে কি না। চিনে-মুরগি সোনালির কানে কানে বললে, 'মনে থাকবে তো ভাই, কুলতলায় ভোর পাঁচটা থেকে ছটার সময়। ময়ূর নিশ্চয় আসবেন, কাছিম বুড়োও আসবেন বোধ হয়, আর সুরকি-দিদি বলেছে কুঁকড়োকেও নিয়ে যাবে।' কুঁকড়ো একবার সুরকির দিকে চেয়ে দেখলেন, সুরকি খোপ থেকে আস্তে আস্তে মুখটি বার করে গিন্নিপনা করে বললে, 'তুমিও যাবে তো। চিনি-দিদির ভারি ইচ্ছে। আমারও ইচ্ছে তুমি পাঁচজনের সঙ্গে একটু মেশো, ছেলেমেয়ের তো বিয়ে দিতে হবে।'

কুঁকড়ো সাফ জবাব দিলেন, 'না।' সোনালি মইখানার নিচে থেকে কুঁকড়োর দিকে মুখ তুলে খুব মিষ্টি করে বললে, 'যেতেই হবে তোমায়।'

কুঁকড়ো মুখ নিচু করে বললেন, 'কেন বলো তো।' সোনালিয়া বললে, 'সুরকি-দিদির আবদারে তুমি অমন 'না' করলে যে।'

কুঁকড়ো একটু গললেন। 'আমি তা —' তার পর খুব শক্ত হয়ে বললেন, 'না, কিছুতেই যাব না। রাত হল', বলে কুঁকড়ো অন্য দিকে চাইলেন। সোনালি একটু বিরক্ত হয়ে কুকুরের বাক্সতে গিয়ে সেঁধলেন।

রাত্রির নীল অন্ধকার ক্রমে ঘনিয়ে এসেছে। একে-একে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। জিম্মা ঘরের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে শুয়েছে। চিনি-দিদি ঘুমের ঘোরে এক-একবার বকতে লেগেছে, '৫টা থেকে ৬টা।' তাল-চড়াইটা তার খাঁচার এককোণে গুটিসুটি হয়ে ঘুম দিচ্ছে। কুঁকড়ো তখনো মটকার উপরে খাড়া দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন আর চারিদিক চেয়ে দেখছেন। একটা দুষ্টু বাচ্ছা রাতের বেলায় চুপি

চুপি উঠোনে বার হয়েছে দেখে কুঁকড়ো তাকে এক ধমক দিয়ে তাড়িয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন। তার পর আস্তে আস্তে সোনালির খাঁচাটার কাছে গিয়ে কুঁকড়ো বললেন, 'সোন।' ঘুম ঘুম সুরে সোনালিয়া উত্তর দিলে 'কী।' কুঁকড়ো একবার বললেন, 'না।' তার পর আবার নিশ্বেস ছেড়ে বললেন, 'নাঃ, কিছু নয়।' বলে কুঁকড়ো মই বেয়ে উপরে চলে গেলেন। উপরে গিয়ে কুঁকড়ো একবার হাঁক দিলেন, 'রাত, ভারী রাত!' তার পর কুঁকড়ো সে রাতের মতো চোখ বুজলেন খোপে ঢুকে।

চার দিক নিশুতি হল আর অমনি কালো বেড়ালের সবুজ চোখগুলো অন্ধকারে ঝকঝক করে উঠল। অমনি ভোঁদড় বললে, 'আমি তবে চোখ খুলি।' ভাম বললে, 'আমিও।' দুজোড়া চোখ তাদের আলেসে জ্বলজ্বল করে ঘুরতে লাগল। ছুঁচো ইঁদুর আর বাদুড় তিনজনেই বললে, 'আমরাও তবে চোখ খুললেম।' কিন্তু তাদের চোখ এত ছোটো যে খুলল কি না বোঝা গেল না, কেবল তাদের টিক টিক আওয়াজ শোনা গেল। একটু পরেই অন্ধকার থেকে তিনটে পেঁচা আগুনের মতো তিন জোড়া চোখ খুলে দৃষ্টি করে দেখা দিলে। তখন সবুজ হলদে লাল —সব চোখ এ ওর দিকে চাওয়া চাওয়ি করতে থাকল আর বলাবলি করতে লাগল, 'আছ তো? এসেছ? আছ তো, এঁ্যা এঁ্যা।' বেড়াল পেঁচাকে বললে, 'আছ তো।' পেঁচা ভোঁদড় বাদুড়কে, এমনি সবাই সবাইকে বললে, 'আছ তো। ঠিক আছ তো। ঠিক আজকে তো। আজও তো ঠিক।' বেড়াল শুধলে, 'আজই নাকি।' পেঁচা-তিনটে জবাব দিলে, 'হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ।' চড়াই খাঁচার মধ্যে জেগে উঠে শুনলে এক পেঁচা আর-এক পেঁচাকে শুধচ্ছে, 'ঘেঁটে কিসের।' অন্য পেঁচা বলছে, কুঁকড়োর সর্বনাশের ঘোঁট রে ঘোঁট।' ভোঁদড় অমনি শুধলে, 'কো-ও-থায়।' পেঁচারা উত্তর দিলে, 'পাকুড়তলে, পাকুড়তলে, পাকুড়তলে, পাকুড় পাকুড় পাকুড়তলে।' ভাম শুধলে, 'ক-খ-ন।' উত্তর হল, 'আটটায়

ঘুঁট। আটটায় ঘুঁট। আটটায় ঘুঁট। ঘুট ঘুটে রাতে। ঘুট ঘুটে রাতে।'

রাতের আঁধারে বাদুড়গুলো জাদুকরের হাতে তাসের মতো একবার দেখা দিচ্ছিল আবার কোথায় উড়ে যাচ্ছিল। বেড়াল পেঁচাকে শুধলে, 'বাদুড় তো আমাদের দলে বটে।' পেঁচা বললে, 'হাঁ নিশ্চয়।' 'ছুঁচো ইঁদুর?' 'হাঁ তারাও।'

বেড়াল বাড়ির দরজা আঁচড়ে বললে, 'পিউ পিউ পিউ। দিয়ো পিউ আটটায় ঘড়ি দিয়ো দিয়ো দিয়ো'। পেঁচা শুধলে, 'ঘড়িটাও এ দলে নাকি।' বেড়াল উত্তর করলে, 'নি-শ-চ-য়। নিশাচর সবাই এ দলে; তা ছাড়া দিনের বেলারও দু-চার জন আছেন।' পেরু আর দু-চার জন উঠোনের এককোণে লুকিয়ে ছিল, আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। পেরু শোধালে, 'ড্যাবা চোখ, ঢাকা মুখ। সব ঠিক তো।' উত্তর হল, অন্ধকার থেকে —'হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ। সব ঠিক, ঘুঁটটা ঠিক, এ পাড়া ঠিক, ও পাড়া ঠিক।' তাল-চড়াই মনে মনে বললে, 'সেও যাচ্ছে ঠিক।'

কুকুর এমন সময় গা-ঝাড়া দিয়ে বলে উঠল, 'কে ও।' অমনি সব নিশাচরগুলো চমকে উঠে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। বেড়াল তাদের সাহস দিয়ে বললে, 'ও কিছু নয়, বুড়িটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বকছে।' কিন্তু এবার কুঁকড়ো যেমন একটু গা-ঝাড়া দিয়ে সাড়া দিয়েছেন, 'কি-ই-ও।' অমনি সব নিশাচর —পেঁচা, বেড়াল, এমন-কি, পেরু পর্যন্ত 'ওইগো' বলেই পালাই পালাই করতে লাগল। পেরু, তিনি পালানোই স্থির করলেন, তাঁর গলার থলি থেকে পা পর্যন্ত ভয়ে কাঁপছিল; বেড়ালের যেন জ্বর এসে পড়ল, পেঁচাগুলো চোখ বুজলেই অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে জানে, তারা অমনি খপ করে চোখের পাতা বন্ধ করে ফেললে। একসঙ্গে সব জ্বলন্ত চোখ নিভে গেল। রাত্রি যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। কুঁকড়ো ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চড়াইকে শুধলেন, 'কারা যেন ফুসফাস করছিল না।'

চড়াই বললে, 'শুনছিলেম বটে একটা ঘোঁট চলেছে।' ঘুটঘুটে অন্ধকারে সব ঘুঁটেগুলো এমন কাঁপতে লাগল যে রাত্রিটা দুলছে বোধ হল।

কুঁকড়ো বললেন, 'বটে, ঘোঁট চলেছে?'

চড়াই বললে, 'হাঁ তোমার সর্বনাশের, সাবধান।' 'বয়ে গেল।' বলে কুঁকড়ো আবার গিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

চড়াই আবার ভালোমানুষটির মতো গা-ঝাড়া দিয়ে বসল। সে ঠিক-ঠিক কথাই বলেছে কিন্তু কেমন দুদিক বাঁচিয়ে বলেছে। যুধিষ্ঠিরের অশ্বত্থামা-হত-ইতি-গজ গোছের। কথাটা চড়াইয়ের মুখে শুনে কিন্তু পেঁচাদের সন্দেহ বাড়ল। 'চড়াই সত্যিই তাদের দলে কি না' শুধাতে অন্ধকারের মধ্যে একটার পর একটা চোখ চড়াইয়ের দিকে চাইতে লাগল। চড়াই বললে, 'আমি বাপু কোনো দলে নেই; তবে ঘোঁটটা কেমন চলে দেখতে ইচ্ছে আছে!' পেঁচাকে চড়াই খায় না, কাজেই ঘোঁটে গেলে কোনো বিপদ তার নেই বলে পেঁচারা চড়াইকে মন্ত্রণাসভায় যাবার স্থানটি বাতলে দিয়ে বললে,' চোরের মন পুঁই-আঁদাড়ে, এই শোলোক বললেই সে দরজা খোলা পাবে।'

এ দিকে ঘরের মধ্যে থেকে সোনালিয়ার হাঁপ ধরছিল; সে একটু ভালো হাওয়া পেতে ঘর থেকে মুখ বার করেই সব নিশাচরকে দেখে 'একী!' বলে চমকে উঠল। অমনি সব চোখ একসঙ্গে ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ আর সাড়া-শব্দ নেই। তখন অন্ধকারে একটির পর একটি চোখ খুলল আর বলাবলি শুরু হল। সোনালিয়া চুপ করে শুনছে কে একজন উঠোনের ও-কোণ থেকে বললে, 'বেঁচে থাকো পেঁচা-পেঁচিরা।' পেঁচারা শুধলে, 'আমরা তো নামটি পর্যন্ত সইতে পারি নে তা জানো, কিন্তু তোমরা তার উপর চটা কেন বলো তো।'

দিনের বেলায় যারা দুষ্টবুদ্ধি লুকিয়ে বেড়ায়, রাত্রে তাদের পেটের কথাটা আপনিই যেন প্রকাশ হয়ে পড়ে। বেড়াল খুব চাপা

জন্তু। কিন্তু আগেই তার কথা বেরিয়ে পড়ল, 'ওই কুকুরটার সঙ্গে অত তার ভাব বলেই কুঁকড়োটাকে দুচক্ষে আমি দেখতে পারি নে।' পেরু বললেন, 'যাকে সেদিন জন্মাতে দেখলেম সে আজ কর্তা হয়ে উঠল, এটা আমি কিছুতেই সইব না। এইজন্যে আমার রাগ ওটার উপর।' রাজহাঁস বললে, 'ওর পা দুখানা বড়ো বিশ্রী, একেবারে হাঁসের মতো নয়। দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে, গোড়ালির ছাপ তো নয়, চলবার বেলায় মাটির উপরে বাবু যেন তারাফুল কেটে চলে যান। কী দেমাক।' কেউ বললে, 'কুঁকড়োর চেহারাটা ভালো বলেই সে তাকে পছন্দ করে না। কেন সে নিজে কুচ্ছিত হল কুঁকড়োটা হল না!'

আর কেউ কেউ বললে, 'সব ক-টা গির্জের চুড়োতে তার সোনার মূর্তি দেখলে কার না গা জ্বালা করে। নিশ্চয়ই ও পাখিটা কিস্টান। ওকে জাতে ঠেলাই ঠিক। মোচলমানের সঙ্গে এক ঘটিতে জল খেতে আমি ওকে স্বচক্ষে দেখেছি। ওর কি বাচবিচার আছে। ওর ছায়া মাড়াতে ভয় হয়।'

ঠিক সেই সময় ঘড়ি পড়ল আর ঘড়ির মধ্যে কলের পাখি বলে উঠল, 'পি-পি-পি-রা-আ-আ-লি।'

মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ অমনি উঁকি দিলেন। উঠোনের এক কোণে খানিক আলো পড়ল। ছুঁচো আস্তে আস্তে মুখ বার করে পেঁচাকে বললে, 'আমার সে পাজিটার সঙ্গে কোনোদিন চোখো-চোখিই নেই।'

ঘড়িকলের পাখিটাকে আর শুধতে হল না; সে আপনিই বললে, 'একটুতে আমার দম ফুরিয়ে যায়, রোজ দম না দিলে মুশকিল, আর কুঁকড়োর দমের শেষ নেই।' বলেই গলা ঘড় ঘড় করে ঘড়িপাখি চুপ করলে। টং টং করে আটটা বাজল। পেঁচারা সব ডানা মেলে বললে, 'আর আমরা কুঁকড়োকে একটুও ভালোবাসি নে, কেননা—কেননা ও কিনা—সে কিনা' বলতে বলতে অন্ধকারের মধ্যে পেঁচারা উড়ে পড়ল নীল রাত্রির মধ্যে।

একলা সোনালিয়া উঠোনে দাঁড়িয়ে বললে, 'আর কুঁকড়োকে আমি এখন খুব ভালোবাসি, কেননা —কেননা —সবাই তাঁর শত্রু।'

খেত আর আবাদ যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানে পাহাড়ের একটা ঢল, সেইখানে পেঁচাদের ঘোঁটের মজলিশ বসবে। অতি নোংরা ঢালু জমি; শেয়ালকাঁটা, বাবলাকাঁটায় ভরা; উপরে মস্ত পাকুড় গাছটা, সরু একটা পাগদণ্ডি বেয়ে সেখানে উঠতে হয়। রাত্রে জায়গাটাতে এলে ভয় করে কিন্তু দিনের বেলায় যখন সূর্য ওঠে, এখান থেকে ছায়ায় বসে পাহাড়ে ঘেরা গ্রাম, নদী সবই অতি চমৎকার দেখায়।

পাকুড় গাছে, লতা-পাতায় ঝোপে-ঝাড়ে জায়গাটা এমনি ঢাকা যে একবিন্দুও চাঁদের আলো সেখানে পড়তে পায় না। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে হুতুম পেঁচার চোখ টিপটিপ করে জ্বলছে, আর কিছু দেখাও যাচ্ছে না, শোনাও যাচ্ছে না, অথচ অনেক পাখিই আজ সেখানে জুটেছে ঘোঁট করতে। পেঁচার সর্দার হুতুম একে একে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, আর চার দিকে একটার পর একটা লাল, নীল, হলদে, সবুজ চোখ জ্বালিয়ে দেখা দিতে থাকল একে একে ধুঁধুল পেঁচা, কাল্ পেঁচা, কুটুরে পেঁচা, গুড়গুড়ে পেঁচা, দেউলে পেঁচা, দালানে পেঁচা, গেছো পেঁচা, জংলা পেঁচা, পাহাড়ী পেঁচা। হুতুমথুমো ডেকে চলেছে, 'ভুতো পেঁচা, খুদে পেঁচা, চিলে পেঁচা, গো-পেঁচা, গোয়ালে পেঁচা, লক্ষ্মী পেঁচা,' লক্ষ্মী পেঁচার দেখা নেই, চোখও জ্বলছে না। হুতুম ঘাড় ফুলিয়ে রেগে ডাক দিলে, 'ল-ক্-ষ্মী-পেঁ-এঁ্যা-এঁ্যা-চা-আ-আ।' লক্ষ্মী পেঁচা তাড়াতাড়ি এসে চোখ খুলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'অনেক দূর থেকে আসতে হয়েছে, বিলম্ব হয়ে গেল।' চিলে পেঁচা চেঁচিয়ে বললে, 'সেইজন্যেই ত্বরা করা তার উচিত ছিল।'

সব পেঁচা একত্র হয়েছে, তখন হুতুম গম্ভীরভাবে বললেন, 'কাজ আরম্ভ হবার আগে এসো ভাই সব এককাট্টা হয়ে এক সুরে নিজের নিজের ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে দিই, হুতুম-থুম, হুতুম-তুম।

লাগ লাগ ঘুঁট। লাগ লাগ ঘুঁট। দে ধুলো, দে ধুলো, দে ধুলো, চোরা-আ-আ গো-ফ-তা।' সমস্ত রাত্রিটার অন্ধকার বিকট শব্দে ভরে দিয়ে পেঁচাগুলো ডানা ঝাপটাতে লাগল, আর অন্ধকারের জয় দিতে থাকল,

ঘুটঘুটে আঁধারে
আমরা খুলি চোখ,
—যত লাল চোখ।
বুকে বসাই নোখ,
রক্তে গিলি ঢোক।
হাড় ভাঙি আর ঘাড় ভাঙি
আর দিই কোপ
ঝোপ বুঝে কোপ।
আঁদাড়ে কোপ, পাঁদাড়ে কোপ।

'চোপ চোপ' বলে হুতুম সবাইকে থামিয়ে গম্ভীর সুরে আঁধারের স্তুতি আওড়ালেন, 'নিঝুম রাত, দুপুর রাত, নিশুত রাত। কেষ্ট পক্ষের কষ্টি পাথর কালো আকাশের কালো রাত। বর্ষাকালের কাজলমাখা পিছল রাত। নিখুঁত রাত। কালোর পরে একটি খুঁত তারার টিপ। ভয়ংকরী নিশীথিনী, বিরূপা ঘোর, ছায়ার মায়া, থাকুন, তিনি রাখুন। নিশাচর নিশাচরী রক্তপাত করি, আচম্বিতে নিঝুম রাতে, দুপুর রাতে। নষ্টচন্দ্র, ভ্রষ্ট তারা, ভিতর-বার অন্ধকার-রাত সারা রাত। নিঝুম দুপুর, নিখুঁত দুপুর, অফুর রাত।'

হুতুম পেঁচা চুপ করলেন। খানিক চারি দিক যেন গমগম করতে লাগল, কারু সাড়া-শব্দ নেই, অন্ধকারে কেবল ছুঁচোর খুসখাস আর বেড়ালের গা-চাটার চটচট শোনা যেতে লাগল। পাকুড়তলায় এত বড়ো গম্ভীর মজলিশ কোনোদিন বসে নি।

এইবার বয়েসে সবার বড়ো চিলে পেঁচার পালা। সে চড়া গলায় চিৎকার করে শুরু করলে, 'ভাই সব।' সব জ্বলন্ত চোখগুলো অমনি চিলের দিকে ফিরল। 'ভাই সব, আমরা আজ এই

কতকালের পুরোনো মিশকালো পাকুড়তলায় ঘুটঘুটে আঁধারে কেন এসেছি জান? খুন খুন খুন করতে, এ আমি চেঁচিয়েই বলব। কিসের ভয়। কাকে ভয়।' তার পর একেবারে নবমে গলা চড়িয়ে চিলে বললে, 'ভয় করব না, চেঁচিয়েই বলি, কুঁকড়োটা চো-ও-ও-র', বলেই বুড়ো চিলের গলা ভেঙে গেল, সে খক খক করে কাশতে লাগল, আর অন্য সব পেঁচা চেঁচাতে থাকল, 'চোর। ডাকাত। সিঁদেল। বদমাশ। আমাদের সর্বস্ব নিলে।'

চড়াই অমনি বলে উঠল, 'কী নিলে শুনি।'

'আমাদের আনন্দ, আমাদের তেজ সবই হরণ করছে জান না?' বলে পেঁচাগুলো চড়াইয়ের দিকে কটমট করে চাইতে লাগল।

চড়াই একটু দূরে সরে একটা বাঁশঝাড়ে বসে শুধলে, 'তোমাদের তেজ কেমন করে হরণ করলে সে।'

'কেন, গান গেয়ে। তার সুর শুনলেই আমাদের দুঃখু আসে, বেদনা বোধ হয়; সব পেঁচারই মন খারাপ হয়ে যায়, কেননা তার সাড়া পেলেই মনে পড়ে।'

'আলো আসছে।' বলেই চড়াই সট করে বাঁশঝাড়ে লুকল। হুতুম রেগে চড়াইকে বললে, 'চুপ। খবরদার, ও জিনিসের নাম আর কোরো না, ও নাম শুনলেই রাত্রির মন চঞ্চল হয়ে যেন পালাই পালাই করতে থাকে।'

চড়াই বেরিয়ে এসে বললে, 'আচ্ছা না-হয় দিন আসছে বলা যাক।'

অমনি সব পেঁচা শিউরে উঠে চারি দিকে 'উ আঁ' করতে লাগল আর কানে ডানা ঢেকে বিকট মুখ করে বলতে লাগল, 'থামো, থামো, চুপ, চুপ।' চড়াই আবার লুকিয়ে পড়ল, পেঁচাদের বিকট চেহারা দেখে তার একটু ভয় হল। হুতুম খানিক ভেবে বললে, 'বলো-না বাপু, যা আসবার তা আসছে।' চড়াই বললে, 'যাক ও কথা, যা আসবার তা তো আসবেই, কেউ তো ঠেকাতে পারবে না।'

হুতুম বললে, 'তা তো জানি, কিন্তু আসবার আগে তার নাম

কেন সে কুঁকড়ো করে বলো তো ? তার কাঁসির মতো গলা শুনলেই সেই শেষ রাতের কথাই যে মনে আসে।'

'ঠিক, ঠিক, সত্যি, সত্যি।' সব পেঁচাই বলে উঠল। দিনের কথা মনে করতেও তাদের বিষম কষ্ট হচ্ছিল।

হুতুম বললে, 'রাত যখন পোহাবার দিকেই যায় নি, তখন পাজি কুঁকড়োটা গান শুরু করে···।'

সবাই অমনি বলে উঠল, 'ডাকু হ্যায়। চোট্টা হ্যায়।' হুতুম আবার বললে, 'বাকি রাতটুকু সে একেবারে কাঁচা-ঘুম ভাঙিয়ে মাটি করে দেয়।' চারি দিক থেকে অমনি চেঁচানি উঠল, 'মাটি। মাটি। একেবারে মাটি। নেহাত মাটি।' তার পর একে একে সবাই আপনার আপনার দুঃখু জানাতে লাগল। ধুঁধুল বললে, 'খরগোশের গর্তর কাছে খানিক বসতে না বসতে কুঁকড়োটা ডাক দেয় আর অমনি আমায় সরতে হয়।' কাল পেঁচা বললে, 'পেটের খিদে ভালো করে মেটাবার জো নেই সেটার জ্বালায়।' কেউ বললে, 'তাঁর সাড়া কানে এলেই আর মাথা ঠিক রাখতে পারি নে, এটা করতে ওটা করে ফেলি। খুন করতে হয় মশাই তাড়াতাড়ি। যেন আমারি দায় পড়েছে। জখমগুলোও যে একটু শক্ত করে বসাব তার সময় পাই নে মশায়। যতটুকু মাংস দরকার তার বেশি একটু কি সংগ্রহ করবার জো আছে ওটার জ্বালায়। ওর গলাটা শুনলেই দেখি যেন অন্ধকার দেখতে-দেখতে ফিকে হচ্ছে, আর আমি ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে যাই।'

চড়াই শুনে শুনে বললে, 'আচ্ছা সব দোষ কি কুঁকড়োর। এ-পাড়া ও-পাড়ায় আরো তো অনেক মোরগ আছে যারা ডেকে থাকে।'

হুতুম বললে, 'তাদের গানকে আমরা ভয় করি নে। ওই কুঁকড়োর ডাকটাই যত নষ্টের গোড়া, সেইটেই বন্ধ করা চাই।'

সবাই অমনি চেঁচিয়ে উঠল, 'বন্ধ হোক। চাই বন্ধ করা চাই।' আর ডানা বাজাতে লাগল। গোলমাল একটু থামলে গো-পেঁচা

বললে, 'তা যাই বল, চড়াই আমাদের জন্যে অনেক করেছেন।' চড়াই ভয় পেয়ে বললে, 'কী, কী, আমি আবার বললেম কী, ও আবার কেমন কথা?' খুদে পেঁচা বললে, 'কুঁকড়োর নিন্দে রটিয়ে তার নকল দেখিয়ে তামাশা করে।' অমনি দেউলে, দালানে, গুড়গুড়ে, গোয়ালে, গেছো, জংলা পাহাড়ে সব পেঁচা হাসতে লাগল, 'হুঃ হুঃ, ঠিক ঠিক, বাঃ, বাঃ, ঠিক ঠিক, হু হু হু হু, হু-উ-উ, খুব ঠিক খুব ঠিক।'

হুতুম রোঁয়া ফুলিয়ে পাখা ঝাপটালে, 'বস্-স্-স।' অমনি সব চুপ হয়ে গেল। চিলে পেঁচা গলা কাঁপিয়ে চিঁ চিঁ করে বললে, 'তার নিন্দেই রটাও আর নকলই দেখাও সে তো তাতে থোড়াই ডরায়। বেপরোয়া সে গান গেয়ে চলে, আর বেকার আমরা কেঁপেই মরি। এই দেখো-না সাজগোজ হীরে-জহরতের দিক দিয়ে দেখলে ময়ূরের সামনে কুঁকড়োটা দাঁড়াতেই পারে না, কিন্তু তবু তার গান, সে তো এখনো আমাদের জ্বালাতে ছাড়ছে না।' সব পেঁচা বিকট চিৎকার করতে থাকল, 'ধরো কুঁকড়োকে। মারো কুঁকড়োকে, ধুমাধুম ধমাধম।'

হুতুম চটপট ডানা ঝেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে বললে, 'থামো থামো শোনো শোনো, এ্যটেন-সা-ন্ অ-ব-ধা-ন।' অমনি সব পেঁচা ডানা ছড়িয়ে গোল চোখগুলো পাকিয়ে স্থির হয়ে বসল, এমনি গম্ভীর হয়ে যে, রাতটাও মনে হতে লাগল যেন কত বড়ো, কত-না গভীর। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে থেকে লক্ষ্মী পেঁচা আস্তে আস্তে বললে, 'তাকে মারা তো হয় না। যে সময়ে সে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় সে সময় আমরা দেখতেই পাই নে, চোখে সব যে বোধ হয় ধোঁয়া আর ধাঁধাঁ —ধাঁ-ধাঁ ধাঁ।' বলেই লক্ষ্মী পেঁচা চুপ করলে, আর সব পেঁচা গুমরোতে থাকল।

তখন পাকুড় গাছের আগডালের উপর থেকে কুটুরে পেঁচা মিহি আওয়াজ দিলে, 'বোলুঙ্গা কুছ, সল্লা হ্যায় কুছ।' হুতুম উপর দিকে চেয়ে বললে, 'শুনি, তোমার মতলবটা কী।' কুটুরে সট করে নিচের

ডালে নেমে বসে আরম্ভ করলে, 'পাহাড়ের ওদিকটায় একটা লোক অদ্ভুত সব পাখির চিড়িয়াখানা বানিয়েছে, নানা দেশী-বিদেশী মোরগ, নানা জাতের নানা কেতার ধরা আছে। ময়ূর যিনি রাজ্যের অদ্ভুত পাখির খবর রাখেন, তিনি কুঁকড়োকে কিছুতে দেখতে পারেন না, কেননা, ময়ূরের একটিমাত্র বৈ দুটি সুর নেই, তাও আবার কর্ণকুহর ভেদ করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। কিন্তু কুঁকড়োর ডাক, সে সোজা অন্ধকারের বুকে গিয়ে বেঁধে আর তার পর যে কাণ্ডটা ঘটে তা কারুর জানতে বাকি নেই। কাজেই ময়ূর স্থির করেছেন চিনে-মুরগির কুলতলার মজলিশে তিনি এই-সব অদ্ভুত মোরগদের হাজির করবেন।' 'চিনে-মুরগির সঙ্গে আলাপ করে দিতে বুঝি?' ব'লেই সব পেঁচা হ্যোঁ হ্যোঁ করে হাসতে থাকল।

কুটুরে বললে, 'এই-সব অদ্ভুত মোরগের কাছে কি কুঁকড়ো দাঁড়াতে পারবে। একেবারে খাড়া দাঁড়িয়ে মাটি হবে।' গোয়ালে পেঁচা বলে উঠল, 'হাজির তারা হবে কেমন করে। খাঁচা না খুলে দিলে তো সেই-সব খাসা মোরগদের এক পা নড়বার সাধ্যি নেই।'

কুটুরে সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বললে, 'তারও উপায় করা গেছে। যে পাহাড়ী ছোঁড়াটা খাঁচা খুলে সকালে তাদের দানাপানি খাওয়ায় সে কাল যেমন খাঁচা খুলবে আর আমি অমনি তার মুখে গিয়ে ডানার এক ঝাপটা দেব। নিশ্চয়ই সে কাঁদতে কাঁদতে দৌড় দেবে খাঁচা খোলা রেখে। পেঁচার বাতাস গায়ে লাগলেই অসুখ, সেটা জানো তো। তার পর সব মোরগকে নিয়ে সরে পড়ো আর কি।'

চড়াই বললে, 'ওদিকে কুঁকড়ো বলছেন যে তিনি মজলিসে মোটেই যেতে রাজি নন।'

বেড়াল বললে, 'যাবে না কী। নিশ্চয়ই যাবে। দেখ নি সোনালিয়া মুরগিটির সঙ্গে তার কত ভাব। আমি এই লিখে দিচ্ছি সোনালিয়া কুঁকড়োকে মজলিশে হাজির করবেই কাল।' চড়াই বুঝলে কালো বেড়ালটা সারাদিন ঘুমোয় বটে, কিন্তু কোথা কী হয়

সেটুকুও দেখে শোনে, গোলাবাড়ির সব খবরই সে রাখে চোখ বুজে বুজেই।

চড়াই বললে, 'হাজির যেন হলেন কুঁকড়ো, তার পর?'

'তার পর আর কী। কুঁকড়ো যখন দেখবেন পাড়ার সবাই অদ্ভুত সব মোরগদের খাতির করতেই ব্যস্ত, এমন-কি, হয়তো সোনালি পর্যন্ত, জেনে রেখো তখন খুঁটিনাটি বাধবেই আর তা হলেই—'

'কুঁকড়োর লড়াই না হয়ে যায় না।' বলেই হুতুম ঠোঁটে ঠোঁট বাজিয়ে দিলেন। কিন্তু বেড়াল বললে, 'ধরো লড়ায়ে কুঁকড়োর হার না হয়ে জিতই হয়ে গেল ফস করে। তখন উপায়?'

কুটুরে অমনি বললে, 'সে ভাবনা নেই, ওই-সব খাসা মোরগদের মধ্যে যে বাজখাঁই পালোয়ান মোরগ আছে তাকে পারে এমন কেউ দেখি নে। মানুষ তার পায়ে লোহার কাঁটা-দেওয়া যে কাতান বেঁধে দিয়েছে তার এক ঘা খেলে কুঁকড়োকে আর দেখতে হবে না, একেবারে চিৎপটাং।' বলে কুটুরে হাসতে লাগল। সঙ্গে সব পেঁচাই ধাই ধাই করে নাচতে থাকল।

হুতুম বললে, 'আমি তো বাপু আগে গিয়ে তার মাথার মোরগ ফুলটা ছিঁড়ে খাব, কপা কপ্ কপা কপ্।'

চড়াই মনে মনে বললে, 'গতিক তো খারাপ দেখছি। কুঁকড়োকে খবর দেব নাকি।' কিন্তু চেঁচিয়ে সে সবাইকে বললে, 'বেশ হবে, খুব হবে, ভালোই হবে, কী বল।'

কুটুরে বললে, 'মজা বলে মজা। খাসা মোরগগুলোও দু-চারটে মরবে নিশ্চয়। পেট ভরে খাও; সেগুলো কি নষ্ট করা ভালো।'

হুতুম চিলের কানে-কানে বললে, 'কুঁকড়োর কাবারের পর দুজনে মিলে, বুঝেছ কিনা, চড়াই ভাতি⋯' আর তার পরে ধুঁধুলে পেঁচা কী বলতে যাচ্ছে এমন সময় দূরে কুঁকড়োর সাড়া পড়ল, 'গা-তোল্-তোল্।' পেঁচারা শুনলে, 'পটোল তোল্।' অমনি ভয়ে সব চুপ। কুটুরে ক্রমেই মাথা হেঁট করতে লাগল। কে যেন তার ঘাড়

ধরে মাটিতে মুখ ঘষে দিতে চাচ্ছে। এতক্ষণ পেঁচা সব রোঁয়া ফুলিয়ে বিকট চেহারা করে বসে ছিল, দেখতে দেখতে ফুটো রবারের গোলার মতো চুপসে গেল, যেন কতদিন খায় নি। মুখে কারু কথা সরছে না, কেবল চোখ পিটপিট করে এ ওকে শোধাচ্ছে, 'হল কী। কী ব্যাপার।' তার পর ডানা মেলে একে একে সবাই পালায় দেখে চড়াই বললে, 'এরি মধ্যে চললে নাকি।' চড়ায়ের কথা কে-ইবা শোনে। চড়াই যত বলে, 'ভোর হতে এখনো দেরি, চলুক না ঘোঁট আরো খানিক।' সব পেঁচা চোখ পিটপিট করে বলে, 'না না না, আর না, আর না, আর না।' হুতুম বললে, 'গেলুম।' ধুঁধুল বললে, 'মলুম।' 'বাঁচাও বাঁচাও।' বলছে আর সব পেঁচাগুলো। তাড়াতাড়িতে কোথায় যাবে, কী করবে ঠিক পাচ্ছে না, কানার মতো কখনো কাঁটা-গাছে গিয়ে পড়ছে, কখনো পাথরে টক্কর খাচ্ছে। আর ডানা দিয়ে চোখ-মুখ ঘষছে আর বলছে, 'উঃ গেছি। উঃ গেছি।' 'লাগছে লাগছে।' বলতে বলতে একে-একে সব পেঁচা চম্পট দিলে। সব-শেষ হুতুম পেঁচাটা 'গেলুম। গেলুম।' বলতে বলতে উড়ে পালাল।

চড়াই দেখলে অন্ধকারের মধ্যে কালো কালো নৌকার মতো দলে দলে পেঁচা গ্রাম ছাড়িয়ে ক্রমে পাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে গেল। আর কেউ কোথাও নেই, পাকুড়তলা সে একা রয়েছে। 'ফজর তো হল এখন ছোটো হাজরির জন্যে একটা গঙ্গাফড়িং পেলে হয় ভালো।' বলে চড়াই এদিক ওদিক করছে, এমন সময় একটা ঝোপের আড়াল থেকে ঝপ করে সোনালিয়া বেরিয়ে এল। চড়াই অবাক হয়ে বললে, 'একী। এত রাত্রে আপনি এখানে।'

সোনালিয়া একটু দূরে থেকে পেঁচাদের যুক্তি সমস্ত শুনেছিল, সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'কী ভয়ানক ব্যাপার, চড়াই তো কুঁকড়োর বন্ধু, এখন বন্ধুকে বাঁচাতে চেষ্টা তো তার করা উচিত।' চড়াই আবার ফড়িং-এর সন্ধান করতে করতে বললে, 'পেঁচা ভাজা খেতে কী মজা তা পাখিজন্মে তারা কেউ জানলে না —।'

সোনালিয়া অবাক হল। চড়াইটার রকম দেখে সে রেগে বললে, 'কথার জবাব দাও-না।' 'কীঃ।' ব'লেই চড়াই ফিরে দাঁড়াল। সোনালি শুধলে, 'ঘোঁটের খবর জানতে চাচ্ছি।' চড়াই ধীরে সুস্থে উত্তর করলে, 'ঘোঁটটা খুব চলেছিল, সব দিকেই ভালো।'

সোনালি চড়াই-এর হেঁয়ালির অর্থ বুঝলে না; সে পরিষ্কার জবাব চাইলে। চড়াই বললে, 'অন্ধকার বেশ ঘুটঘুটে আর পেঁচাগুলোও বেশ মোটা-সোটা দেখলেম।'

'তারা তাঁকে মারবার যুক্তি করলে?' সোনালি শোধালে।

'নাঃ, মারবার নয়, তাকে পরলোকে পাঠাবার যুক্তি।' বলে চড়াই সোনালিকে আশ্বাস দিয়ে বললে, 'তবু কতকটা রক্ষে, কী বলো।' সোনালি কী বলতে যাচ্ছিল, চড়াই বললে, 'ভাবছ কেন, শেষ দাঁড়াবে যা তা ফক্কাঃ, বুঝলে।' সোনালি ভয়ে ভয়ে বললে, 'যাই বল কিন্তু পেঁচারা তো সহজ পাখি নয়।'

চড়াই হেসে বললে, 'কিন্তু তাদের যুক্তিটা মোটেই ভয়ানক নয়। আরো অনেক যুক্তি তারা এঁটেছে আঁটবেও। পেঁচাগুলো যদি সহজ পাখি হত তবে ঘুঁট না করে খাবার ঘুঁটেই তারা বেড়াত। কিন্তু তাদের ভুরু চোখের উপরে, নিচে, আশেপাশে, আর চোখগুলো দেখেছ তো? মনে হয় যেন পাহারোলার লণ্ঠন, খোলো আর বন্ধ করো। আর ঠোঁট তো দেখেছ?' বলেই চড়াই 'ছিঃছিঃ।' ব'লে ডানা ঝাড়া দিয়ে বললে, 'তুমি কিছু ভেবো না সোনালি। সব ঠিক হবে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা চাই, বুঝলে কিনা।'

সোনালি চড়াই-এর হেঁয়ালি বড়ো একটা বুঝলে না কিন্তু কুঁকড়োর পুরোনো বন্ধু হয়ে চড়াই এখনো যখন হাসিতামাশা করছে তখন ভয়ের কারণ খুবই কম এটা তার মনে হল। 'কিন্তু তবু কী জানি, কুঁকড়োকে সব কথা জানানো ভালো।' বলে সোনালি গোলাবাড়ির দিকে যাবে, চড়াই তাকে তাড়াতাড়ি পথ আগলে বললে; 'অমন কাজটি কোরো না, যদি-বা কুঁকড়ো সেখানে না

যান, এই ঘোঁটের কথা শুনলে নিশ্চয়ই যাবেন, আর তা হলে লড়াই বাধবেই।' সোনালি চড়ায়ের কথা রাখলে। চড়াই যখন তাঁর পুরোনো বন্ধু, তখন তারি পরামর্শমতো কাজ করাই ঠিক। সোনালি যাচ্ছিল, ফিরে এল।

ওদিক থেকে শব্দ এল, 'গা তো ল্।' চড়াই আর সোনালি ফিরে-দেখলে কুঁকড়ো আসছেন। কুঁকড়ো হাঁক দিলেন, 'কো-উ-ন হ্যায়!'

সোনালি মিহিস্বরে উত্তর দিলে, 'সো-না-লি-য়া', কুঁকড়ো শোধালেন, 'ওখানে আর কেউ আছে কি।' সোনালি চড়াইকে চোখ টিপে বললে, 'না মশাই।' ঘোঁটের কথা কুঁকড়োকে যেন বলা না হয় সোনালিকে সে বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে, চড়াই আস্তে আস্তে বাবলা গাছের তলায় একটা খালি ফুলের টবের আড়ালে গিয়ে লুকোল।

৫

কুঁকড়ো নিজে যেমন, তেমনি কাউকে ভোরে উঠতে দেখলে ভারি খুশি। সোনালিয়াকে দেখে বললেন, 'বাঃ, তুমি তো খুব সকালে উঠেছ। বেশ, বেশ।' কিন্তু সোনালিয়া চিনে-মুরগির চা-পার্টিতে যাবার জন্যেই খালি আজ এত সকালে বিছেনা ছেড়ে বেরিয়েছে শুনে কুঁকড়ো ভারি দমে গেলেন। কুঁকড়ো পষ্ট বললেন, তিনি ওই চিনে-মুরগিটাকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। কিন্তু সোনালিয়া ছাড়বার নয়, সে তবু কুঁকড়োকে চিনে-মুরগির মজলিশে যেতে পেড়াপিড়ি করে বললে, 'দেখি তুমি আমার কথা রাখ কি না।'

কুঁকড়ো তবু যেতে রাজি নয়, তখন সোনালিয়া অভিমান করে বললে, 'তবে আমি এখনি বাড়ি চলে যাই।' কুঁকড়ো তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন, 'না সোনালি, এখনি যেয়ো না।' সোনালি অমনি

সুযোগ বুঝে বললে, ''তবে যাবে বলো চিনি-দিদির বাড়িতে।' কুঁকড়ো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আচ্ছা তাই, আমিও যাব।' কথাটা বলেই কুঁকড়ো মনে মনে নিজের উপর খুব চটলেন, মেয়েরা যা আবদার করবে, তাই কি মানতে হবে।

সোনালি কুঁকড়োর ভাব বুঝে মনে মনে হাসতে লাগল। কুঁকড়োকে চিনি-দিদির বাড়িতে নিয়ে যেতে সে খুব ব্যস্ত ছিল না; সে কুঁকড়োর কাছ ঘেঁষে বললে, 'তোমার সেই মন্তরের কথাটি বলো না, শুনিই-ই—।'

কুঁকড়ো একটু গম্ভীর হলেন, সোনালি বললে, 'বলো-না, বলো-বলো, বলো-না।'

কুঁকড়ো এবারে গদগদস্বরে 'সোনালি আমার মনের কথাটি' বলে আবার চুপ করলেন। সোনালি বলে চলল, 'বনের মধ্যে বসন্তকালের চাঁদনিতে সারারাত কাটিয়ে একলাটি আমি বনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি, সকালের আলো আকাশে ঝিলিক দিয়ে উঠল, আর অমনি শুনলেম, তোমার ডাক দূর থেকে আসছে, যেন দূরে কার বাঁশি বাজছে।' —বনের রানী সোনালিয়া পাখি সকালের সোনার আলোতে একলাটি দাঁড়িয়ে কান পেতে তাঁর গান শুনছে একমনে, এ খবর পেয়ে কোন্ গুণীর না মনটা নরম হয়। কুঁকড়ো ঘাড় হেলিয়ে ভাবতে লাগলেন, 'বলি কি না বলি।' সোনালিয়া মিঠে সুরে আরম্ভ করলে রূপকথা, 'এক যে ছিল কুঁকড়ো আর যে ছিল বনের টিয়া।' কুঁকড়ো ভুল ধরলেন, 'হল না তো হল না তো।' তার পর নিজেই রূপকথার খেই ধরলেন, 'কুঁকড়োর পিয়া ছিল সোনালিয়া, বনবাসিনী বনের টিয়া।' সোনালিয়া বলে উঠল, 'কুঁকড়ো টিয়াকে কখনো বললে না রূপকথার নিতিটুকু', বলতেই কুঁকড়ো সোনালিয়ার কাছে এসে বললেন, 'জানো, সে কথাটা কী? যেটা বনের টিয়েকে কুঁকড়ো বলতে সময় পেলে না? কথাটা হচ্ছে, তোমার সোনার আঁচল বসন্তের বাতাস দিয়ে গেল সোনালিয়া বনের টিয়া।' সোনালি গম্ভীর হয়ে বললে, 'কী বকছেন আপনি। রূপকথা

শোনাতে হয় তো আপনার চার বউকে শোনান গিয়ে, খুশি হবে', বলেই সোনালি অন্য দিকে চলে গেল।

কুঁকড়ো রেগে গজ গজ করে ঘুরে বেড়ান, অনেকক্ষণ পরে সোনালি আস্তে আস্তে কুঁকড়োর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'একটা গান গাও-না।' কুঁকড়ো ফোঁস করে উঠলেন, সোনালি বললে, 'বাসরে, একে বুঝি বলে গান!' তখন মিষ্টি সুরে কুঁকড়ো ডাকলেন, 'সো-ও-ও-ন্', যেন শ্যামা পাখি সিটি দিলে, সোনালি অমনি আবদার ধরলেন, কুঁকড়োর গুপ্ত মন্তরটি শোনবার জন্যে। কুঁকড়ো খানিক এদিক ওদিক করে বললেন, 'সোনালি, তুমি বাইরে যেমন খাঁটি সোনার, বুকের ভিতরটাও যদি তেমনি তোমার খাঁটি হয় তবে তোমায় আমার গোপন কথাটি শোনাতে পারি', বলে সোনালির মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে যেন শুনতে লাগলেন, সোনালির বুকের মধ্যে থেকে ডাক আসছে কি না, 'বলো বলো।' তার পর কুঁকড়ো আরম্ভ করলেন, 'সোনালি পাখি, বুঝে দেখো আমি কী, সোনার শিঙার মতো বাঁকা আমি বাজবার জন্যই সৃষ্টি হয় নি কি জীবন্ত এক রৌশন-চৌকি ? জলের উপরে যেমন রাজহাঁস, তেমনি সুরের তরঙ্গে ভেসে বেড়াতেই আমার জন্ম, আমি চলেছি সুরের বোঝা শব্দের ভার বয়ে সোনার একটি মউরপঙখি, সকাল-বিকাল।'

সোনালিয়া বলে উঠল, 'নৌকোর মতো ভেসে বেড়াতে তো তোমায় কোনোদিন দেখি নি, মাটি আঁচড়াতে প্রায়ই দেখি বটে।'

কুঁকড়ো বললেন, 'মাটি আঁচড়াবার অর্থ আছে। তুমি কি মনে কর, আমি মাটি আঁচড়াই মাসকলাই সংগ্রহ করতে। সে করে মুরগিরা, আমি মাটি আঁচড়ে দেখি, কোন্ মাটি আমার উপযুক্ত দাঁড়াবার বেদি হতে পারে। আমি জানি, গান গাওয়া মিছে হবে যদি না ইঁট-পাটকেল ঘাস কুটো কাঁটা সব সরিয়ে এই পুরানো পৃথিবীর কালো মাটির পরশখানি নিতে ভুলি। পৃথিবীর বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে নিজেকে একেবারে মিলিয়ে তবে আমি গান করি। সোনালিয়া, প্রায় সবই তো শুনলে, আরো যদি

জানতে চাও তো বলি, আমাকে সুর খুঁজে খুঁজে তো গান গাইতে হয় না, সুর আপনি ওঠে আমার মধ্যে, মাটি থেকে লতায় পাতায় রস যেমন করে উঠে আসে, গানও তেমনি করে আমার মধ্যে ছুটে আসে আপনি, জন্মভূমির বুকের রস। পুব আকাশের তীরে সকালটি ফুটি-ফুটি করছে, ঠিক সেই সময় আমার মধ্যে উথলে উঠতে থাকে সুর ও গান, বুক আমার কাঁপতে থাকে তারি ধাক্কায়, আর আমি বুঝি, আমি না হলে সরস মাটির এই সুন্দর পৃথিবীর বুকের কথা খুলে বলাই হবে না। সকালের সেই শুভ লগ্নটিতে মাটি আর আমি যেন এক হয়ে যাই, মাটির দিকে আমি আপনাকে নিয়ে যাই, আর পৃথিবী আমাকে সুন্দর শাঁখের মতো নিজের নিশ্বেসে পরিপূর্ণ করে বাজাতে থাকে, আমার মনে হয় তখন আমি যেন আর পাখি নই, আমি যেন একটি আশ্চর্য বাঁশি, যার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর কান্না আকাশের বুকে গিয়ে বাজছে।

অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভোর রাতের হিম মাটি এই যে কাঁদন জানাচ্ছে, আকাশের কাছে তার অর্থ কী সোনালিয়া, সে আলো ভিক্ষে করছে, একটুখানি সোনার আলো-মাখা দিন তারি প্রার্থনা, ভোর বেলার সবাই কাঁদছে, দেখবে, আলো চেয়ে, গোলাপের কুঁড়ি সে অন্ধকারে কাঁদছে আর বলছে, আলো দিয়ে ফোটাও। ওই যে খেতের মাঝে একটা কাস্তে চাষারা ভুলে এসেছে, সে ভিজে মাটিতে পড়ে মরচে ধরে মরবার ভয়ে চাচ্ছে আলো, একটু আলো এসে যেন রামধনুকের রঙে চারি দিকের ধানের শিষ রাঙিয়ে দেয়।

নদী কেঁদে বলছে, আলো আসুক, আমার বুকের তলা পর্যন্ত গিয়ে আলো পড়ুক। সব জিনিস চাচ্ছে যেন আলোয় তাদের রঙ ফিরে পায়, আপনার আপনার হারানো ছায়া ফিরে পায়, তারা সারারাত বলছে, আলো কেন পাচ্ছি নে, আলো কী দোষে হারালেম।

আর আমি কুঁকড়ো তাদের সে কান্না শুনে কেঁদে মরি, আমি জানতে পাই ধান খেত সব কাঁদছে, শরতের আলোয় সোনার ফসলে ভরে উঠবার জন্যে, রাঙা মাটির পথ সব কাঁদছে, যারা চলাচল

করবে তাদের ছায়ার পরশ বুকের উপর বুলিয়ে নিতে আলোয়। শীতে গাছের উপরের ফল আর গাছের তলায় গোল গোল নুড়িগুলি পর্যন্ত আলো তাপ চেয়ে কাঁদছে, শুনি। বনে বনে সূর্যের আলোক কে না চাচ্ছে বেঁচে উঠতে জেগে উঠতে, কে না আলোর জন্যে সারা রাত কাঁদছে। এই জগৎসুদ্ধ সবার কান্না আলোর প্রার্থনা এক হয়ে যখন আমার কাছে আসে তখন আমি আর ছোটো পাখিটি থাকি নে, বুক আমার বেড়ে যায়, সেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাজছে শুনি, আমার দুই পাঁজর কাঁপিয়ে তার পর আমার গান ফোটে, 'আ-লো-র ফুল।' আর তাই শুনে পুবের আকাশ গোলাপি কুঁড়িতে ভরে উঠতে থাকে, কাকসন্ধ্যার কা কা শব্দ নিয়ে রাত্রি আমার গানের সুর চেপে দিতে চায়, কিন্তু আমি গেয়ে চলি, আকাশে কাগডিমে রঙ লাগে তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল, তার পর হঠাৎ চমকে দেখি আমার বুক সুরের রঙে রাঙা হয়ে গেছে আর আকাশে আলোর জবাফুলটি ফুটিয়ে তুলেছি আমি পাহাড়তলির কুঁকড়ো।'

সোনালি অবাক হয়ে বললে, 'এই বুঝি তোমার মন্তর।'

'হাঁ, সোনালি, মন্তরটা আর কিছু নয়, আমি না থাকলে পুব আকাশে সব আলো ঘুমিয়ে থাকত এই বিশ্বাসটা আমি করতে পেরেছি এইটুকুই আমার ক্ষমতা, তা একে মন্তরই বলো বা তন্তরই বলো', বলে কুঁকড়ো এমনি ঘাড় উঁচু করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন যে মনে হল যেন তিনি বলছেন —'ঘাড় হেঁট হয় এমন কাজ আমি করি নে, আমি নিজের গুণগান করে বেড়াই নে, আমি আলোর জয়-জয়-কারই দিই, আমি জোরে গাই নিজের গলার রেশ নিজে শোনবার জন্যে নয়, আমি জোরে গাই আলোতে সব পরিষ্কার হয়ে ফুটবে বলে।' কুঁকড়ো যতক্ষণ বলে চলেছিলেন ততক্ষণ সোনালি সব ভুলে তাঁর কথাই শুনছিল, এখন কুঁকড়ো চুপ করতে তার চটকা ভেঙে গেল, কুঁকড়োর কথায় তার অবিশ্বাস হল; সে বলে উঠল, 'একী পাগলের কথা! তুমি, তুমি ফুটিয়ে দাও আকাশে…'

'সেই জিনিস যা চোখের পাতা মনের দুয়ারে এসে ঘুমের ঘোমটা খুলে দেয়। আকাশ যেদিন মেঘে ঢাকা, সেদিন জানব, আমি ভালো গাই নি।'

'আচ্ছা তুমি-যে দিনের বেলাও থেকে থেকে ডাক দাও, তার অর্থটা কী শুনি।' সোনালি শুধল।

কুঁকড়ো বললেন, 'দিনের বেলায় এক-একবার গলা সেধে নিই মাত্র। আর কখনো-বা ওই লাঙলটাকে নয়তো কোদালটাকে ওই ঢেঁকি ওইখানে ওই কুড়ুল এই কাস্তেকে বলি, ভয় নেই আলোকে জাগিয়ে দিতে ভু-ল-ব-না ভু-ল-ব-না।'

সোনালি বললে, 'ভালো, আলোকে যেন তুমি জাগালে, কিন্তু তোমাকে ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেয় কে, শুনি ?'

'পাছে ভুল হয়, সেই ভয়েই আমি জেগে উঠি।'

কুঁকড়োর জবাব শুনে সোনালির তকরার করবার ঝোঁক বাড়ল বৈ কমল না; সে বললে, 'আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, সত্যিই তোমার গানে জগৎ জুড়ে আলোর বান ডাকে ?'

কুঁকড়ো বললেন, 'জগৎ জুড়ে কী হচ্ছে তার খবর আমি রাখি নে, আমি কেবল এই পাহাড়তলিটির আলোর জন্যে গেয়ে থাকি, আর আমার এই বিশ্বাস যে, এ-পাহাড়ে যেমন আমি ও-পাহাড়ে তেমনি সে, এমনি এক-এক পাহাড়তলিতে এক-এক কুঁকড়ো রোজ রোজ আলোকে জাগিয়ে দিচ্ছে।' সোনালির সঙ্গে কথা কইতে রাত ফুরিয়ে এল। কুঁকড়ো দেখলেন, সকালের জানান দেবার সময় হয়েছে, তিনি সোনালিকে বললেন, 'সোনালি আজ তোমার চোখের সামনে সূর্য ওঠাব, আমাকে পাগল ভেবো না, দেখো এবং বিশ্বাস করো। আজ যে গান আমার বুকের মধ্যে গুমরে উঠছে, তেমন গান আমি কোনোদিন গাই নি, গানের সময় আজ তুমি কাছে দাঁড়াবে, আমার মনে হচ্ছে, আজ সকালটি তাই এমন আলোময় হয়ে দেখা দেবে যে তেমন সকাল এই পাহাড়তলিতে কেউ কখনো দেখে নি সোনালিয়া।' বলে কুঁকড়ো ঢালুর উপরে

গিয়ে দাঁড়ালেন। নীল আকাশের গায়ে যেন আঁকা সেই কুঁকড়োকে কী সুন্দরই দেখাতে লাগল। সোনালি মনে মনে বললে, 'এঁকে কি অবিশ্বাস করতে পারি।' এইবার কুঁকড়ো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, গায়ের রঙিন পালক ঝাড়া দিয়ে। সোনালি দেখলে, তাঁর মাথার মোরগ-ফুলটা যেন আগুনের শিখার মতো রগরগ করছে। পুব দিকে মুখ করে কুঁকড়ো ডাক দিলেন, 'ফ-জী-ই-ই-র্ ফ-জী-র্'... সোনালি শুনলে কুঁকড়ো যেন পুব আকাশকে হুকুম দিলেন, 'কাজ শুরু করো', আর অমনি মাটির হুকুম কাজের সাড়া সকালের বাতাসে অনেক দূর পর্যন্ত ছুটে গেল, 'ভোর ভয়ি ভো-র ভ-য়ি' হাঁকতে হাঁকতে। তার পর সোনালি দেখলে কুঁকড়ো যেন সব কাদের সঙ্গে কথা কইছেন, 'বাদল বসন্তের চেয়ে দুদণ্ড আগে তোমার আলো এনে দেব ভয় নেই।' সোনালি দেখলে তিনি একবার মাটির কাছে মুখ নামিয়ে একবার ও-ঝোপ এ-ঝোপের দিকে মুখ ফিরিয়ে কখনো ঘাসগুলির পিঠে ডানা বুলিয়ে কত কী বলছেন, যেন সবাইকে তিনি অভয় দিচ্ছেন আর বলছেন, 'দেব, দেব, আলো দেব, রোদ দেব, হিম আঁধার ঘুচবে, ভয় কী ভয় কী।' অণুপরমাণু ধুলোবালি তারা—কুঁকড়োর কানে কানে কী বলে গেল, কুঁকড়ো ঘাড় নেড়ে বললেন, 'দোলনা চাই, আচ্ছা, দোলনা দিচ্ছি, সোনার সে দোলনা বাতাসে ঝুলবে, আর অণু পরমাণু মিলে লাগবে ঝুলোন দে দোল দোল, দে, দোল দোল।' সোনালি দেখলে আকাশ আর মাটির মধ্যে ঝোলানো পাতলা নীল অন্ধকার একটু একটু দুলছে আর দেখতে দেখতে ভোরের শুকতারা যেন ক্রমে নিভে আসছে। সোনালি বললে, 'দিনের আলো দেবার আগে সব তারাগুলোকে বড়ো যে নিভিয়ে দিচ্ছ, একেকে নিভিয়ে অন্যকে আলো দেওয়া, এ কেমন?' কুঁকড়ো একটু হেসে বললেন, 'একটি তারাও আমি নিভিয়ে ফেলি নি সোনালি, আলো জ্বালাই আমার ব্রত, দেখো এইবার পৃথিবী আলোময় হচ্ছে, রাত্রি দূ-উ-উ-র হল দেখতে দেখতে।' সোনালির চোখের সামনে নীলের উপর

হলদে আলো লেগে সমস্ত আকাশ ধানি রঙে সবুজ হয়ে উঠল, মেঘগুলোতে কমলা রঙ আর দূরের পাহাড়ে মাঠে সব জিনিসে কুসুম ফুলের গোলাপি আভা পড়ল। কুঁকড়ো ডাক দিয়ে চললেন, 'আলোর ফুল আলোর ফু-ল-কি-ই-ই গোলাপি হোক সোনালি, সোনালি সে রুপোলি, রুপোলি হোক সাদা আ-লো-আ-লো-র ফুল', কিন্তু তখনো দূরে খেতগুলোতে শোন্ ফুলের রঙ মেলায় নি, সব জিনিসে চমক দিচ্ছে, কুঁকড়ো ডাকলেন, 'আ-লো-ও-ও', অমনি কাছের খেতের উপরে চট করে এক পোঁছ সোনালি পড়ল, পাহাড়ে ঝাউগাছের মাথায় সোনা ঝকমক করে উঠল। কুঁকড়ো পুব ধারের আকাশকে বললেন, 'খুলুক, খুলুক।' অমনি আকাশ জুড়ে পুব দিকে আলোর ছড়া পড়তে থাকল। পাহাড়ের দিকে চেয়ে কুঁকড়ো ডাকলেন, 'খুলুক খুলুক', অমনি সব পাহাড়ে পাহাড়ে গোলাপি ফুলে ভরা পদম গাছ ছবির মতো খুলে গেল সোনালির চোখের সামনে। 'খুলুক খুলুক', দূরে ঝাপসা পাহাড় কুয়াশার চাদর খুলে ফেলে কাছে এসে দাঁড়াল। দূরের কাছের সব জিনিস ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে, নতুন করে আলো-ছায়া দিয়ে গড়া এক টুকরো পৃথিবী। শুকনো ডাঁড় থেকে ফলন্ত আমগাছ গড়বার সময় ছেলেরা যেমন সেটার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে সোনালি তেমনি কুঁকড়োর এই-সব কাণ্ডকারখানা অবাক হয়ে দেখছিল, আর ভাবছিল, কুঁকড়োই বুঝি এ সবের সৃষ্টিকর্তা, এমন সময় কানের কাছে শুনলে 'মোন, বলো ভালোবাসো তো?'

সোনালি খানিক চুপ করে থেকে বললে, 'অন্ধকার থেকে এমন সকাল যে উঠিয়ে আনলে, তার সঙ্গে মনের কথা চালাচালি করতে কে না ভালোবাসে।'

কুঁকড়ো বললেন, 'সরে এসো সোনালি, বুক তুমি আনন্দে ভরে দিয়েছ, তোমাকে পেয়ে আজ কাজ মনে হচ্ছে কত সহজ' এই বলে কুঁকড়ো ডাকলেন, 'আলোর ফুলকি সোনালি', সোনালি অমনি

কুঁকড়োর একেবারে খুব কাছে এসে বললে, 'ভালোবাসি গো ভা-লো-বা-সি।' কুঁকড়ো বললেন, 'সোনালিয়া, তোমার সোনালিয়া রূপটি সোনালি কাজের মতো আমার চোখের কোলে লাগল, তোমার মধুর মতো মিষ্টি আর সোনালি কথা প্রাণের মধ্যেটা সোনায় সোনায় ভরে দিয়েছে। এত সোনা আজ পেয়েছি যে মনে হচ্ছে এখনি ওই সামনের উঁচু পাহাড়টা আমি আগাগোড়া সোনায় মুড়ে দিতে পারি।' সোনালিয়া আদর করে বললে, 'দাও-না পাহাড়টা গিলটি করে, আমি তোমাকে রোজ রোজ ভালোবাসব।' কুঁকড়ো হাঁক দিলেন, 'সো-না-র জল সো-না-লি-য়া', অমনি পাহাড়ের চুড়োয় সোনা ঝকঝক করে উঠল, তার পর সোনা গলে ঢালু বেয়ে আস্তে আস্তে নিচের পাহাড়ের গোলাপিতে এসে মিশল, শেষে গোলাপি ছাপিয়ে একেবারে তলায় মাঠের উপর গড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে দূর আর কাছের রাস্তা-ঘাট মাঠ-ময়দান ঘর-দুয়োর গ্রাম-নগর বন-উপবন সোনাময় হয়ে দেখা দিলে। কিন্তু দূরে পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে নদীর ধারে গাছগুলোর শিয়রে এখনো একটু-আধটু কুয়াশা মাকড়সার জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে, ওগুলো তো থাকলে চলবে না, কুঁকড়ো প্রথম আস্তে বললেন, 'সাফাই', সোনালি ভাবলে, কুঁকড়ো বুঝি হাঁপিয়ে পড়েছেন আর বুঝি পারেন না গান করতে, কিন্তু একি যে-সে কুঁকড়ো যে কাজ বাকি রেখে যেমন-তেমন সকাল করেই ছেড়ে দেবে, 'আরো আলো চাই' বলে কুঁকড়ো আবার গা-ঝাড়া দিয়ে এমন গলা চড়িয়ে ডাক দিলেন যে মনে হল বুঝি, তাঁর বুকটা ফেটে গেল, 'আলোর ফুল আলোর ফুল, ফু-উ-উ-উল-কি-ই-ই আলো-র-র-র'। দেখতে দেখতে আকাশের শেষ তারাটি সকালের আলোর মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেল, তার পর দূরে দূরে গ্রামের কুটিরের উপর জ্বলন্ত আখার সাদা ধুঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সকালের আকাশের দিকে উঠে চলল আস্তে আস্তে। সোনালি তাকিয়ে দেখলে কুঁকড়ো কী সুন্দর। সে সকালের শিল্পী কুঁকড়োকে মাথা নিচু করে নমস্কার করলে। আর

কুঁকড়ো দেখলেন, আলোর ঝিকিমিকি আঁচলের আড়ালে সোনালিয়ার সুন্দর মুখ। কুঁকড়ো মোহিত হলেন। আজ তাঁর সকালের আরতি সার্থক হল, তিনি এক আলোতে তাঁর জন্মভূমিকে আর তাঁর ভালোবাসার পাখিটিকে সোনায় সোনায় সাজিয়ে দিলেন। কুঁকড়ো আনন্দে চারি দিকে চেয়ে দেখলেন, কিন্তু তখনো কেন মনে হচ্ছে, কোথায় যেন একটু অন্ধকার লুকিয়ে আছে। তিনি আবার ডাক দিতে যাবেন, এমনি সময় নিচের পাহাড় থেকে একটির পর একটি মোরগের ডাক শোনা যেতে লাগল ; যে যেখানে সবাই সকালের আলো পেয়ে গান গাচ্ছে। আগে আলো হল, পরে এল সব মোরগের গান, কুঁকড়ো কিন্তু সবার আগে যখন আলো বলে ডাক দিয়েছেন, তখনো রাত ছিল, তিনি যে সবার বড়ো তাই অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি আলোর আশা সবাইকে শোনাতে পারেন। আলো জাগানো হল, এইবার সূর্যকে আনা চাই, কুঁকড়ো আবার শুরু করলেন, 'রাঙা ফুল আগুনের ফুলকি', অমনি দিকে দিকে সব মোরগ গেয়ে উঠল সেই সুরে, 'আলোর ফুলকি, আলোর ফুল।'

সোনালি বললে, 'দেখেছ ওদের আস্পর্ধা। তোমার সঙ্গে কি না সুর ধরেছে, এতক্ষণ সবাই ছিলেন কোথা ?'

কুঁকড়ো বললেন, 'তা হোক, সুর বেসুর সব এক হয়ে ডাক দিলে যা চাই তা পেতে বেশি দেরি হয় না, সূর্য দেখা দিলেন বলে।' কিন্তু তখনো কুঁকড়ো দেখলেন একটি কুটির ছায়ায় মিশিয়ে রয়েছে, তিনি ডাক দিলেন অমনি কুটিরের চালে সোনার আলো লাগল। দূরে একটা সরষে খেত তখনো নীল দেখাচ্ছে, কুঁকড়ো ডাক দিলেন, আলো পড়ে খেতটা সবুজ হল, খেতে যাবার রাস্তাটি পরিষ্কার সাদা দেখা গেল। নদীটা কেমন ধুঁয়াটে দেখাচ্ছিল, কুঁকড়ো ডাকলেন, অমনি নদীর জলে পরিষ্কার নীল রঙ গিয়ে মিলল। হঠাৎ সোনালিয়া বলে উঠল, 'ওই যে সূর্য উঠছেন।' কুঁকড়ো আস্তে আস্তে বললেন, 'দেখেছি, কিন্তু বনের ওপার থেকে এপারে টেনে আনতে হবে আমাকে ওই সূর্যের রথ, এসো তুমিও', বলেই কুঁকড়ো নানা ভঙ্গিতে

যেন সূর্যের রথ টেনে ক্রমে পিছিয়ে চললেন, 'তফাত হো তফাত হো' বলতে বলতে। সোনালিয়া বলতে লাগল, 'আসছেন আসছেন', কুঁকড়ো হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ওপার থেকে এল রথ।' ঠিক সেই সময় শালবনের ওপার থেকে সূর্য উদয় হলেন সিন্দুরবরন। কুঁকড়ো মাটিতে বুক ঠেকিয়ে সূর্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন, 'আঃ, আজকের সূর্য কত বড়ো দেখছো!' সোনালির ইচ্ছে, কুঁকড়ো সূর্যের জয় দিয়ে একবার গান করেন। কিন্তু গলার সব সুর খালি করে তিনি আজ সকালটি এনেছেন আর তাঁর সাধ্য নাই গাইতে। যেমন এই কথা সোনালিকে কুঁকড়ো বলেছেন, অমনি দূরে দূরে সব মোরগ ডেকে উঠল 'উরু-উরু-রু-রু-রু'। কুঁকড়ো শুকনো মুখে বললেন, 'আমি নেই-বা জয় দিলেম, শুনছ দিকে দিকে ওরা সব তূরী বাজিয়ে তাঁর উদয় ঘোষণা করছে।' সোনালি শুধলে, 'সূর্য উঠলে পর তুমি কি কোনোদিনই তাঁর জয়-জয়কার দাও না? তোমার নবতখানায় সোনার রৌশনচৌকি সূর্যের জয় দিয়ে কি কোনোদিন বাজাও নি।'

'একটি দিনও নয়' বলে কুঁকড়ো চুপ করলেন। সোনালি একটু ঠেস দিয়ে বললে, 'সূর্য তো তা হলে ভাবতে পারেন অন্য সব মোরগেরা তাঁকে উঠিয়ে আনে।' কুঁকড়ো বললেন, 'তাতেই-বা কী এল গেল।' সোনালি আরো কী বলতে যাচ্ছে, কুঁকড়ো তাকে কাছে ডেকে বললেন, 'আমি তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি, তুমি আমার কাছে আজ না দাঁড়ালে সকালের ছবিটা কখনোই এমন উৎরতো না।' সোনালি কুঁকড়োর কাছে এসে বললে, 'তুমি যে সকালটা করতে সূর্যের রথ বনের ওধার থেকে টেনে আনতে এত কষ্ট করলে তাতে তোমার লাভটা কী হল।' কুঁকড়ো বললেন, 'পাহাড়ের নিচে থেকে ঘুমের পরে জেগে ওঠার যে সাড়াগুলি আমার কাছে এসে পৌঁচচ্ছে, সেইটেই আমার পরম লাভ।' সোনালি সত্যিই শুনলে, নিচে থেকে দূর থেকে কাছ থেকে কী-সব শব্দ আসছে। সে পাহাড় থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে চারি দিক চাইতে লাগল। কুঁকড়ো চুপটি করে চোখ বুজে বসে বললেন, 'কী শুনছ সোনালিয়া, বলো।'

সোনালিয়া বলে চলল, ‘আকাশের গায়ে কে যেন কাঁসর পিটছে।’

কুঁকড়ো বললেন, ‘দেবতার আরতি বাজছে।’

সোনালি বললে, ‘এবার যেন শুনছি মানুষদের আরতির বাজনা টং টং।’

কুঁকড়ো বললেন, ‘কামারের হাতুড়ি পড়ছে।’

সোনালি, ‘এবার শুনছি গোরু সব হাম্বা দিয়ে ডাকছে আর মানুষে গান ছেড়েছে।’

কুঁকড়ো, ‘হাল গোরু নিয়ে চাষা চলেছে।’

সোনালি এবার বললে, ‘কাদের বাসা থেকে বাচ্ছাগুলো সব রাস্তার মাঝে চল্‌কে পড়ে কিচমিচ করে ছুটছে।’

কুঁকড়ো বলে উঠলেন, ‘পাঠশালার পোড়োরা চলল’, বলে কুঁকড়ো সোজা হয়ে বসলেন। সোনালি আবার বললে, ‘পিঁপড়ের মতো কারা সাদা সাদা হাত-পা ওয়ালা কাদের সব ধরে ধরে আছাড় দিচ্ছে, খুব দূরে একটা জলের ধারে পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।’

কুঁকড়ো বললেন, ‘কাপড় কাচা হচ্ছে। আর দেখছি’—সোনালিয়া বললে, ‘এ কী, কালো কালো ফড়িংগুলো সব ইস্পাতের মতো চক-চকে ডানা ঘষছে।’ কুঁকড়ো দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ‘ওহো, কাস্তেতে যখন শান পড়ছে তখন ধান কাটার দিন এল বলে।’ তার পর পাহাড়তলির থেকে এদিক থেকে ওদিক থেকে চারি দিক থেকে কত কিসের সাড়া আসতে লাগল। ঘণ্টার ঢং ঢং, হাতুড়ির ঠং ঠং, কুড়ুলের খট্ খট্, জলের ছপ ছপ, সেকরার টুকটাক, কামারের এক ঘা, হাসি বাঁশি-বাজনা সব শুনতে লাগলেন কুঁকড়ো। কাজ-কর্ম চলেছে, কেউ কি আর ঘুমিয়ে নেই বসে নেই। সত্যিই দিন এসেছে, কুঁকড়ো যেন স্বপন দেখার মতো চারি দিকে চেয়ে বললেন, ‘সোনালি, দিন কি সত্যিই আনলেম, এই-সব কারখানা একি আমার ছিষ্টি। দিন আমি যে আনলুম মনে করেছি আমি যে ভাবছি আকাশে আলো আমিই দিচ্ছি একি সত্যি, না এ-সব পাহাড়তলি পাগলা কুঁকড়োর খ্যাপামি

আর খেয়াল ? সোনালি, একটি কথা বলব, কিন্তু বলো সে কথা প্রকাশ করবে না, আমার শত্রু হাসাবে না? সোনালি, তুমি আমাকে যাই ভাব-না কেন, আমি জানি এই স্বর্গে মর্ত্যে আলো দেবার ভার নেবার উপযুক্ত পাত্র আমি নই, এত পাখি থাকতে অতি তুচ্ছ সামান্য পাখি আমার উপর অন্ধকারকে দূর করবার ভার পড়ল ? কত ছোটো, কত ছোটো আমি, আর এই জগৎজোড়া সকালের আলো সে কী আশ্চর্য-রকম বড়ো, কী অপার তার বিস্তার। প্রতিদিন সকালে আলো বিলিয়ে যখন দাঁড়াই তখন মনে হয়, একেবারে ফকির হয়ে গেছি। আমি যে আবার কোনোদিন এতটুকুও আলো দিতে পারব তার আশাটুকুও থাকে না।' সোনালি শুনলে যেন কুঁকড়োর কথা চোখের জলে ভিজে ভিজে, সে তাঁর খুব কাছে গিয়ে বললে, 'মরি মরি।' কুঁকড়ো সোনালির মুখ চেয়ে বললেন, 'আঃ সোনালি, যে আশা-নিরাশার মধ্যে আমার বুক নিয়ত দুলছে তার যে কী জ্বালা কেমন করে বলি। গান গাইতে হবে, আলোও জ্বালাতে হবে, কিন্তু কাল যখন আবার এইখানে দাঁড়িয়ে দশ আঙুলে আশার রাগিণী খুঁজে খুঁজে কেবলই মাটির বুকের তারে তারে টান দিতে থাকব, তখন হারানো সুর কি আবার ফিরে পাব, না দেখব, গান নেই গলা নেই আলো নেই তুমি নেই আমি নেই কিছু নেই ? হারাই কি পাই, এরি বেদনা মোচড় দিচ্ছে বুকের শিরে শিরে সোনালি। এই যে দো-টানায় মন আমার দুলছে এর যন্ত্রণা কে বুঝবে। রাজহাঁস যখন রসাতলের দিকে গলাটি ডুবিয়ে দেয়, সে নিশ্চয় জানে, পদ্মের নাল তার জন্যে ঠিক করা রয়েছে জলের নিচে, বাজপাখি যখন মেঘের উপর থেকে আপনাকে ছুঁড়ে ফেলে মাটির দিকে তখন সেও জানে ঠিক গিয়ে সে যেটা চায় সেই শিকারের উপরেই পড়বে, আর সোনালি তুমিও জান বনের মধ্যে উই পোকা আর পিঁপড়ের বাসার সন্ধান পেতে তোমায় এতটুকুও ভাবতে হয় না, কিন্তু আমার এ কী বিষম ডাক দেওয়া কাজ। কাল যে কী হবে সেই দুঃস্বপ্নই বয়ে বেড়াচ্ছি, আজকের ডাক আজকের সাড়া কাল আবার দেবে

কি না প্রাণ, গান গাব কি না ফিরে আর-একবার, তাই ভাবছি সোনালিয়া।'

সোনালি কুঁকড়োকে আপনার ডানার মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললে, 'নিশ্চয়ই কাল তুমি গান ফিরে পাবে গলা ফিরে পাবে, আলোর সুর মাটির ভালোবাসা আবার সাড়া দেবে তোমার বুকের মধ্যে।'

কুঁকড়ো সোনালিকে বললেন, 'কী আশার আলোই জ্বালালে সোনালি, বলো, বলো, আরো বলো —।'

সোনালি চুপি চুপি বললে, 'আহা মরি, কী সুন্দর তুমি।' 'ও কথা থাক্ সোনালি।' 'কী চমৎকারই গাইলে তুমি।' কুঁকড়ো বললেন, 'গান ভালো মন্দ যেমনি গাই আমি যে আনতে পেরেছি…।' সোনালি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'ঠিক, ঠিক, আমি তোমায় যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।' 'না সোনালি, আমার কথার উত্তর দাও, বলো, সত্যি কি —।' সোনালি আস্তে বললে, 'কী?' কুঁকড়ো বললেন, 'বলো, সত্যি কি আমি', সোনালি এবার তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, 'পাহাড়তলির কুঁকড়ো তুমি সত্যি আলো দিয়ে সূর্যকে ওঠালে আজ, এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

'ভ্যালারে ওস্তাদ' বলেই তাল-চড়াইটা হঠাৎ উপস্থিত। কুঁকড়ো চমকে উঠে দেখলেন, চড়াইটা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ভুরু তুলে শিস দিচ্ছে আর নমস্কার করছে। কুঁকড়ো ভাবছেন এ হরবোলাটা সব শুনেছে নাকি। ইতিমধ্যে সোনালিয়া আস্তে আস্তে অন্য দিকে চলেছে দেখে তিনি ডাকলেন, 'আমাদের একলা ফেলে কোথায় যাও সোনালি।' চড়াই যতই হাসুক কুঁকড়োর আজ কিছুই গায়ে লাগবে না, সোনালিকে কাছে পেয়ে তাঁর আনন্দ ধরছে না।

চড়াই বললে, 'বাহবা তারিফ। যা দেখলেম শুনলেম—।'

কুঁকড়ো বললেন, 'চটকরাজ, তুমি যে মাটি ফুঁড়ে উপস্থিত হলে দেখছি।'

চড়াই কুঁকড়োকে সেই পুরানো ময়লা খালি ফুলের টবটা দেখিয়ে

বললে, 'আমি ওইটের ভিতরে ব'সে একটা কান-কুটুরে পোকা কুট কুট করে খাচ্ছি এমন সময় আঃ, কী যে দেখলেম, কী যে শুনলেম তা কী বলি।'

কুঁকড়ো বললেন, 'তার পর।' চড়াই অমনি বলে উঠলে, 'তার পর যদি বলি ওই মাটির টবটা দিব্যি শুনতে পায় তবে কি তুমি অবাক হবে নাকি।'

কুঁকড়ো বললেন, 'গামলা থেকে লুকিয়ে শোনা বিদ্যেও তোমার আছে দেখছি।' চড়াই জবাব দিলে, 'শুধু শোনা নয় লুকিয়ে দেখার লুকি-বিদ্যেও আমি জানি, আমি এমনি অবাক হয়েছিলেম যে কখন্ যে গামলার তলার ফুটোটা দিয়ে উঁকি মেরে সব দেখেছি তা আমার মনে নেই। আহা, কী দেখলেম রে, কী সুন্দর কী সুন্দর।'

কুঁকড়ো তাকে এক ধমক দিয়ে বললে, 'বটে, লুকিয়ে দেখা! তফাৎ যাও।' কুঁকড়ো যত বলেন, 'তফাত তফাত', চড়াই ততই লেজ নাচিয়ে বেড়ায় আর ঘাড় নেড়ে কুঁকড়োর নকল করে কিচ কিচ করে, 'বিদ্যে ফাঁস লুকি-বিদ্যে হল ফাঁস ফুস-মন্তর হল ফাঁস ক্যাবাৎ কাব্যাৎ।' কুঁকড়ো তার রকম দেখে হেসে ফেললেন। সোনালিয়া বললে, 'চড়াই যখন সত্যিই তোমায় ভক্তি করে তখন ওর সাত খুন মাপ।'

চড়াই বললে, 'ভক্তি করব না? এমন আলেয়া বাজিগর বুজরুগ কেউ কি দেখেছে, কী সকালের রঙটাই ফলালে কী গানটাই গাইলে গা যেন তুবড়িবাজি ভুস।'

সোনালি বললে, 'এখন তোমরা দুই বন্ধুতে আলাপ-সালাপ করো, আমি চললুম।'

কুঁকড়ো বললে, 'কো-ক্-কা-ক কোথায়?'

সোনালি বললে, 'ওই যে সেই —।'

চড়াই অমনি বলে উঠল, 'তাই তো, কুঁকড়োর গানের গুণে চিনে-মুরগির ছোটো হাজিরিও জমতে চলল, সাধে বলি কুঁকড়োর গান গাওয়া, চিনে-মুরগির চা খাওয়া, একসঙ্গে আসা যাওয়া।'

কুঁকড়ো সোনালিকে চুপি চুপি শুধলেন, সে একা যাবে, না তিনিও সঙ্গে যাবেন ?

সোনালি বললে, না ওরকম মজলিসে তাঁর যাওয়াটা ভালো দেখায় না। কুঁকড়ো সোনালিকে বললেন, 'তবে তুমি যাচ্ছ যে।'

সোনালি বললে, 'আমি যাচ্ছি আজ তোমার আলোর ঝকমকানিটা কেমন তাই সেই-সব হিংসুক পাখিকে দেখিয়ে আসব,' ব'লে সোনালি একবার গা ঝাড়া দিলে তার সোনার পালকগুলো থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়তে লাগল। সোনালি কুঁকড়োকে সেইখানে তার জন্যে থাকতে বলে চিনে-মুরগির মজলিসে চলল। চড়াই অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হাঁ, কুঁকড়োর আজ সেখানে না গেলেই ভালো।'

কুঁকড়ো শোধালেন, 'কেন।'

'সে তোমার শুনে কাজ নেই' বলে চড়াই মিটমিট করে চাইতে লাগল সোনালির দিকে।

সোনালি হেসে বললে, 'না, চড়াইকেও যে তুমি পাগল করলে' বলে সোনালি পাখি সোনালি ডানা মেলে উড়ে গেল। কুঁকড়ো চড়াইয়ের দিকে চেয়ে ভাবছেন, জিম্মা একে দেখতে পারে না, কিন্তু চড়াইটা নেহাত মন্দ নয়, একটু বক্তার বটে, কিন্তু বদমাশ তো নয়।

চড়াই এবার লেজ নেড়ে বললে, 'বলিহারি তোমার বুদ্ধিকে, সব মুরগিগুলোকে বিশ্বাস করিয়েছ যে তুমিই সূর্যোদয় করে থাক, মেয়েদের চোখে ধুলো দিতে তোমার মতো জুটি নেই, এতদিনে বুঝলেম মুরগিরা কেন তোমার অত প্রশংসা করে। হয় কলম্বস যে ডিমটি নিয়ে রাজাকে ডিমের বাজি দেখিয়েছিলেন সেই ডিমটি থেকে তুমি বেরিয়েছ, নয়তো সিন্ধবাদ যে আজগুবি সামোরগের ডিমের গল্প লিখে গেছে, তারি তুমি বাচ্ছা, এ না হলে তুমি অলোর আবিষ্কর্তা হতে না আর মুরগিদের এমন আজগুবি কথা শুনিয়েও ভোলাতে পারতে না। অণু পরমাণুদের জন্যে আলোর দোলনা, খড়ের চালে সোনার পোঁচ, এ-সব খেয়াল কি যে-সে মাথা থেকে

বার হয়, না আপনাকে অতি দীন অতি হীন ব'লে চালিয়ে যেমনি দিন এল বলে অমনি আলোর ফুল বলে চেঁচিয়ে উঠে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে যাওয়া যার-তার কর্ম।'

রাগে কুঁকড়োর দম বন্ধ হবার জোগাড় হচ্ছিল, তিনি অতি কষ্টে বললেন, 'থামো, চুপ।'

চড়াই দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বললে, 'আচ্ছা, সত্যি কি তুমি জান না যে দিন-রাত যে আসে সেটা একটা প্রকৃতির নিয়ম ছাড়া আর কিছু নয়?'

কুঁকড়ো বললে, 'তুমি জানতে পার আমি জানি নে। আর যাই নিয়ে ঠাট্টা কর, করো, এ কথা নিয়ে আর কোনোদিন তামাশা কোরো না যদি আমার উপর তোমার একটুও মায়া থাকে।'

চড়াই মুখে বললে, খুব মায়া খুব শ্রদ্ধা সে কুঁকড়োকে করে কিন্তু তবু খোঁচা দিয়ে ঠেস দিয়ে কথা সে বলতে ছাড়ছে না, তর্কও করতে চায়।

কুঁকড়ো রেগে বললেন, 'কিন্তু যখন আমি ডাক দিতে সূর্যই উঠল আলো হল, সে আলো পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে গেল, আকাশে নানা রঙ ধরলে তখনো কি একবার তোমার মনে হয় না যে এ-সব কাণ্ড করলে কে।'

চড়াই বললে, 'গামলায় গর্তটা এমন ছোটো যে সেখান থেকে আমি কেবল একটুখানি মাটি আর তোমার ওই হলুদ বরন চরণ দুখানি দেখেছিলেম, আকাশটা কোথায়, তা খবরেও আসে নি।'

কুঁকড়ো বললেন, 'তোমার জন্য আমার দুঃখু হয়, আলোর মর্ম বুঝলে না, তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকো অত্যন্ত চালাক পাখি।'

চড়াই জবাব দিলে, 'বেশ কথা, অতি বিখ্যাত কুঁকড়ো।'

কুঁকড়ো বললেন, 'বেশ কথা, যে থাকবার থাক্, আমি যেমন চলেছি সূর্যের দিকে মুখ রেখে তেমনিই চলি দিনরাত এই পাখি-জন্ম সার্থক করে নিয়ে। চড়াই জান, বেঁচে সুখ কেন তা জান?'

চড়াই ভয় পেয়ে বললে, 'তত্ত্বকথা এসে পড়ল শুনেই মনে হয় পিঁপড়ের পালক ওঠে মরিবার তরে', বলে চড়াই নিজের পালক খুঁটতে লাগল। কিন্তু কুঁকড়ো বলে চললেন, 'কিছুর জন্যে যদি চেষ্টা না করব তবে বেঁচেই থাকা বৃথা, বড়ো হবার চেষ্টাই হচ্ছে জীবনের মূল কথা, তুই চড়াই সবার সব চেষ্টাকে উড়িয়ে দিতে চাস, সেইজন্যে তোকে আমি ঘৃণা করি, এই যে এতটুকু গোলাপি পোকাটি একা মস্ত ওই গাছের গুঁড়িটাকে রুপোর জাল দিয়ে গিল্টি করতে চাচ্ছে, ওকে আমি বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করি।' 'আর আমি ওকে টুপ করে গালে ভরি' বলেই চড়াই পোকাটিকে ভক্ষণ করলেন। 'তোর কী দয়া-মায়া নেই রে? যাঃ, তোর মুখ দেখব না' বলে কুঁকড়ো চললেন। চড়াই বললে, 'দয়া-মায়া নেই কিন্তু ঘটে আমার বুদ্ধি আছে, যা হোক আমি আর তোমার কিছুতে নেই 'তোমার শত্রুরা যা-ইচ্ছে করুক বাপু, আমরা সে কথায় কাজ কী, তুমি জান আর তারা জানে।'

কুঁকড়ো শোধালেন, 'শত্রু কারা শুনি?'

'কেন, পেঁচারা।' চড়াইটা বলে উঠল।

'শেষে এও ভাগ্যে ছিল, পেঁচা হলেন শত্রু আমার, হাঃ হাঃ হাঃ' বলে কুঁকড়ো হেসে উঠলেন।

চড়াই বললে, 'আলোর কাছে তারা এগোতে পারে না বটে, সেইজন্যে তারা এক বাজখাঁই গুণ্ডা জোগাড় করেছে, যে পাখি রোজই দিন গুনছে তাকে জবাই করতে।'

'কাকে তারা জোগাড় করেছে' কুঁকড়ো শোধালেন।

চড়াই বললে, 'তোমারই জাতভাই হায়দ্রাবাদি মোরগ, আঃ, সে যে কুস্তিগীর ভীম বললেই চলে, সে তোমার আসা-পথ চেয়ে সেখানে আছে।' কুঁকড়ো শোধালেন, 'কোথায়।' 'ওই চিনে-মুরগির ওখানে' চড়াই বললে। কুঁকড়ো শোধালেন, 'তুমি তাকে দেখতে যাচ্ছ নাকি।' 'না বাবা, যে তার পায়ে লোহার কাঁটা বাঁধা কী জানি যদি লেগে যায় তবে' বলে চড়াইটা আড়চোখে কুঁকড়ো কী

করেন দেখতে লাগল। কুঁকড়ো চট করে কুলতলার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। চড়াই যেন কত ভয় পেয়ে বললে, 'যাচ্ছ কোথায়।' 'কুলের কাঁটা যেখানে অনেক সেই কুলতলাতে যাচ্ছি' বলে কুঁকড়ো ঘাড় উঁচু করে পায়ে পায়ে চললেন। চড়াই যেন কুঁকড়োকে কিছুতেই যেতে দেবে না এমনি ভঙ্গি করে বললে, 'না তোমার যাওয়া সেখানে মোটেই উচিত হবে না, আমি বলছি যেয়ো না।' 'যাওয়া চাই' বলে কুঁকড়ো গম্ভীর মুখে পুরোনো ফুলের খালি টবটা দেখে বললেন, 'এই ছোটো গামলাটির মধ্যে তুমি সেঁধোলে কেমন করে।' 'কেন এমনি করে' বলেই চড়াই লাফিয়ে সেটার মধ্যে গিয়ে বললে, 'কেন এই এমনি করে সেঁধিয়ে এই ফুটো দিয়ে আমি দেখলুম'। 'কী দেখলে ?' 'কেন মাটি', 'আর, এইবার আকাশ দেখে নাও।' বলেই কুঁকড়ো ডানার এক ঝাপটে টবটা উলটে চড়াইকে চাপা দিয়ে সোজা চলে গেলেন। চড়াইটা গামলার মধ্যে থেকে বেরোবার জন্যে ঝটাপটি করতে থাকল 'গেছি গেছি' বলে।

৬

চিনি-দিদি ব্যস্ত হয়ে চারি দিকে ঘুরছেন — খাতির যত্ন করে ; আর তাঁর ছেলেটিও মায়ের সঙ্গে ঘুরঘুর করছেন আর মাঝে মাঝে মায়ের দু-একটা ইংরিজি উচ্চারণের আর আদব-কায়দার ভুল হলেই চমকে তাঁকে কানে কানে ধমকাচ্ছেন। ছেলেটি বিলেতে ভাষাতত্ত্ব পড়তে গিয়েছিলেন কিন্তু সাঁতার মোটেই না জানায় তিন-তিনবার প্লাক্‌ট হয়ে এসেছেন।

সোনালি-আঁচল উড়িয়ে বনমুরগি সোনালি যখন হেঁসেলবাড়ির খিড়কির কাছটায় পৌঁছল, তখন রাজ্যের পাখি সেখানে জুটে কিচমিচ লাগিয়েছে ; চিনি-দিদির মজলিসটা খুঁজে নিতে সোনালির আর একটুও কষ্ট পেতে হল না।

সোনালিয়াকে দেখেই চিনি-দিদি খাতির করে কুলতলায় ফাঁকায়

নিয়ে বসিয়ে ওদিকে চলে গেলেন। সোনালি শুনতে লাগল বোলতারা সব ফলন্ত গাছকে ঘিরে ঘিরে মোচং বাজিয়ে গাইছে, সোনা-ফলের গান, হুল রাগে।

গান

মন ভুলে গুঞ্জরি — মুঞ্জরি মুঞ্জরি।
বাতাসে গুঞ্জরি, আকাশে মুঞ্জরি।
ফুলে বউল গোছা গোছা,
ফলে মউল গাছে গাছে,
আমরা বলি গুঞ্জরিয়া —
শেষ সবারই আছে আছে।
সবজে পাতার কলি, সোনালি ফুলের মধু
বঁধু ওগো বঁধু—
ফুলের মঞ্জরি! আমরা গুঞ্জরি।
ফুল ঝরে, ফল ঝরে, কুঁড়ি ঝরে, কলি ঝরে,
মন ঝুরে গুঞ্জরি — মঞ্জরি মঞ্জরি।

শুধু যে বোলতারাই গাইছিল তা নয়; ভোমরা, মৌমাছি, গঙ্গা-ফড়িং সবাই দলে দলে বাত্তি আর গান জুড়ে দিলে। চিনি-দিদি গড়ের মাঠের বাত্তি যত দল, তা ছাড়া কালোয়াতি কীর্তন বাউল সব রকম জোগাড়ই করেছিলেন। কেবল চুনোগলির ব্যাণ্ডটা তিনি জোগাড় করতে পারেন নি। আর সেইজন্যে তিনি সবার কাছে বার-বার দুঃখু জানাতে লাগলেন। কালো-কোট সাদা-কামিজে ফিটফাট কাক দরজায় দাঁড়িয়ে মোড়লি করে এর-ওর-তার আলাপ-পরিচয় করে বেড়াচ্ছেন —ইনি রাজহংস, ইনি হংসেশ্বরী, তুরস্কের পেরু, ও-পাড়ার চটসাঁই চড়াইমশায় ইনি আমাদের। সোনালি চড়াইকে ধুলোমাখা, কেমন হতভাগা-গোছের চেহারায় আসছে দেখে শুধলেন, 'কোনো অসুখ হয় নি তো!' চড়াই সোনালিকে ফুলের টবের ইতিহাস বলতে সোনালি হেসেই অস্থির। সোনালি আর

চড়ায়ে কথা হচ্ছে, এমন সময় আরো পাখি আসতে লাগল। ভিড় দেখে সোনালি চড়াইকে নিয়ে একটা জলের বোমার আড়ালে সরে দাঁড়ালেন। সেই সময় জিম্মা কাছেই একটা ভাঙা ঠেলাগাড়িতে লাফিয়ে বসল, সোনালি তাকে দেখে একবার ঘাড় হেলিয়ে নমস্কার করলেন, দূর থেকেই।

জিম্মার চেহারাটা কেমন রাগি-রাগি বোধ হল। ঘোঁটের খবর যেমন শোনা অমনি সে কুঁকড়োকে বিপদ থেকে বাঁচাতে শিকলিটা ছিঁড়ে টানতে টানতে এসে উপস্থিত কুলতলায়। চড়াইকে বোমার পিছনে দেখে জিম্মা রাগে গোঁ-গোঁ করতে লাগল। ভয় পেয়ে চড়ায়ের লেজ কাঁপতে লেগেছে, এমন সময় ফড়িংদের স্ট্রীংব্যাণ্ড শুরু হল, সেইসঙ্গে গঙ্গা-মৃত্তিকার অলকা-তিলকা দিয়ে ছাপমারা গঙ্গাফড়িং কীর্তন ধরলেন —তুড়ি রাগিণীতে খোল বাজিয়ে সূর্যের রূপবর্ণনা। —

কনক বরন, কিয়ে দরশন
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত চাঁদ শোভিত
সিন্দুর অরুণ আর
আহা কিবা সে মধুর রূপ।

দু-একজন বিলেত-ফেরত মোরগ, খোল শুনে দশা পেলেন।

তার পর মৌমাছি গাইতে লাগল দলে দলে 'মধু'র গান —

আলোতে চলি সবাই গুনগুনিয়ে,
আলোতে ফুল ফুটেছে তাই শুনিয়ে,
গুন-গুনিয়ে।
বাহিরে সোনার আলো,
ভিতরে সোনার রেণু,
বাহিরে বাজল বীণা,
ভিতরে বাজল বেণু,
সকালের আলো আলো গুন-গুনিয়ে।

ফুলের সুবাস, সোনার রেণু, পদ্মের মধু, রোদ-বাতাস সব যেন একসঙ্গে এসে উপস্থিত হল। মধুকরের দল চারি দিকে সুরের মধুবিষ্টি করে দিলে। বাহবা বাহবা পড়ে গেল। চিনি-দিদি কিন্তু গানও বুঝছেন না, সুরও শুনছেন না। তিনি কেবল কারা কারা তাঁর পার্টিতে এসেছে তারি হিসেব সবাইকে দিচ্ছেন, 'বোঝা থেকে শাকের আঁটিটি পর্যন্ত কেউ আর আসতে বাকি নেই, দেখেছ ভাই?' একটা শ্যামা পাখি পেয়ারা গাছে বসে শিস দিলে, অমনি চিনি-দিদি বললেন, 'ওই শ্যামদাসী এলেন। ওই বুঝি কাছিমুদ্দি? না না কাছিম বুড়ো তো নয়। এ তবে কে। সবাইকে তো চিনি নে ভাই, তেনার সব পুরোনো বন্ধু।' একটা ভীমরুল বোঁ-বোঁ করে চারি দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল, চিনি-দিদি তার পিছনে 'ভালো আছ? ভালো আছ?' বলতে বলতে ছুটলেন।

চড়াই সোনালিকে বললে, 'চিনি-দিদি একেবারে খেপে গেছেন।' সোনালি মজা দেখবার জন্যে আড়াল থেকে বেরিয়ে দাঁড়ালেন। চিনি-দিদি ভীমরুলের সঙ্গে খানিক ছুটে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটু কপি পাতা খাচ্ছেন এমন সময় হাওয়াতে টুপ টাপ ক'রে পাতার শিশিরের সঙ্গে একটি শিউলি ফুল ঝরে পড়ল। চিনি-দিদি অমনি বলে উঠলেন, 'অ শিউলি, অ শিশির, এতক্ষণে বুঝি আসতে হয়?' এই সময় একটু হাওয়া উঠল আর টুপ করে একটি কুল চিনি-দিদির ঠিক নাকের উপরে পড়ে গেল, চিনি-দিদি চমকে উঠে বললেন, 'এই যে বাতাসি-দিদিও এসেছ। তবু ভালো যে মনে পড়েছে।' বলে কতকগুলো গিনিপিগ নিয়ে চিনি-দিদি খাওয়াতে চললেন। 'কে যে চিনি-দিদির চেনা নয়, তা জানি নে।' বলে চড়াই এদিক ওদিক ভালো করে দেখে পা টিপে টিপে বেড়াল যেখানে আতা গাছের ডালে গুঁড়ি মেরে বসে এদিক ওদিক দেখছিল, সেইখানে গিয়ে বললে, 'সব ঠিক তো বন্দোবস্ত?' বেড়াল একবার ওই ওদিকটায় ঘাড় তুলে দেখে বললে, 'সব ঠিক। আসছে তারা।' এদিকে চিনি-দিদি সোনালিকে নতুন

বিলিতি কলে-দিয়ে-ফোটানো দুটি মুরগির ছানার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, এমন সময় দূরে ময়ূর গলা-খাঁকানি দিলেন, 'কেও, চিনি নাকি।' ময়ূর এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন ; মুরগি, হাঁস, তিতির, বটের সব অমনি তাঁকে ঘিরে যেন রথ দেখবার ভিড় করলে। ময়ূর সবাইকে জাঁকালো পোশাক আর হীরে জহরতের ভাউ বাৎলাতে লাগলেন, খুব বুদ্ধিমানের মতো গম্ভীর মুখ ক'রে। জিম্মা কুত্তানি কিন্তু ময়ূরকে দেখে মনে-মনে বললে, 'এটার মতো দেমাকে অদ্ভুত জানোয়ার আর দুটি দেখা যায় না।' এমন সময় কাক দরজা থেকে ফোকরালেন, 'চাটগাঁই মোরগ।' চিনি-দিদি এ নাম কখনো শোনেন নি ; বুঝি-বা ভুল করেছে কাকটা ভেবে সেদিকে যাবেন, এমন সময় সত্যিই সাদা জোব্বা-খাব্বা, কালো চাপদাড়ি মোড়াসা-মাথায় চাটগাঁই এসে সেলাম করলেন। চিনি-দিদির মুখে আর কথা সরল না। তার পর কাক একে একে সব অদ্ভুত মোরগের নাম ফোকরাতে থাকল, 'সিংগালি, বোগদাদি, জাপানি।' সবাই বলে উঠল, 'একি ব্যাপার।' চিনি-দিদি বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলেন দলে দলে অদ্ভুত মোরগ সব আরো আসছে, 'সেলেম সাহি, খাঁ খানানি, তখতে তাউস, কান্দাহারি, কাবুলী, জবরদস্ত ঝোঁটনদার, চম্পাধাড়ি, কুলঝুটি, খুঞ্চেপোষ, ডেগচি, মোগলাই, জবড়জঙ্গ, ইয়াহুদি, চাল বাহাদুর, খেতাববক্স, মেজাজি, পরদুম্বা, মুলুকচাঁদি, বাজখাঁই, শির-ই-ফরহাদ, গোলগুম্বজ, কাবাবি।'

চিনি-দিদি দেখে শুনে অবাক, কেবল লেজ দোলাচ্ছেন আর বলছেন, 'ওমা কোথায় যাব। ওলো দেখ, কী হবে গো, এমন তো কখনো দেখি নি।'

নবাবী আমলের মোরগ সব একে একে এলেন। এবার পাটনাই মোরগ সব আসছেন, 'তিলকধারী ভোজপুরি, রামদুলালি।'

'ওমা কোথায় যাব।' বলে চিনি-দিদি সবাইকে খাতির করতে ছুটলেন।

এবার গৌড়িয়া মোরগ সব আসছেন, 'গোবরগণেশ, চালপিটুলি,

মোহনভোগ, বামুনমারি, কানাইচুড়ো, চৌগোপলা, ঢেঁকুচকুচ, ঢাক্-পিটুনে, ফিকরে গোঁসাই, বেঁটেবঙ্কট, কয়লাধামা, রাজকুমড়ো, থুতি সাতি।'

কুলতলাটা ঝুঁটিতে, পালকে, চাপদাড়ি, গোঁপ, টিকি, আর পোষা-পালা বড়ো-বড়ো খেতাব-জাইগির-শিরপেঁচওয়ালা মোরগের ভিড়ে সরগরম হয়ে উঠল, যেন পালকের গদি। কারু লেজের পালক, মেপে সাতগজ। কারু গলায় যেন উলের গলাবন্ধ জড়ানো রয়েছে। একজনের ঝুঁটির কেতা যেন রামছাগলের শিং। কারু মাথায় জরির তাজ, কারু এক চোখে চশমা, অন্য চোখটা টুপিতে ঢাকা; কারু বুকে ফুলের তোড়ার মতো খানিক পালক, কারু আঙুল দস্তানায় মোড়া, কারু-বা আঙুল এত লম্বা যে কিছুই ধরতে পারে না। কেউ ঝাঁকড়া চুলের উপরে আবার টিকি রেখেছে, আর কারু বা মাথায় চুলও নেই, টিকিও নেই, কিছুই নেই। ঘাড়ে-গর্দানে-সমান এই শেষের মোরগটা হচ্ছে সেই নামজাদা লড়ায়ে মোরগ, যে বিলেত পর্যন্ত মেরে এসেছে। এরি দুপায়ে ইস্পাতের কাঁটা-মারা ভয়ংকর দুটো কাতান মানুষ শখ করে বেঁধে দিয়েছে, অন্য মোরগকে লড়ায়ে খুন করে বাজি জেতবার আর মজা দেখবার জন্যে। ঘোড়দৌড়ের খেলায় যেমন, তেমনি এই মোরগের লড়াই দেখতে আর বাজি লাগাতে লোকে টিকিট পায় না, এত ভিড় হয়।

বেড়াল চড়াইকে গাছের উপর থেকে এই মোরগটাকে দেখিয়ে বললে, 'এই সেই বাজখাঁই গুণ্ডা বা লড়ায়ে মোরগ বা নবাব বাজেখাঁর বাবুর্চিখানার শেষ-পোষা পাখি। পুরুষানুক্রমে এদের ঘাড় এমন শক্ত যে মোটেই নোয় না, ইনি শুধু দিল্লীর লাড্ডু খেয়ে লড়েন।'

এইবার সব বিলেত-ফেরতা মোরগ এলেন, মিস্টার চচ্চড়ি, মিঃ ভাজি, মিঃ ঘণ্ট, মিঃ আবার খাব, মিঃ চাপাটি, মিঃ বে-হোঁস। চিনি-দিদি ভাবছেন এই-সব মোরগের মুরগিদের নিয়ে আসছেবারে

তিনি একটা পর্দাপার্টি দেবেন। দাঁড়কাক তখনো হাঁপাতে হাঁপাতে ফুকরোচ্ছে, 'রামধনুস, রঙবেরঙ, বুঁদেলা মল্, রণছোড় ভাগি,ধান ভগৎজিউ···' যত মাড়োয়ার দেশের মোরগ, সিন্দি, কচ্ছি, অরোদা-বরোদা সবাই এলে পর দাঁড়কাক মুখ ফিরিয়ে দেখলে — কুঁকড়ো। সে তাঁর পদবী উপাধি ফুকরোতে যাবে, কুঁকড়ো বললেন, 'কিছু দরকার নেই। শুধু জানিয়ে দাও আমি কুঁকড়ো এলেম।' দাঁড়কাক তাঁর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মুখটা বেঁকিয়ে জোরে হাঁক দিলে, 'কুঁকড়ো-ও-ও।' কুঁকড়ো অতি শান্ত ভালোমানুষটির মতো চিনি-দিদিকে নমস্কার করে বললেন, 'আমাকে মাপ করতে হবে, আমার সাজসজ্জা পদবী উপাধি কিছুই নেই, আমার ঠিক যতগুলো আঙুল হওয়া উচিত তাই আছে, আর মাথার এই লাল একটিমাত্র টুপি, জন্মাবধি এইটেই পরে বেড়াচ্ছি, সে কথাটা লুকিয়ে লাভ নেই। আর আমার এই গায়ের কাপড় —এটা পরে এখানে আসাটা বাস্তবিক অন্যায় হয়েছে ; দেখো-না রঙচঙ বেশি নেই, কেবল একটু কচিপাতার সবুজ আর পাকা ধানের সোনালি। মাফ করো, আমি নেহাতই একটা সাধারণ কুঁকড়ো যাকে দেখা যায় ধানের গোলায়, চালের মটকায়, গির্জার চুড়োয়, সোনায় মোড়া ছেলেদের হাতে টিনের বাঁশির আগায় রঙ-করা, জলেস্থলে সর্বত্র। কেবল কোনো চিড়িয়াখানায় আর জাদুঘরে আমার দেখা পাওয়া যাবে না।'

চিনি-দিদি বললেন, 'তা হোক। তোমার কাজের সাজে এসেছ তাতে কী দোষ। তোমার সময় কোথা যে, সেজে বেড়াবে ? কাজের পাখি তোমার সব দোষ মাপ। কিন্তু যারা বিয়েতে যায়, কেরানির কিংবা উকিল বেরিস্টার মোক্তারের সাজ প'রে, কিংবা বুট হ্যাট প'রে যায় বউভাতের ভোজে, তাদের আমি কিছুতে মাপ করি নে।'

দাঁড়কাক ফোকরাল, 'জুড়ি লোটন পায়রা।' কুঁকড়ো ভাবলেন বুঝি তাঁর বন্ধু কবুদ আর কবুদনী। কিন্তু ফিরে দেখলেন সাদা দুটি

গুজরাটি, পায়রা কিং—কী, বোঝবার জো নেই, ডিগবাজি খেতে খেতে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তার পর দাঁড়কাক ফুকরলে, 'ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর রাজহংস স্বামিজী।' কুঁকড়ো পদ্মবনের মরাল আসছেন ভেবে আনন্দে দরজার দিকে চেয়ে রইলেন, অনেকক্ষণ পরে পাখির মতো পাখি আসছে ভেবে ; কিন্তু হেলতে দুলতে সাদা মরাল না এসে, নেংচাতে নেংচাতে এলেন এক পাখি, দেখতে মরালের মতো কতকটা, কিন্তু মোটেই সাদা নয়, সিধেও নয়, কালো ঝুল। কুঁকড়ো নিশ্বেস ছেড়ে বললেন, 'মরাল না এসে এল কি না মরালের একটা বিকট কালো ছায়া।' ব'লে কুঁকড়ো একটা দোলার উপরে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন, দূরে সবুজ মাঠ, তারি উপরে ধেনু চরছে, বাছুরগুলো ছুটোছুটি করছে ; কোথায় আমলকী গাছের ছায়ায় বাঁশি বাজছে তারি শব্দ। পৃথিবীর সবই এখনো এই সব হরেক রকম পোষা পাখিগুলোর মতো টেরে বেঁকে অদ্ভুত রকম হয়ে ওঠে নি ; সাদাসিদে গোলগাল যেমন ছিল তেমনিটি আছে। ঘাসের রঙ সবুজই রয়েছে, আকাশ নীল, জল পরিষ্কার, পাখিরা উড়ছে ডানা ছড়িয়ে, গোরু হাঁটছে চার পায়ে, মানুষ চলেছে দুপায়। কুঁকড়ো আনন্দে এই-সব দেখছেন আর সোনালি আস্তে আস্তে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলছে, 'এই-সব চিড়িয়াখানার উপযুক্ত অদ্ভুত সঙ-গুলোকে আমার ভারি খারাপ লাগছে, আর একদণ্ড এখানে থাকা নয়, চলো আমরা দুজনে সেই বনে চলে যাই ; সেখানে আলো আর ফুল আর তোমার আমার ভালোবাসা।' কুঁকড়ো ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না সোনালি, সে হতে পারে না। বিধাতা যেখানে রেখেছেন সেইখানেই আমাকে থাকতে হবে। আমি জানি এই আবাদটুকুর মধ্যে করবার মতো কাজ আমাদের অনেক রয়েছে, আর, সবার ভালোবাসাও এখানে পাচ্ছি তো।'

সোনালির মনে পড়ল রাত্রের ঘুঁটের কথা ; কিন্তু ওদের ভালো-বাসা যে মোসলমানের মুরগি-পোষার মতো, সেটা ব'লে কুঁকড়োকে দুঃখ দেওয়া কেন। সে বার বার বলতে লাগল, 'না না, চলো

তুজনে চলে যাই, আহা সেই বনে যেখানে বসন্ত বাউরী কেবলি বলছে, 'বউ কথা কও'; আর পাতায় পাতায় সোনার অক্ষরে ভালোবাসার গান সব লেখা হচ্ছে সকাল থেকে সন্ধে।'

এই সময় ওধারটায় কিচিরমিচির শব্দ উঠল, সব পাখিরা ময়ূরকে পাখম ছড়াবার জন্যে পেড়াপিড়ি করছে। চিড়িয়াখানার সব মোরগগুলো তাদের সম্পর্কে পাখমদাদা ময়ূরের চারি দিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। অনেক বলা-কওয়াতে ময়ূর পাখম খুলে দেখালেন। পাতিহাঁস হাঁ করে চেয়ে রইল। ময়ূরের কাছে কোটের কাটকুট নমুনো ফ্যাশান চাইতে লেগে মোরগদের মধ্যে হট্টগোল বেধে গেল। সবাই ময়ূরকে আপনার আপনার সাজগোজ দেখিয়ে পাস হতে চাচ্ছে, এক মোরগ অন্যকে ঠেস দিয়ে বলছে, 'তোমায় দেখতে হয়েছে ওই কাপড়ে, যেন সুড়ুঙ্গে সুপুরি গাছটি।' সে আবার তাকে এক ধাক্কা দিয়ে বলছে, 'আর তোমারই সাজাটা কী দেখতে হয়েছে? যেন মগের মুল্লুকের আটচালাখানি, শিং বের-করা ছুঁচোলো।' সবাই যখন সাজসজ্জা দেখাতে মারামারি বাধিয়েছে তখন কুঁকড়ো গলা চড়িয়ে বলে উঠল, 'তাকাও, তাকাও, ওদিকে তাকাও।' কুঁকড়োর কথামতো সব মোরগ মায় ময়ূর হাঁস আর যত দেমাকে পোশাকী পাখি সবাই সেই কাপড়-ঝোলানো খড়ের কুশো-পুতুলটার দিকে চেয়ে দেখলে, হাওয়াতে সেই খড়ের কাঠামোর কামিজের হাতাটা লটপট করে যেন তাদেরই দেখিয়ে কী বলতে যাচ্ছে। ভয়ে সব পোশাকী পুষ্যি পাখিদের মুখ চুন হয়ে গেল। কুঁকড়ো হেঁকে বললেন, 'তাকাও, তাকাও, উনি তোমাদের আশীর্বাদ করছেন।' মোরগগুলো কুঁকড়োর দিকেই চেয়ে রইল, তখন কুঁকড়ো বললেন, 'ওই যে কাঠামোটার পায়ে পেন্টালুন লটপট করছে, ওটা কী বলছে জানো? আমার এই ছককাটা ছিট একদিন ফ্যাশান ছিল, উনোপঞ্চাশ টাকা গজ দরে আমি বিকিয়েছি; এক কালে। আর ওই যে ভাঙা তোবড়ানো সোলার টুপি ওটার মাথায় চড়ানো দেখছ, ওটাই-বা কী বলছে? — আমিও একদিন ফ্যাশান ছিলুম, আশি

টাকা দিয়ে লোকে আমায় কিনেছিল, এখন মেথরও আমাকে মাথায় দিতে লজ্জা পায়। আর ওই দেখো কোট, তার এখনো ভুল ভাঙে নি, সে এখনো দেখো, চলতি বাতাসে উড়ে উড়ে আকাশে ফ্যাশান হাতড়ে বেড়াচ্ছে। চলতি বাতাস চলে গেল আর ওই দেখো ফ্যাশান-ধরা নিষ্কর্মা কোটের হাতত্নটো নিরাশ হয়ে ঝুলে পড়ল।' এই কথা কুঁকড়ো যেমন বলেছেন আর সত্যি সত্যি বাতাস বন্ধ হল, সব পাখিরা দেখলে হুই হাতা মাটির দিকে ঝুলিয়ে কুশো-পুতুলটা স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারা সব সেইদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এমন সময় ময়ূর বললে, 'রাখো, ওটা কি কথা বলতে পারে যে এ-সব বলবে। তুমিও যেমন।'

কুঁকড়ো ময়ূরকে বললেন, 'তুমি যা বললে ওটাকে, মানুষেরা ঠিক ওই কথাই তোমাকে বলছে ইস্ত-না-গা-দ।'

ময়ূর তার কাছের এক পাখিকে চুপি চুপি বললে যে, এই-সব জাঁকালো জাঁদরেল পোষা মোরগকে সোনালির সামনে হাজির করাতেই কুঁকড়োটা তার উপর খাপ্পা হয়েছে। তার পর ময়ূর কুঁকড়োকে বললে, 'আচ্ছা, এই যে সব জাঁদরেল মোরগ এসেছেন, এঁদের তুমি ঠাউরেছ কী শুনি?'

বুক ফুলিয়ে কুঁকড়ো উত্তর দিলেন, 'দর্জির হাতে সেলাই করা, কলে কাটা, কাঁচি দিয়ে ছাঁটা নকল ছাড়া এরা আর কিছুই নয়। সবটাই এদের জোড়াতাড়া দেখছি, ওর ডানা তার ঝুঁটি, এমনি সব টুকিটাকি দিয়ে গড়া এদের চেহারাগুলো কাঁসারিপাড়ার সঙের বিজ্ঞাপনে লাগতে পারে; আর-কোথাও এমন-কি, এই সামান্য গোলাবাড়িতেও, এদের দরকার মোটেই নেই। এদের চলন, বলন, গড়ন সবই বেসুরো, বেয়াড়া, বেখাপ্পা। ডিমের সুন্দর ডৌলটি নিয়ে সব পাখিই বেরিয়ে আসে জগতে, কিন্তু ডিম ফাটিয়ে এরা যে বেরিয়েছে তার কোনো লক্ষণ তো এদের শরীরে দেখছি নে।'

কুঁকড়োর কথা শুনে একটা পোশাকী মোরগ রেগে বলে উঠল,

'বাড়াবাড়ি কোরো না।' কুঁকড়ো সে কথায় কান না দিয়ে বলে চললেন, সূর্যের দিকে চেয়ে, 'এরা কি সত্যিকার মোরগ। কখনোই নয়। কোথায় এদের মধ্যে সেই সকালের আলো, সেই রক্তের মতো রাঙা সুর। সূর্য তুমি সাক্ষী, এরা দেখতে হরেক রকমের বটে, কিন্তু মিথ্যে ছায়া-বাজি বৈ সত্যি নয়, সত্যি নয়। আর ছায়াবাজিরই মতো এরা তামাশা দেখিয়ে কোথায় মেলাবে তার ঠিক নেই। এদের কেউ বেঁচে থাকবে না, হ-রে-ক-র-ক-ম-বা-জি-বা-হ-বা' ব'লে কুঁকড়ো একটু থামলেন। ময়ূর শোধালে, 'কাকে তুমি সত্যিকার মোরগ বল শুনি।'

'সত্যিকার মোরগ তাকেই বলি যার একমাত্র ধ্যান হল', ব'লে কুঁকড়ো চুপ করলেন। সব পাখিই অমনি শুধোলে, 'কী কী? ধ্যান হল কী?'

কুঁকড়ো বুক-ফুলিয়ে বললেন, ' আলোর ফুলকি—ই-ই—।'

সব পোশাকী মোরগ অমনি বাজখাঁই গলায় বলে উঠল, 'কা-লো-কু-ল-চু-র। হাঁ, হাঁ এই তো চোখ বুজলেই আমরা সরষে-ফুলের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো কী যেন দেখতে পাচ্ছি। বাঃ এ তো সবাই ধ্যান করে, নতুনটা কী হল?' ব'লে মোরগগুলো কুঁকড়োকে প্রশ্ন করতে লাগল, তিনি ওড়বে না খাড়বে না নাদে গলা সাধেন? তিনি দক্ষিণী চালে গান করেন না হনুমানের মতে। কোন্ রাগে তার দখল বেশি।

কুঁকড়ো সংগীতশাস্ত্র, স্বরলিপি এ-সবের ধার দিয়েও যান নি; তিনি প্রশ্ন শুনে অবাক হলেন। কুঁকড়ো গাইবে কুঁকড়োর মতো, হনুমানের মতে কেন যে হনুমান ছাড়া আর কেউ গাইতে যাবে কুঁকড়ো তা বুঝে উঠতে পারলেন না। এক মোরগ বললে, 'রোসো, তালটা ঠিক করে নেওয়া যাক, 'কা-আ-আ-লো-ও-ও-ও'…নাঃ মিলল না তো, ফাঁকের বেলায়ও সোম পড়ছে, সোমের বেলাতেও তাই, ফাঁক মোটেই নেই।' ফাঁকা আওয়াজের জন্যে কেন যে এ পাখিটা এত ব্যস্ত তা কুঁকড়ো বুঝলেন না। এক মোরগ মুখে মুখে

স্বরলিপি করে যাচ্ছিল, সে বললে, 'প্রথম লাগল মধ্যম আ-মা; তার পর হল, রি-র-গা-র-গা, এই হল মা-রি-গা।'

আর একজন বললে, 'মা-রি-গা তো নয়, ধ-পা-স।'

কুঁকড়োর মনে হল, ঠিক সবাই পাগল হয়ে গেছে। এ-সব কী খেয়াল। তিনি সাফ জবাব দিলেন, তিনি কোনো গানের ইস্কুলে গান শেখেন নি, শাস্তর-মাস্তর তিনি জানেনও না মানেনও না, গোলাপ যেমন ফুল ফুটিয়ে চলেছে, তিনি তেমনি গান গেয়ে চলেছেন, এইটুকুই তিনি জানেন।

কুঁকড়ো শাস্ত্রের কিছুই জানেন না দেখে অন্য মোরগগুলো তর্ক ছাড়লে। কিন্তু গোলাপের শোভা কি কুঁড়িতে কি ফোটা অবস্থায় ময়ূরটার অসহ্য ছিল, দেখলেই সে ঠোকর দিতে ছাড়ত না; কুঁকড়ো গোলাপের নাম করতেই ময়ূরটা অমনি বলে উঠল, 'গোলাপ আবার একটা ফুলের মধ্যে নাকি?'

কুঁকড়ো গোলাপের নিন্দে শুনে রেগেই লাল; তিনি সব মোরগকে শুনিয়ে বললেন, 'কুঁকড়ো কিংবা মোরগ হয়ে গোলাপের নিন্দে যে সয় সে নরাধম কুলাঙ্গার···।'

'হেঃ তে-রি-গো-লা-প!' ব'লে বাজখাঁই মোরগ তাল-ঠুকে উপস্থিত, 'আওতো, কুঁকড়ো দেখে' ব'লে।

'আও।' ব'লেই কুঁকড়ো বুক-ফুলিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, 'তোকেই খুঁজছিলেম ঝুঁটিকাটা কাকাতুয়া।'

বাজখাঁই কেওমেঁও করে বলে উঠল, 'ক্যা বোলা? এ কেসা বাত হুয়া?—কা-কা-তু-য়া-তুয়া কাকা।'

কুঁকড়ো ঠিক তেমনি সুরে বলে উঠলেন, 'ক্যা বোলা কা-কা-তুয়া।'

খানিক দুজনে চোখ পাকিয়ে পালক ফুলিয়ে এ-ওর দিকে চাওয়া-চায়ি হল। তার পর বাজখাঁই বললে, 'তুমসে কুস্তিগীর পাহালোয়ান জাহানদার জবরদস্ত দশ জোয়ানকো সাথ বেলায়েৎমে ময় লড়া হুঁ, আউর জিতা হুঁ, দো দশকো ঘয়েল ভি কিয়া।'

কুঁকড়োর কাজ খুন নয়—ভয় যারা পায় তাদের অভয় আর আলো দেওয়া। তিনি কিন্তু তাই ব'লে কাপুরুষ ভীরু ছিলেন না, এগিয়ে এসে বললেন, 'তবে লড়ায়ের আগে একবার আলাপ-পরিচয়টা হয়ে যাক।'

বাজখাঁই চেঁচিয়ে বললে, 'মেরা নাম ফতে-জঙ্গ তাগবাহাদুর মালিকিময়দান।'

কুঁকড়ো হেসে বললেন, 'আর আমার নাম কুঁকড়ো।'

লড়াই বাধে দেখে সোনালি ভয় পেয়ে জিম্মার কাছে ছুটে গেল। কুঁকড়ো বললেন, 'জিম্মা, খবরদার, তুমি এতে কোনো কথা বলতে পাবে না, তুমি নড়তে পাবে না, যেখানে আছ সেখান থেকেই শেষ পর্যন্ত দেখো।'

সোনালি বললে, 'একটা গোলাপ ফুলের জন্যে প্রাণ দিতে যাবে?'

কুঁকড়ো গম্ভীর সুরে বললেন, 'ফুলের অপমানে সূর্যের অপমান, তা জান?'

সোনালি চড়াইয়ের কাছে ছুটে গিয়ে বললে, 'তুমি যে বলেছিলে সব মিটিয়ে নেবে?'

চড়াই গম্ভীর হয়ে উত্তর করলে, 'সব মেটে কিন্তু জ্ঞাতির ঝগড়া মেটে না গো মেটে না।'

চিনি-দিদি বুক চাপড়াতে লেগেছেন আর বলছেন, 'এ কী গো। লোকের বাড়ি নেমন্তন্নে এসে খুনোখুনি।' এই বলছেন আর কুঁকড়োর লড়াই দেখবার জন্যে সবাইকে বসাচ্ছেন—ফুলের টবে, লাউকুমড়োর মাচায়। দেখতে দেখতে সব পাখি দুই পালোয়ানকে ঘিরে বসে গেল কুস্তি দেখতে। সবপ্রথমে মুরগিরা গোল হয়ে বসেছে, ছানাপোনা কোলে, তার পর হাঁস ইত্যাদি, শেষে যত পোশাকী মোরগ, ময়ূর এঁরা।

জিম্মা কুঁকড়োকে ডেকে বললে, 'জেতা চাই, পাহাড়তলির নাম রেখো।'

কুঁকড়ো একবার চারি দিক চেয়ে দেখলেন, সবাই আজ তাঁকে যেন মরতে দেখতে ঘাড়গুলো বাড়িয়ে বসে আছে মনে হল। কোথাও একটু ভালোবাসা নেই—হিংসে আর খুনের নেশায় সবার মুখ বিকট দেখাচ্ছে। কুঁকড়ো একটি নিশ্বেস ফেললেন।

সোনালি চোখের জল মুছে বললে, 'আহা, কাচ্ছাবাচ্ছাগুলির কী হবে গো।'

কিন্তু কুঁকড়োর প্রাণে কোনো দুঃখু নেই, তিনি বুঝলেন যে, তাঁকে মরতেই হবে। তবে মরবার পূর্বে কেন না তিনি সবার কাছে প্রচার করবেন, যা এতদিন কাউকে বলা হয় নি। এই তো ঠিক সময়। তবে আর কেন গোপন রাখা তাঁর মহামন্ত্র। কুঁকড়ো সবাইকে বললেন, 'শোনো তোমরা আমার গোপন কথা, মহামন্ত্র, যা এতদিন বলি নি, আজ বলে যাব।'

সবাই যেটা জানতে ব্যস্ত, সেটা আজ কুঁকড়ো প্রচার করবেন, মুরগিদের আনন্দ আর ধরে না। কুঁকড়ো বাঁচুক মরুক তাতে কী। মন্তরটা শুনতে পেলেই হল। তারা সবার আগেই গলা বাড়িয়ে বসল। কুঁকড়ো সেটা দেখলেন। হায়দ্রাবাদিটা কেবল তাল ঠুকছিল, তার আর তর সয় না। কুঁকড়ো তাকে বললেন, 'ভয় নেই, পালাব না, একটু সবুর করো।' তার পর সবার দিকে চেয়ে বললেন, 'কথাটা শুনে তোমাদের যদি খুব হাসি পায় তো খুবই হেসো; তামাশা টিটকিরি দিতে চাও তাও দিয়ো, আমি তাই দেখেই সুখে মরব।' সোনালি চেঁচিয়ে বললে, 'ছিঃ, ও কী কথা।' জিম্মা বুঝেছিল, কুঁকড়োর মনের কথাটা কী; তাই সে বললে, 'বেনা বনে মুক্ত ছড়িয়ে কী লাভ হবে বন্ধু।' কিন্তু কুঁকড়ো যখন বলেছেন তখন তিনি আর সে কথা নড়চড় হতে দেবেন না। তাঁর মুখ দেখে জিম্মা আর সোনালি দুজনেই চুপ হয়ে গেল। কুঁকড়ো চারি দিকে দেখে বললেন, 'নিশাচরদের বন্ধু, অন্ধকারের পাখি সব। তবে শোনো, আর শুনে আমায় পাগল বলে খুব হাসো। আজ আমার কাছে তোমাদের কিছুই লুকোনো রইল না, কে আমার আপনার, কেবা পর সব চেনা

গেল, ধরা পড়ল। তবে আজ আমিই-বা লুকিয়ে থাকি কেন আপনাকে না জানিয়ে।' ব'লে কুঁকড়ো আর একবার চারি দিক দেখে বললেন, 'আলোর ফুলকি, আলোর ফুল আকাশে ফোটে কেন তা জানো ? আমি গান গাই বলে।' প্রথমটা সবাই থ হয়ে গেল, তার পর একেবারে হাসির হুল্লোড় উঠল, 'পাগল ! পাগল।'

কুঁকড়ো বলে উঠলেন, 'সবাই হাসছ তো।' ব'লেই হাঁক দিলেন, 'সামাল জোয়ান সামাল।'

লড়াই শুরু হয়ে গেল। তখনো সবাই হাসছে, কী মজা, উনি গান গেয়ে আকাশে আলো জ্বালান, কী আপদ···।

কুঁকড়ো বাজখাঁই মোরগের এক প্যাঁচ সামলে বললেন, 'হাঁ আমিই সূর্যের রথ রোজকে রোজ টেনে আনি।' তার পরেই কুঁকড়োকে বাজখাঁই এক ঘা বসালে; তার পর আর-এক ঘা, আর-এক ঘা। সবাই চারি দিক থেকে চিৎকার করতে লাগল, 'বাহবা বাজখাঁ, চালাও, জোরসে ভাই।' কুঁকড়োর মুখে চোখে ঘা পড়ছে আর সবাই চেঁচাচ্ছে, 'খুব হুহা, বহুত আচ্ছা, জেসাকে তেসা, ইয়েঃ মারা।' ওদিকে কুঁকড়োও বলে চলেছেন, 'আমিই আলো আনি, সকাল আনি, আলো, আলো, আলো।' কুকুর চেঁচাচ্ছে, 'হাঁ হাঁ।' সোনালি কাঁদছে চোখ ঢেকে আর সব পাখি তারা বলে চলেছে হাততালি দিয়ে, 'চালাও বাজখাঁই চোঁচ, আওর এক লাথ তুণ্ডমে, বাহবা বাজখাঁ, খুব লড়তা, ইয়েঃ এক ঘা, উয়োঃ দো ঘাও, মারা মারা।' রাজ্যের পাখির গালাগালি হাসি টিটকিরির মধ্যে কুঁকড়ো এক এক পা করে ক্রমে মরবার দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর বুক বেয়ে রক্ত পড়ছে, গায়ের পালক সব ছিঁড়েখুঁড়ে চারি দিকে উড়ছে, চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে পৃথিবী যেন ঘুরছে কিন্তু তবু তিনি যুঝছেন। কিন্তু শক্তি ক্রমেই কমছে। এই সময় তাঁর মোরগ-ফুলের উপরে বাজখাঁ এমন এক ঘা বসিয়ে দিলে যে কুঁকড়ো অসান হয়ে বসে পড়লেন। অমনি চারি দিকে সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'বাহবা কী বাহবা। ঘায়েল হুয়া, ঘায়েল হুয়া।'

জিম্মা রাগে ফুলতে লাগল আর তার দুই চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। কুঁকড়োর হুকুম, তার নড়বার জো নেই। কিন্তু সে তার বন্ধুর দুর্দশা আর দেখতে পারে না। সে ধমকে উঠল, 'তোরা সব পাখি, না মানুষ?' জিম্মা বলতে চায় যে মানুষ ছাড়া এমন নির্দয় আর কে হতে পারে। কিন্তু তার কথা জোগাল না; সে কেবল বলতে লাগলে, 'ওরে, এরা পাখি, না মানুষ?' কুঁকড়ো যখন সান পেয়ে আবার চোখ মেললেন, তখন সব চুপচাপ রয়েছে, হায়দারি মোরগ বেড়ায় ঠেস দিয়ে হাঁপাচ্ছে, জিম্মা কেবল কাছে দাঁড়িয়ে; আর দূরে, সব পাখির দলের থেকে দূরে, ডানায় মুখ ঢেকে রয়েছে সোনালিয়া।

কুঁকড়ো জিম্মাকে বলছেন, 'এই শেষ, না যন্ত্রণার আরো কিছু রেখেছে পোশাকী পাখি আর তাদের দলবলেরা।' এমন সময় দেখা গেল, সব পাখি পা টিপে টিপে কুঁকড়ো যেখানে পড়ে রয়েছে সেই দিকে দল বেঁধে এগিয়ে আসছে; সবার মুখ শুকনো, যেন কী-একটা ভয়ে সবাই জড়সড়, কেউ আর হাসছে না।

কুঁকড়ো বললেন, 'আঃ জিম্মা, দেখো দেখো ওরা আমায় ভালোবাসে কি না দেখো। আহা সবার মুখ শুকিয়ে গেছে। এরা যদি শত্রু তবে আর মিত্র কে। আজ আমার ভুল ভাঙল, এখন সবাই আমায় ভালোবাসে জেনে সুখে মরতে পারব।'

জিম্মাও একটু অবাক হয়ে গেল, এই যারা 'মার্ মার্' করে কুঁকড়োকে গাল পাড়ছিল, তারাই আবার হঠাৎ বন্ধু হয়ে উঠল এমন যে কেঁদেই অস্থির! কুকুর ঘাড় নেড়ে ভালো করে পাখিদের দিকে চাইলে; দেখলে, সবাই ভয়ে ভয়ে আকাশের দিকে এক-একবার চাচ্ছে আর কুঁকড়োর কাছে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। পাখিরা কখন কীভাবে থাকে জিম্মার বেশ জানা ছিল, সে কুঁকড়োকে চুপি চুপি বললে, 'আমার তো বোধ হয় না ওরা তোমার প্রাণের জন্যে ভয় পেয়েছে একটুও। ভয় ওইদিক থেকে আসছে শিকরে বাজ হয়ে,

আর সেটা এসে ঘাড়ে পড়বার আগে সব পাখিরা চিরকাল যা করে থাকে, আজও ঠিক তাই করছে।'

কুঁকড়ো দেখলেন আকাশের অনেক উপরে থেকে সত্যিই বাজপাখি ঘুরে ঘুরে নামছে। তার কালো ছায়াটা যেন কালো হাতের মতো একবার খানিকক্ষণ ধরে সব পাখিদের উপর দিয়ে যেন তাদের একে-একে গুনতে গুনতে এক পাক ঘুরে গেল; অমনি সব পাখি ভয়ে জড়সড়, আর-এক পা কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে এল। বিপদের সময় কুঁকড়োর আশ্রয় তারা চিরকাল না চেয়েও যে পেয়েছে, বাজ অনেক বার পড়ো পড়ো হয়েছে, আর অনেকবারই কুঁকড়ো সেটাকে সরিয়ে দিয়েছেন, এবারও তা হবে না কেন। কুঁকড়ো সেই রক্তমাখা বুক ফুলিয়ে সত্যিই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তার পর ঘাড় তুলে হুকুম হাঁকলেন, 'আয় তোরা আয়, কাছে আয়, বুকে আয়, ভয় নেই, ভয় নেই।' অমনি বাচ্ছাগুলোকে ডানার মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে সবাই কে কার ঘাড়ে পড়ে, ছুটে এসে কুঁকড়োর গা ঘেঁষে দাঁড়াল কাতারে কাতারে সব পাখি। পোশাকী মোরগগুলোর কাছে কেউ গেলও না, তাদের আশ্রয়ও কেউ চাইলে না। কেননা পোশাকী তারা নিজেরাই ভয়ে কাঁপছিল এ-ওকে জাপটে ধ'রে। বাজের ছায়া আবার সবার উপর দিয়ে ঘুরে চলল, এবারে আরো কালো, আরো বড়ো; আর সবাই এমন-কি পালোয়ান হায়দারি পর্যন্ত ভয়ে গুটিয়ে যেন পালকের পুঁটলিটি। কেবল সবার উপরে মাথার মোরগফুল লাল নিশেনের মতো উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কুঁকড়ো, রক্তমাখা বুক ফুলিয়ে। বাজপাখি আর-এক পাক ঘুরে এল, এবার সে একেবারে কাছে এসেছে, কালবোশেখের মেঘের মতো কালো হয়ে উঠেছে তার ভয়ংকর কালো ছায়া; সমস্ত যেন অন্ধকার করে আসছে সেটা আস্তে আস্তে। ভয়ে মায়ের বুকের মধ্যে বাচ্ছাগুলো পর্যন্ত কাঁদতে থাকল। সেই সময় কুঁকড়োর সাড়া আকাশ ভেদ করে উঠল, 'অব্‌তক্ হাম জিন্দা হ্যায়, অব্‌তক্ হাম দেখতা হ্যায়, অব্‌তক্ হাম মালেক হ্যায় ···।'

অমনি দেখতে দেখতে বাজের ছায়া ফিকে হতে হতে কোথায় মিশিয়ে গেল। আকাশ যে পরিষ্কার সেই পরিষ্কার নীল ঝকঝক করছে। আহ্লাদে পাখিরা সব আবার গা ঝাড়া দিয়ে যে যার জায়গায় উঠে বসে বললে, ‘এইবার আবার কুস্তি চলুক।’ জিম্মা অবাক হয়ে গেল ; কুঁকড়োর মুখে কথা সরল না, সোনালি বললে, ‘তুমি ওদের বাঁচালে আর ওরা তার পুরস্কার দেবে না ? বাজ দেখালে ভয়, তার শোধ তুলবে ওরা তোমায় মেরে।’

কিন্তু কুঁকড়ো জানেন আর তাঁর মরণ নেই ; যে-পাখিকে সবাই ভয় করে, সেই বাজের কালো ছায়া তিনবার তাঁর মাথার উপর দিয়ে ঘুরে গেছে, ভয় থেকে তিনি সবাইকে বাঁচিয়েছেন এখন নিজে তিনি নিজেয়ে যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে এসে হায়দারিকে এক গোঁত্তা বসিয়ে বললেন, ‘আসুন।’ গোঁত্তা খেয়ে হায়দারি ঠিকরে বেড়ার উপর গিয়ে পড়ল। এবার ওস্তাদের পেরেক-আঁটা কাতান কুঁকড়োর উপর চালাবার মতলব করে সে দুপায়ে বাঁধা ছোরাছুটোয় শান দিয়ে নিতে লাগল। বেড়াল গাছের উপর থেকে হায়দারিকে বললে, ‘কেমন মিঁয়া।’

চড়াই বললে, ‘কাতানি কাটকাটানি।’

জিম্মা বললে, ‘চালাক দেখি, ও কাতান, ওর টুটি ছিঁড়ব না!’

আবার কুস্তি চলল। জিম্মা দেখছে হায়দারিটা ছোরা না চালায়, এমন সময় হঠাৎ হায়দারি সাঁ ক’রে ছোরা উঁচিয়ে ‘লেও’ ব’লেই যেমন কুঁকড়োকে কাতান বসাবে, অমনি কুঁকড়ো এক প্যাঁচ দিয়ে তাকে উলটে ফেললেন। হায়দারির নিজের কাঁটা তার নিজেরই বুকে কেটে বসল। হায়দারি পড়লেন। তার বন্ধুরা তাকে ধরাধরি করে উঠিয়ে নিয়ে পালাল। পাখিরা সব ‘হুও হুও’ করে তার পিছনে চলল। সোনালি আর জিম্মা কুঁকড়োর কাছে ছুটে এসে দেখলে, তিনি চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছেন।

জিম্মা বললে, ‘আমরা এসেছি বন্ধু, আমাদের সঙ্গে কথা কও।’

সোনালি বললে, ‘আমি এসেছি একটিবার চেয়ে দেখো।’

কুঁকড়ো আস্তে-আস্তে চোখ মেলে বললেন, 'ভয় নেই, কালও আবার সূর্য উঠবে, আলো ফুটবে।' এদিকে হায়দারিকে 'ছুও' দিয়ে তাড়িয়ে সব পাখি কুঁকড়োকে 'জয় জয়' বলে খাতির করতে এল।

কুঁকড়ো রেগে হাঁকলেন, 'ছুঁও মৎ, তফাত রও।'

জিম্মা বললে, 'আর কেন। কে কেমন তা বোঝা গেছে, সরে পড়ো।'

সোনালি বললে, 'সত্যিকার পাখি যদি থাকে তো সে বনে, তোরা কি পাখি।' তার পর কুঁকড়োর দিকে ফিরে সোনালি বললে, 'চলো, আর এখানে কেন, বনে চলে যাই চলো।'

কুঁকড়ো বললেন, 'না, আমাকে এখানেই থাকতে হবে!'

'এত কাণ্ডের পরেও, সব জেনেও?' সোনালি অবাক হয়ে শুধোলে।

কুঁকড়ো জবাব দিলেন, 'হাঁ, সব জেনেও থাকতে হবে।'

সোনালি অবাক হয়ে রইল। কুঁকড়ো আবার বললেন, 'হাঁ সোনালি, এখন শুধু আমার গানের জন্যেই থাকব, আর কারু জন্যে নয়। মনে হচ্ছে এ দেশ ছাড়লে বিদেশে বিভুঁয়ে গান আমার শুকিয়ে মরবে। আঃ, এই আকাশ, এই দিন—একে আবার আমি গান গেয়ে আলো দিয়ে কাল জাগিয়ে তুলব, মরতে দেব না।' পাখিগুলো আবার মুখ কাঁচুমাচু করে কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে এল। তিনি ঘাড় নেড়ে মানা করলেন, 'না, আর না, কেউ না, এখন শুধু আমি আর আমার গান, আর আমার কেউ নেই, কিছু নেই, সরে যাও, আমি দিনের আসা গাই।' সব পাখিরা দূরে সরে গেল; কুঁকড়ো সোজা দাঁড়িয়ে সুর ধরলেন, 'আ-আ-আ···।' কিন্তু এ কী। গান কোথায় গেল। তাঁর মনের ভিতর ঘুরছে — সা-সা-সা। তিনি আবার চাইলেন গাইতে, অমনি মনে হল সুরটা ওড়ব না খাড়ব? ওটা পঞ্চম না ধৈবত। তেতালা না চৌতালা? এমনি সব নানা শাস্ত্রের বিড়বিড় হিজিবিজি তাঁর গলার মধ্যে বুকের মধ্যে ঘট্‌ঘট্ করতে লাগল। কুঁকড়ো নিশ্বেস ছেড়ে বললেন, 'হায় আমার

গান পর্যন্ত রাখলে না; সব কেড়ে নিলে—কোথায় আমার গান।' ব'লে কুঁকড়ো ঘাড় হেঁট করলেন।

সোনালিয়া কাছে ছুটে এল, কুঁকড়ো তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কেঁদে বললে, 'তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, তোমার ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নেই জগতে, ও আমার স্বপন-পাখি।' সোনালি আস্তে আস্তে বললে, 'চলো চলে যাই, যেখানে কেবলই গান আর ফুল ফুটছে সেই বন, সেখানে সা-রে-গা-মা বলে কেউ মাথা বকায় না—দিনরাত গেয়েই চলে।'

কুঁকড়ো সোনালিকে বললেন, 'যাব, তোমার সঙ্গেই যাব, দুজনে যাব, শুধু যাবার আগে এদের একবার চোখ ফুটিয়ে দিয়ে যাব।' ব'লে কুঁকড়ো সবাইকে ডেকে বললেন, 'ওগো কুলতলার নিষ্কর্মার দল! এই সবজি বাগান হাওয়া খাবার জায়গাও নয়, গুল্‌তোন করবার আড্ডাও নয়, এখানে কাজ চলেছে, ফুল থেকে ফল আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে, হট্টগোলের জায়গা এটা নয়, ওই শোনো মৌমাছিরাও এই কথাই বলছে।' অমনি সব মৌমাছি বলে উঠল, 'কাজের সময়, সরো না মশয়! সরো না মশয়! এসো না মশয়! এসো না মশয়!'

তার পর মুরগিদের ডেকে কুঁকড়ো বললেন, 'ওই পোষা মোরগের পালক দেখে ভুলো না। ভুলো না। যে ধান ছড়ায় তারি কাছে ওরা ছুটে যায়, গোলাম ব'নে সেলাম বাজায়। ওদের সবখানিই মিথ্যে দিয়ে গড়া, সত্যির মধ্যে কেবল ওদের পেটটি। আর ময়ূর তোমাকে বলি, দেব-সেনাপতির বাহন বলে বিধাতা তোমায় ভালো সাজ দিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে সাহস বলে জিনিস তোমায় একটুও তিনি দেন নি; দিয়েছেন তোমার বুকের মধ্যে হিংসে আর দেমাকের বিষ এমনি ভাবে যে তোমার গলার খানিক পালক পুড়ে কালি হয়ে গেছে; আর তোমার ল্যাজের ডগাটি পর্যন্ত হয়ে গেছে নীল, পাছে কারু বাড় দেখতে হয় সেই ভয়ে।'

চড়াই অমনি বলে উঠল, 'ছুট্!'

কুঁকড়ো চড়ায়ের দিকে ফিরে বললেন, 'কী কুক্ষণে শহুরে চড়ায়ের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল বনের তালচড়াই, সেই থেকে কেবলই তুমি ভয়ে-ভয়ে আছ, পাছে কেউ তোমার শহুরে খোলস খুলে নেয়। নকল-শহুরে! তোমার চলন নিজের নয়, বলন নিজের নয়, কেননা তোমার আনন্দ নেই, আছে কেবল ধরা-পড়বার ভয়। তুমি নিজেকে পছন্দ কর না কাজেই অন্যকেও ভালোবাস না। তোমার কী নাম দেব? তুমি জ্বলন্ত সল্‌তের পোড়া গুল, তোমাকে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দেওয়াই দরকার।'

চিনি-দিদি বলে উঠলেন, 'বেশ বেশ।'

চড়াইটা ল্যাজ-গুড়িয়ে এক কোণে সরে পড়ল, আর পেরুর উপরে এই অপমানের ঝালটা পাড়তে গেলে কোনো বিপদে পড়বে কি না সেটা মনে মনে বিচার করতে লাগল। ঠিক এই সময় দূর থেকে চিড়িয়াখানার মালিক ডাক দিলেন, 'আয়—আঃ—আয় আঃ!' অমনি সব পোশাকী মোরগ সেই দিকে দৌড় দিলে।

চিনি-দিদি বললে, 'চললে নাকি। চললে নাকি।' ব'লে তাদের সঙ্গে ছুটলেন।

সোনালি কুঁকড়োকে বললে, 'আর কেন? চলো এইবার।' ব'লে কুঁকড়োকে নিয়ে বনের দিকে আস্তে আস্তে চলে গেল। জিম্মা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সেইদিকে খানিক চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে গোলাবাড়িতে ফিরে গেল মাথা নাড়তে নাড়তে।

চিনি-দিদি ফিরে দেখলেন সবাই চলে গেছে। তিনি তবু যেন সবাইকে খাতির করে বেড়াতে লাগলেন আর কেবলই বলতে লাগলেন, 'আসছে সোমবারে আসবে তো? নমস্কার। মনে থাকে যেন আসছে সোমবার।'

খালি উঠোনময় চিনি-দিদি ঘুরে বেড়াচ্ছেন এইভাবে, এমন সময় কাক ফুকরোলে, 'কাছিম মিয়া, কাছিম মিয়া'। চিনি-দিদি তার ছেলেকে বলছিলেন, 'আঃ, আজ মজলিস্ কেমন জমেছিল দেখিছিস্!' গুটি-গুটি কাছিম এসে কুলতলায় বসলেন।

৭

বনে বসন্তকাল এসেছে। চমৎকার দিনগুলি—আলো-ছায়ায় নিবিড় বনের সবুজে ঢাকা পথে-পথে, আর নিস্তব্ধ রাতগুলি—রাঙা-ফুলে ঢাকা অশোক গাছের দোলনায়, কুঁকড়ো আর সোনালিয়া ছুটিতে আনন্দে কাটাচ্ছেন। এমন সবুজ, এমন ঠাণ্ডা ছায়ায় ছায়াময় সে বন, যেন মনে হয় মায়ের কোলে এসেছি। সেইখানে কুঁকড়ো আস্তে আস্তে সব কষ্ট ভুলতে লাগলেন। সকাল থেকে সন্ধে তিনি বেড়িয়ে বেড়ান, একলাটি। চারি দিকে বড়ো বড়ো দেবদারু আর ঝাউ, এত পুরোনো যে তাদের বয়স কেউ জানে না। ডালে ডালে সব সবুজ শেওলা জটার মতো ঝুলে পড়েছে; শিকড়গুলো তাদের পাথর আঁকড়ে কোন্ পাতালে যে নেমে গেছে তার ঠিক নেই। কোথাও ঝুর ঝুর করে পাতা ঝরছে, কোথাও ঝাউ ফলগুলোয় মাটি একেবারে বিছিয়ে গেছে। একটা নালার ধারে ঝরনা ঝরছে, তারি এক পাশে ব্যাঙেরা ছতরি বেঁধে হাট বসিয়েছে।

কত রকমের পাখি গাছে গাছে। কাঠবেড়ালি সব বাদাম-গাছের ডালে-ডালে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে; খরগোশ ঘাসের মধ্যে লুকোচুরি আর কপাটি খেলছে। বনে এসেই খরগোশগুলোর সঙ্গে কুঁকড়োর ভাব হয়ে গেল; কিন্তু তারা ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে, সোনালিয়া সেটা সইতে পারে না; এক-একদিন কুঁকড়োর আড়ালে ডানার ঝাপটা দিয়ে তাদের ভয় দেখাতে ছাড়ে না।

একটা কাঠঠোকরার সঙ্গে কুঁকড়োর খুব জমে গেল। অশোক গাছটার পাশেই একটা কাঁঠাল-গাছে তার কোটর। দিনের মধ্যে দশবার সে কুঁকড়োর সঙ্গে গল্প করতে এসে হাজির হয়। সোনালিয়া কিন্তু এটা ভারি অপছন্দ করে; সময় নেই, অসময় নেই, এলেই কেন ? শেষে কাঠঠোকরার সঙ্গে বন্দোবস্ত হল, আসবার আগে সে তিনবার ঠুকঠুক আওয়াজ দিয়ে তবে আসবে।

কিন্তু কাঠঠোকরার গল্প শুনতে কুঁকড়ো সত্যি ভালোবাসেন ; সে যে কত কালের সব পাখিদের কথা জানে, তার ঠিক নেই।

একদিন সন্ধেবেলা কাঠঠোকরা কুঁকড়োকে সন্ধ্যা-পাখির গান শোনালে। সে অতি চমৎকার। দুটি টুনটুনি সুর ধরলে আর বনের সব পাখি তাদের গানে আস্তে-আস্তে যোগ দিলে। প্রথম পাখিটি গাইলে, 'ও আমাদের বন্ধু !' জুড়ি-টুনটুনিটি অমনি ধরলে, 'ও অনাথের নাথ !' হাজার হাজার পাখির মিষ্টি সুর অমনি গাছে গাছে সাড়া দিলে, 'ওগো বন্ধু। ওগো বন্ধু।' তার পরে বন্দনা শুরু হল —

'নমস্কার নমস্কার ! আকাশে নমস্কার, আলোতে নমস্কার, বাতাসে নমস্কার, রাতে নমস্কার, দিনে নমস্কার— তোমাকে নমস্কার। তোমার দেওয়া চোখের আলো, তোমার দেওয়া মিষ্টি জল, তোমার এই ঘন বন, তোমার এই মধু ফল, তোমার এই কাঁটার বেড়া, তোমার এই সবুজ ঘাস। মিষ্টি সুর এও তোমার, তোমার এ নিশ্বাস। তোমার এই পাতার বাসা, তোমার এই ছোটো পাখি। আমার এই ছোটো সুরে তোমারেই আমি ডাকি।··· ছোটো বাসার ছোটো পাখি - সন্ধ্যা হল তোমায় ডাকি, বন্ধু এসো, তোমায় ডাকি।'

এ পাখি থেকে ও পাখি, এ গাছ থেকে ও গাছ, এমনি করে বনের শেষ পর্যন্ত 'বন্ধু এসো' ব'লে সবাই ডাক দিয়ে গেয়ে উঠল। কুঁকড়োও ডাক দিলেন, 'বন্ধু বন্ধু !' তার পর একটি একটি করে সব ছোটো পাখিরা পাতার আড়ালে ঘুমিয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে চাঁদের আলো বনের ফাঁক দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ঝরনার মতো নেমে এল — লতাপাতার কিনারায়, পাথরের উপর, শেওলার গায়ে। কুঁকড়ো দেখলেন, একটুখানি মাকড়সার জালে হীরের মতো কা ঝলক দিচ্ছে। মনে হল, বুঝি একটা জোনাক-পোকা জালে পড়েছে। কাছে গিয়ে দেখেন, বিষ্টির একটি ফোঁটায় চাঁদের আলো এসে লেগেছে। এমনি সব নূতন-নূতন কত কী দেখতে দেখতে সেই মহাবনে কুঁকড়োর দিন আর রাতগুলি আনন্দে কাটছে।

বনে ফিরে এসে কুঁকড়ো আবার তাঁর গান ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু কেবল সকালের গানটি ছাড়া সোনালি তাঁকে আর-একটি গানও গাইতে দেবে না—তাও আবার সকালটা যদি সোনালির গায়ের পালকের চেয়েও রঙিন আর জমকালো হয়ে দেখা দেয় তবেই। কুঁকড়ো সোনালিকে বলেন, 'এই আলোতেই আমাদের সেদিনের মিলন, সেটা ভুললে চলবে না সোনালি। আলোর জয় আমাকে দিতেই হবে সারাদিন।' সোনালি বলে, 'তুমি আমার চেয়ে আলো-কে কেন ভালোবাসবে।'

ইতিমধ্যে একদিন চক্‌চকে সবুজ এক সোনাল-পাখির সঙ্গে সোনালির দেখাশুনো হয়েছে, আর গহন-বনের একটা নির্জন পথে দুটিতে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে এটা কুঁকড়োর চোখ এড়াল না। কিন্তু মনের দুঃখ মনেই রেখে কুঁকড়ো ভাবলেন, 'আমি কি বলতে পারি, কেন তুমি সোনালকে বেশি পছন্দ করবে আমার চেয়ে সোনালি? আকাশ কি কোনোদিন তাতে-পোড়া পৃথিবীকে বলতে পারে—তুমি বিষ্টির ফোঁটাগুলিকে রোদের চেয়ে কেন ভালোবাসবে? না, মাটিই বলতে পারে আকাশকে—তুমি বিষ্টিকেই বরণ করো, আলো-কে চেয়ো না! সোনালিয়া, সে বনের দুলালী, অরণ্য তো তাকে আমার সঙ্গে বাইরে—দূরে পাঠাতে পারবে না; সে দূত পাঠিয়েছে ঘন বনের সবুজ সোনাল-পাখিটি; ওরি সঙ্গে কোন্‌দিন চলে যাবে ঝরা ফুল ঝরা পাতার স্বপ্ন-বিছানো গহন-বনের অন্দরের পথে সোনার আঁচলে ঝিলিক দিয়ে সোনার পাখি। আর আমি'—বলে কুঁকড়ো নিশ্বাস ফেললেন। —'কাঠঠোকরা ঠিকই বলে, যেখানে যার বাসা, সেইখানেই তার ভালোবাসা। আমার সবই সেই পাহাড়তলির আকাশের নিচে—আর সোনালির সবই এই বনের তলায় যেদিন দেখা দেবে, সেদিন তো কেউ-কাউকে 'যেয়ো না' ব'লে রাখতে পারব না; কেবল এইটুকুই সেদিন বলবার থাকবে—ভুলো না বন্ধু, মনে রেখো।'

সে আর-একদিন; দুজনে অশোক-তলাটিতে দাঁড়িয়ে; সূর্য

অস্ত গেছে; সন্ধ্যার পাখিদের গান বন্ধ হয়েছে'; দু-একটা কাঠবেড়াল তখনো পাতার মধ্যে উস্‌খুস্‌ করছে; খরগোশগুলো তাদের গড়ের বাইরে বসে একটু সন্ধের বাতাসে জিরিয়ে নিচ্ছে; বন আস্তে-আস্তে নিঝুম হয়ে আসছে। রাত্রির অন্ধকারে গাছ সব ক্রমে যেন মিলিয়ে গেল; সেই সময় ক্রমে-ক্রমে চাঁদের আলো ঘুমন্ত বনে এসে পড়ল। সে রাতের মতো বিদায় নেবার জন্যে সোনালি কুঁকড়োকে 'আসি' বলতে গিয়েই দেখলে খরগোশগুলো চোখ প্যাট-প্যাট করে তাদের দিকে দেখছে। অমনি এক ডানার ঝাপটায় সোনালি তাদের তাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'আসি তবে।' কুঁকড়ো বললেন, 'দেখো, মনে রেখো।' সোনালি বিদায় নিয়ে অশোক ফুলের গাছে তার মনোমতো ডালটির উপরে উড়ে-বসতে ফিরে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় পায়ে তার কী-একটা ঠেকল। 'ইস্‌' ব'লে সোনালি সরে দাঁড়িয়ে দেখলে কী, সে তো কিছু বুঝতে পারলে না। কুঁকড়ো কাছে এসে দেখে বললেন, 'সর্বনাশ, এ যে ফাঁদ পাতা রয়েছে। কে এখানে ফাঁদ পাতলে?' টুক্‌ টুক্‌ টুক্‌ তিনবার আওয়াজ দিয়ে সবুজ ফতুয়া লাল-টুপিটি মাথায় কাঠঠোকরা কোটর থেকে বেরিয়ে বললেন, 'ফাঁদটা বাঁচিয়ে চলো, ওই গোলাবাড়ির মানুষটিই ফাঁদ পেতেছে, সোনালিয়াকে ধরবে বলে।' 'আমাকে ধরা তার কর্ম নয়।' —ব'লে সোনালি মাথা ঝাড়া দিলে। কাঠঠোকরা বললে, 'শুনলুম সে তোমাকে ধরে পোষ মানাবে।' কুঁকড়ো বললেন, 'তিনি খুব ভালো লোক, যদি তুমি ধরা পড়তে, তবে তোমাকে তিনি কষ্ট দিতেন না, এটা আমি ঠিক বলতে পারি।' সোনালি বললে, 'কষ্ট না দিন; কিন্তু প্রাণ থাকতে সোনালি তার পোষ মানত না, সেটাও ঠিক।'

ফাঁদ পাতা হলে বনের সবাই সবাইকে সাবধান না করে নিশ্চিন্ত হতে পারে না, তাই খরগোশ এসে বললে, 'দেখো, খবরদার ওই কলটাতে যেন পা দিয়ো না; ছুঁয়েছ কি —'

'বোকো না তুমি। ফাঁদে যে আটকায় কেমন-করে তা আমি

খুব জানি। এক কুকুর ছাড়া আর কাউকে আমি ডরাই নে। ঘরে যাও, ঠাণ্ডা লাগবে।' —ব'লে সোনালি আস্তে ডানার ঝাপটা দিয়ে খরগোশকে বিদায় করে কুঁকড়োকে বললে, 'আমি একবার গোলাবাড়ির দিকে যাচ্ছি।'

কুঁকড়ো ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'কেন। কেন। সেখানে কেন।' 'ও-দিককার কুকুরগুলোকে একটু দৌড় করিয়ে আসি। এই এক-পা এখানে, এক-পা ওখানে, যাব আর আসব, দেরি হবে না।'

সোনালি চলে গেল, কুঁকড়ো অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে, গাছের উপর কাঠঠোকরাকে শুধালেন, 'সোনালিকে দেখতে পাচ্ছ কি।' কাঠঠোকরা উঁচু ডাল থেকে গলা বাড়িয়ে দেখে বললেন, 'না, তিনি গেছেন।' কুঁকড়ো বললেন, 'তুমি ভাই, একটু নজর রেখো তো, সে আসছে কি না। আমি একবার গোলাবাড়ির চড়াইটার সঙ্গে কথা কয়ে নিই।'

কাঠঠোকরা আশ্চর্য হয়ে ব'লে উঠল, 'চড়াই না তোমার শত্রু?'

কুঁকড়ো বললেন, 'কিন্তু খবর দিতে আর তার মতো জুটি নেই। খবর যা চাও, তার কাছে পাবে।'

'চড়াই আসছেন নাকি।' কাঠঠোকরা শুধলে।

কুঁকড়ো বললেন, 'না। এই দেখো-না তাকে ফোঁ করি। এই যে নীল ধুঁতরো ফুলটা দেখছ, এর সঙ্গে মাটির মধ্যে দিয়ে তারের মতো সরু শিকড় দিয়ে গোলাবাড়ির পুকুরধারে শ্বেত ধুঁতরো ফুলের যোগ আছে। ফুলের ভাষা বলে কবিতার বইয়ে পড়েছ তো। একেই বলে ফুলে-ফুলে কানাকানি।'

বনের মধ্যে যে এমন কল আছে কাঠঠোকরা তা জানত না। ফোঁ কেমন, দেখতে সে ব্যস্ত হল। কুঁকড়ো ফুলের মধ্যে মুখ দিয়ে ডাকলেন, 'হ্যালো।' খানিক ঘর্ ঘর্ শব্দ হল। — 'হ্যালো চড়াই। গোলাবাড়ি।' কাঠঠোকরা বলে উঠল, 'কুঁকড়ো ভাই, তোমার তো সাহস কম নয়। বাসার একেবারে দরজায় দাঁড়িয়ে কথা-চালাচালি। সোনালি টের পেলে —।'

কুঁকড়ো বললেন, 'সেখান থেকে যখন কথা আসবে তখন এই ফুলের মধ্যে যে মৌমাছিটা আছে, সে জেগে উঠবে আর —।'

'বোঁ-ও-ও' শব্দ হল। অমনি কুঁকড়ো ফুলে কান দিয়ে 'চড়াই নাকি' বলে খানিক আবার শুনে বললেন, 'ওঃ তাই নাকি। আজ সকালে —।'

কাঠঠোকরা শুধলে, 'কী বলছে? কী?'

কুঁকড়ো বললেন, 'তুকুড়ি দশটা মুরগির বাচ্চা ফুটেছে?' তার পর আবার একটু শুনে বললেন, 'বলো কী। তম্মার ভারি ব্যায়রাম!'

কী একটা গোল বাধল। কুঁকড়ো বললেন, 'রোসো, রোসো। কী। ভালো শোনা যাচ্ছে না হে। আঃ, মশাগুলো জ্বালালে। চড়াই, আঃ, হাঁ হাঁ তার পর, জিম্মাকে নিয়ে তারা শিকারে বেরবে। বল কী হে।' 'জিম্মা গোলাবাড়ির একজন।'—কাঠঠোকরাকে এই বলে কুঁকড়ো আবার ফোঁ ধরলেন, 'কী বললে? আমি চলে আসবার পর থেকে সব কাজে গোলমাল চলেছে? এ তো জানা কথা···এই সেদিন এসেছি এরি মধ্যে···যেতে হবে···তাই তো কী করা যায় হে···যাব নাকি। কী বল।' কাঠঠোকরা চুপিচুপি বললে, 'সোনালি আসছেন।' কিন্তু কুঁকড়ো তখন মন দিয়ে কানে ফুলটা চেপে ধরেছেন, কাঠঠোকরার কথা তাঁর কানেই গেল না। কথা চলল, 'কী বললে? হাঁসগুলো সারারাত লাঙলটার তলায় ঘুমিয়েছে? বল কী!' কাঠঠোকরা কুঁকড়োকে বলছে, 'থাক্, দেখো, চুপ।' কিন্তু কিছু ফল হচ্ছে না। ওদিকে সোনালি এসে উপস্থিত। কাঠঠোকরাকে ইশারায় চুপ করতে বলে সোনালি কুঁকড়োর পিছনে লুকিয়ে দাঁড়াল।

ফোনে কুঁকড়ো বললেন, 'বলো কী, সব কজনেই? ওঃ ময়ূরটা তা হলে মাটি হয়েছে বলো।'

কাঠঠোকরা আবার মুখ বার করতেই সোনালি তার দিকে এমনি চোখ রাঙিয়ে উঠল যে সে তাড়াতাড়ি কোটরে যেমন সেঁধবে, অমনি

দরজায় মাথা ঠুকে ফেললে। কুঁকড়ো ফোনে বললেন, 'মুরগিরা সব…আঃ, আলো আছে শুনে খুশি হলেম…গান? ওঃ গান করি বৈকি। হাঁ রোজ। কিন্তু এখান থেকে একটু দূরে…ওই যে দিঘিটা আছে, তারি ধারে। হাঁ, নিত্যি নিত্যি, ঠিক আগেরই মতো।'

রাগে সোনালি লাল হয়ে উঠল; তাকে লুকিয়ে গান গাওয়া হয়। এত বারণ করলুম…।

কুঁকড়োর কথা চলল, 'সোনালি গাইতে মানা করে, তাই লুকিয়ে আমি আলো আনছি আজকাল।' সোনালি এক-পা কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে শুনলে, কুঁকড়ো বলছেন, 'যখন সোনালির কালো চোখদুটি ঘুমে ঢলে পড়ে, যখন তার সোনার দেহটি আলিসে লুটিয়ে চমৎকার দেখতে হয়', সোনালির মুখে এবার হাসি ফুটল। '…সেই সময় আমি পা-টিপে-টিপে শিশিরের উপর দিয়ে দূরে গিয়ে, আলোর জন্যে যে-ক'টি গান সব ক'টি গেয়ে, যেমনি দেখি অন্ধকার ফিকে হচ্ছে, অমনি আস্তে আস্তে বাসায় ফিরি।…কী বলছ? শিশিরে পা ভিজে দেখে সে সন্দেহ করবে? তাই যদি হবে, তবে ডানার পালক-গুলো আছে কী করতে। পা-দুটো মুছে নিতে কতক্ষণ। তার পর আস্তে আস্তে অশোকের ডালে বসে যে-গান সে গাইতে মানা করে নি, সেইটে গেয়ে তার ঘুম ভাঙাই।'

সোনালি আর রাগ সামলাতে না পেরে ফোঁস করে উঠল। কুঁকড়ো ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখেই চটপট ফোনে বললেন, 'নাঃ কিছু না, আর একদিন হবে এখন।'

সোনালি বললে, 'আমাকে ঠকালে কেন।'

ফোনটা শব্দ করলে, 'ফুর্-র।'

কুঁকড়ো বললেন, 'আমি তোমাকে—'

'ফুর্-র', আবার ফুলের মধ্যে মাছিটা ডাকলে। কুঁকড়ো ফুলটার উপর ডানা চাপা দিলেন, কিন্তু সেটা ক্রমাগত 'ফুর-র্-র্-র্-র্-র্' বলেই চলল।

সোনালি খুব রেগে বললেন, 'কী নির্দয় তুমি ঠগ।…কেন শুধচ্ছ।

তুমি মুরগিদের খবর নিতে এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলে না? কে কোথায় ঘুমোয়, কে কী খায়, কার কটি ছানা হল? গোলাবাড়ির বাইরেও যে ডাল-কুত্তোটা তার পর্যন্ত খবর নেওয়া হচ্ছে। এও না-হয় সইলুম, কিন্তু ভোরবেলায় ডানায় পা মুছে চুপি চুপি···ওঃ বুঝেছি, তুমি একলা এই সোনার পাখিটাকেই ভালোবাস, কেমন?'

কুঁকড়ো খানিক চুপ থেকে বললেন, 'সোনালি, ভেবে দেখো, এই হৃদয়ের মধ্যে আলোটি যদি না দেখতে পেতে তবে কি এখানে আসতে তোমার ইচ্ছে হত। হৃদয়ের মধ্যে কিছু না থাকার চেয়ে আলো থাকা কি ভালো নয়। রঙিন-আলো দিয়ে গড়া সোনালিয়া। আমি আলো-কে ভালোবাসি তাই তোমাকেও ভালোবাসতে পেরেছি, আলোর দিকে হৃদয় পেতে যদি প্রতিদিন না দাঁড়াতেম, তবে ভালোবাসার ফোয়ারা যে এতদিনে শুকিয়ে যেত সে কি জান না।'

কুঁকড়োর কথায় সোনালির অভিমান বাড়ল বৈ কমল না। সে ঝগড়া করতে লাগল। কান্নাকাটি করে করে পাড়া জাগিয়ে তোলবার জোগাড় করলে। কুঁকড়োও একটু যে চটেন নি তা নয়। শেষে সোনালি বললে, 'আচ্ছা আমার যদি মন রাখতে চাও, তবে কাল সকালে একেবারে গাইবে না বলো।'

কুঁকড়ো বললেন, 'এ কী কথা। সমস্ত পাহাড়তলিটা যে অন্ধকার হয়ে থাকবে।' সোনালি ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, 'না-হয় থাকলই। তোমারই-বা কী, আমারই-বা কী।' কুঁকড়ো ঘাড় নাড়লেন, 'তা হতে পারে না। একদিন আলো বন্ধ! সব যে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাকে গাইতেই হবে।'

সোনালি বললে, 'আচ্ছা, যদি প্রমাণ করে দিই, তুমি না থাকলেও সকাল হতে কিছু বাধল না, তখন?'

কুঁকড়ো একটু হেসে বললেন, 'তখন সোনালি আমি সেখান থেকে তোমার সঙ্গে ঝগড়াও করতে আসব না, আর আলো হল কি না হল সে খবরও জানতে খুব উৎসাহ করব না। কেননা যেদিন

আমি-ছাড়া হয়ে আলো উঠবে, সেদিন আমি তো আর কুঁকড়ো নেই, আমি যে আলোর আলোয় গিয়ে মিশেছি।'

সোনালির চোখে জল ভরে উঠলে সে কেঁদে বললে, 'একটি দিন আমার কথা রাখো।'

কুঁকড়ো ঘাড় নাড়লেন, 'না, হতে পারে না।'

সোনালি বললে, 'ভুলেও কি একদিন আমার কথা রাখতে নেই গা।'

কুঁকড়ো বললেন, 'ভুল হবার যোটি নেই। অমনি অন্ধকার বুকে চেপে বলে, ডাক্ আলো-কে।'

সোনালি বলে উঠল, 'অন্ধকার ওঁর বুকে চেপে ধরে? সব বাজে কথা। বলো-না বাপু গান গাও—সবাই তোমার তারিফ করবে বলে। গানের তো ঐ ছিরি, এর জন্যে মিছে কথা কেন বাপু। তোমার গান শুনে তো বনের সবাই মোহিত হল। এখানকার বাবুই-পাখি, সেও তোমার চেয়ে গায় ভালো।'

কুঁকড়ো বললেন, 'হতে পারে বাবুই গায় চমৎকার, কিন্তু সেইজন্যে অভিমানে আমি গাওয়া বন্ধ করব. তেমন কুঁকড়ো আমায় ভাবলে নাকি।' সোনালি রেগেই বলে চলল, 'যেখানে নিচের বনে রোদের বেলা বসন্ত বাউরির গানটি মিনতি জানায়, আর উপরের বনে সা-বুলবুল গানের ফোয়ারা খুলে দেয়, সেই বনের মধ্যে কুঁকড়োর ডাক কেউ শুনতে চাইবে, এটা পাগল ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।'

কুঁকড়ো কোনো কথা না কয়ে তফাতে সরে দাঁড়ালেন। সোনালি তবু বললে, 'শুনেছ কোনোদিন নিশুত রাতের স্বপনপাখির গান?' 'শুনি নি।' ব'লে কুঁকড়ো অশোকের ডালে উঠে বসলেন। সোনালি নিজে নিজেই বলে যেতে লাগল 'স্বপনপাখির গান, সে এমন আশ্চর্য ব্যাপার যে প্রথমবার শুনতে শুনতে', হঠাৎ সোনালির কী একটা বুদ্ধি মাথায় জোগাল; সে চুপ হয়ে ভাবতে লাগল।

কুঁকড়ো শুধলেন, 'কী বলছিলে?' সোনালি চেঁচিয়ে বললে,

'নাঃ, কিছু নয়।' আর মনে-মনে হেসে বললে, 'এইবার ঠিক হবে। উনি তো জানেন না যে স্বপনপাখির গান শুনতে শুনতে রাত কখন যে ভোর হয়ে যায়, কেউ বুঝতে পারে না।'

কুঁকড়ো গাছের উপর থেকে নেমে এসে সোনালিকে বললেন, 'কী বলছিলে।'

'কিছু না।' বলে সোনালি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

৮

ঘাসের মধ্যে থেকে ব্যাঙ আওয়াজ দিলে, 'কর্তা, ঘরে আছেন ? কর্তা।' সোনালি 'ও মাগো ব্যাঙ।' ব'লে একলাফে একটা গাছের কোটরে গিয়ে লুকোল। ছ'-ছ'টা কোলাব্যাঙ এসে উপস্থিত। তার মধ্যে সব চেয়ে বড়ো ব্যাঙ এসে হাত নেড়ে কুঁকড়োকে বললে, 'বনে চিন্তাশীল যাঁরা, তাঁদের হয়ে আমরা এসেছি ধন্যবাদ জানাতে গানের ওস্তাদ আপনাকে·· ওর নাম কী, অনেক গানের আবিষ্কর্তাকে', আর একজন থপ্ করে বললে, 'জলের মতো সহজ গানের', অমনি তৃতীয় ব্যাঙ থপ্ থপ্ করে বললে, 'যত-সব ছোটো গানের', অমনি অন্যে বললে, 'মজার গানের।'

পঞ্চম, ষষ্ঠ, তারাও থপ্ থপ্ ছপ্ ছপ্ করে এগিয়ে এসে বললে, 'সব বড়ো বড়ো গানের···সব পবিত্র গানের।'

ব্যাঙেদের কুঁকড়োর মোটেই ভালো লাগছিল না, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে তিনি তাদের বসতে বললেন। একটা মস্ত ব্যাঙের ছাতা টেবিলের মতো পাতা রয়েছে, তারি চারি দিকে সবাই বসলেন। সদালাপ চলল। ব্যাঙ বিনয় করে বললেন, তাঁরা কিছুই নয়, অতি হীন। কুঁকড়ো বললেন, 'কিন্তু বড়ো বড়ো চোখ দেখলেই বোঝা যায় তাঁরা খুবই বুদ্ধিজিভি।' কোলাব্যাঙ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'আমরা বনের মধ্যে একছত্রী সবাই, মোরগদের মধ্যে একমাত্র কুঁকড়োকে একদিন ভোজ দিতে মনস্থ করেছি। আপনার গান

পৃথিবীকে আলোকিত, পুলকিত, চমকিত, সচকিত করেছে।' এক ব্যাঙ বললে, 'সত্য আপনার গান ···।' অন্য ব্যাঙ আকাশে চোখ তুলে বললে, 'স্বর্গীয়।' 'অথচ এই পৃথিবীরই।' —অন্য ব্যাঙ মাটিতে চোখ নামিয়ে বলে উঠল। সোনাব্যাঙ বললে, 'স্বপনপাখির গান, সে কী তুচ্ছ আপনার গানের কাছে।'

কুঁকড়ো বলে উঠলেন, 'কী বললে। স্বপনপাখির গান··· তুচ্ছ? ··· একি সত্যি? না, তোমরা নিশ্চয় বাড়িয়ে বলছ।' কোলাব্যাঙ গম্ভীর স্বরে বললে, 'স্বপনপাখির স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে, সত্যিকার গানে বনকে মাতিয়ে তুলে দেয়, এমন একজনের বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। একটু অদল-বদল না হলে আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না।'

কুঁকড়ো দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'সে কাজটা যদি আমার দ্বারা সম্ভব হয়, তবে আমি রাজি আছি।' সব ব্যাঙ ডেকে উঠল, একসঙ্গে কুঁকড়োর জয় দিয়ে, 'কুঁক-ড়ো পাহাড়-ত-লির কুঁকড়ো-পা-হাড় — ত-লির।'

সোনাব্যাঙ গলা ভারি করে বললে, 'এইবার স্বপনের দফা রফা হল।' কুঁকড়ো শুধলেন, 'দফা রফা কী রকম।' কিন্তু কে তাঁর কথা শোনে। গলা ফুলিয়ে গান ধরলে সব ব্যাঙ-কটা করতাল বাজিয়ে —

মেঘ হাঁকে, 'গড় কর্, গড় কর্, গড় কর্।'
বিষ্টি বলে, 'টুপ টাপ, চুপ চাপ, ঝুপ ঝাপ।'
শিল বলে, 'তড়-বড়, গড় কর্, গড় কর্।'
বাদল ঝরে গড় করি,
জলে ভাসে মাঠ, ঘাঠ আর বাট,
এল বাতাস এলোমেলো,
লাফ দিয়ে ঝড় এল
ঘাড় ধরে বলে গেল, 'কর্ গড় কর্' ···।

কোলাব্যাঙ ধুয়ো ধরলেন, 'কে তারে গড় করে। কে কারে গড় করে।' সোনাব্যাঙ চিতেন গাইলেন, 'বাতাস তারে গড়

করে, সবাই তারে গড় করে।' ফেরতা গাইলে সব ব্যাঙ, 'গড় কর্ গড় কর্। কর্ কর্ গড় কর্। গড় কর্ গড় কর্।' কুঁকড়ো ব্যাঙেদের শুধালেন, 'স্বপনপাখির গান কেমন।'

ব্যাঙরা বললে, 'আমরা কেউ থাকি পাথর-চাপা, কেউ থাকি কুয়োর তলায়, আমাদের কানে কেমন করে সে গান আসবে। তবে স্বপন আমরা দেখি বটে, শীতের ক'মাস চব্বিশ ঘণ্টাই। গেছোব্যাঙকে শোধালে হয়, সে স্বপন আর পাখি দুই দেখেছে।'

কুঁকড়ো গেছোব্যাঙকে শুধালেন স্বপনপাখির গানের কথা।

গেছো তার কটকটে আওয়াজে পাখির গানের নকল দেখিয়ে দিলে, 'দম ফাট্ দম ফাট্। দুয়ো দুয়ো দুয়ো দুয়ো ···।' নকলটা মোটেই আসলের মতো হল না, কিন্তু কুঁকড়ো ভাবলেন সত্যিই স্বপনপাখি এমনিই গায়, তিনি ব্যাঙদের বললেন, 'আহা বেচারা পাখি যদি এই গান গেয়েই খুশি থাকে তো থাক্-না। তার উপর উৎপাত করে কী হবে। মশা মারতে কামান পাতবার কী দরকার।'

ব্যাঙরা বললে, 'না মশয়, আপনার গান যেদিন শুনেছি, সেইদিনই বুঝেছি কী বিশ্রী স্বপনপাখিটার গান। আপনার সুর শুনলে আমাদের যেন ডানা গজিয়ে উঠে উড়তে ইচ্ছে হয়। আর তার গান, ছোঃ।' ব'লে সব ব্যাঙগুলো হাঁচতে লাগল। তাঁর গান শুনে ব্যাঙরা ডানা গজিয়ে সব উড়ে চলেছে এ ছবিটা মনে করে কুঁকড়ো বেশ একটু আমোদ পেলেন। ব্যাঙরা তাঁর হাসি দেখে আরো জোরে ছাতা পিটতে লাগল, 'জয় কুঁকড়ো, জয় কুঁকড়ো' ব'লে।

সোনালি বেরিয়ে এসে বললে, 'এত গোল কিসের।' কুঁকড়ো বললেন, 'ব্যাঙরা আমায় ভোজের নিমন্ত্রণ করছে।' সোনালি অবাক হয়ে শুধলে, 'তুমি যাবে নাকি ওদের ভোজেতে।' কুঁকড়ো বললেন, 'আপত্তি কী। এঁরা সবাই বুদ্ধিজিভি। আমার গান এদের যদি ডানা গজাবার কাজে লাগে, তবে কেন আমি এদের সে সুখ থেকে বঞ্চিত রাখি। তোমার স্বপনপাখির গান তো সে কাজটা

করতে পারলে না, উলটে বরং বেচারাদের দম ফাটিয়ে দেবারই জোগাড় করেছে। শোনো-না স্বপনপাখি ওদের কী গানই শুনিয়েছে।' কুঁকড়ো ব্যাঙেদের ইশারা করলেন, আর অমনি তারা সোনালিকে স্বপনপাখির গানের নকল দেখিয়ে দিলে, 'দম ফাট্, দম ফাট্, হুয়ো হুয়ো হুয়ো। দম ফাট্ ফাট্ দম, হুয়ো হুয়ো।'

'শুনলে তো।' কুঁকড়ো সোনালিকে বললেন। ঠিক সেই সময় বনের শিয়রে নিশুত রাতের আঁধার কাঁপিয়ে একটি সুর এসে পেঁছিল, 'পিয়ো।' কুঁকড়ো সেই মিষ্টি সুর শুনে চমকে বললেন, 'ও কে ডাকে?' কোলাব্যাঙ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কেউ নয়, ওই সেই পাখিটা।'

এবার আবার সেই স্বপনপাখির মিষ্টি সুর কুঁকড়োর কানে এল, যেন একটি-একটি আলোর ফোঁটা 'পিয়ো, পিয়ো। পিয়ো।' কুঁকড়ো শুনতে লাগলেন। একি পাখির ডাক। না এ স্বপ্নের বীণায় ঘা পড়েছে! সোনাব্যাঙ কী বলতে আসছিল, কুঁকড়ো তাদের এক ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলেন। এইবার স্বপনপাখি গান ধরলে,

পিয়া।
আঁধার রাতের পিয়া, একলা রাতের পিয়া।
পিয়ো, ওগো পিয়ো। দিয়ো, দেখা দিয়ো।
আমায় দেখা দিয়ো, একলা দেখা দিয়ো।
আঁধার-করা ঘরে, জাগছি তোমার তরে,
অন্ধকারে পিয়ো, দিয়ো দেখা দিয়ো।

দেখতে দেখতে চাঁদের আলো জলে স্থলে এসে পড়ল। নীল আলোর সাজে সেজে অন্ধকারের পিয়া যেন বনের আঁধার-করা বাসরঘরে এসে দাঁড়ালেন। স্বপনপাখি-আনন্দে গেয়ে উঠল 'পিয়ো, সুধা পিয়ো সুধা পিয়ো পিয়ো পিয়ো।'

কুঁকড়ো বলে উঠলেন, 'ছি ছি, ব্যাঙগুলোকে বিশ্বাস করে কী ভুলই করেছি। হায় এ লজ্জা রাখব কোথায়, ওগো স্বপনপাখি।' মধুর সুরে স্বপনপাখির উত্তর এল, 'দিনের পাখি তুমি নির্ভীক, সতেজ ডাক দাও, রাতের পাখি আমি আঁধারে ডাকি, ভয়ে ভয়ে মিনতি ক'রে।

কিন্তু বন্ধু, তুমিও যাকে ডাক, আমিও তাকে ডাকি। ওরা যা বলে বলুক, তুমি আমি এক আলোরই দূত।'

কুঁকড়ো বনের শিয়রে চেয়ে বললেন, 'গেয়ে চলো, গেয়ে চলো রাত্রির স্বপন। আলোর দূত।'

আবার সুর উঠল আকাশ ছাপিয়ে তারার মধ্যে গিয়ে ঝংকার দিয়ে। বনের সবাই চাঁদের আলোয় বেরিয়ে দাঁড়াল সে সুর শুনে। গাছের তলায় আলো ছায়া বিছানো, তারি উপরে হরিণ দাঁড়িয়ে শুনছে; কোটরের মধ্যে চাঁদের আলো পড়েছে, সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে বাচ্ছারা সব শুনছে; বনের পোকা-মাকড় পশু-পাখি সবার মনের কথা এক করে নিয়ে স্বপনপাখি বনের শিয়রে গাইছে; জোনাকির ফুলকি, তারার প্রদীপ, চাঁদের আলোর মাঝে—নীল আকাশের চাঁদোয়ার তলায়। ব্যাঙের কড়া সুর থেকে আরম্ভ করে ঝিঁঝির ঝিমে সুরটি পর্যন্ত সবই গান হয়ে এক তানে বাজছে যেন এই স্বপন পাখির মিষ্টি গলায়। কুঁকড়ো অবাক হয়ে বলে উঠলেন, 'এ যে জগৎজোড়া গান, এর তো জুড়ি নেই। স্বপনপাখি কার কানে তুমি কী কথা বলে যাচ্ছ কে তা জানে।' অমনি কাঠবেড়ালি বললে, 'অমনি শুনছি, ছুটি হল, খেলা করো।' খরগোশ বললে, 'আমি শুনছি, শিশিরে ভেজা সবুজ মাঠে চলো।' বনবেড়াল বললে, 'শুনছি, চাঁদের আলো এল।' মাটি বললে, 'বিষ্টির ফোঁটা পড়ছে যেন।' জোনাক বললে, 'তারা আর তারা।' কুঁকড়ো তারার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমরা কী শুনছ আকাশের তারা।' তারা সব উত্তর করলে, 'আমরা নয়নতারার নয়নতারা।'

কাছে সোনাল-পাখি দাঁড়িয়েছিল, কুঁকড়ো তাকে শুধোলেন, 'আর তুমি কী শুনছো।' সে এক মনে শুনছিল, কোন কথা কইলে না, কেবল 'ওঃ!' ব'লে নিশ্বাস ফেললে।

কুঁকড়ো সোনালিকে বললেন, 'যে যা ভালোবাসে স্বপনপাখি তাকে সেই গানই শুনিয়ে যায়। আমি কী শুনলেম জানো? — দিন এল, গান গাও। ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি …।'

সোনালি মুখ টিপে হেসে মনে-মনে বললে, 'ভোরের বড়ো দেরি নেই, তুমি না গাইলেও ভোর আজ আসে কি না দেখাব তোমায়।'

কুঁকড়ো একেবারে মোহিত হয়ে গান শুনছিলেন ; ভোর হচ্ছে, কিন্তু সেটা আজ তাঁর খেয়ালই হল না ; তিনি বলে উঠলেন, 'ওগো স্বপনপাখি, তোমার এ গানের পরে আর কোন্ লজ্জায় আমি গাইব ?' স্বপনপাখি বললে, 'গান বন্ধ তো করতে পার না তুমি।' কুঁকড়ো বললেন, 'কিন্তু এর পরে সেই রগ্‌রগে আগুনের মতো রাঙা সুর কি কারো গাইতে ইচ্ছে হয়।' স্বপন উত্তর দিলে, 'আমার গান আমারি মনে হয় যে, সময়ে সময়ে বড়ো বেশি নীল। আসল কথাটা কী জানো ? যে সুরের স্বপ্ন তোমারো মনে, আমারো মনে জাগছে, সেটিকে সুরে বসাতে তোমারো সাধ্য হল না, আমারো ক্ষমতায় কুলোল না কোনোদিন। গানের পরে মন সে বলবেই, হল না হল না, তেমনটি হল না, এ কিছুই হল না।'

কুঁকড়ো বললেন, 'সুরের পরশে ঘুম আসবে, তাকেই বলি গান।' স্বপন বললে, 'গানের ডাকে জেগে উঠল, কাজে লাগল—তন্দ্রা ছেড়ে, তাকেই বলি গান।'

কুঁকড়ো বললেন, 'আমার গান কি কোনোদিন কারু চোখে এক ফোঁটা জল আনতে পারবে।'

স্বপনপাখির উত্তর হল, 'আর আমার গান কি কোনোদিন কিছু জাগিয়ে তুলবে। বন্ধু, দুঃখু নেই গেয়ে চলো, যেমন সুর পেয়েছি, ভালো হোক, মন্দ হোক, গেয়ে যাই যতক্ষণ—।'

'দুম' করে বন্দুকের শব্দ হল। একটা আগুনের হলকা বিদ্যুতের মতো বনের শিয়রে চমকে উঠল। একটি ছোটো পাখি গাছের শিয়র থেকে কুঁকড়োর পায়ের কাছে ঝরা পাতার মতো ঝরে পড়ল।

সোনালি চিৎকার করে উঠল, 'স্বপনপাখি রে, স্বপনপাখি।' কুঁকড়ো ঘাড় হেঁট করে বলে উঠলেন, 'ওরে মানুষ কী নিষ্ঠুর। কী নির্দয়।' স্বপনপাখি তাঁর দিকে কালো চোখ মেলে একটিবার চেয়ে দেখলে, তার পর একবার তার ডানা দুটি কেঁপে উঠে স্থির হল।

সকালের হাওয়া আগুনে-ঝলসানো রক্তমাখা একটি ছেঁড়া পালক আস্তে আস্তে উড়িয়ে নিয়ে চলল, বনের পথে হুহু করে কেঁদে।

হঠাৎ ওদিকের ঝোপঝাপগুলো মাড়িয়ে হোঁস ফোঁস করে হাঁপাতে হাঁপাতে জিম্মা হাজির। কুঁকড়ো তাকে দেখে বললেন, 'জিম্মা, তুমি এখানে যে। শিকার পৌঁছে দিতে না কি।'

জিম্মা ঘাড় হেঁট করে বললে, 'এরা যে জোর করে আমায় শিকারে নিয়ে এল…।'

কুঁকড়ো এতক্ষণ স্বপনপাখিটিকে আড়াল করে আগলে ছিলেন, এবার সরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চেয়ে দেখো কাকে তারা মেরেছে।'

জিম্মা ঘাড় নেড়ে বললে, 'আহা যে গাছটি সুরে ভরা দেখবে, সেই গাছেই কি আগে গুলি চালাবে রাক্ষসগুলো। আমি আবার এদের হুকুম মানব!'—বলে জিম্মা ঘুরে বসল। তার পর, মাটির মধ্যে সব কারা চলাফেরা করতে লাগল, আর দেখতে দেখতে স্বপন-পাখিকে পৃথিবী যেন কোলের মধ্যে আস্তে আস্তে টেনে নিতে লাগলেন।

দূরে শিকারীদের সিটি পড়ল। জিম্মা কুঁকড়োকে চট্‌পট্‌ গোলাবাড়িতে ফিরে যেতে বলে দৌড়ে চলে গেল শিকারীদের দিকে। এদিকে সোনালি কেবল দেখছিল কখন্ সকাল হয়। তার ভয় হচ্ছিল বুঝি কুঁকড়ো এইবার আকাশে চেয়ে দেখেন। কিন্তু কুঁকড়ো যেমন মাথা হেঁট করে স্বপনপাখির জন্যে কাঁদছিলেন, সেই ভাবেই রইলেন। সোনালি আস্তে আস্তে তাঁর কাছে গিয়ে বললে, 'এসো, আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদো।' কুঁকড়ো নিশ্বাস ফেলে সোনালির কাছে সরে গেলেন, সে ডানায় তাকে ঢেকে নিলে। তার পর সেই সোনার ডানার মধ্যে ঢেকে সোনালি কত ভালোবাসাই জানাতে লাগল, কত মিষ্টি কথা, কত মিনতি, কত ছল। আর ওদিকে সকাল হতে থাকল, অন্ধকার ফিকে হয়ে এল, সব জিনিস স্পষ্ট হতে থাকল, কিন্তু তখনো সোনালি বলছে, 'দেখছ আমি তোমায় কী ভালোবাসি।' তার পর হঠাৎ এক সময় ডানা সরিয়ে নিয়ে সোনালি

বলে উঠল পালক ঝাড়া দিয়ে, ‘দেখেছ, কেমন সকাল এসেছে, তুমি না ডাকতেই।’

কুঁকড়ো চমকে আকাশে চাইলেন। তার পর বুক ফেটে তাঁর এমন স্বর উঠল যে তেমন কান্না কোনোদিন কেউ শোনে নি। তিনি যেন পাষাণের মতো স্থির হয়ে গেলেন; আর চোখের সামনে তাঁর সকালের আলো মেঘে আকাশে গাছে ছড়িয়ে পড়তে থাকল।

সোনালি নিষ্ঠুরের মত বললে, ‘শেওলাগুলো রাঙা হয়ে উঠল বলে!’ ‘না, কখনো না!’ বলে সেদিকে কুঁকড়ো ছুটে যাবেন, দেখতে দেখতে পাথরের গায়ে শেওলার উপরে সকালের আভা পড়ল আর সেগুলো আগুনের মতো লাল হয়ে গেল। সোনালি বললে, ‘ওই দেখো পূর্বদিকে।’ কুঁকড়ো ‘না’ বলে যেমন সেদিকে চাইলেন, অমনি সোনায় আকাশ ভরে উঠল। ‘এ কী। এ কী।’ বলে কুঁকড়ো চোখ ঢাকলেন। সোনালি বললে, ‘পূর্বদিক কারু হুকুম মানে না, দেখলে তো?’

কুঁকড়ো ঘাড় হেঁট করে বললেন, ‘সত্যিই বলেছ। মন সেও হুকুম মানে, কিন্তু পুবদিক, সে কারু নয়। আজ আমি বুঝেছি কেউ কারু নয়।’

এই সময় জিম্মা ছুটতে ছুটতে এসে বললে, ‘গোলাবাড়িতে সবাই চাচ্ছে তোমাকে। পাহাড়তলি আর অন্ধকার করে রেখো না।’ কুঁকড়ো জিম্মাকে বললেন, ‘হায়, এখনো তারা আমাকে আলোর জন্যে চাচ্ছে? আলো দেব আমি, এ কথা এখনো তারা বিশ্বাস করছে।’ জিম্মা অবাক হয়ে রইল। কুঁকড়ো এ কী বলছেন। তার চোখে জল এল। সোনালি এবার সব অভিমান ছেড়ে ছুটে কুঁকড়োর কাছে গিয়ে বললে, ‘আকাশ আর আলো দুটোই কি আমার এই বুকের ভালোবাসার চেয়ে বড়ো? দেখো ওরা তো তোমায় চায় না, আর আমার বুক তোমায় চাচ্ছে।’

কুঁকড়ো ভাঙা গলায় বললেন ‘হাঁ, ঠিক।’ সোনালি বলে চলল, ‘আর অন্ধকার, সে কি আর অন্ধকার থাকে, যদি দুটি প্রাণের

ভালোবাসার আলো সেখানে—।' কুঁকড়ো তাড়াতাড়ি 'হাঁ' বলে সোনালির কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে সপ্তম-সুরে চড়িয়ে ডাক দিলেন, 'আলোর ফুল।' সোনালি অবাক হয়ে বললে, 'গাইলে যে।'

কুঁকড়ো বললেন, 'এবার আমি নিজেকে নিজে ধমকে নিলেম। বারবার তিনবার আমি যা ভালোবাসি, তা করতে ভুলেছি।' সোনালি শুধলে, 'কী ভালোবাস শুনি।'

কুঁকড়ো গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কাজ, আমার যা কাজ তাই।' বলে কুঁকড়ো জিম্মাকে বললেন, 'চলো, এগোও।' 'গিয়ে করবে কী।' সোনালি শুধলে। 'আমার কাজ সোনালি।' 'কিন্তু রাত্রি তো আর নেই।'

কুঁকড়ো বললেন, 'আছে, সব ঘুমন্ত চোখের পাতায়।'

সোনালি হেসে বললে, 'আজ থেকে ঘুম ভাঙানোই বুঝি ব্রত হল তোমার। কিন্তু যাই বল, সকাল তো হল তোমাকে ছেড়ে, তেমনি ঘুমও ভাঙবে তুমি না গেলেও।'

কুঁকড়ো বললেন, 'দিনের চেয়েও বড়ো আলোর হুকুমে আমায় চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সোনালি···।'

সোনালি গাছের তলায় মরা স্বপনপাখিটি দেখিয়ে বললে, 'এও যেমন আর গাইবে না, তেমনি তোমার মনের সুরটি কোনোদিন আর ফিরে আসবে না।' ঠিক এই সময় সবাইকে অবাক করে দিয়ে বনের শিয়রে স্বপনপাখি ডাক দিলে, 'পিয়ো পিয়ো।' ঠিক সেই গাছটির উপর থেকে যার তলায় রাতের স্বপন এখনো পড়ে আছে ধুলোয়। কুঁকড়ো উপর দিকে চেয়ে শুনলেন যেন আকাশবাণী হল, 'শেষ নেই, শেষ নেই, বনের স্বপন অফুর।'

কুঁকড়ো আনন্দে বলে উঠলেন, 'অফুর সুর, অশেষ স্বপন।' সোনালি বললে, 'তোমার বিশ্বাস কি এখনো অটল থাকবে। দেখছ না সূর্য উঠছেন।' কুঁকড়ো বললেন, 'কাল যে গান গেয়েছি, তারি রেশ আকাশে এতক্ষণ বাজছিল সোনালি।'

এমন সময় পেঁচাগুলো চেঁচিয়ে গেল, 'আজ কুঁকড়ো গায় নি,

কী মজা।' 'ওই শোনো, সোনালি, পেঁচারা স্পষ্টই জানিয়ে গেল যে, আলো আজ দেওয়া হয় নি। তাই আনন্দ করছে তারা।' বলে কুঁকড়ো সোনালির কাছে গিয়ে বললেন, 'সকাল আমিই আনি। শুধু তাই নয়, বাদলে যখন পাহাড়তলিতে দিনরাত ঘন কুয়াশা চেপে এসেছে, দিন এল কি না বোঝা যাচ্ছে না, সেই-সব দিন আমার সাড়া সূর্যের জায়গাটি নিয়ে সবাইকে জানায়, 'দিন এল, দিন এল রে, দিন এল'।'

সোনালি কী বলতে যাচ্ছিল, কুঁকড়ো তাকে বললেন, 'শোনো।' সোনালি দেখলে, কুঁকড়ো যেন কতদূরে চেয়ে রয়েছেন, চোখে তাঁর এক আশ্চর্য আলো খেলছে। কুঁকড়ো আস্তে আস্তে বললেন, যেন মনে-মনে, 'দূর স্বর্গলোকের পাখি আমি। তাই না আমি ডাক দিলে নীল আকাশ ছেয়ে জ্বলে ওঠে সন্ধ্যার অন্ধকারে রাত্রির গভীরে আলোর ফুলকি। আমার দেওয়া আলো কোনোদিন কি নিভতে পারে। না আমার গান বন্ধ হতে পারে? কতদিন গাচ্ছি, কতদিন যে গাইব তার কি ঠিকানা আছে। যুগ যুগ ধরে এমনই চলবে…। আমার পর সে, তার পর সে গেয়ে চলবে—আমারি মতো অটল বিশ্বাসে। শেষে একদিন দেখা যাবে আকাশের নীল, তারায় তারায় এমনি ভরে উঠছে যে রাত আর কোথাও নেই, সব দিন হয়ে গেছে—আলোয় আলোময়।' সোনালি অমনি শুধলে, 'কবে সেটা হবে শুনি।' 'কোনো এক শুভদিনে।' বলে কুঁকড়ো চুপ করলেন।

সোনালি বললে, 'আমাদের এই বনটিকে ভুলো না যেন সেদিন।'

কুঁকড়ো বললেন, 'কোনোদিন ভুলব না। এইখানেই জানলেম যে, এক স্বপন ভেঙে যায়, আর-এক স্বপন এসে দেখা দেয়, স্বপনের সঙ্গে নিজেও ভেঙে পড়া নয় কিন্তু জেগে ওঠা, নতুন আলোয় নতুন আশা নিয়ে।' সোনালি বুঝলে কুঁকড়ো আর থাকেন না, সে হতাশ হয়ে অভিমানে বলে উঠল, 'যাও যাও, সেই খোপের মধ্যে রোজ সন্ধেবেলা ঘুম দিয়ো, নিজের অন্দরমহলে মই বেয়ে উঠে।'

কুঁকড়ো উত্তর দিলেন, 'ডানা খুলে উড়তে বনের পাখিরা শিখিয়েছে যে।'

'যাও, সেই ঝুড়ির মধ্যে মুরগি-গিন্নি এতক্ষণ কাঁদছে।'

কুঁকড়ো বললেন, 'মা আমায় দেখে কী খুশিই হবেন।'

জিম্মা বললে, 'আর বলবেন পুরোনো চাল ভাতে বেড়েছে রে।' বলে কুকুর ঠিক মুরগি-গিন্নির আওয়াজটা নকল করলে। কুঁকড়ো জিম্মাকে বললেন, 'চলো যাওয়া যাক। আর কেন।'

সোনালি যেন সে কথা শুনেও শুনলে না। সে দেখাতে চায় কুঁকড়ো গেলে তার একটুও কষ্ট হবে না। কিন্তু আপনা হতেই তার চোখদুটি জলে ভরে এল। কুঁকড়ো তা দেখলেন, তাঁরও মন একটু উদাস হল। শেষে কুঁকড়ো জিম্মাকে সোনালির কাছে দু-একদিন থাকতে বললেন। জিম্মা অনেক দুঃখু সয়েছে, সে সোনালিকে বোঝাবার জন্যে কিছুদিন বনে থাকাই স্থির করলে। কুঁকড়ো বিদায় নিয়ে এবার সত্যিই চললেন, সোনালি আর থাকতে পারলে না, ছুটে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বললে, 'আমাকেও সঙ্গে নাও।' কুঁকড়ো তার মুখে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'আলোর ছোটো বোন হয়ে থাকতে পারবে কি।' 'কখনো না।' বলে সোনালি সরে দাঁড়াল। 'তবে আসি।' বলে কুঁকড়ো এগোলেন। সোনালি রেগে বললে, 'আমি তোমায় একটুও ভালোবাসি নে।' কুঁকড়ো তখন মাঝ-পথে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি তোমায় সত্যিই ভালো-বাসি, কেবল ভাবছি আমার দিনগুলির সঙ্গে যদি তুমি মিলতে পারতে।' বলতে-বলতে কুঁকড়ো বনের আড়ালে বেরিয়ে গেলেন। সোনালি রাগ-ভরে বলে উঠল, 'যেমন আমাকে ঠেলে গেলেন, তেমনি পড়েন পাখ্‌মারের পাল্লায় তো ডানাদুটি কেটে ছেড়ে দেয়।'

জিম্মা চুপটি করে বসে সোনালির রকম-সকম দেখছে, এমন সময় কাঠঠোকরা নিজের কোটর থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে বলে উঠল, 'পাখ্‌মারটা কুঁকড়োকে তাগ করছে যে। কী বিপদ।' পেঁচারা অমনি গাছের উপর থেকে দুয়ো দিয়ে বললে, 'বেশ হয়েছে, খুব

হয়েছে, কুঁকড়োর এবারে কর্ম কাবার।' খরগোশগুলো গড় থেকে ছুটে বেরিয়ে এল, একটা বাচ্ছা কান খাড়া করে দেখে বললে, 'পাখ্‌মার বন্দুকটা মুচড়ে ভাঙলে যে।' আর একজন অমনি বলে উঠল, 'না রে, গুলি ভরছে, দেখছিস না?'

জিম্মার দিকে সোনালি, সোনালির দিকে জিম্মা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। জিম্মা বললে, 'ওরা কি কুঁকড়োর ওপরেও গুলি চালাবে।'

সোনালি বললে, 'না। সোনালির দেখা যদি পায়, তবে সেই-দিকেই বন্দুক ওঠাবে।' বলে সোনালি চলল। জিম্মা পথ আগলে বললে, 'কোথায় যাও সোনালি।'

'আমার যেটুকু করবার সেই কাজটুকু করতে।' বলে বন্দুকের মুখে সোনালি উড়ে পড়তে চলল।

কাঠঠোকরা চেঁচিয়ে উঠল, 'ফাঁদ। ফাঁদ। ফাঁদটা বাঁচিয়ে সোনালি।' কিন্তু তার আগেই সোনালিকে দড়ির ফাঁদ নাগপাশের মতো জড়িয়ে ফেলেছে। 'তারা তাঁকে প্রাণে মারবে।' বলে সোনালি ধুলোর উপরে সোনার পাখা লুটিয়ে কাঁদতে লাগল। তার সব অভিমান চুর হয়ে গিয়ে কান্নার সুরে মিনতি করতে লাগল কেবলি সকালের কাছে, 'হিমে সব ভিজিয়ে দাও, বারুদ না জ্বলুক।' ভিজে ঘাসে শিকারীর পা পিছলে যাক অন্য দিকে। ওগো সকালের আলো, তুমি তোমার পাখিকে রক্ষে করো, যে-পাখি আঁধার দূর করে, আকাশের বাজকে ফিরিয়ে দেয়, সবার উপর থেকে। ওগো স্বপনপাখি, তুমি গেয়ে ওঠো, ঢুলে পড়ুক দুরন্ত মানুষের চোখের পাতা, স্বপ্নের রাজ্যে সে ঘুমিয়ে থাক্, তার মৃত্যুবাণের পাশাপাশি।'

স্বপনপাখি গেয়ে উঠল বন মাতিয়ে করুণ সুরে, 'পিয়-পিয়, ও গোলাপের পিয়, ও আমাদের পিয়।' সোনালি দুখানি ডানা ধুলোর উপরে রেখে বললে, 'আলো। তোমার পাখিকে বাঁচাও, তার সঙ্গে সেই গোলাবাড়িতেই আমি চিরদিন থাকব, আর কোনোদিন অভিমান করব না তার উপরে।' অমনি সোনালি দেখলে আলো

হতে আরম্ভ হল, চারি দিকে পাখিরা গেয়ে উঠল, আকাশ ক্রমে নীল হতে থাকল, বনের ঘুম আস্তে আস্তে ভাঙতে লাগল।

সোনালি মাটিতে মাথা নুইয়ে বললে, 'আলোর অপমান, আলোর দূতের অপমান আর আমি করব না। হে আলোর আলো, আমায় ক্ষমা করো, তাঁকে বাঁচাও।' 'দুম' ক'রে ওধারে বন্দুক ছুটল, বনের সমস্তটা যেন রী-রী করে শিউরে উঠল, তার পর কুঁকড়োর সাড়া এল, 'আলোর ফুলকি।'

'তাগ ফসকেছে। গুলি ফসকেছে।'—পেঁচাটা কেঁদে উঠল। আর অমনি দিকে দিকে পাখি সব 'জয় জীব। জয় জীব।' বলে কুঁকড়োর জয় দিয়ে উঠল। কোকিল উলু উলু দিয়ে বলতে লাগল, 'শুভদিন এল—শুভদিন।' দেখতে দেখতে চারি দিক আলোময় হয়ে উঠল। সেই সময় বনের মধ্যে পায়ের শব্দ উঠল। সোনালি চোখ বুজে চুপ করে শুনতে লাগল, পায়ের ধ্বনি আস্তে আস্তে তালে তালে পড়ছে এক, দুই, তিন। কার ঠাণ্ডা হাতের যেন পরশ পেয়ে সোনালি চোখ খুলে দেখলে, পলাতক কুঁকড়োকে বুকের কাছে ধ'রে কুঁকড়োর মনিব। সোনালি পালাবার চেষ্টাও করলে না; কুঁকড়োর পাশে গেরেপ্তার হয়ে গোলাবাড়িতে চলল। বসন্ত বাউরি পাহাড়তলি মাতিয়ে সুর ধরলে, 'কথা কও, বউ কথা কও, কোথা যাও। বউ কোথা যাও। কথা কও, বউ কথা কও।'

খাতাঞ্চির খাতা

খাতাঞ্চিনী ও খাতাঞ্চি
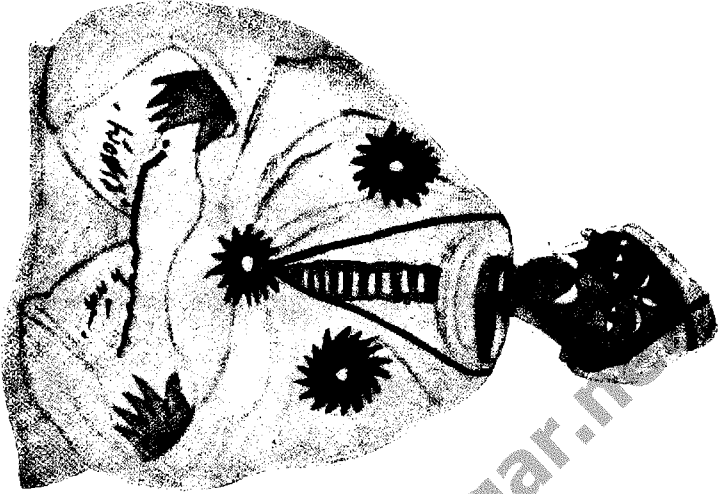
আঙুটি পাঙুটি

মনিবের খাতাঞ্চিমশায় হিসেব লিখছেন, গোলাবাড়ির কোন কোণে কী জমা হল, কোন ঘরে কী খরচ হল। কাজেই নামে গোলাবাড়ি হলেও সেখানে কেউ যে 'দে টপাটপ নে টপাটপ ভাবনা কিছু নেই' বলে বেহিসাবি কাণ্ড করে হিসেব গোল করবে, তার জো-টি নেই। :খাতাঞ্চিমশায় অমনি খাতায় তোমার নামে হাওলাত টানলেন, আর অমনি মাসের শেষে তোমার মাইনের টাকা কখনো চার আনা কখনো পাঁচ সিকে এমন কী পুরো পাঁচ টাকাই কমে গেল! দুচারটে রসগোল্লা বেশি খেয়ে ফেললে মাইনের টাকা কেন যে কমে যাবে, এটা সোনাতোন ছোঁড়া গোলাবাড়িতে চুল পাকিয়েও বুঝতে পারলে না। কাজেই এদানিং সে খাতাঞ্চির দোয়াতদানিরই কাছ থেকে কেবলি হাওলাত নিয়ে চলেছে, মাইনের আশা একেবারে করে না।

সেদিন খাতাঞ্চির জমাখরচের ঘরের বাইরে জানলার ধারে ফাগুন মাসের কোঁ-গাছের মৌ লুট করে মৌমাছিটা গুন-গুন করে কেবলি বাজে বকে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় বৌঠাকরুনের প্রথম সোনা মেয়েটি জন্মেই শুধু-শুধু কেবলি দুধ খাবার, কাপড় পরবার, দাঁত ওঠাবার, কান বিঁধোবার, ওষুধ খাবার, খেলাঘর পাতবার, শ্বশুর-বাড়ি যাবার, আবার দুগগো পুজোয় বাপেরবাড়ি আসবার, এমনি নানা ছুতোয় কান্না শুরু করে দিলে যে সোনাতোনের আর হাসি ধরে না। সে খাতাঞ্চিমশায়ের কাছে ছুটে এসে বললে, 'কর্তার মেয়ে হল, এবার বকশিশ চাই।'

খাতাঞ্চি তাকে ধমকে বললেন, 'বাজে বকচিস ফের?' তারপর সোনাতোনের হাতে একটি আধলা পয়সা দিয়ে খরচের ঘরে খাতায় লিখলেন —প্রথমা কন্যার জন্মোপলক্ষে বকশিশ বাবদ বাজে খরচ

আধ পয়সা! অমনি মনটা ছাঁৎ করে উঠল। একটু ভেবে খাতাঞ্চি খরচের পাতায় জের টানলেন--সোনাতোনের হাওলাত বাবদ তাহার গতবৎসরের মাহিনা দেওয়া যায় আধ পয়সা। কিন্তু এতেও বাজে খরচ বন্ধ হওয়া দায়, এবার খাতাঞ্চিমশায় বেশ বুঝলেন।

পাঁচদিন ধরে খাতাঞ্চিমশায়ের মেজাজ খিটখিটে হয়েই রইল। তিনি কেবলি বিড়-বিড় করতে লাগলেন —কুড়িতে বুড়ি, তা হলে রোস, তা হলে এই কুড়ি গণ্ডায় একপণ; একপণ একপণ দুইপণ, আর তিনপণ, হলে হল পাঁচপণ; পাঁচপণ আর তিনপণ হলে হল আটপণ, আটের উপর আর একপণ কিংবা আর এক মেয়ে হলে হল নপণ; তা হলে হাতে রইল এই দুই চোখ! খাতাঞ্চিমশায় চশমা জোড়া হাতে করে মেয়ের বাজে খরচ মনে-মনে ঠিক দিতে লেগেছেন— গিন্নীর বরাদ্দ একসের দুধের থেকে কেটে রাখা যাক আধসের, আর আমার আফিঙের ক্ষীর থেকে, না হয় চায়ের ঘন দুধ থেকে, দিনে চার ছটাক —এই পাওয়া গেল মেয়েটার জন্যে মোটের উপর তিনবেলায় তিন পোয়া দুধ। তারপর দুজনের জন্যে যে দুটো কৈ মাছ আনা যায়, এখন থেকে তা না করে, গিন্নীর জন্যে চুনো পুঁটি আর আমার জন্যে যদি একটা বাগদা চিংড়ি বরাদ্দ করে দেওয়া যায়, তবে আর একটা মেয়ের মাথায় দেবার তেলটার খরচ চলতে পারে; আর হাতেও কিছু জমে —মাটির পুতুলটা, রাঙা চুড়িটা, সোনার পাখিটা কিনতে। কাপড়ের দর যে রকম বেড়েছে, তাতে করে সোনাতোনের বছরে দেড়-জোড়া কাপড়ের দাম থেকে কত আনা কত পাই কেটে নিলে, সোনার জন্যে ছমাসে সাড়ে-তিন-জোড়া রাঙা ডুরে আর নীলাম্বরী কাপড় হতে পারে, যখন এই হিসেবটায় এসে ঠেকেছেন খাতাঞ্চিমশায়, ঠিক সেই সময় সোনাতোন এসে বললে, 'মেয়ের সেটেরা পুজো, বৌমা দোয়াত কলম চাইলেন।'

সোনার কপালে বিধাতা রাত্তিরে চুপি-চুপি এসে কী হিসেব যে লিখবেন তা খাতাঞ্চিও জানেন না, কিন্তু এটা তিনি বেশ জানতেন

যে বিধাতার হাতে দোয়াত কলম ছেড়ে দিলে একটুও কালি খরচ হবার ভয় নেই। খাতাঞ্চি সোনাতোনকে বললেন, 'আমার এই দোয়াত কলমটা নিয়ে যাও, নতুন দোয়াত কলম কিনে আর কাজ নেই।'

কিন্তু সোনাতোন তখনও নড়ে না দেখে খাতাঞ্চি বললেন, 'আরো কী চাই?'

সোনাতোন বললে, 'এক পয়সার তেল, বিধাতা কি অন্ধকারে লিখবেন?'

খাতাঞ্চি পাঁচই তারিখে খাতায় এক পয়সার তেলের খরচ সোনাতোনকে দেখিয়ে বললেন, 'এক পয়সার তৈল, কিসে খরচ হৈল?' সোনাতোন হিসেব দিয়ে-দিয়ে পাকা হয়ে গিয়েছিল, সে অমনি চট করে বললে, 'এক পয়সার তৈল খরচ আর কিসে হৈল, খরচ হৈল কর্তার দাড়িতে, গিন্নীর পায় আর দিয়েছি মেয়ের গায়।'

খাতাঞ্চিমশায়ের হিসেবে বাঁচা উচিত ছিল ঐ এক পয়সার তেল থেকে এতটা যে, তাতে ছেলে-মেয়ের বিয়ের আনন্দ নাড়ু ভাজা এবং সাত রাত যে নাচ গান হবে তার মশাল জ্বালা চলবে। কিন্তু এর একটাও হল না দেখে তিনি বিষম চটে একটা পয়সা সোনাতোনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গোঁ হয়ে বললেন, 'বেটা হতভাগা ঘরে এল, বাকি তেলটা ঢেলে নিল!'

এমনি ধুমধামে ছদিনের দিন সোনার সেটেরা পুজোটি কোনো গতিকে সেরে নিয়ে একটু গুছিয়ে বসতে না বসতে আটকৌড়ে এসে পড়ল। সোনাতোনকে সেদিন দপ্তরখানার উঠোন দিয়ে দু-চারবার রান্নাবাড়িতে ঢুকতে দেখেই খাতাঞ্চিমশায় বুঝলেন এবার শুধু আটপণ কড়ির উপর দিয়েই যাবে না। তিনি চুপি-চুপি সোনাতোনকে ডেকে শুধোলেন, 'ব্যাপার কী?'

সোনাতোন অমনি হিসেব দিলে দরজার সামনে উবু হয়ে বসে, 'এক সের ধানের খই ভেজে বসিয়েছি এক ডোল—রায়মশায়, এবার লোকের বড় গোল।' রায়মশায় বললেন, 'লোকের আর গোল কী,

গোল বাধবে এবার হিসেবের সময়। ঢেঁকিতে অত পাড় দিচ্ছিলে কেন, সোনাতোন ?'

সোনাতোন অমনি বললে, 'তিনসের ধানের চিড়ে কুটলেম মেয়ের কাজেতে।'

'সর্বনাশ, এত চিঁড়ে খাবে কে ?' খাতাঞ্চি শুধোলেন।

সোনাতোন তখনি জবাব করলে, 'সব খাবে বাজে লোকেতে।'

সোনাতোন যা-যা বলে গেল ঠিক ঠিক মিলল। সন্ধ্যার পর রাজ্যের কচি ছেলে এসে কুলো পিটিয়ে খই কড়ি ছড়াছড়ি করে খাতাঞ্চি-খানার উঠোন শাদা করে দিয়ে ছড়া কাটতে-কাটতে গেল, 'আটকড়া বাটকড়া আট-দুগুণে ষোলো, খাতাঞ্চির দাড়ি ধরে ঝোলো।'

খাতাঞ্চি ঘরের ঘুলঘুলি থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'বাছারা অমন আশীর্বাদ কর না, দুগুণে আর কাজ নেই এক গুণেই থামা ভালো।' তারপর, বাজে লোক সব চিঁড়ে বাতাসায় আঁচল ভরিয়ে দলে-দলে যখন বলতে লাগল, 'রায়মশায়, মেয়ের বিয়েতে আমাদের খাওয়াবেন তো ?' তখন রায়মশায় খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বল কী, এমন খাওয়া খাওয়াব যে টের পাবে, এখন থেকে আমি তার আয়োজন করছি :

মধুখালি লোক পাঠিয়েছি ময়দার কারণ
কিছু লুচির আয়োজন —
তেল দিয়ে ভাজব লুচি মিশাল দেব ঘি
তোমরা খাবে নাতো কি ?
এবার একটা আচ্ছা ফলার দেব মনের মতো
খেও পেটে ধরে যত।'

একমাস পরে ষষ্ঠী পুজো, ঘটে একটু সিঁদুর ডাব আর আম পাতা দিয়ে খাতাঞ্চিমশায় সেরে দিলেন। তখন সোনার মা বললেন, 'সোনার কর্ণবেধে যদি ধুম না করি তো কী বলেছি!'

সাত বছরের আগে সোনার কান ফোঁড়বার দরকার নেই,

পাঁজিপুঁথি দেখে খাতাঞ্চিমশায় সেটা জেনেছিলেন, আর মনে-মনে কর্ণবেধের একটা মোটামুটি খরচের হিসেবও করে রেখেছিলেন। তিনি বললেন, 'তা তোমার যখন ইচ্ছে তখন তাই হবে। এখন একটু বুঝে-সুঝে চল, সাত মাসে মেয়ের অন্নপ্রাশনটা দিতে হবে তো আমায়!'

অন্নপ্রাশন এল, সেটা ষষ্ঠিমার্কণ্ডের পুজো নমো-নমো করে সেরে দিয়ে, খাতাঞ্চিমশায় ছমাসের হিসেবনিকেশ লিখতে বসলেন। কিন্তু ষষ্ঠিমার্কণ্ড দুজনে সোনার অন্নপ্রাশনের নৈবিদ্যি খেয়ে এমনি খুশি হয়েছিলেন যে, সোনা দুই বছরে পড়তেই খাতাঞ্চির ঘরে একেবারে মউরে চড়ে জোড়া কার্তিক এসে উপস্থিত! সোনার মা দুই ছেলের নাম দিলেন আঙুটি পাঙুটি, আর এক খরচে দুই ছেলের সেটেরা থেকে পৈতে এমন কি বিয়ে পর্যন্ত চলে যাবে জেনে, খাতাঞ্চিমশায় এবার বরং খুশিই হয়ে ভুলে সোনাতোনকে ডবল পয়সা দিয়ে ফেললেন!

জোড়া কার্তিকের মউর দুটো খাতাঞ্চির ঘরে সোয়ার নামিয়ে দিয়ে কৈলাসে উড়ে পালাল। কিন্তু সেইদিন থেকে সিঙ্গির মতো ঝাঁকড়া মাথা 'বোহিম' কুকুরটা মউর পালকের গন্ধে-গন্ধে এসে খাতাঞ্চির দরজায় যে ধন্না দিয়ে বসল, আর যাবার নামটি করলে না। খাতাঞ্চি সেটাকে তাড়াতে হাতের কলমটা ছুঁড়ে যতবার মারলেন ততবারই সে মুখে করে কলমটা তুলে এনে রায়মশায়কে দিয়ে গেল। বোহিম যে কাজের কুকুর সেটা রায়মশায় বুঝলেন। তিনি কুকুরটাকে চিঠি বইতে বাজার থেকে মাছের খালুই মুখে করে আনতে আর সন্ধ্যেবেলা চক্কোত্তিমশায়ের বাড়িতে দাবা খেলতে যাবার সময় সঙ্গে লণ্ঠন নিয়ে যেতে শিখিয়ে, তাকে ভাত দেবার খরচটা পুষিয়ে নিতে লাগলেন। তাছাড়া সে ছেলেদের খেলা দেওয়া, রাত্রে দরজায় পাহারা দেওয়া, এমনি নানা কাজ দিতে লাগল, পাতের খেয়ে সেই কুকুর। ছেলে বাড়ল কিন্তু চাকর-চাকরানী আর একটিও বাড়াবার দরকার হল না। বোহিম আসাতে,

বুড়ো সোনাতোনেরও খাটুনি কমে গেল ; ছেলেদের দাঁত উঠেছে, কর্তার পা ফুলেছে, গিন্নীর অম্বল হয়েছে, ওষুধ আনতে ছুটল বোহিম। ধোপার বাড়ির কাপড় আসতে দেরি হচ্ছে, চলল বোহিম ধোপাকে তাড়া লাগাতে। আঙুটি পাঙুটি সেলেট বই হারিয়েছে, চলল পাঠশালায় খুঁজতে। সোনার পোষা টিয়ে গাছে উঠে পালিয়েছে, চলল বোহিম খাঁচা মুখে টিয়ের সন্ধানে।

সোনাতোন বলে, 'জানো বৌঠাকরুন, বোহিম আর জন্মে আমার ইস্ত্রী ছেল, তাই এ জন্মে সে আমার হয়ে খাটছে।' বৌমা যদি বলেন, 'গাধার স্ত্রী কি কুকুর হয় রে সোনাতোন ?' সোনাতোন খুব গম্ভীর হয়ে বলে, 'তাতে আর আশ্চয্যি কি বৌঠাকরুন, না হলে কুকুর হয়ে অত কাজ সে জানলে কোথা থেকে ? আর দেখেচি বৌমা —আমার তিনি যেমন করে কাঁটা-মুড়ো শুদ্ধু কৈমাছ গিলতেন, ও ঠিক তেমনি করে মাছ খায়।' সোনা শুধোয়, 'কুকুরটা তবে তোমার ঘরে ভাত না খেয়ে আমার পেসাদ খেতে আসে কেন ?' সোনাতোন সেটাও ভেবে ঠিক করেছে, সে বললে, 'দিদিমণি, তোমরা হলে গুরু লোক, তোমাদের সামনে বৌ কি আমার ঘরে গিয়ে ভাত খেতে পারে ? তার যে লজ্জা পায় !'

আঙুটি-পাঙুটি অমনি বলে ওঠে, 'মিছে কথা, আমরা দেখেছি বোহিম সোনাতোনের খাবার সময় সামনে গিয়ে রোজ বসে, কিন্তু ও থালা চেঁচে-পুঁচে সব খেয়ে ফেলে। কিছু থাকলে তো পেসাদ পাবে ?'

সোনাতোন হেসে বলে, 'দাদাবাবু, তোমাদেরও বিয়ে হোক, দেখবে বৌদিদিরা ঠিক অমনি করে তোমাদের খাবার সময় সামনে বসে বলবে —আর একটু খাও না মাছের ঝোল, পাতে ভাত যে পড়ে রইল —আর তোমরা থালা চেঁচে-পুঁচে আমারি মতো সব খেয়ে নেবে।' এইভাবে সোনাতোন বোহিমে মিলে ছেলে-মেয়েদের খুব আমোদে রেখেছে। ওদিকে খাতাঞ্চিমশায় ভিজে গামছা মাথার চাপিয়ে সংসারের হিসেব-নিকেশ করে চলেছেন —খেরো-মোড়া দড়িবাঁধা,

জাবদা খোতেন আর পাকা, খাতা তিনখানা নিয়ে। বাইরে বোশেখ-জষ্টি মাসে পাকা আমকাঁঠালের বাগানে বৌকথা-কও পাখি ডাক দিয়ে গেল, সোনার ছোট্ট মনটির মধ্যে অমনি সোনাতোনে আর বোহিমে নতুন করে বিয়ে দেবার মতলব চট করে জাগল। যেমন মতলব অমনি সোনা রায়মশায়ের কাছে হাজির হয়ে বললে, 'বাবা, আমি বিয়ে দেব!' ভিজে গামছা চাপিয়ে খাতাঞ্চিমশায়ের মাথা তখন অনেকটা ঠাণ্ডা ছিল, তাই তিনি ধমকে না উঠে সোনাকে বললেন, 'কার বিয়ে রে সোনা?'

আঙুটি পাঙুটি এতক্ষণ দরজার আড়ালে ছিল, সাহস পেয়ে বলে উঠল, 'বাবা, আমরা সোনাতোনের বিয়ে দেব।'

খাতাঞ্চি ভেবেছিলেন পুতুলের বিয়ে, কিন্তু সোনাতোনের নাম হতে তিনি একটু ভয় পেয়ে বললেন, 'তা হলে তো অল্প খরচে হবে না?'

সোনা অমনি বলে উঠলে, 'খুব ধুমধাম করতে হবে বাবা, বাড়ি-বাড়ি আম কাঁঠাল মাছ দই সন্দেশ পাঠাব আমরা।'

খাতাঞ্চি এবার ভিজা গামছা মাথা থেকে নামিয়ে বললেন, 'আচ্ছা তোর মাকে ডেকে দে।'

ছেলে-মেয়েরা মাকে ডাকতে ছুটল, খাতাঞ্চি হাঁক দিলেন, 'সোনাতোন, একবার শোনো তো!'

সোনাতোন উঠোনে একগাছা খড় নিয়ে গরুর জাব দিচ্ছিল, তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললে, 'কেন কর্তা?'

খাতাঞ্চি চোখ পাকিয়ে বললেন,—'শুনছি, তুই নাকি বিয়ে করবি?' সোনাতোন একটু ভেবে বললে, 'ইচ্ছে তো আছে কর্তা, কিন্তু খরচ পাব কোথা?'

খাতাঞ্চি দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, 'তাই বুঝি সোনাকে ধরে বসেছ বিয়েটি দিয়ে দিতে?' সোনাতোন কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় মাকে নিয়ে সোনা উপস্থিত! খাতাঞ্চি সোনার মাকে বলে উঠলেন, 'সোনাকে এ বুদ্ধি তুমি দিয়েছ? সংসারের খরচই চলছে না এর

উপর আবার সোনাতোনকে বিয়ে দেবে তুমি ?' সোনার মা নাকি সুরে বললেন, 'তা গরীবের যদি একটি বিয়ে হয়ে যায় তো মন্দ কী ?'

সোনাতোন আর থাকতে পারলে না, তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'দেখ বৌঠাকরুন, ওই আমাদের নোটো তাঁতির পাঁচ বছরের মেয়েটি দেখতে শুনতে কালো-কোলো মোটা-সোটা, বেশ আমার সঙ্গে মানায়, কিছু পয়সা পেলেই তার বাপ দিয়ে ফেলে বিয়েটা।'

সোনা অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সে হবে না সোনাতোন, বোহিমকে তোমার বৌ করতে হবে, না হলে আমি বিয়ে দেব না।' খাতাঞ্চি সোনাকে কোলে তুলে বললেন, 'এই আমার মেয়ের মতো কথা বলেছ ; এ বিয়েতে আমি খুব রাজি আছি।' সোনা বাপের গলা ধরে বললে, 'বাবা, বোহিম বলেছে সোনার চাবি শিকল তাকে যৌতুক দিতে হবে, তবে সে বিয়ে করবে।' খাতাঞ্চি ভয় পেয়ে বললেন, 'তা সোনাতোন সেটা গড়িয়ে দেবে ; এখন যাও, আমি চট করে একটা বিয়ের ফর্দ লিখে ফেলি।'

সোনা দৌড়ে বিয়ের খবর বোহিমকে জানাতে ছুটল আর খাতাঞ্চি কপালে চশমা তুলে সোনার মাকে বললেন, 'এসব বুদ্ধি যাতে ওর মাথায় না আসে তার বিশেষ চেষ্টা করোগে। সোনাতোন! বুড়ো বয়সে তোমার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই – ছেলে-মেয়েদের মাথায় যত কু-মতলব দিচ্ছ, এবার পুজো-বকশিশ চেয়ো, কেমন পাও দেখব। যাও, এখন বিয়ে যাতে নিখরচায় হয়ে যায় তারি চেষ্টা করোগে।'

সোনা যখন বোহিমের কপালে সিঁদুর দিয়ে সোনাতোনকে বিয়ের জন্যে ডাকতে এল, তখন, আঙুটি পাঙুটি সোনাতোনের মাথায় কাগজের টোপর দিয়ে বর সাজাচ্ছে। তারা বললে, 'রোসো, এখনো সাজানো হয়নি আমাদের।'

সোনাতোন বললে, 'আমার সোনার চাবি-শিকলি এখনো সেকরা তো দিলে না, দিদিমণি ?'

সোনা একটু ভাবিত হয়ে বললে, 'তবে কী হবে সোনাতোন ? এদিকে লগ্ন যে বয়ে গেল !'

সোনাতোন একটু চোখ বুজে বললে, 'এখন এই লোহার শিকলিটাই মেজে-ঘষে সোনা বলে চালিয়ে দেওয়া যাক—কী বল দিদিমণি ?'

সোনা ঘাড় নেড়ে বললে, 'কিন্তু বিয়ের পরে বৌ যদি ধরে ফেলে ওটা নোয়া ?'

সোনাতোন বুক ফুলিয়ে বললে, 'তখন বলা যাবে নোয়াই তো হল মেয়েদের আসল গয়না। তাতে বৌ রাগ করে তো আমার ওপর করবে, তোমাকে তো কিছু বলতে পারবে না ; আর ধর সেকর যদি সোনা নিয়ে পালিয়ে থাকে তাহলে কি আমার বিয়ে হবে না, দিদিমণি ?'

সোনাতোনকে নিয়ে সোনা আমপাতায় সাজানো সভায় এনে বসিয়ে কনে আনতে ছুটল। কনে বোহিম তখন লুকিয়ে একটা মাছের মুড়ো গিলছিল, সে কিছুতেই আসতে রাজি হয় না। সোনা এসে দেখলে বর অনেকক্ষণ বসে-বসে রাগ করে উঠে গেছে।

আঙুটি পাঙুটি বললে, 'সোনাতোন বাবার তক্তার নিচে সেই যে বেড়ালটা বসে থাকে তাকেই বিয়ে করতে গেছে।'

সোনা কাঁদতে-কাঁদতে মায়ের কাছে নালিশ করতে গেল। গিয়ে দেখলে সোনাতোন সেখানে বসে, আর একটি ছোট্ট বেড়ালছানা দৌড়ে বেড়াচ্ছে। সোনাকে দেখেই সোনাতোন ছানাটি তার কোলে দিয়ে বললে, 'দিদিমণি, কেমন ছোট্ট মোটা-সোটা কালো-কোলো বৌটি দেখ, যেন স্বয়ং মা ষষ্ঠির বাহন ঘরে খেলছেন।'

কুকুরটা বিয়ে না করায় একটা বেড়াল বাড়ল, এ জন্যে কুকুরের উপরে খাতাঞ্চি বড়ো যে খুশি হলেন তা নয়। বেড়ালের উপর তো তিনি সদয় মোটেই না। আর সোনাতোনের বেড়ালবৌ বাসিবিয়ের দিন শ্বশুরবাড়ি পা দিয়েই যখন সোনাতোনের পাত থেকে ভাজা মাছটা তক্তার নিচে লুকিয়ে খেয়ে ফেললে, তখন সোনাতোনও যে খুশি হল তা নয়। কিন্তু সোনা এমন খুশি হল যে বেড়ালবৌয়ের গলায় নিজের মাথার লাল ফিতে দিয়ে এতটুকু একটু চকচকে ঘুঙর

বেঁধে দিলে। এ দেখে বোহিম মনে-মনে বেড়ালের উপর চটে রইল, তাকে আড়ালে পেলেই খ্যাঁক করে মুখ ভেঙচাতে ছাড়ত না। সোনা দুই সতিনের ঝগড়া দেখে হেসেই অস্থির।

কিন্তু সোনাতোন বললে, 'দিদিমণি, বেড়ালবৌ আর কুকুরবৌয়ে যেদিন সত্যি কোঁদল বাধবে সেদিন বাড়িতে কারু টেঁকা ভার হবে, খাতাঞ্চিমশায় ভারি রাগবেন। আমি বলি এই বেলা বাড়াবাড়ি হবার আগেই হতভাগি মুড়োখাগি ও বেড়াল-চোখি নরুণ-দাঁতি আমার ছোটো বৌটাকে ওর বাপেরবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া যাক।'

কিন্তু সোনার মা সোনাকে ঘুম পাড়াবার সময় প্রায়ই বলতেন:

'সোনা যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে
বাড়িতে আছে পুসি বেড়াল কোমর বেঁধেছে।'

পাছে একলা শ্বশুরবাড়ি যেতে হয় সোনার সেই ভয়টা খুব ছিল; কাজেই সোনাতোনের বেড়ালবৌকে বাপের বাড়ি পাঠাতে সোনা একেবারেই রাজি হল না। নিজের বাপেরবাড়ি যেতে হল না, তাই না হয় থাক ভালো-মানুষটি হয়ে শ্বশুরবাড়ি, তা নয় যাবি তো যা, বেড়ালবৌ একদিন সোনার বাপের ঘরে গিয়ে ঘন দুধের বাটিতে চুমুক দিয়েছে। সন্ধেবেলায় খাতাঞ্চিমশায় হাত মুখ ধুয়ে আফিমের ডেলাটি গালে ফেলে ঘরে ঢুকে দেখেন, দুধের বাটি খালি করে হিসেবের খাতায় মাথা রেখে দিব্যি ঘুম দিচ্ছে বেড়াল! রায়মশায় আস্তে-আস্তে বোহিমকে সেই ঘরের মধ্যে পুরে দিয়ে বাইরে থেকে দরজার শিকল টেনে দিলেন। তারপর দশমিনিট ধরে যে ঝগড়া চেঁচামেচি চুলোচুলি মারামারি চলল তা আর বলবার নয়! সোনার মা সেলাই ফেলে ছুটে এলেন, সোনা তার মোমের পুতুল-ছেলের পা ধরে সেটাকে মাটিতে হেঁচড়াতে-হেঁচড়াতে নিয়ে উপস্থিত, আঙুটি পাঙুটি তো ভয়ে কেঁদেই ফেললে। কেবল সোনাতোন তখনো দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে ইটের বালিসে মাথা রেখে।

খাতাঞ্চি ডাকলেন, 'সোনাতোন।' অমনি সে ধড়মড়িয়ে উঠে

চোখ রগড়াতে লাগল। খাতাঞ্চি বললেন, 'সোনাতোন, বেড়াল পুষবে তুমি আর দুধ খাওয়াব আমি ?'

সোনাতোন মাথা চুলকে বললে, 'তা তো হতে পারে না কর্তা।' খাতাঞ্চি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বেড়াল তবে যে আমার ঘরে গেল!'

সোনাতোন কী জবাব দেবে ভাবছে এমন সময় তাড়াতাড়ি সোনা বলে উঠল, 'বাবা, আমি জানি বেড়ালবৌ কেন তোমার ঘরে গেছে। সোনাতোনের এ বছরের মাইনে আদায় করতে।'

খাতাঞ্চি সে কথায় কান দিচ্ছেন না দেখে সোনার মা বললেন, 'ওগো শুনছ, তোমার মেয়ে কী বলছে।'

খাতাঞ্চি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সব কথাতেই টিক-টিক কর কেন বল তো ? ওরে সোনাতোন, যা ঘরের দরজাটা খুলে দে। আমি চক্কোত্তিদের ওখানে চললুম।'

ঘর খুলে দেখা গেল বেড়ালবৌ কোথায় পালিয়েছে, বোহিম তার গলার ঘুঙুরটা দাঁতে চিবোচ্ছে আর দোয়াতের সমস্ত কালি উল্টে রায়মশায়ের হিসেবের খাতার সাদা পাতাগুলো সব কালো হয়ে গেছে।

সেইদিন কর্তা আসবার আগেই সোনাতোন বৌঠাকরুনের কাছে ছুটি নিয়ে দু-চার দিনের জন্য দেশে পালাল। সোনাতোন অনেক-দিন দেশে যায়নি, কাজেই তার ফিরতে দেরি হতে লাগল।

এদিকে রায়মশায় বললেন, 'ওই কুকুরটাই আমার দোয়াত ফেলেছে ; ওকে চোতমাস গেলেই জবাব দিতে হবে।' সোনা আর সোনার মা আর আঙুটি পাঙুটি এই শুনে ভারি মুষড়ে গেল।

বেড়ালটা গিয়ে অবধি রাত্তিরে দরজায় কে খুট-খুট করছে, ধামায় মুড়ি থাকছে না, মোমবাতি না জ্বালালেও তার আধখানা এক রাত্তিরে উড়ে যাচ্ছে, এমনি সব উৎপাত হচ্ছে। সোনার মা একদিন এই কথা বলাতে, খাতাঞ্চি বললেন, 'তোমার ওই এক কথা। গেছে উৎপাত ঢুকেছে।'

কিন্তু সোনার মা দেখলেন বেড়াল যেদিন থেকে গেল সেইদিন থেকে

রাতের বেলায় ছেলেদের শোবার ঘরের জানলায় কে যেন খুট-খুট শব্দ করে, আর খানিক বাদে কারা যেন ঘরের মধ্যে ফুসফাস কথা কইছে মনে হয়। তিনি নিচের ঘর থেকে বোহিমকে ডেকে নিয়ে এসে দেখলেন সোনার পাশে আঙুটি পাঙুটি অকাতরে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু ঘুমের ঘোরে সোনা একবার ডাকলে, স্পষ্ট শোনা গেল, 'পুতু!' আঙুটি পাঙুটি একসঙ্গে বলে উঠল 'পুতু!' সোনার মা একটু ভয় পেয়ে 'পুতু'টা কে সন্ধান করতে ছেলে-মেয়েদের মনের ভিতরটা এক-একদিন হাতড়ে দেখতে লাগলেন।

ছেলে-মেয়েরা যদি জেগে থাকতে পারত তবে তারা দেখতে পেত, সব কচি ছেলেকে তাদের মা চাপড়ে-চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে আস্তে-আস্তে বুকে হাত বুলিয়ে সবার মনের মধ্যেকার ছোটোখাটো সিন্দুক-গুলি খুলে তার পরদিনের জন্যে বেশ করে গুছিয়ে রাখছেন। ঠিক যেমন করে পেঁটরার কাপড় গোছানো হয় তেমনি! সমস্ত দিন খেলায়-ধুলোয় ছেলেরা যে কোথায় কী ছড়িয়ে ফেলে তা তাদের মনেও থাকে না, মা সেগুলি যত্ন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে দেন মনের সিন্দুকে, যাতে সকালে উঠে ছেলে-মেয়েদের আর কিছু খুঁজতে না হয়। মনের সিন্দুকে যদি কোথাও পোকার মতো দুষ্টুবুদ্ধি দেখেন তো মা সেটি আস্তে-আস্তে টেনে ফেলেন, ভালো বুদ্ধিগুলিকে যত্ন করে কাগজে মুড়ে মলমলের কাপড়ের মধ্যে ঝেড়ে-ঝুড়ে পোঁটলা বেঁধে তুলে রাখেন। রোজ-রোজ কত টুকিটাকি মনের সিন্দুকে ছেলেরা যে জমা করে, তা দেখে মা এক-এক সময় অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন। রাতের বেলায় যদি কচি ছেলেরা জেগে থাকতে পারত তবে এ সবই দেখতে পেত, কিন্তু তারা কচি ছেলে কিনা তাই যেমন মা সুর করে তাদের চাপড়ান, 'খুকু ঘুমোল পাড়া জুড়োল' বলেন, অমনি তারা ঘুমিয়ে পড়ে। কোনো-কোনো ছেলে, 'বর্গি এল দেশে' এটুকুও শুনতে পায়, তারপর বুলবুলিতে ধান খেয়ে গেল তাও দেখে, কিন্তু তারপর যে কী কাণ্ড ঘটে খুব কম ছেলেই সেটা দেখেছে। সব ছেলের মনের সিন্দুকে একটি করে লুকোনো দেরাজ

আছে। চাবি ছেলেরা হারিয়ে ফেললে মুশকিল হবে, তাই এই লুকোনো দেরাজে চাবি নেই, একটা করে কীল আছে, সেইটে সরিয়ে দিলেই দেরাজটি আপনি খুলে যায়। সেইখেনে সবার সবুজ পাতায় বাঁধানো এতটুকু খেলার খাতাখানি! সারাদিন যে যা খেলেছে, যা দেখেছে, যা পেয়েছে, যা হারিয়েছে, আর যা পেতে চায়, খুঁজে বেড়ায়, এমন কি রাতের স্বপ্নের ছবিও, এই ছোট্টো খাতায় রোজ-রোজ নতুন-নতুন করে লেখা হয়ে যাচ্ছে। এ খাতা এমনি চমৎকার এমনি চকচকে যে ছেলেরা হাতে পেলে তার মলাট চিবিয়ে সন্দেশ বলে সেটাকে খেয়েই ফেলত। তাই মা মনের লুকোনো দেরাজ রোজ রাতে উল্টে-পাল্টে দেখে চুপিচুপি বন্ধ করে রাখেন। যতদিন না নিজের মনের সিন্দুক তারা নিজেরা গোছাতে পারে ততদিন কোনো ছেলে-মেয়ে এই লুকোনো খাতার সন্ধান পায় না।

অনেক ছেলে দেখেছি বুড়ো হয়ে মরে গেল তবু এই সবুজ খাতা লুকোনো দেরাজের সন্ধানই পেল না ; আবার অনেক ছেলে দেখেছি আগেই ওই খাতার সন্ধান পেয়ে গেছে। আমাকে ছবি আঁকতে দেখে আমার মা আমাকে একদিন আমার সবুজ খাতাখানি দিয়েছিলেন। আমি কি জানি তখন সে খাতার গুণ! আর একটু হলেই একটা বিলিতী খবরের কাগজের ছবির সঙ্গে সেটা বদল করেছিলুম আর কি! ভাগ্যি মায়ের চোখে পড়েছিল, তিনি আমায় কোলে বসিয়ে যখন সেই খাতা থেকে একটির পর একটি ছবি দেখাতে লাগলেন তখন আমি অবাক হয়ে গেলুম। কী রঙ দিয়েই সে সব ছবি লেখা! বাজারে সে রঙ পাবার যো নেই।

প্রথম পাতাতেই লেখা, কমলাপুলির দেশে সকাল হচ্ছে, আকাশে কমলানেবুর রঙ, গাছে-গাছে সোনালি সব ফল ফুল পাখি, তার মাঝে কনকরাজার মেয়ে কপলে গাই দুইতে বসেছে, নদীতে সব সোনালি রঙের হাঁস মাছ আর নৌকো ভাসতে-ভাসতে চলেছে, মাঠে মাঠে সোনালি ধানের শিষ বাতাসে ঝিকমিক করে দুলছে, তার মাঝে ছোট্ট একটি রাখাল বাঁশি বাজাচ্ছে, রাজকন্যের হরিণ

সোনার ছিকলি ছিঁড়ে সেই দিকে ছুটে চলেছে বাঁশির গানে ভুলে। আর শেষ পাতায় ফটিক জোছনার দেশে রাজকন্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন, নীল আকাশে মস্ত চাঁদ হিঞ্চেবনের আড়াল থেকে রুপোর থালার মতো দেখা দিয়েছে, আর সেই রাখাল পরানের কাটিটি আস্তে-আস্তে রাজকন্যার বুকে ছুঁইয়ে দিচ্ছে। এই দুই ছবির মাঝে রয়েছে, কোন্নগড় আঁস্তকুঁড়ে বেড়াল বসে আছে, খেলাঘরে ছেলেরা ইকড়ি-মিকড়ি খেলছে, হিঙুল গাছে মাদারের ফুল, আঁকড় ফুল বেঁচ ফুল ফুটে রয়েছে, ট্যাঁপোর ভিতর সব ঝিঙে ঝুলছে, নটেশাগের গুড়িতে নেজ-ঝোলা পাখি উড়ে বসে চাটিম কলা খাচ্ছে, চালতাতলায় ঝিঁঝিঁ ডাকছে আর প্যাখনা বিবি নাচছেন, সোনার আঁচিলেপাঁচিলে হড়মবিবি খড়ম পায়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, আর হলদেগুড়ির মাঠে গামুর-গুমুর ঢোল বাজছে; চেঙা ক্ষেতে নৈছাগল ঝেঙা ফুল ছিঁড়ে খাচ্ছে, বন-কাপাশি গাছে নোটন পায়রা ডিমে তা দিচ্ছে, রামছাগল আতাপাতা খেতে লেগেছে, মুড়ো নটেগাছের তলায় গালফোলা গোবিন্দর মা বসে-বসে তাই দেখছে, আর চুবড়ি মাথায় দিয়ে ভোম্বল দাস হাটে চলেছে। তারপর বাপ-মায়ের দেশের ছবি —সেখানে পুকুরে পানকৌড়ি ডুব দিয়ে মাছ ধরছে, বাঁশতলায় বুড়ি শুকনো পাতা ঝাঁট দিচ্ছে, জোড়পুতুলের বিয়ে হচ্ছে, কাঁচনীপাড়ার নাচনী নাচ্ছে, জটাধারী ভিক্ষে চাইছে, 'হাতে-পো কাঁখে পো' ছেলে ধরে বেড়াচ্ছে, জোয়ান গুরু জোড়া-বেত হাতে বসে, গোয়ালের শোভা নেহাল বাছুর হামা দিচ্ছে, শিবসদাগর অগ্রদ্বীপে বাণিজ্য করতে চলেছেন, ভাঁত-কাঁদুনে ফেউয়ার মা ছেলে ঘুম পাড়াচ্ছে, আর মাসি-পিসি বনগাঁয়ে বসে খয়ের মোয়া পাকাচ্ছেন। ময়রাবুড়ো সন্দেশ খাচ্ছে, কামারশালে হাতুড়ি পড়ছে ঠকাঠক, খাটের খুড়ো নলের হুঁকো নিয়ে তালপুকুরের ঘাটে চুপটি করে বসে আছেন, কানকাটার মা তাঁর কান চুলকে দিচ্ছে, রামের বাঁশিতে তুলো জড়িয়ে। রামতুলসীতলায় দুখপাসরা নয়নতারার পিদিম জ্বলছে, আর ভুঁড়োশেয়ালী অন্ধকার থেকে মুখ বাড়িয়ে সেদিকে চেয়ে আছে; মন্দিরে

দেবশঙ্খ বাজছে। তারপর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার ছবি সব —বেড়াল কোমর বেঁধে পালকির সঙ্গে চলেছে। তারপর বর্ষাকালের ছবি সব —অভদ্রা বর্ষাকালে হরিণ বাঘের ছাল চাটছে, আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, সূর্য্যি পাটে বসলেন ; খুকু জল আনতে পদ্মদিঘির ঘাটে চলল, সেখানে পদ্মদিঘির কালো জলে হরেক-রকম ফুল ফুটেছে। খুকুর গোছাভরা চুল বাতাসে হোটোর নিচে দুলছে, মা দূর থেকে ডাকছেন :

'বৃষ্টি এল ভিজবে সোনা, চুল শুকোনো ভার,
জল আনতে খুকুমণি যেও নাকো আর।'

তারপর একটি ছবি সে যে কী চমৎকার কী বলব ! ছোটো নাতনী তার বুড়ো দাদামশায়ের গলা ধরে বাপের বাড়ি যেতে বলছে —

'ও পারেতে কালো রঙ
বৃষ্টি পড়ে ঝম-ঝম
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক-টুক করে,
ওগো দাদাভাই আমার মন কেমন করে !'

দাদাভাই তার পিঠে হাত বুলিয়ে কইছেন—

'এ মাসটা থাক দিদি কাঁদিয়ে কঁকিয়ে
ও মাসেতে লয়ে যাব পাল্‌কি সাজিয়ে।'

আর বলছে তারপর তুজনে তুজনের গলা ধরে কাঁদছে —

'হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি
আয় রে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।'

এমন সব ছবি যা দেখে হাসি চাপা যায় না, আবার এমন সব ছবি যা দেখতে-দেখতে চোখে জল আসে।

এমনি আমার খাতা, তেমনি সব ছেলের খাতা আছে, তাদের আপনার-আপনার মনের লুকোনো দেরাজে। আমার খাতায় এক-রকম ছবি পড়েছে, তাদের খাতায় অন্যরকম ছবি পড়েছে। কোনো ছেলের খাতায় শিব সওদাগরের ছবিই বেশি, কেবল বাণিজ্য আর

দেশ-বিদেশে ঘোরা। কোনো মেয়ের দেরাজ কেবলি পুষি-বেড়ালে ভরা ; কারু কেবল যাতুমণির ছবিতেই পোরা ; কারু বা একানোড়ে, কান-কাটা, উদবিড়াল, চোরের মা পাঁদারু-মাচারু, আঁকড়াবাড়ি, এমনি সব বিকট ভয় পাওয়ানো ছবিতেই অর্ধেক খাতা ভরে গেছে। কারু তাকতুড়াতুড়, চড়ুই-মড়ুই, তালপাতার সেপাই, এমনি সব মজার ছবিতে বারো আনা পোরানো। কোনো ছেলের আরব্য উপন্যাসের ছবি দিয়ে খাতা ভর্তি ; কারু বা ননিগোপাল রাখাল ছাড়া কিছু নেই ; কারু ঘটি-বাটি খেলাঘর আর খেলনা, কারু হিজিবিজি চাঁচি-মুচি ; কারু কেবলি ফুটবল আর মার্বেল, ঘুড়ি আর বেলুনে ভরা ; কারু কেবল গহনা, কাপড়, চুলবাঁধা পাল্‌কিচড়া, কারু লাফালাফি মারামারি ছাড়া কিছু নেই। কারু বা কেবল উনুন হাতা বেড়ি, মাছ তরকারি, কারু ছিপ মাছ পাখি পাখিধরা ফাঁদ, খাঁচা, খরগোশ, পায়রা, প্রজাপতি ছাড়া খাতায় আর কিছু নেই ; কারু খাতায় বালিস তোষক পাখা আর ঘুমের ছবি। কারু —যেমন আমাদের টোটোর —দুধ রসগোল্লা সন্দেশ জিলিপি বুঁদিয়াতে ভরা ছিল আগে, এখন আবার সেগুলোর ওপরে পড়েছে নতুন সব ছবি —বেলুন, ঢোলক, হিন্দুস্থানী গান, অছিলাল দরোয়ান, টমা কুকুর, মোটর গাড়ির ভেঁপু, তুলো ড্রাইভার, বড়দাদার পাকানো চোখ, ডাক্তারের হাতের চোঙা। কিন্তু, কি ছেলে, কি মেয়ে, সবারই খাতার মলাটের ভিতরে বাবা আর মায়ের ছবি দুটি। আর মলাটের আর এক পিঠে যত ভাই বোন তাদের ছবি। সে ছবিগুলি কখনো বদলায় না, মোছেও না, বড়ো জোর মাথার কালো চুলের রঙ ফিকে হয়ে শাদা হল, এইমাত্র। এই সবুজ বইগুলি দেখতে ছোটো, কিন্তু সব ছবি পাশাপাশি ছড়িয়ে সাজালে, ইওরোপের চেয়েও বড়ো দেখাবে মনের লুকানো দেশের এই ম্যাপটা।

সোনা আর আঙুটি পাঙুটির লুকোনো দেশের ম্যাপে এতদিন কেবল সোনাতোন, বোহিম, কলম-দোয়াত, খেরোর খাতা আর ঘরকন্নারই ছবি সোনার মা দেখতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু আজকাল

দেখছেন যেন খানিক-পাখি খানিক-মানুষ একজন কার চেহারা। নিচে লেখা রয়েছে 'পুতু'। আঙুটি পাঙুটির খাতায় পুতুর ছবিগুলো একটু ঝাপসা কিন্তু সোনার খাতায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পুতুর চেহারাটি কতকটা কুঁকড়ো কতকটা মানুষ। এ ছাড়া, বোম্বেটের জাহাজ, বর্গির হাঙ্গামারও ছবি দেখা যেতে লাগল। সোনাতোন বর্গি বোম্বেটের গল্প ছেলেদের কাছে করত, কিন্তু 'পুতু' কে? একে তো কেউ চেনে না, এর কথাও তো কোনোদিন হয়নি। সোনার মা একদিন কথায়-কথায় সোনাকে শুধোলেন, 'পুতু কাদের ছেলে রে, সোনা?'

সোনা বললে, 'তা কী জানি —সে 'পুতু'।'

'পুতু' যে কে, তা খুব ছেলেবেলার কথা মনে করেও সোনার মা ধরতে পারলেন না। ছেলেবেলায় ভয় পেলে ঠানদিদি একটা ছড়া বলতেন, তাতে একজন 'পুতের' কথা ছিল। তার কেবল গোড়াটা মনে আছে, 'ভূত আমার পুত, শাঁখিনী আমার ঝি।' এই পুতু যদি সেই পুতু হয়!

সোনা বললে, 'নিশ্চয় মা, ও কর্তামায়ের সেই 'পুতুই' হবে।'

সোনার মা বললেন, 'দূর, সে কতদিনের কথা, সে কি আর ছোটো পুতটি আছে? সে এখন মস্ত হয়ে পুত্রবান হয়ে গেছে।'

সোনা অমনি বলে উঠল, 'না মা, তুমি জানো না। পুতু তো কখনো বড়ো হবে না, চিরকাল সে ঠিক এই আমি যতটুকু ততটুকু থাকবে।' সোনার মা শুধোলেন, 'তুই কেমন করে জানলি, পুতু আর একটুও বাড়বে না?'

সোনা বললে, 'তা আমি জানিনে, কিন্তু দেখো, কিছুতেই সে বড়ো হবে না। মোমের পুতুলটির মতো ছোটোই থাকবে।'

সোনার মায়ের সেইদিন থেকে ধুকপুকনি জাগল। পুতু যদি ভূত হয়, তবে তো এইবেলা রোজা ডাকা ভালো। তিনি খাতাঞ্চি-মশাইকে পুতুর কথা একদিন বললেন।

খাতাঞ্চিমশাই হেসে উড়িয়ে দিলেন আর বললেন, 'এ নিশ্চয়

ওই বোহিন কুকুরটার কাজ। না হলে ছেলেদের কাছে এমন আজগুবি গল্প আর কে করতে পারে ? কিছু ভয় নেই ; সব ঠিক আছে। এর জন্যে আবার রোজা ডেকে খরচ করতে হবে না, যাও।'

খাতাঞ্চিমশাই বললেন বটে, সব ঠিক আছে যাও, কিন্তু পুতু সে কথা মানবে কেন ? সে ঠিক আবার একদিন এসে উপস্থিত ! সকাল বেলা সোনার মা ঘর ঝাঁট দেবার সময় তক্তার নিচে দেখলেন, একটি শিরতোলা কতকালের শুকনো হিজুলি পাতা। ছেলেরা যখন শুতে গেল, তার আগেই সোনার মা ঘর ঝেঁটিয়েছেন। সেখানে একটি কুটো পর্যন্ত ছিল না, আর রাতের মধ্যে হিজুলি পাতা কোন দেশ থেকে উড়ে এল ? হিজুলি গাছ তো গ্রামে একটিও ছিল না, রাজার বাড়িতেও নয়, কোম্পানির বাগানেও নয়। সোনার মা হিজুলি পাতাটি হাতে নিয়ে বললেন, 'এটা কোথা থেকে এল রে, সোনা ?' সোনা অমনি বলে উঠল, 'পুতু ফেলে গেছে।'

'বলিস কী সোনা ?'

'হ্যাঁ মা, সে ওই ফোঁপরা পাতার জামা পরেই তো আসে। আর আমায় বলে, 'দেখেছিস কেমন লেসের কাপড়। কালও সে এসেছিল আর তক্তার পায়ার কাছটিতে বাঁশি বাজাচ্ছিল, তুমি শোনোনি ?'

সোনার মা অবাক হয়ে বললেন, 'কই আমি তো শুনিনি !'

সোনা বললে, 'তবে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আমি শুনেছি। আমি জানি ও পুতুর জামার পাতা খসে পড়েছে।'

সোনার মা বললেন, 'তা কখনো হয় ? সদর দরজা বন্ধ, সে আসবে কেমন করে ঘরের মধ্যে ?'

সোনা বললে, 'কেন ? পায়ের কাছের জানলা দিয়ে যে সে আসে, আমি দেখেছি।'

সোনার মা বললেন, 'একতলার উপরে জানলা, এখানে উঠবে কেমন করে সে ?'

'কিন্তু ঠিক জানলার ধারেই তো পাতাটি পরে ছিল মা। জানলা দিয়ে সে যদি না আসে তবে পাতাটি ওখানে পড়ল কেন ?'

এবার আর সোনার মা জবাব দিতে পারলেন না। পুতু যে এসেছিল পাতাটাই তার প্রমাণ। তিনি সোনাকে বললেন, 'সোনা, একথা তুই এতক্ষণ বলিসনি কেন?'

সোনা বললে, 'ভুলে গিয়েছিলুম। আমার যে বড্ড খিদে পেয়েছিল তাই তাড়াতাড়ি দুধ খেতে গেলুম।'

সোনার মা পাতাটি বেশ করে নেড়ে-চেড়ে দেখলেন। সত্যিই এমন পাতা কেউ কখনো দেখেনি। তিনি পিদিম ধরে বেশ করে দেখলেন মেঝেতে কারু পায়ের দাগ আছে কি না। জানলা দিয়ে সুতো ঝুলিয়ে দেখলেন, সেখান থেকে মাটি তিরিশ হাত নিচে, আর দেয়ালের গা শেওলা পড়ে একেবারে পিছল। টিকটিকি ছাড়া সে দেয়াল বেয়ে কেউ উপরে উঠতে পারে না। সোনার মা খাতাঞ্চিকে পাতা দেখালেন।

খাতাঞ্চি বললেন, 'রেখে দাও, কোত্থেকে কী জংলি পাতা উড়ে এসেছে, আর ছেলেরা সব কী স্বপ্নে দেখেছে, তাই নিয়ে এত ভাবনার কী দরকার?' কিন্তু ছেলে-মেয়েরা পুতুকে যে স্বপ্নেই দেখেছে — তা নয়। পুতু যে সত্যিই তাদের কাছে আনাগোনা করছে, খেলা-ঘরের খেলার সাথি হতে, তারও প্রমাণ সেইদিনই পাওয়া গেল।

বাইরে দুপুর রোদ ঝাঁঝাঁ করছে —এমন গরম যে কেউ বাইরে নেই। কালবোশেখি আগুন ঝরে, কালবোশেখি রোদে পোড়ে, গঙ্গা শুকু শুকু, আকাশে ছাই। কুকুরটা পর্যন্ত দাওয়ার উপর ছাওয়ায় পড়ে ঘুমোচ্ছে। গাছের পাতাটি নড়ছে না। ঘুমতা ঘুমায় ঘাটের পাতরা, ঘুমতা ঘুমায় গাছের বাকলা! সেই সময় অন্ধকার-করা ঘরটিতে ছেলে মেয়ে তিনটিকে ঘুম পাড়িয়ে সোনার মা মেঝের উপর মাদুর বিছিয়ে কাঁথা সেলাই করছেন। ঠাণ্ডা ঘরখানি, জানলার নিচেই আতাগাছের আগডালের দুটি চারটি সবুজ পাতায় রোদ লেগেছে। দূরে মাঠের মাঝে একটুখানি জল ঝিক-ঝিক করছে। কোনখানে একটা ঘুঘু সুর করে বলতে লাগল, 'পুতুর ঘুম ঘুম ঘুম —দুপুর ঘুম ঘুম ঘুম।' সোনার মা তাই

শুনতে-শুনতে কখন আস্তে-আস্তে হাতের সেলাই কোলে রেখে জানলার ধারটিতে ঘুমিয়ে পড়লেন, আর একটি ছোটো মেয়ের মতো অমনি আস্তে-আস্তে সোনার মা'র মনের মধ্যেকার সবুজ খাতায় একটি ছবি পড়ল।

আতা গাছের বাসায় ঘুঘু পুতুকে ঘুম পাড়িয়ে নদীতে চান করতে গেল। পুতু এতক্ষণ মটকা মেরে চোখ বুজে ছিল। অমনি আস্তে-আস্তে উঠে বাসা ছেড়ে আতাগাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে একটা বাঁশি বাজাতে লাগল। মানুষ হয়ে পুতু ঘুঘুর বাসায় ঘুমোচ্ছে। সে পাখির মতো আতার ডালে উঠে বসল। এ সব সোনার মায়ের কাছে কিছুই আশ্চর্য বোধ হল না, মনে হলো পুতু যেন কত দিনের চেনা। তিনি দেখলেন, সোনা আর আঙুটি পাঙুটি জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে ডাকলে, 'পুতু-উ-উ।' অমনি পুতু হিজুলি পাতার জামা বাতাসে মেলে দিয়ে ঘরের মধ্যে উড়ে এল, সঙ্গে তার জোনাক-পোকার মতো একটুখানি আলো। ঘরের মধ্যে এসে ঝুম-ঝুম করে ঘুঙুর বাজিয়ে খেলাঘরের কোণটিতে গিয়ে বসল।

ঘুঙুরের শব্দেই বোধহয় সোনার মা চমকে উঠলেন। ঘুম ভেঙেই পুতুকে দেখে তিনি চমকে উঠলেন, 'ওগো দেখ'সে কে ?'

পুতু তার দুধে দাঁত দুটি কিড়মিড় করে ছোট্টো একটি কিল দেখিয়ে জানালা দিয়ে যেমন উড়ে পালাবে অমনি তক্তার নিচ থেকে বোহিম 'ধরলুম' বলে পুতুর দিকে তাড়া করে গেল। পুতু জানালার ওপর উঠল দেখে, সোনার মা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পলো রে পলো রে !' পুতু তখন পালিয়েছে। সোনার মা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, ছোট্টো ছেলেটি একতলা থেকে পড়ে হাত পা ভাঙলে নাকি ? কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। তিনি তাড়াতাড়ি বাগানে গিয়ে খুঁজে দেখলেন সেখানে কেউ নেই। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন, কেবল দেখা গেল একটি ছোটো পাখি কতদূরে উড়ে যাচ্ছে। রাঙা ফিতেয় বাঁধা পুতুর সবুজ খাতাটি, পালাবার সময়, বোহিম কুকুরটা চেপে ধরেছিল। ফিতে ছিঁড়ে পুতুর বই বোহিমের কাছে রয়ে গেল,

সে সেটা মুখে করে এনে সোনার মাকে দিল। সোনার মা দেখেই বুঝলেন এটি পুতুর লুকোনো সিন্দুকের সবুজ খাতা, কিন্তু পুতু সেটা কেন যে পকেটে-পকেটে রাখে তা তিনি বুঝতে পারলেন না। রোদ বিষ্টি পেয়ে খাতার সবুজ মলাট জ্বলা-পাতার মতো সোনালি হয়ে এসেছে। সোনা, আঙুটি পাঙুটি অকাতরে ঘুমোচ্ছে দেখে, সোনার মা বোহিমকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে চুপি-চুপি উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলেন, সেই চমৎকার জীবনবৃত্তান্ত।

বইখানার প্রথম পরিচ্ছেদ —যেখানে পুতুর বাপ মা কে, কবে তার জন্ম, কোন্ পাড়ার কোন্ বাড়িতে, কোন্ দিন কত ঘণ্টা কত মিনিটে, কোন্ তিথিতে কোন্ বারে, কোন্ লগ্নে, কোন্ বংশে, কোন্ কুলে, কোন্ সনে, কোন্ মাসে, কোন্ তারিখে, এমনি সব বিশেষ দরকারি কথা লেখা, সেটা সমস্ত ছিঁড়ে কোথায় উড়ে গেছে তার ঠিক নেই। হয়তো বোহিম কুকুর বইটা নিয়ে খেলা করবার সময় সেটুকু চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে, নয়তো পুতু নিজেই কোনো সময় পাতাগুলো কেটে, নৌকো নয় তো আর কিছু বানিয়ে, খেলা করে নষ্ট করেছে। কার বই, কে লিখেছে, মূল্য কত, সূচীপত্র, উপহার কিছুই নেই। একেবারে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে আরম্ভ। ঠিক যেন দুধে দাঁত দুটি দেখিয়ে আধো-আধো কথায় কে বলছে, 'পুতুর বই—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।'

ছাতের উপর থেকে শহরের বাড়িঘর দেখে ভাবছ কী ?

দিনের বেলায় শহরের এই যে হাজার-হাজার ইটের বাড়ি তার কলের চিমনি দেখছ, রাত নয়টার তোপ যেমন পড়বে, সব অমনি বাগান আর বাজার, মাঠ আর পুকুর হয়ে যাবে। থাকবার মধ্যে থাকবে রাজার কেল্লা, রায়মশায়দের বৈঠকখানা আর এই জোড়া-সাঁকো আর এই তেতলা বাড়ি। বিশ্বাস হচ্ছে না ? ভাবছ আমি বাজে কথা বলছি ? আচ্ছা সকালবেলা পুবদিকের আকাশে লাল রঙের একটা ফানুস দেখতে পাও, সাদা ফানুস থাকে না তো ? রাত্তিরে দেখো দিকি, সেখানে সাদা একটা ফানুস ঝুলছে দেখবে, আবার সেটা কখনো দেখাবে রুপোর বাটি যেন কাত হয়ে পড়েছে, কখনো বা দেখবে যেন একখানি নৌকো ভাসছে। তবু বিশ্বাস হচ্ছে না ? আচ্ছা দিনের বেলায় আকাশে নীলরঙ, পাখি আর মেঘ, এ ছাড়া কিছু তো দেখ না, রাতের বেলায় আকাশে দেখ সব তারা ফুটেছে দেখবে। এ যদি হতে পারে, তবে আর রাত হলেই শহরটা বাগান হতে পারবে না কেন ? দুপুর রাতে ভূতের ভয়ে ছাতে উঠতে পার না, তাই বল, না হলে দেখতে পেতে, সব বাড়ি ঘর দুয়োর কোথায় মিলিয়ে গেছে, কেবল চারদিকে সব সারি-সারি আলোর নিশেন ঝুলছে, চৌকো, লম্বা, চওড়া, সরু, তর-বেতর। আর কেবল রাজার বাড়ির চুড়ো, রায়মশায়দের বৈঠকখানার বারাণ্ডা, আর আমাদের চিলের ছাতটা একটু-একটু দেখা যাচ্ছে, আর কিছু নেই। পুকুরে সব ব্যাঙ করর্ করর্ করছে, বনে-বনে ঝিঁঝি ঝিম-ঝিম করছে। খানিক রাত পর্যন্ত একটু একটু ঢোলের আওয়াজ কিংবা একটু-একটু মানুষের গলা শোনা যায়, তারপর সব চুপ।

রাত দুটোর পরেও যদি কোনোদিন জেগে থাকতে পার, তবে বুঝবে আমার কথা সত্যি কিনা। তখন যেমনি শেয়ালদার দিকে একপাল শেয়াল হুয়া-হুয়া বলে ডাক দিলে, সব অমনি বাগান আর বন হয়ে গেল, একটিও আর ইট থাকল না। পুতু তার বাঁশি বাজাতে শুরু করলে আর সব পরীরা জোনাক-পিদিম জ্বালিয়ে একে-একে বেরিয়ে, বিশ্বাস হল না বুঝি ? ভাবছ ইট কাঠ পাথর কখনো গাছ হতে পারে ? এই তো ? যেও দেখি যাদুঘরে, দেখবে গাছ পাথর হয়ে গেছে, পাথর হয়ে গেছে গাছ। আকাশের তারা তো দেখ, যেন আলোর ফুলকি ! একটা তারা সেদিন মাটিতে খসে পড়েছিল, যাদুঘরে কাঁচের বাক্সয় সেটা বন্ধ আছে, একেবারেই আগুনের ফুলের মতো নয়, শুধু একতাল চকচকে লোহা। দেখবে, যে শিকলিতে তারাটা আকাশে ঝাড়ের মতো ঝোলানো ছিল, এখনো সেটা তেমনিই আছে। যাদুঘরে রাত্তিরে যদি ঢুকতে দিত তবে হয়তো অনেক আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে পাওয়া যেত।

দিনের বেলা ঘরবাড়ি-চাপা পড়ে, তাই বলে বাগান যে থাকে না মনে কর না। আমাদের ওই গোল বাগানের ওধারে যে ফুটবল খেলার জমি দেখছ, ওর তলায় একটা মস্ত পুকুর আর বটগাছ আছে, ছেলেবেলায় আমরা সেই বটতলায় বসে পুকুরে মাছ ধরেছি। এখনো এক-একদিন আমি সে বটগাছ আর পুকুরটা পষ্ট দেখতে পাই। পুকুরটা নিশ্চয়ই আছে, না হলে ওই বকটা ওখানে ঘুরবে কেন ? বক কখনো গরুর মতো ঘাস খেয়ে বাঁচে না, নিশ্চয়ই রাতের বেলায় যখন পুকুরটা বেরিয়ে আসে মাটির নিচে থেকে, তখন বকটা সেখানে মাছ ধরে-ধরে বেড়ায়, তাই এতদিন বেঁচে আছে।

এইবার পুতুর বইখানিতে হালিশহরের পুরনো ছবি-দেওয়া ম্যাপখানার দিকে চেয়ে দেখ। শহর কোথায় ? সবই বাগান, পুকুর, ঘাট মাঠ। আর পশ্চিমে দেখ বড়োগঙ্গার ধারে তিনটে বড়ো বড়ো ঘাট ; মাঝে বাবুঘাট, দক্ষিণে কয়লাঘাট, উত্তরে জগন্নাথঘাট। বাবুঘাটে শৌখিন বাবুদের বজরা, কুটির বাবুদের পানসি, ছেলেবাবুদের

বাচখেলার নৌকো ; কয়লাঘাটে সদাগরদের কয়লার জাহাজ, পালের জাহাজ, ওলন্দাজ দিনেমারি বোম্বেটের জাহাজ ; জগন্নাথের ঘাটে মহাজনদের গাধাবোট, বড় ডিঙি আর নাখোদার জাহাজ। দক্ষিণে রয়েছে আদিগঙ্গা, সেখানে কালিঘাটে খালি কিস্তি মার হল। পুবে থেকে টালার নালা উত্তরে গিয়ে পড়েছে, সেখানে বর্গি ধরার জন্যে সারি-সারি সব ছিপ রয়েছে। তারপর বাগবাজারের খাল, সেখানে খালি ধোঁয়া, এত যে কিছু দেখবার জো নেই।

এই ম্যাপখানায় হাবড়ার পুলের নামগন্ধ নেই, রয়েছে কেবল কত-কালের বাঁধা জোড়াসাঁকো। এই দুই পুল হচ্ছে একটি রাজার, একটি রায়দের। এই জোড়াসাঁকো পেরিয়ে রাস্তা চৌমাথায় গিয়ে মিলেছে। চৌমাথা থেকে দক্ষিণমুখো গেলেই চৌরঙ্গী হয়ে রাজা-বাগান পাবে, আর উত্তরমুখো গেলে পাবে রায়বাগান। এই দুই বড় বাগানের ঠিক মাঝে দুটো সমুদ্রের মতো প্রকাণ্ড দিঘি। রাজা-বাগানে চৌকোনো লালদিঘি, তার মাঝে শ্বেতদ্বীপ, আর রায়-বাগানে হল গোলদিঘি তার মাঝে জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপে থাকেন ভুষুণ্ডিকাগ, কাগের ছা বগের ছা পাখিরা আর শ্বেতদ্বীপে থাকে সব ডানাকাটা পরী আর পর। লালদিঘির পারেই রাজার গড় আর গোলদিঘির ধারেই দেখ বাবুদের বৈঠকখানা, গড়ের মধ্যে কামান লেখা রয়েছে আর বৈঠকখানায় হুঁকো আঁকা রয়েছে দেখ।

এইবার প্রথমে রায়বাগানটা ঘুরে দেখ কী রকম। পায়ে হেঁটে ঘুরতে হলে আমার মতো পঞ্চাশ বছরেও বাগান দুখানা দেখে শেষ করতে পারতে না, ম্যাপে বলে চটপট হচ্ছে। তারপর এই রায়-বাগানের মধ্যে দেখ পাথর আর নুড়ি দিয়ে ঘাট-বাঁধানো জোড়া বাগান, একটায় কেবল কলাগাছ আর একটায় কেবল কলমের চারা, কচু গাছ। একটাতে লাফাচ্ছে হনুমান আর একটাতে বসে জাম্বুবান। আর একটু এগিয়ে, জোড়াসাঁকোর বড়ো রাস্তার ধারে রয়েছে দেখ সিংহীর বাগান। পাছে সিংহী বেরিয়ে পড়ে সে জন্যে তার চারদিকে শিক দেওয়া রয়েছে দেখ সিকদার বাগান। সেখানে ছেলে-

এই ম্যাপখানায় হাবড়ার পুলের নামগন্ধ নেই, রয়েছে কেবল কতকালের বাঁধা জোড়াসাঁকো। [পৃঃ ১৩০]

পুতু এতক্ষণ মটকা মেরে চোখ বুজে ছিল। অমনি আস্তে আস্তে উঠে বাসা ছেড়ে আতা গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে একটা বাঁশি বাজাতে লাগল। [পৃঃ ১২৬]

মেয়েরা দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে সিংহীকে দেখতে পারে। শ্যামপুকুর আর মনোহরপুকুর, এই দুই পুকুরের মাঝে, সানবাঁধানো মানিকতলায় সোনার গাছে চড়ে, মুক্তোর ফল মানিকের ফুল নিয়ে, রায়দের ছেলেরা বড়ো হয়েও দিন-রাত খেলা করে। আর একদিকে ফুর্তির জন্যে মোহনবাগানের ফুটবল গ্রাউণ্ড, কিন্তু রায়দের ছেলেরা সেখানে গ্রাণ্ড কাপ না হলে যায় না—পাড়ার ছেলেরাই সেখানে খেলে।

গোলদিঘির দক্ষিণ ধারেই পেয়ারাবাগান, তারপরে ফড়েপুকুর, পুকুরের ধারে ফড়েদের ঘর, তারা পেয়ারা গাছ জমা নিয়েছে। পুকুরের পাশে পটলডাঙার ক্ষেতে পটল হয়েছে। তারপরে বৌ-বাজার, মেছোবাজার—রায়গিন্নীদের মাছ আর দশহাত কাপড় এই দুই বাজার থেকে তোলা হিসেবে কেনা হয়। এরই পাশে বাঁশতলা, সেখানে কেবল মোটা-মোটা রায়বাঁশের ঝোপঝাড়, গুণ্ডারা এখান থেকে বাঁশের লাঠি সংগ্রহ করে এখনো। বাঁশতলার ধারেই বড়ো-বাজার, সেখানে জলের খেলা থেকে আবির খেলা পর্যন্ত না পাওয়া যায় এমন জিনিস নেই। তার পাশে আমা-ইট দিয়ে গাঁথা এমো পোস্তাতে ফল বিক্রি হচ্ছে। তারই কাছে বড়বাজারের পরেই ছাতু-বাবুর মাঠ, বাগবাজার পর্যন্ত সেখানে এক চড়কগাছ ছাড়া আর একটি গাছ নেই দেখ। এ ছাড়া নালার ধারে মাড়েদের বাগানের পাশে ধোপা পুকুর, কাপড় কাচবার জন্যে, নাপতে বাজারের ধারে ঝামাপুকুর, রায়গিন্নীদের আলতা পরবার পা ঘষবার জন্য; তারপর মুচিপাড়া কুমোরটুলি এমনি সব। বড়োবাজার আর বাগবাজারের মাঝে শোভাবাজার, সেখানে রায়বাবুদের বিয়ের শোভাযাত্রার সোলার কাগজের পাহাড়, মউরপঙ্খি, কদমঝাড়, খাসগেলাস, চতুর্দোলা, মহাপায়া, আসাসোটা, সঙ সমস্ত ঠাসা রয়েছে; ইচ্ছে করে ভাড়া কর, চাও তো কিনে নাও, নয় তো বাবুদের কাছে চেয়ে আনো। এর পর বাগবাজার, সেখানে বাঘের দুধ, বাঘের চর্বি এমনি সব আজগুবি জিনিস বিক্রি হয়। তা ছাড়া রায়মশায়ের রায়বাঘিনী গিন্নী বাগবাজারের মেয়ে, রাগে পেলে তিনি সিংহীকেও জব্দ করে ছাড়েন।

এর ইদিকে বাহুড়বাগান, সেখানটায় আহুরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়া মুশকিল, কেন না, গেলেই আহুরের কলাগুলি বাহুড়ে খেয়ে ফেলবে। তাই বলি জগন্নাথঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে জোড়াবাগানের হনুমান আর জাম্বুবনকে, 'ও হনুমান কলা খাবি, ও জাম্বুবান কচু-পোড়া খাবি, জয়-জগন্নাথ দেখতে যাবি' বলে চল হাতিবাগানে রাজহস্তি দেখতে।

কী খুঁজছ? আমাদের তেতলা বাড়িটা? ওই দেখ জোড়াসাঁকোর দুটো পুল, তার মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, ওখানে লেখা রয়েছে 'পীরবাগান' ওই 'র'য়ের মাথার যে শূন্যটি, ঠিক তারি মাঝে দেখ আমাদের বাড়ি। খুব ছোট্ট দেখা যাচ্ছে।

চল এইবার রাজাবাগানে হাতি ঘোড়া গোর গোরা দেখে আসি। কিন্তু বলি, চৌরঙ্গী এত বড়ো রাস্তা যে, সেখানে পায়ে হেঁটে সব দেখতে চেষ্টা করেছ কী 'চৌরঙ্গী বাতে' পঙ্গু হয়ে তার পরদিনই বিছানায় পড়েছ। চল বাবুঘাটে পানসি চড়ি, পা বাঁচবে—চারটে পয়সা গেলেই বা।

ওই যে গঙ্গার ধারে-ধারে কেল্লার সামনে সারি-সারি সব, ওগুলো গাছ নয়, জাহাজের মাস্তুল। দেখছ জাহাজের যেন বন একটা। ওই যে কেল্লার মধ্যেখানে মস্ত একটা মোটা থামের মতো, যার মাথায় একটা শিকে প্রকাণ্ড একটা কামানের গোলা গাঁথা রয়েছে, ওইটে হচ্ছে তোপ। ওই গোলা যেমন পড়বে দিনের বেলায় দুম করে মাটিতে অমনি সবার ঘড়ি খুলে দেখতে হবে ঘড়ি চলছে কিনা।

আবার ওই গোলাটা শিক বেয়ে আস্তে-অস্তে আকাশের দিকে উঠতে-উঠতে দুপ করে যেমনি রাত নটায় নিচে পড়বে, অমনি যে যেখানে আছ হাই তুলে তিনবার তুড়ি দিতে হবে, এ না করলে তোমার নিন্দে হবে।

জোড়াসাঁকো হয়ে রায়বাগানে ঢুকতে হলে মহড়ায় যেমন পীরের দরগা, তেমনি কালিঘাট হয়ে রাজাবাগানে ঢুকতে হলে প্রথমেই আলিপুর। সেখানে হাতিবাগানে দেখবে গজহস্তী শুঁড় দোলাচ্ছে,

একটি পয়সা দাও অমনি টুপ করে সেটি কুড়িয়ে নেবে। মাহুতকে বকশিশ দিলে এই হাতির পিঠে চড়িয়ে চিড়িয়াখানা দেখিয়ে আনবে। চিড়িয়াখানার দরজায় একটা হাঁসকল পাতা আছে, একজনের বেশি দুজন মানুষ গেলেই ধরা পড়ে যায়। এই বাগানের পিছনে পাতি-পুকুর, ডিমের বদলে, চিনে পাতি কলম্ব। নেবু, যারা নিরামিষ খায় তাদের জন্যে হাঁসেরা পাড়ছে। এক-একটা বাগানকে-বাগান জাল দিয়ে ঘেরা, তার মধ্যে পাখিরা মনের সুখে উড়ে বেড়াচ্ছে, বাসা বাঁধছে, ডিম পাড়ছে, আবার কত কী পড়ছে। এত বড়ো এই চিড়িয়াখানা যে দিনের পর দিন দেখে গেলেও শেষ হবে না। তারপরেই ঘোড়দৌড়ের মাঠ আর গড়ের মাঠ। এই মাঠের ধারেই যাদুঘর, সেখানে সব মরা মানুষ জন্তু জানোয়ার। সেখানে দরজায় পাহারা নেই, ওমনি যেতে পার আসতে পার, কেবল ছাতা লাঠি যাবার হুকুম নেই।

এরই কাছেই জানবাজার আর মুর্গিহাটা। কোম্পানির বাগান হচ্ছে ঠিক বাবুঘাটের উপরেই, সেখানে গড়ের বাদ্যি বাজে। এই বাগানে টিকিট না থাকলে যে সে ঢুকতে পারে না, দরজায় কনস্টেবল রয়েছে, খালি গা খালি পা দেখলেই রুল ওঠাবে। রুল ওঠালে লাটসাহেবের গাড়ি পর্যন্ত থেমে যায়— তুমি তো তুমি! এই বাগানের ফটকের ধারেই একটা ছেলে বেলুন ধরে পাঁচিলে চেপে বসে আছে, ফটকের থাম জড়িয়ে পাছে থাম ছেড়ে দিলে বেলুন তাকে সুদ্ধু উড়িয়ে নিয়ে যায়। আগে এখানে দেখেছি একটা বুড়ি থাকত, একদিন ভুলে যেমন সে থাম ছেড়েছে অমনি বেলুন তাকে উড়িয়ে নিয়েছে। সে সময় থাকলে মজা দেখা যেত।

এই বাগানের এদিকে কাছারি, সেদিকে কেরানীরা দিন-রাত খেটে মরছে; আবার ওদিকের কোণেই নবাবি আমলের অন্ধকূপের একটা থাম। চৌমাথার কাছে রাজার বাড়ির সিংদরজা, সেখানে সান্ত্রী পাহারা, ঢোকবার জো নেই। ফটকের উপর যে সিংহী বসে আছে কামানের গোলা হাতে, দেখেছ তো? উত্তরে গোয়াবাগান,

সেখানে ফৌজের ছাউনি, তারি পাশে গোরারাজার জাহাজি গোরার আড্ডা সেখানে। লালবাজার পেরিয়ে চিনেবাজার, সেখানে সারি-সারি জুতোর দোকান আর আরশোলা ভাজা।

শ্বেতদ্বীপ আর জম্বুদ্বীপ দেখতে চাচ্ছ? কিন্তু ওদিকে যার ডানা নেই সে তো যেতে পারবে না! এ পর্যন্ত যত ছেলে-মেয়ে জন্মেছে, তার মধ্যে কেবল আমি পুতুই সেখানে যেতে পেরেছি। কেন জানো? আমি বড়ো হয়ে উঠতে চাইনি বলে। দুধে-দাঁত উঠতে না উঠতে সব ছেলেরা ঠোঁটের উপর লুকিয়ে-লুকিয়ে হাত বুলিয়ে দেখে, গোঁফ উঠল কিনা। কিন্তু আমি কেবল ঠোঁটে হাত বোলাতুম আর ভাবতুম —এই রে! বুঝি গোঁফ উঠে পড়ল। বড়ো হবার ভয় আমার এমনি ছিল যে দুটি দুধে-দাঁত যেমন ওঠা অমনি আমি দুধের বাটি ফেলে উড়ে পালাবার চেষ্টায় রইলুম। ডানার জায়গা দুটো এমনি চুলকোতে আরম্ভ করলে যে পিঠের দুদিকে লাল হয়ে সেখানে পালকের বদলে 'মাসিপিসি' বেরিয়ে পড়ল। অমনি আমি জানলা দিয়ে ভোঁ দৌড়।

এমন ছেলেমেয়ে কে আছে যে ওড়বার চেষ্টা না করেছে? ওড়বার জন্যে তাদের পিঠ সুড়সুড় করে কিন্তু ভুলে গেছে কেমন করে উড়তে হয়। তাছাড়া, কচি ছেলেদের পায়ে তাদের মা এমনি ভারি-ভারি মল পরিয়ে দেন, সে নিয়ে ওড়া ভারি শক্ত। দেখতে-দেখতে সব পালক শক্ত দুধে-দাঁত হয়ে যায়, তখন আর পালকও ওঠবার আশা থাকে না, মাসিপিসিও বার হয় না। তার ওপর ডাক্তার টিকে দিয়ে পালকের জড় মেরে দেয়, তখন দুধে-দাঁত পড়ে গজ-দাঁত গজায়। গজ-দাঁত দিয়ে খোঁড়া যায়, ওড়া তো হতে পারে না।

ডানার বদলে মাসিপিসি নিয়ে যদিও পাখির মতো আমি উড়তে না পারি, কাগজের মতো হাওয়ায়, গায়ের কাঁথাখানা সুদ্ধু উড়ে চললুম। তখনো আলো রয়েছে। বাড়ি ছেড়ে উড়ে পড়েই প্রথমটা ভারি ভয় হল, দেখলুম বাড়ির পর বাড়ি সব জানলাগুলো

খুলে যেন হাঁ করে আমায় গিলতে চাচ্ছে। আমি সোঁ করে আকাশে উঠে পড়লুম, সেখানে একটা কলের চিমনির কালো ধোঁয়ার মধ্যে পড়ে মনে হল যেন দম বন্ধ হয়ে গেল। খানিক ধোঁয়ার সঙ্গে উড়তে উড়তে ছাতুবাবুর মাঠে চড়কগাছটা দেখে যেমন বসতে যাব, অমনি সেটা কেঁক করে চেঁচিয়ে উঠে আমাকে সাতপাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, একেবারে গোলদিঘির মাঝে জম্বুদ্বীপে। পড়েই খানিক আমি চিৎপাত হয়ে ঘাসের উপর গড়িয়ে নিলুম। আমার ঠিক মনে হচ্ছে যেন পাখি হয়ে গেছি, ভুলেই গেছি যে মানুষ ছিলুম। খিদে পেয়েছিল —টুপ করে একটা ফড়িং ধরতে গিয়ে দেখি, হাত ফসকে সেটা পালিয়ে গেল। তখন মনে পড়ল পাখিরা যে ঠোঁটে করে ফড়িং ধরে। গোলদিঘির জল দেখেই অমনি আমার, সব ছেলেদের যেমন তেমনি, বড্ড তেষ্টা পেয়ে গেল। আমি টিয়েপাখির ঠোঁটের মতো ছোট্ট নাকটা জলে ডুবিয়ে জল খেতে গেছি আর সোঁ করে নাকে-মুখে জল ঢুকে হেঁচে বাঁচিনে। আমার চান করতে ইচ্ছে হল যেমন জলে নাবা অমনি ঝুপ করে কাদায় পড়ে গেছি। তাড়াতাড়ি জল ছেড়ে উঠে, মনে হল কী যেন করা উচিত, কিন্তু জল লাগলে পালকগুলো ঝেড়ে-ঝুড়ে ঠোঁটে করে খুঁটে-খুঁটে যে শুকিয়ে নিতে হবে, সেটা আমার মনেই এল না।

তখন রাত হচ্ছে। ওপারে জগন্নাথঘাটে কাঁসর ঘণ্টা বাজছে আর এদিকে রায়দের বৈঠকখানায় সারিঙ্গী আর তবলা বাঁধার শব্দ পাচ্ছি। আমি বিরক্ত হয়ে জামগাছের ডালে ঘুমোতে গেলুম। প্রথমটা ডালে বসে ঘুমোতে আমার ভয় করতে লাগল। বুঝি-বা পড়ে গেলুম। কিন্তু একটু পরেই অভ্যাস হয়ে গেল। গুটিসুটি হয়ে জামগাছের ডালে ঘুমিয়ে পড়লুম। আমার গায়ে তখন তো পালক ছিল না, রয়েছে খালি পাতলা কাঁথাখানি ; রাত্তির থাকতেই শীত করতে লাগল, জেগে উঠলুম। আমার মাথা যেন ভার বোধ হল আর নাকটা সুড়সুড় করতে লাগল। বুঝলুম কী যেন অসোয়াস্তি হচ্ছে ; কিন্তু সর্দি ঝেড়ে দেবার জন্যে যে মাকে ডাকতে

হবে সেটা তখন মনেই এল না। কাজেই আমি ভাবলুম কাউকে শুধাই কী করতে হবে, নাকটা নিয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলুম।

তুজন জোনাক পোকা লণ্ঠন জ্বালিয়ে ভোর রাত্তিরে ঘরে ফিরছিল, যেমন আমায় দেখা অমনি ফস করে আলো নিভিয়ে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। পাখিদের সঙ্গে পোকার ঝগড়া আছে বলে, রাত-বিরেতে একটা কথা শুধোতে গেলে যে তারা এমন অভদ্রতা করবে তা কে জানে। এক ছুঁচো গায়ে বিদঘুটে রকম এসেন্স মেখে একটা থিয়েটারের প্রোগ্রাম থেকে কিচমিচ করে একটা গান গেয়ে চলেছিল, তার কাছে যেতেই সে একটা থলপদ্মর আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। যাকে শুধোতে যাই সেই দেখি পালায়। পাখিদের ডোমপাড়ায় একদল ব্যাঙ হোগলাতলায় বসে রোদ ওঠবার আগেই যতগুলো পারে ছাতা বানিয়ে ফেলছিল, আমাকে দেখেই তারা চম্পট দিলে, ছাতাগুলো ফেলে। পাখিদের গোয়ালা যত গোসাপ, তারা রাত থাকতে তুধে জল মেশাচ্ছিল গোলদিঘির ধারে, তারা আমাকে পুলিসম্যান ভাবলে বোধ হয়, যেমন দেখা অমনি তুধের কেঁড়েগুলো উল্টে দিয়ে একেবারে সাঁতরে ওপারে পালাল। এ ওদিকে পালায়, ও সেদিকে ; ওখানে কেউ পিদিম নিভিয়ে অন্ধকারে লুকোয়, সেখানে কেউ বাসার দরজা ঝপ করে বন্ধ করে দেয়। আমাকে দেখে যেন চারদিকে সোরগোল পড়ে গেল —বাগানে মানুষ এসেছেরে ! মানুষ !

ওদিকে শুনলুম কেল্লার মধ্যে দামামা বাজছে। আমার ভয় হল এইবার তেলেঙ্গি সেপাই সব আমাকে ধরতে আসছে। আমি যে মানুষ কোনখানটায়, তা তো আমি কিছুতেই ভেবে পাইনে। দেখলুম তেলাপোকার মতো খয়েরি রঙের সব তেলেঙ্গি বন্দুক ঘাড়ে চৌরঙ্গী বেয়ে আসছে। কিন্তু যেমন দূর থেকে আমায় দেখা, 'ওই ওদিকে, ওই ওদিকে' বলে, 'রাইট লেপ্‌ট্‌, রাইট লেপ্‌ট্‌' করতে করতে তারা লালদিঘির চারদিকে ঘুরতে লাগল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

নাক সুড়সুড় করলে কী করতে হয়, আমি আমার জাতভাই পাখিদের শুধোতে যাব মনে করলুম, কিন্তু তখনি মনে পড়ল, যখন আমি ঝুপ করে জম্বুদ্বীপে এসে পড়লুম তখন পাখিগুলো ভয়ে কিচমিচ করে বাসা ছেড়ে পালিয়েছিল। সবাই আমাকে দেখে সরে যাচ্ছে, তবে তো আমি এখনো মানুষ আছি। ভেবে আমার কান্না এল। আমি দুইহাতে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে কাঁদতে-কাঁদতে অন্ধকারে যেদিকে দুচোখ যায় সেই দিকে চললুম।

দুঃখের কথা কাকে জানাই ভাবছি —এমন সময়ে গাছের উপর থেকে ভুষুণ্ডিকাগ আমার দেখে বলে উঠলেন, 'কও ক্যা কও ক্যা···'

আমি সেই গাছের তলায় বসে কাগমশায়কে আমার নালিশ জানালুম, 'কেন সব পাখি আর পরী আমায় দেখে পালাবে? আমি কি মানুষ?'

কাগ খানিক এক চোখ বুজে ভেবে বললেন, 'পুতু, তুমি গায়ে ওটা কী পরে আছ? পাখিরা কি তোমার মতো গায়ে কাঁথা জড়ায়?'

আমি চেয়ে দেখলুম কোনো পাখিরই গায়ে কাঁথা নেই, খালি গা। কাক আবার বললেন, 'পুতু, তোমার পায়ে ওগুলো আঙুল, না আঁকড়ি?'

আমি দেখলুম পায়ে আমার দশটাই আঙুল, একটাও আঁকড়ি নেই।

কাগা বললেন, 'আচ্ছা দেখি পালক ঝাড়া দাও তো।'

আমার কেবলি গা ঝাড়াই সারা হল। তবে তো আমি এখনো মানুষ আছি। যেমন এই কথা মনে হওয়া, অমনি আমার মাকে মনে পড়ে গেল। আমি ভয়ে-ভয়ে কাককে বললুম, 'আমি মায়ের কাছে যাব।'

গম্ভীরভাবে কাক বললেন, 'এস', কিন্তু আমি তখনো দাঁড়িয়ে আছি দেখে আবার বললেন, 'যাও।'

আমি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললুম, 'আমার মনটা কেমন কেমন করছে।'

কাক বললেন, 'মনটা কী রকমটা করছে শুনি !'

আমি যেমনি উত্তর দিয়েছি, 'মন ভারি খারাপ হয়েছে।' অমনি দাঁড়কাগ তাড়াতাড়ি, 'কই দেখি দেখি' বলে, আমার কপালে হাত দিয়ে বললেন, 'ইস ভারি গরম ! দেখি হাতটা।'

আমার হাতের কড়ে আঙুলটা একবার ঠোঁটে করে তুলতে চেষ্টা করে কাক বললেন, 'মন ভারি কী বলছ ? তোমার যে আঙুল সুদ্ধু ভয়ানক ভারি হয়ে গেছে।'

আমার ভয় হল। কেঁদে বললুম, 'কী হবে তবে ?'

কাক বললেন, 'মন ভারি হয়ে গেলে কি কেউ উড়তে পারে ? মন হালকা রাখা চাই বাতাসের মতো। পাখিদের মন কখনো ভারি হয় না। যে পাখিটার দেখবে ডানা ছুটো ভারি হয়ে ঝুলে পড়ল সে পাখিটা মোল আর তার ওড়ারও শেষ হল জানবে।'

আমি দেখলুম যতই আমার ভয় বাড়ছে, ততই যেন হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। একবার উড়তে চেষ্টা করলুম, কিন্তু পা ছুটো যেমনি মাটি ছাড়া অমনি আমার মাথাটা গিয়ে মাটিতে পড়ল ছুম করে। কাক বললেন, 'মিছে চেষ্টা। আর তোমার ওড়া হচ্ছে না, পড়াই তোমার কপালে আছে দেখছি। ভারি লোক হয়েছ, পায়া ভারি হবে না এখন। না বসন্তের দখিন বাতাস, না শীতের উত্তর বাতাস, না সকালের আলো-গোলা পুব হাওয়া, না কোনো বাতাসেই আর তোমাকে ওড়াতে পারছে। মহা ঝড় এলেও নয়। বড়ো গোল। তোমাকে গোলদিঘির জম্বুদ্বীপেই চিরকাল কালোজামের বাগানে থাকতে হবে। পালাবার জো নেই।'

আমার কান্না পেল। আমি শুধোলুম, 'শ্বেতদ্বীপে, যেখানে পাউডার মেখে পরীরা থাকে, আর ওই রাজাবাগান, ওই হাতিবাগান, আলিপুর, যাত্থর, সিংহীবাগান, এসব দেখতে যেতে পাব না।'

উত্তর হল, 'না।'

'ছাতুবাবুর মাঠে চড়ক, গড়ের মাঠে গোরার বাদ্যি, রাম-

বাগানের রামলীলে, সাতপুকুরের গোলকধাঁধা, এসব কিছুই দেখতে পাব না।'

'না, তুমি গোলদিঘি পেরিয়ে ওপারে যাবে কেমন করে? যখন উড়তেই পার না?'

আমি শুধালেম, 'আমি তবে করব কি?'

কাক বললেন, 'খাও দাও, বাঁশি বাজাও।' এই বলে তিনি, একটা ছেঁড়া মোজা তাঁর বাসার কাছে ঝুলছিল, সেটা থেকে একটা ছোট্ট বাঁশি আমাকে বার করে দিলেন ; আমি বাঁশির দাম কোথা পাব বলতে কাক বললেন, 'দাম সময়মতো দিও।'

বাঁশিটা চমৎকার বাজত। পাখিরা পরীরা, এমন কি, সাপ ব্যাঙ মাছি টিকটিকি ফড়িং প্রজাপতি সিংহী বাঘ, তারাও ভালোবাসত সেই বাঁশি শুনতে। কিন্তু তবু আমার রকম-সকম দেখে তারা আমার খুব কাছে আসতে চাইত না, উল্টে বরং ডিম ফুটে পাখির ছানাগুলো আমায় দেখে হাসাহাসি করত, যেন আমিই নতুন জানোয়ার, তারা কেউ নতুন নয়। আমি বসে-বসে দেখতুম, ডিম ফুটে বেরিয়ে দিন কতক পরে পাখির ছানাগুলো উড়ে-উড়ে ওপারে চলে যায়। শুনলুম তারা সব মানুষ হতে যাচ্ছে। পাখির মায়েরা ডিম ফোটাতেই জানে, মানুষ করতে হয় কেমন করে তা তারা ভালো জানে না। বাচ্ছাগুলো বড়ো হলেই তারা ঠেলে তাদের বাসা থেকে ফেলে দেয় আর উড়তে-উড়তে তারা যেখানে পারে মানুষ হতে চলে যায়। যখন ডিম ফুটতে দেরি হচ্ছে, তা দিয়ে-দিয়ে আর পারে না তখন আমি শুনেছি পাখির মায়েরা বলছে, 'ওরে দেখসে, পুতু কেমন করে চান করছে আর জল খাচ্ছে।' অমনি হাজার হাজার পাখির ছানা তাড়াতাড়ি ডিম থেকে বেরিয়ে দেখতে আসে আমি কী করছি। আমাকে পাখিরা এটা-ওটা গাছ থেকে ফেলে দিত, আর আমি হাতে করে সেগুলো খেতুম। তখন তারা ভারি মজা পেত।

আমি তো পাখিদের মতো পোকা মাকড় ফড়িং খেতে চাইতুম

না, তাই কাক সব পাখিদের বলে দিয়েছিলেন, তারা সবাই আমার জন্যে রুটি, মেঠাই, সন্দেশ, এটা-ওটা মানুষদের ঘর থেকে ঠোঁটে করে নিয়ে আসত। মানুষের ছেলেরা খাবারের ঠোঙায় ছোঁ দিলে পাখিদের দোষ দেয়, সেটা বড়ো ভুল। পাখিরা সেগুলো আমার জন্যে নিয়ে আসে। পাখিরা তো কথা কইতে জানে না যে মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইবে, তাই তারা আমার খাবার ছোঁ দিয়ে নিয়ে আসে। খাবার এনে দিত বলে পাখিদের বাসায় পাতবার জন্যে আমি আমার কাঁথা থেকে এক-এক টুকরো তাদের ছিঁড়ে দিতুম কিন্তু কাকমশায় একদিন বললেন, 'না, কাঁথাটা ছিঁড়ে নষ্ট কর না, ওটা কাজে লাগতে পারে।' আমি সেইদিন আমার ছেঁড়া কাঁথাটা এক জায়গায় লুকিয়ে ফেললুম।

ক্রমে আমি পাখিবিদ্যেতে পাখিদের চেয়েও পণ্ডিত হয়ে পড়লুম। আমি গন্ধ পেলেই বুঝতে পারি হাওয়া পশ্চিম থেকে এল না পুব থেকে। বাঁশ বেড়ে উঠছে আস্তে-আস্তে, আমি তা চোখে দেখতে পেতুম, আর গাছের ডালের মধ্যে কোথায় ফল আছে, কোথায় ফুল, কোথায় পাতা, কোথায় বা গর্ত করে পোকারা তার মধ্যে চলাচলি করছে, তা পর্যন্ত আমি বলে দিতে পারতুম। আর কাকমশায় মনের সুখে থাকতে হয় কেমন করে তা আমায় শিখিয়েছিলেন, আমি পাখিদের মতো সুখে বাঁশি বাজিয়ে গান গেয়ে, সুখে খেয়ে সুখে ঘুমিয়ে, দিনরাত কাটাতে লাগলুম।

আমি এক-একদিন সন্ধেবেলা জলের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে বাঁশিতে বাজাতুম, 'বাতাসের ঝিরঝির, ঢেউয়ের ঝিপঝিপ, আলোর ঝিকমিক'। জলের ধারের মাছরাঙা পাখিরা বুঝতে পারত না যে সত্যি জলে মাছ খেলা করছে না আমি বাঁশিতে বাজাচ্ছি চাঁদামাছের খেলার গান। কখনো আমি বাঁশিতে ডিমপাড়ানো গান আস্তে-আস্তে বাজাই, পাখিরা অমনি বাসার মধ্যে ডিম খুঁজতে থাকে। অমনি আমি ঘুমপাড়ানো গান ধরি, তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। গোলদিঘির ওপারেই যে আমগাছটা, সেটায় শীতকালে আমের

বোল ধরে কেন জানো ? যখন খুব শীতকালে আমার আম খেতে ইচ্ছে হয়, মনে হয় গরম পড়লে বাঁচি, সেই সময় আমি এক-একদিন বাঁশিতে বাজাই বসন্তবাহার সুরে, 'আমের বউল আসলো নোচা-নোচা, আমের বউল আসলো বাড়ি-বাড়ি,' আমগাছটা ওপার থেকে শুনে মনে করে বুঝি সত্যিই বসন্তকাল এসেছে, আর অমনি সবার আগে তার বোল ফুল হয়ে ফোটে। কিন্তু থেকে-থেকে এক-একদিন আমার মন ওপারে যেতে, মায়ের কাছে যেতে, সব ছেলেমেয়ে যেমন খেলে তেমনি করে খেলে বেড়াতে, কেমন কেমন করতে থাকে, সেদিন আমার বাঁশিতে কান্নার সুরে কেবলি দুঃখু বাজে, 'পারে চল পারে চল, মায়ের কোলে, মায়ের কোলে খেলাঘরে।' পাখিরা সেদিন কত মায়ের কত ছেলেমেয়ের খবর আমাকে এনে দেয় আর আমি একলাটি বসে কাঁদি।

মানুষ তোমরা আমার কথা শুনে নিশ্চয়ই মনে-মনে হাসছ আর ভাবছ, সাঁতরে গোলদিঘির ওপারে গেলেই তো গোল চোকে। কিন্তু আমি তো ঠিক মানুষটি নয়, কাজেই মানুষের বয়সের সঙ্গে যেমন বুদ্ধি বেড়ে ঢেঁকি হয়ে ওঠে, আমার তো হল না। আমার যতটুকু বুদ্ধি তাতে বুঝলুম, সাঁতরাগাছির ইস্কুলে সাঁতার না শিখে সাঁতরাতে গেলেই ভুস করে ডুবে যাব। পাখিদের মধ্যে হাঁস সাঁতার দিতে মজবুত কিন্তু হাঁস সাঁতার শেখাতে একেবারেই জানে না, তারা বলে, 'সাঁতার আবার শক্তটা কী ? জলের উপর বসে পা দুটো দিয়ে কেবল পিছনের দিকে লাথি চালাও।' একদিন হাঁসেদের বুদ্ধি শুনে সাঁতরাতে গিয়ে ডুবেছিলুম আর কি। দূরে সব রাজহাঁস ভাসত, আমি তাদের একজনকে আমার সারাদিনের খোরাক যা কিছু সব একদিন দিলুম কিন্তু রুটি যখন ফুরিয়ে গেল তখন, কী করে ভাসতে হয় শুধোতেই, দেখলুম রাজহাঁসটা ফোঁস করে উঠে আমাকেই এক ঠোকর বসিয়ে, আস্তে-আস্তে ভেসে, ওপারে কেউ আমার মতো বোকা আছে কিনা দেখতে গেল।

একদিন একখানা রুইতনের মতো কাগজের একটা কী পাখি

আকাশ থেকে লাট খেতে-খেতে যেন ডানাভাঙা পায়রার মতো এসে পড়ল। পাখিরা চেঁচিয়ে উঠল 'ঘুড়ি-ঘুড়ি।' সেই প্রথম আমি ঘুড়ি দেখলুম। ঘুড়ি ওড়ানো পাখিদের কাছে জেনে নিয়ে আমি ঘুড়িটা দখল করলুম। আমাকে ঘুড়ি ওড়াতে দেখে একদিন পাখিরা ঘুড়ি ওড়াতে চাইলে, আমি তাদের লক ধরতে দিলুম। তারা ঠোঁটে সুতোগাছা ধরে উড়ে চলল আর ঘুড়ি তাদের সঙ্গে দেখতে-দেখতে আকাশে উঠল। সেই দেখে আমার মাথায় এক বুদ্ধি এল, আমি পাখিদের বললুম আমি ঘুড়ি ধরে ঝুলব আর তোরা সুতো ধরে ঘুড়িসুদ্ধ আমাকে ওড়া। একশো পাখি ঘুড়ির সঙ্গে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল। আমি ভাবছি একবার ওপারে পৌঁছুলে হয়, ঝুপ করে ঘুড়ি ছেড়ে নেমে পড়ব। এই ভেবে আমি ঘুড়ির কাঠি চেপে ধরেছি, অমনি ঘুড়িটা ফস করে ফেঁসে গেছে। আমি একেবারে আকাশ থেকে জলে পড়লুম। পড়বি তো পড় দুই রাজহাঁসের ঠিক মধ্যিখানে, কাগজ লক কাটিকুটি নিয়ে। পড়েই আমি দুই রাজহাঁসের গলা এমনি চেপে ধরলুম যে তারা গজ-গজ করতে-করতে আমাকে ডাঙায় নামিয়ে দিয়ে গেল।

সেইদিন থেকে পাখিরা বললে, 'আর আমরা ঘুড়ি ওড়াব না। তুমি ওপারে যেতে পার ভালো, না পার তো আমাদের কী?' কিন্তু তাই বলে ওপারে যাবার মতলব যে আমি ছাড়লুম তা ভেব না।

আগেই বলেছি জোড়াসাঁকোর মাঝে পীরবাগান, তার যে 'র'য়ের শূন্যটি, তার মাঝে যেমন কৌটার ভিতর কৌটা থাকে তেমনি, একটি এতটুকু গোলবাগান, তার মাঝখানে তার চেয়েও ছোটো একটি গোল ফোয়ারা তার তুটি তেতলা বাড়ি, ঝিনুকের মধ্যে মুক্তোর মতো বসানো রয়েছে। এইটে হল নন্দনবাগান ইন্দ্রপুরী। এখানে ছেলে বুড়ো সবাই একসঙ্গে গান গেয়ে, ছবি এঁকে, বই লিখে, স্বচ্ছন্দে আনন্দে থাকে বলে এই বাগানের নাম নন্দনকানন। এখানে এক বিঘত গাছে সব ফল ধরেছে ; আম, জাম, ডালিম, তেঁতুল। রায়বাবুদের ছেলেরা কাগজ পেলে ঘুড়ি বানায়, নয়তো কোম্পানির কাছে স্ট্যাম্প দিয়ে সেগুলো জমা করে বস্তা-বস্তা। কিন্তু এখানকার ছেলেরা ঠিক তার উল্টো করে, কাগজ হাতে পেলে তারা তাতে ছবি লেখে, নয়তো বই লেখে। নোটের কাগজে ছবি লেখা যায় না বইও লেখা চলে না, তাই কেবল সেই কাগজগুলোই নৌকো করে তারা ফোয়ারায় ভাসায়, সুবিধা পেলেই কখনো কখনো। এই ফোয়ারার সঙ্গে গোলদিঘির মাঝে জম্বুদ্বীপের যোগ ছিল, সেখানে নৌকো ছাড়লে ঠিক এখানে এসে পোঁছুত। একদিন একটা কাগজের নৌকো ভাসতে-ভাসতে রাতের বেলায় জম্বুদ্বীপে এসে ঠেকল, ঠিক সেইখানটিতে যেখানে জলের মধ্যে একটা ডুবো বন উলটো দিকে মাথা করে রয়েছে দেখা যায়।

ওপার থেকে ছেলে-মেয়ে পাঠাবার জন্যে বৌরা প্রায়ই কাক মশায়কে চিঠি পাঠায়। সেই জন্যে সব কাক-বক ডাকপেয়াদা দিন-রাত জলের ধারে-ধারে পোস্ট-আফিস ঘরে বসে আছে। 'পোঃ গোল-দিঘি, জম্বুদ্বীপ,' এই ঠিকানায় দরখাস্ত ছাড়লেই পেয়াদারা

সেগুলো কাক-মশায়ের কাছে নিয়ে উপস্থিত হয়। কাকমশায় দেখেন, কোন্ মা কী রকম ছেলে-মেয়ে চান, আর তিনি পাখিদের বাসা থেকে কখনো কাকের ছা কখনো বকের ছা নিয়ে তাদের কাছে মানুষ করতে পাঠিয়ে দেন। সব মা লেখেন আমার পয়লা নম্বর ছেলে চাই। কাকমশায় এক-এক সময় বিরক্ত হয়ে যে পাখি সামনে পান তাকেই মানুষ হতে পাঠিয়ে দেন। উপরো-উপরি মেয়ে পেয়ে যে মা মিনতি করে লেখেন, 'কাকমশায়, এইবার অনুগ্রহ করে যদি একটি ছেলে পাঠান তো চিরবাধিত থাকব। আপনার স্নেহের তমুক।' তবে কাকমশায়ের যদি মেজাজ খুশি থাকে সেদিন তবে নিশ্চয়ই তিনি আর এক মেয়ে পাঠাবেন, জানা কথা। আবার হয়তো যেদিন চটে আছেন, সেদিন কেউ চাইলে, সাত ছেলের পরে একটি মেয়ে, সাত ভাই চম্পার এক বোন পারুল, কাকমশায় তাকে অষ্টম গর্ভের আর এক ছেলে পাঠিয়ে বসলেন। এমনি প্রায়ই ঘটে। তাই দরখাস্ত লেখবার সময় পরিষ্কার করে কী চাই লেখা আর ঠিক ঠিকানা দেওয়া প্রয়োজন। কত যে ছেলে-মেয়ে ঠিকানা ভুল হওয়াতে এ বাড়িতে যেতে ও-বাড়িতে গিয়ে পড়ে, তার ঠিকানা নেই। বড়োমানুষ তার অনেক মেয়ে হলেও বিয়ে দেবার ভাবনা নেই, কিন্তু সে চায় পয়সা ওড়াতে পারে এমন একটি ছেলে; আর গরিব চাচ্ছে একটিও মেয়ে নয়, রোজগারি এক ছেলে। কিন্তু ঠিকানা বদল হয়ে গরিব পেলে এক ঝাঁক মেয়ে আর বড়োমানুষটা কিছুই পেলে না; পুষ্যিপুত্তুর নেবার জোগাড় করতে লাগল। এমনি পণ্ডিতের ঘরে যাচ্ছে চাষা ছেলে, চাষার ঘরে যাচ্ছে পণ্ডিত। সব গোলমাল হচ্ছে, কাকমশায় যতই বুড়ো হচ্ছেন।

নন্দনকাননের নোটের নৌকোটা যখন কাকের হাতে পড়ল, তখন তিনি সেটা পড়ে কিছুই বুঝতে পারলেন না। কাকের দপ্তরখানার খাতাঞ্চি দেওয়ান কারকুন কাক বক সবাই এসে, একবার সোজা পায়ে একবার উল্টো পায় ধরে উল্টে-পাল্টে পড়ে ঠিক করলে, বোধহয় কে একেবারে পাঁচটি খোকা চায়, কেন না

কাগজটার মাঝে বড়ো করে ৫ লেখা রয়েছে। শুনেই কাক চটে বলে উঠলেন, 'কী কাকের ছা বকের ছা লিখেছে, দরখাস্ত নামঞ্জুর', বলে তিনি কাগজখানা ঠোঁটে করে আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'যাও, খেলা করগে।' পাখিরা জানত না, তাই ভারি কাজের জিনিসকে বাজে বলে তারা ফেলে দিয়েছে। নোটখানা সামান্য কাগজ নয়, থোক পাঁচ টাকা, শুনে পাখিরা অবিশ্যি সেটা ফিরে চাইলে না। পাখিরা জানত, দিয়ে নিলে তাদের কালিঘাটের কুকুর হতে হবে। সবাই চুপ করে রইল, কাকমশায়ের দিকে কটমট করে চেয়ে। কাকমশায় নিজেকে ভারি বুদ্ধিমান ঠাওরাতেন, এবার ঠকেছেন দেখে কাজকর্ম ছেড়ে জামগাছের আগডালে গোমড়া মুখে বসে রইলেন।

কাকমশায়কে খুশি করবার জন্যে আমি তাঁর বাসায় গিয়ে শুনলুম, তিনি তাঁর দিঘির ধারে বাগানবাড়িতে গেছেন, দু-চার দিন আর কাচারি করবেন না। কাকবুড়ো শেষবয়সে একটু আরাম আর আমোদ-আহ্লাদে কাটাবেন মনে করে অশথগাছের আগডালে ছেঁড়া মোজার একটি বগলি নানা টুকিটাকি দিয়ে ভর্তি করে, বুড়ো বয়সের জন্যে কিছু জমা করে রাখছিলেন। আমি যখন সেখানে উপস্থিত হলুম, তখন কাকমশায় তাঁর ছেঁড়া মোজার ভাঁড়ারঘর গোছাচ্ছেন। দেখলুম সেখানে তিনি জমা করেছেন, একশো-আশিটা মটর, কিসমিস বাদাম পেস্তা চৌত্রিশটি, ষোলো টুকরো পাঁউরুটির খোলা, একটা ফাউনটেন পেন, আর একটা জুতোর ফিতে। কাক আমাকে দেখে বললেন, 'এই মোজাটা ভর্তি করে দিয়েই পেন্সন নেব, কী বল দাদা।' প্রায় বারো আনা মোজা ভর্তি হয়েছে দেখে, আমি তাঁকে আমার নোটের একধার থেকে আর চার আনা দিলুম। মোজা ষোলো আনা ভর্তি দেখে তাঁর আর হাসি ধরে না। এই সময় আমি সুযোগ বুঝে তাঁকে ওপারে যাবার একটা উপায় ঠাওরাতে বলে নিজের বাসায় ফিরে এলুম।

তার পরদিনই পাখিদের সভায় বাবুইপাখির ডাক পড়ল। এত

পাখি থাকতে বাবুইপাখিদের কেন যে কাকমশায় তলব দিলেন তা এখুনি বুঝবে। সব পাখিরা সভায় উপস্থিত হলে কাকমশায় বলতে শুরু করলেন। তাঁর সামনে আর কেউ কিছু বললে কাক বড়ো চটতেন, তাই যা কিছু বলবার তিনিই বলতেন, বাকি সব পাখিরা শুনে যেত। শুরুতেই কাক বাবুইপাখিদের বাসা তৈরি করবার ক্ষমতা যে চিনে-বুলবুলের চেয়ে ঢের বেশি, তা বলে বাবুইদের বেশ একটু খুশি করে দিলেন। পাখিদের মধ্যে বাসা বাঁধার কারিগুরি নিয়ে ভারি রেষারেষি চলত, কাক সেটা জানতেন। তিনি বললেন, 'আর সব পাখি বাসা বাঁধে বটে, কিন্তু এক বাবুই ছাড়া আর কেউ তাদের বাসা কাদা দিয়ে পরিষ্কার করে নিকোয় না বলে, তাদের বাসায় বাটির মতো জল ধরে রাখা চলে না।'

কাক ঘাড় উঁচিয়ে আরো কী বলতে যাচ্ছেন, এমন সময় চুলবুল করে বুলবুলির মা একদিক থেকে বলে উঠল, 'ডিম ধরবার জন্যেই তো বাসা, জল ধরতে আবার বাসা বাঁধে কে ?'

বাবুইপাখিরা কাগামশায়ের লেকচার শুনে খুব ডানা তালি দিচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গেল। কাগা একটু ভড়কে গিয়ে, দু-এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে, আবার বললেন, 'কাদার দেয়াল দেওয়াতে বাসা কী রকম গরম থাকে, সেটা ভেবে দেখ।'

বুলবুলি অমনি বলে উঠল, 'বেনো জল বাসায় ঢুকে যদি বার হয়ে না যায়, তবে আণ্ডাবাচ্ছা জলে ডুবে যাবে, চোখে দেখতে পাচ্ছি।' কাক বুলবুলিকে একটা শক্ত রকম জবাব দেবেন ভাবছেন দেখে বুলবুলি বললে, 'আর এক ঢোক জল খেয়ে নাও না গো।' কাকমশায় সত্যিই আর এক ঢোক জল খেয়ে চাঙা হয়ে এবার জবাব দিলেন, 'বুলবুলির বাসা যদি গোলদিঘির জলে ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে জল ঢুকে সেটা আণ্ডা-বাচ্ছা সুদ্ধ ভুস করে ডুবে যাবে আর বাবুইবাসা ভাসতে থাকবে, শুকনো খটখটে হেন রাজহাঁসের পিঠ।'

এবার বাবুইপাখিরা সবাই একসঙ্গে ডানা তালি ঠোঁট তালি দিতে

লাগল। বুলবুলি একবার বললে, 'গোলদিঘিতে ভাসাতে তো বাসা বাঁধা হয় না।' কিন্তু বাবুইরা 'হুও' দিয়ে বুলবুলিকে সভা থেকে তাড়িয়ে দিল।

এরপর সবাই ঠাণ্ডা হয়ে বসল তখন কাক বাবুইদের বললেন, 'তোমরা জানো এই জম্বুদ্বীপে 'পুতু' আমাদের অতিথি, ইনি যাতে খুশি হন তা আমাদের করা উচিত। ইনি গোলদিঘির ওপার দেখতে ব্যস্ত হয়েছেন, তাই আমি এর জন্যে একখানি নৌকো তৈরি করিয়ে দিতে চাই। তোমাদের মতো কারিগর এই জম্বুদ্বীপে পাওয়া কঠিন।' বাবুইপাখিরা কথাটা শুনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে দেখে আমার ভয় হল, বুঝিবা তারা না করে। কাগা তাড়াতাড়ি বললেন, 'মানুষদের মতো একটা বিদঘুটে বড় জাহাজ আমরা চাইনে, এই পুতুকে ধরে এত বড়ো একটা বাবুইবাসা হলেই কাজ চলবে। সেটায় জল না ঢুকলেই হল।'

কিন্তু বাবুইপাখিরা বললে, 'আমাদের অনেক কাজ, এত বড়ো বাসা করতে সময় অনেক যাবে।'

কাক বললেন, 'ঠিক কথা, তোমাদের কাজ ক্ষেতি করে এ কাজ করতে হবে না, কিন্তু পুতু তোমাদের যে অমনি খাটিয়ে নেবেন তা নয়, তোমরা জনপিছু রোজ দেড় পাই হিসেবে মজুরি পাবে।'

মজুরির নামে বাবুইদের আনন্দ দেখে কে! তারা তক্ষুনি কাজে লেগে গেল।

তখন বাবুইপাখির ডিম পাড়বার সময়। কিন্তু সে বছর তারা আমার জন্যে বাসা বাঁধতেই ব্যস্ত, তাদের নিজেদের বাসা খালি রইল। ওদিকে ওপার থেকে কেবল চিঠি আসতে লাগল, 'বাবুইছানা পাঠাও।' বাবুইছানাগুলো দেখতে গোল-গাল মোটা-সোটা, তাই বড়ো ঘরের মেয়েরা সেইগুলোই মানুষ করতে চায়। কাকমশায় মুশকিলে পড়লেন। বাবুইবাসা সব খালি, এদিকে বড়ো বড়ো খদ্দেরের মনও রাখা চাই। তিনি সব চড়াইপাখিকে বাবুইদের পুরোনো বাসায় ডিম পাড়তে হুকুম দিলেন, আর সেই ছানা ক্রমাগত

ওপারে চালান দিতে লাগলেন। মানুষেরা খুব চটকদার ছেলে পেয়ে খুশি রইল।

এদিকে আমি রোজ রোজ বাবুইদের মজুরি চোকাতে লাগলুম। সন্ধেবেলা তারা সারি সারি ডালে এসে বসে, আর আমি এক দুই তিন করে, একে-একে নোটের এক-এক কোণ ছিঁড়ে তাদের দিয়ে চলি, আর তারা সেগুলো মুখে করে উড়ে পালায়। দু'মাস পরে আমার নৌকো তৈরি হল। নৌকোর ভিতরটায় মেটে দেওয়াল, বাইরেটা সবুজ ঘাসপাতায় ছাওয়া, চমৎকার দেখতে হল। আর সব পাখিরা নৌকোটা দেখে হিংসেয় জ্বলে গেল। তারা বললে, 'এ নৌকো জলে ভাসবে না, কাত হয়ে পড়বে।' কিন্তু নৌকো ঠিক সোজা ভাসল। তখন তারা বললে, 'জল উঠবে,' কিন্তু জল এক ফোঁটাও উঠল না। তারপর তারা বললে, 'দাঁড় নেই নৌকো কখনো চলে?' বাবুইপাখিরা এবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে দেখে আমি বললুম, 'দাঁড় কী হবে? আমি পাল তুলে ভেসে যাব।' আমার ছেঁড়া কাঁথাখানায় পাল তৈরি করে নৌকোতে খাটিয়ে দিলুম। সেদিন পূর্ণিমে, দেখতে-দেখতে জলের উপর চাঁদের আলোর রাস্তা ধরে ওপারে আমার নৌকো পাড়ি দিতে চলল।

মাঝদিঘিতে আসতে না আসতেই উল্টো বাতাসে আমার নৌকো কাত হবার যোগাড় হল, আমি তাড়াতাড়ি পাল নামিয়ে দিলুম। সামনেই জোড়াসাঁকো, নৌকোটা আস্তে-আস্তে স্রোতের টানে সেই দিকেই চলল। সাঁকোর নিচে দিয়ে পীরবাগানের একটা খাল বেয়ে, নৌকো নন্দনবাগানের গোল ফোয়ারার মধ্যে ছোটো পাহাড়ের গায়ে, এক বিঘত একটা তেঁতুল গাছের তলায় গিয়ে ঠেকল।

আমি তেঁতুলগাছে নৌকো বেঁধে খপ করে ডাঙায় লাফিয়ে পড়লুম। টুনু, অনু, ভানু, রানু বলে একদল মেয়ে, আর সোনা, মোনা, সুজো, সুজি আর টোটো বলে কটা ছেলে, সেই এক বিঘত তেঁতুল তলায় খেলে বেড়াচ্ছিল, আমাকে দেখে বলে উঠল, 'ও ভাই ব্যাঙ!' কেবল সবচেয়ে ছোটো যে টোটো বলে ছেলেটা সে বললে, 'এ ভাই

পাখি।’ সব ছেলেমেয়েগুলো খাঁচা আনতে ছুটল, আমি সেই ফাঁকে আবার নৌকো খুলে একেবারে লালদিঘিতে এসে শ্বেতদ্বীপে নেমে পড়লুম।

বলছি সেখানে সব ‘পরী’ আর ‘পর’ থাকে, আমারও কেউ নয়, তোমারও কেউ নয়। আমাকে দেখে ‘পর’ সব তলোয়ার খুলে তাড়া করে এল। কী যে বিড়বিড় করে বললে, তা বুঝলুম না। আমি হাঁ করে দেখালুম খিদে পেয়েছে, তারা ভাবলে তাদের ভেঙাচ্ছি, তাতে আরো রেগে গেল। তখন একজন বললে, ‘দেখছ না কচি ছেলে, চল ওকে রানীর কাছে নিয়ে যাই, তিনি ওকে গরীব ছেলেদের ইস্কুলে দিয়ে হয়তো মানুষ করে তুলবেন।’

ইস্কুল কেমন দেখিনি কিন্তু আবার মানুষ হতে হবে শুনে ভয় হল। আমি পালাব কিনা ভাবছি, এমন সময় দলে-দলে পরীর সঙ্গে পরীদের রানী লালদিঘিতে জল না খেয়ে হাওয়া খেতে নামলেন উড়তে-উড়তে। সে কী চমৎকার, যদি দেখতে। কিন্তু মানুষের তখন লালদিঘিতে আসবার হুকুম নেই, ফটক বন্ধ। পরীরা আমায় আদর করে কোলে নিয়ে নাচাতে-নাচাতে রানীর সামনে হাজির করলে।

পরীরানী আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ‘তোমার নাম কী?’ আমি বললুম, ‘পুতু।’

রানী শুধোলেন, ‘তুমি কী কর?’

আমি উত্তর করলুম, ‘খাই দাই, বাঁশি বাজাই।’

রানী বললেন, ‘তুমি যদি ডাক্তারি জানতে, তবে আমি তোমাকে মস্ত একটা কেতাব দিতুম।’

‘কেতাব’ কী জানা ছিল না, আমার লোভ হল। আমি বললুম, ‘কী অসুখ জানলে বলতে পারি সারাতে পারব কিনা। আমি জম্বুদ্বীপে জামের রস খাইয়ে অনেক পাখিকে বাঁচিয়ে দিয়েছি।’

পরীরানী ইশারা করলেন, অমনি পরীদেশের সরকারি গোবদ্যি খাতির করে খুব খানিক মিষ্টি কথা বলতে লাগলেন। আমি খানিক

শুনে-শুনে বিরক্ত হয়ে বললুম, 'রোগী দেখতে হয় তো চলুন।' গোবদ্যি বললেন 'আপনার পেট ভরেছে তো? আর যদি মিষ্টি চান তো—' আমি তখন বুঝলুম মিষ্টি কথা দিয়েই পরীরা কেউ অতিথি এলে তার পেট ভরায়। তারপর গোবদ্যি কালিঘাটের পাশে আলিপুরের গোখানায় আমাকে এনে একটা দুধরাজের গাছ দেখিয়ে বললেন, 'এইটি আগে ছাতুবাবুর মাঠে ছিল। সেখানে এটি অজস্র দুধ দিচ্ছিল। গরমের দিনে না চাইতেই অত দুধ দিয়ে, পাছে গাইটি মারা পড়ে, তাই দয়া করে আমরা এটিকে গড়ের মাঠে এই চমৎকার পিঁজরাপোলে এনে রেখেছি। প্রথম প্রথম, দিন নেই রাত নেই, দুয়েও এর দুধ আমরা শেষ করতে পারিনি, কিন্তু আজ-কাল ফোঁটা কতকের বেশি আর দুধ দিচ্ছে না।'

দুধরাজ গাছকে এরা গাই বলে শুনে আমার হাসি পাচ্ছিল কিন্তু তবু গম্ভীর হয়ে বললুম, 'কতদিন ধরে এমনটা হয়েছে?'

গোবদ্যি বললেন, 'এই শীতটা পড়ে অবধি।'

আমি অমনি বললুম, 'ঠাণ্ডায় দুধ সব জমে আইসক্রীম হয়ে যাচ্চে না তো?'

গোবদ্যি বলে উঠলেন, 'আজ্ঞে না। ওর বাঁটে আমরা গুলের আগুন বসিয়ে দেখেছি, তাতেও কিছু হয় না।'

আমি ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলুম না, মনে-মনে বললুম, 'পুতু! এইবার তোমার কথা ফুরলো। গাই যদি দুধ না দেয়, তবে কালিঘাটের হাড়কাঠে ছেড্যাং করে দেবে তোমার মাথাটি।' যেমন এই কথা মনে হওয়া অমনি আপনিই সেই ছড়াটা মনে পড়ল, 'কেনরে গরু খাস না?' গরুটা অমনি বলে উঠল, 'রাখাল কেন চরায় না?' আমি কথার উত্তর পেয়েছি দেখে বুঝলুম, দুধরাজ গাছটা এখনো মরেনি একেবারে। আমি আবার শুধোলুম, 'কেন রাখাল চরায় না?' উত্তর হল, 'বৌ আর ভাত দেয় না।' আমি এতক্ষণে বুঝলুম কেন দুধ দিচ্ছে না গরু। সব দুধ রাখাল খাচ্ছে, ভাত না পেয়ে। আমি গোবদ্যিকে বললুম, 'রাখালের বৌকে রোজ

একসের চালের ভাত দিও, গরুও দুধ দেবে।' আমার কথায় গোবদ্যির বিশ্বাস হল না।

তিনি বললেন, 'এ কথা তো ডাক্তারি কেতাবে লেখে না, একজন ভাত খেলে অন্য জন ভালো দুধ দেবে?' তিনি গজগজ করতে করতে চালের চালান লিখতে গেলেন।

তার পরদিন গরু আবার দুধ দিতে লাগল। গরু দুধ দিলে কিন্তু পরীদের কাছ থেকে কেতাব আমি পেলুম না। কী জানি সে গোবদ্যিটা তাদের কাছে কী বললে, একদিন দেখলুম গোবদ্যিই কেতাব পেয়ে গেল। আমি কেবল পরীদের বিয়েতে বাঁশি বাজাবার ফরমাশ পেতে লাগলুম আর মিষ্টি কথায় পেট ভরিয়ে আসতে লাগলুম।

একদিন যখন টাপুর-টুপুর বিষ্টি হচ্ছে, আমি একটা ছিপ নিয়ে আদিগঙ্গায় মাছ ধরতে চলেছি, এমন সময় পরীদের রানীর কাছ থেকে হুকুম এল : নন্দনকাননে শিবঠাকুরের বিয়ে—তিন ডানাকাটা পরীর সঙ্গে হবে। সব ঠিক কিন্তু শিবঠাকুরের মন কিছুতে গলতে চাচ্ছে না, জমে বরফ হয়ে গেছে, অনেক গরম জল খাইয়েও কিছু হয়নি, এখন আমাকে গিয়ে তাঁর মনটি গলিয়ে দিতে হবে, না হলে চলছে না। বিয়েটি দিয়ে দিতে পারলে আমি যা চাই তাই পাব। আমি সেবারেও কিছু পাইনি, এবারেও হয়তো ফাঁকে পড়ব, এই ভেবে আমি একসঙ্গে দুই বর চেয়ে বসলুম। পরীদের রানী তাই দিতে রাজি হয়ে বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন। বিয়ের দিন শিবঠাকুর, শিবসদাগর সেজে, ময়ূরপঙ্খিতে চড়ে লালদিঘিতে এসে উপস্থিত। লালদিঘির ঘাটে-ঘাটে, গাছে-গাছে, জলে-স্থলে সেদিন সব জোনাক পোকার পিদিম দিয়ে সাজানো হয়েছিল। ভূতের কেত্তন, গলাব জি, ভোজবাজি, ভেল্কিবাজি, বাঁশবাজি, ডিগবাজি, লাঠিবাজি কত বাজিই হচ্ছিল। সবাই জল খাচ্ছিল, হাওয়া খাচ্ছিল, খাবি খাচ্ছিল, বিষম খাচ্ছিল, হোঁচট খাচ্ছিল, চোখ খাচ্ছিল, চুক খাচ্ছিল, সুদ খাচ্ছিল, ঘুষ খাচ্ছিল, খাপ খাচ্ছিল, মিশ খাচ্ছিল, ঘুরপাক খাচ্ছিল, গালাগালি খাচ্ছিল, কীল, চড়, লাথি ঘুঁসি, গুঁতো

খাচ্ছিল, জুতো খাচ্ছিল, চাবুক খাচ্ছিল, আছাড় খাচ্ছিল, হিমসিম খাচ্ছিল, মোচড় খাচ্ছিল, কানমলা খাচ্ছিল, গলাধাক্কা খাচ্ছিল, টোল খাচ্ছিল, দোল খাচ্ছিল, ভ্যাবাচাকা খাচ্ছিল, কত খাবারের নাম করব, এমন খাওয়া কোথাও খাইনি। নুন থেকে কচুপোড়া আর ঘণ্টা পর্যন্ত। এত খাওয়া-দাওয়া, তবু শিবঠাকুরের মন গলছে না। সরকারি ডাক্তার থেকে-থেকে তাঁর বুকে চোঙা বসিয়ে ঘড়ি দেখছেন আর কেবলি ঘাড় নাড়ছেন। কত সুন্দর-সুন্দর পরী তাঁর চারদিকে ঘিরে মিষ্টি কথায় তাঁর মন গলাতে চেষ্টা করতে লাগল। তুমি আমি হলে গলে একেবারে জল হয়ে যেতুম কিন্তু শিবঠাকুর কাদাও হলেন না। বরফের পাহাড়ের মতো থির হয়ে বসে রইলেন। লালদিঘির গরম গরম লালপানি কত যে খাওয়ানো হল কিন্তু তাতে শিবঠাকুরের মনটা গলা দূরে থাক বরং আরো জমে উঠল তাঁর ঘুম। আমি একপাশে দাঁড়িয়েছিলুম, সরকারি ডাক্তার আমাকে ইশারা করলেন কাছে এসে দেখতে, কিন্তু আমি তার মতলব বুঝে-ছিলুম, সেদিকেই গেলুম না। পরীরা আমার হাতে-পায়ে ধরতে লাগল, আমি বললুম, 'ওই সরকারি গোবদ্যিটাকে সরিয়ে না দিলে আমি রোগ সারাতে পারব না। আর আগে আমাকে তোমাদের রানী দুটি বর দিন, তবে তোমাদের বরটি ভালো হবে।'

পরীরানী তখন বললেন, 'তবে এইখেনে হাঁটু গেড়ে বোস, বল কী বর চাও।'

আমি বর চাইলুম, 'আমি আমার মার কাছে যেতে পারি যেন।' আমি পরীদের দেশে থেকে তাদের বাঁশি শোনাই, এইটেই সবার ইচ্ছে ছিল।

পরীরা বললে, 'এ কি আবার বর হল? একটা বরের মতো বর নাও।'

আমি বললুম, 'তবে আমি যেন মায়ের কাছে যেতে পারি, কিন্তু যদি মা আমায় চিনতে না পারেন, তবে যেন আবার এখানে ফিরে আসতে পারি।'

রানী আমাকে প্রথম বর দিয়ে বললেন, 'এইবার শিবঠাকুরের মন গলিয়ে তোমার দ্বিতীয় বর নাও।'

আমি বললুম, 'আগে মাকে দেখে আসি তারপর নেব।'

পরীরা বললে, 'তা হবে না। তুমি যদি পালাও।'

আমি তখন আমার বাঁশিতে পাগলা ঝোরার গান ধরলুম, যা শুনে বরফ গলে ঝরনা হয়ে বেরিয়ে আসে, মন তো মন। শিবের মন গলে জটা বেয়ে ঝরনার মতো ঝরঝর করে পিচকিরি দিয়ে পড়তে থাকল সবার গায়। তখন পরীরা খুশি হয়ে আমার পিঠ চাপড়াতে লাগল। যেমন পিঠ লাল হয়ে উঠল, অমনি আমি উড়তে আরম্ভ করলুম। উড়তে পেয়ে প্রথমটা আমার এমন আহ্লাদ হল যে আমি মায়ের কথা ভুলে গেলুম। কেবলি গির্জের চুড়ো আর মনুমেণ্ট ঘুরতে লাগলুম। তারপর শেষে আস্তে-আস্তে আমাদের বাড়িতে এসে দেখলুম জানলা খোলা রয়েছে, মা খাটের উপর ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি আস্তে পায়ের দিকে খাটের ফুলটার উপরে বসলুম। মা গালে হাত রেখে ঘুমিয়ে আছেন, কালো চুলের খোঁপাটি বালিসের উপর এলিয়ে পড়েছে। দেখাচ্ছে যেন ছোট্ট একটি পাখির বাসা, কিন্তু পাখি নেই। আমার মনে পড়ল এক-একদিন মায়ের চুল নিয়ে আমি খেলা করতুম, আর মা সেই কালো চুল দিয়ে আমাকে জড়িয়ে জাল দিয়ে পাখিধরা খেলতেন। দেখলুম তাঁর বাঁ হাতখানি ঘুমের ঘোরে আমাকে যেন জড়িয়ে ধরতে চাইলে, হাতে সোনার চুড়ি ঝিনঝিন করে বেজে উঠল। আমি আস্তে-আস্তে তাঁর পায়ে হাত দিলুম। ইচ্ছে হল মা বলে ডাকি, আর মা উঠে আমার গলা জড়িয়ে ধরেন। একবার ডাকলেই জানি মা জেগে উঠে আমাকে কোলে টেনে নেবেন, কিন্তু পারলুম না। মন কেন যে খোলা জানলার দিকে, আকাশভরা তারার দিকে, পাতায় ছাওয়া গাছের দিকে, গাছে ছাওয়া বাগানের দিকে, বাগানের শেষে বনের দিকে, মাঠের দিকে, বারে-বারে টানতে লাগল কে জানে!

যে ছোটো বাক্সতে আমার কাপড় থাকত, সেটা খুলে দেখলুম

এখনো আমার লাল ফতুয়া, লাল জুতুয়া সেখানে রয়েছে। একবার ভাবলুম পরে দেখি, কিন্তু ভয় হল যদি আর খুলতে না পারি! সিন্দুকের কোণে আমার ঝুমঝুমিটা ছিল সেটা হাতে নিলুম। কে জানে, সেটা বেজেছিল কিনা, ওদিক থেকে মা বলে উঠলেন, 'পুতু!' আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। তারপর শুনলুম, মা একটি নিশ্বাস ফেলে আবার ঘুমোলেন। আর একবার যদি মা ডাকতেন তবে নিশ্চয়ই আমি ধরা দিতুম। কিন্তু আর তিনি ডাকলেন না, আমি উঠে গিয়ে দেখলুম তাঁর ঘুমন্ত চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে। আমি অনেকক্ষণ ধরে মায়ের পায়ের কাছে বসে, আমার নাম দিয়ে ঘুমপাড়ানো গান বাঁশিতে বাজালুম, যদি মা জেগে ওঠেন! আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, মা জেগে উঠে আমার বাঁশি শুনে অবাক হয়ে বলেন, 'আহা, কী বাঁশি বাজালি পুতু!' কিন্তু দেখলুম মা অকাতরে ঘুমুচ্ছেন। খোলা জানলা আবার আমার মনকে টানতে লাগল। মনে পড়ল পরীরানীর কাছে আর একটা বর নিতে হবে। আমি মায়ের কাছেই ফিরে আসব কিন্তু তার আগে আর একবার কাকমশাই আর সব পাখিদের কাছে বিদায় নিয়ে আসি। আমায় উড়তে দেখে পাখিগুলো ভারি আশ্চর্য হবে, আমাকে হয়তো তাদের রাজা করতে চাইবে কিন্তু মাকে আমি ছেড়ে যাব না। এইসব ভাবতে-ভাবতে কখন আমি জানলা দিয়ে বেরিয়ে একেবারে দূরে চলে গেছি, তখন আর ফেরবার উপায় নেই, সকাল হচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি জম্বুদ্বীপে নেমে পড়লুম।

সেখানে আবার সব পুরোনো খেলা নতুন করে খেলতে, নৌকো ভাসাতে, ঘুড়ি ওড়াতে, কত মাস কেটে গেল। সেখান থেকে রাজা-বাগান, রায়বাগান সব দেখে আবার পরীর দেশে খাই দাই বাঁশি বাজাই। তারপর একদিন স্বপ্নে দেখলুম, মা আমার কাঁদছেন। সেইদিনই আমি রানীর কাছে শেষ বর নিয়ে উড়তে-উড়তে আবার আমাদের বাড়ি চললুম। আবার চোখে পড়তে লাগল, সেই গাছ, সেই নদী, সেই নদীর ধারে আমাদের বাড়ি, সেই বাড়ির এককোণে

মায়ের শোবার ঘরের সেই জানলা। কিন্তু হায়, কাছে এসে দেখলুম জানলায় কে জাল লাগিয়ে দিয়েছে বাইরে থেকে। মা আর একটি কচি ছেলের গলা জড়িয়ে অকাতরে ঘুমিয়ে আছেন, সেই খাটে সেই পিদিম-জ্বালানো ঘরের মধ্যে। আমি জালের বাইরে ডানা ঝটপট করে ডাকলুম, 'মা, মা'। কেউ সাড়া দিলে না। আমার ঘরে যাবার পথ লোহার জাল দিয়ে চিরকালের মতো বন্ধ রইল। আমি যেখান থেকে এলুম, সেইখানে ফিরে চললুম, আকাশভরা চাঁদের আলোর নিচ দিয়ে, কাঁদতে-কাঁদতে 'মা, মা' বলে।

উড়ে-যাত্রা

'পুতুর বই'খানি শেষ করে সোনার মা দেরাজে সেটি যত্ন করে রাখলেন। যদি কোনোদিন পুতু চায় তো ফিরিয়ে দিতে হবে। বইখানি পড়ে পুতুর উপর সোনার মা'র একটু মায়া হল। তাঁর মনে হল পুতু যেন ঐ বুড়ো সোনাতোন হয়ে, সোনা হয়ে, আঙুটি পাঙুটি হয়ে, তাঁকে মা বলে ডাকছে। বিকেলবেলার সোনা-রোদ জানলার ধারে এসে পড়েছে, মনে হল যেন পুতুর জন্যে একখানি কাঁথা কে পেতে রেখেছে। গাছের তলায় ঘাসের উপরে ছাওয়ার মধ্যে চাকা-চাকা রোদ, যেন পুতু সোনা-পায়ে হেঁটে গেছে, তারই ছাপ পড়েছে। বাতাসে আতাগাছের পাতাগুলি মনে হচ্ছে যেন পুতুকে নিয়ে দোলা দিচ্ছে।

সোনার মা সেই সোনার-রোদে-মাখা বিকেলবেলায় আবার যেন নিজের ছেলেবেলার মধ্যে গিয়ে পড়লেন। দূরে নদীর ধারে একটা নৌকো যেন শিব সদাগরের বাণিজ্যে যাবার জন্যে ঘাটে ভিড়েছে, জোয়ার এলেই ছাড়বে। নদীর জল তাই যেন আস্তে-আস্তে কাদার উপর দিয়ে ছুপ-ছুপ করে নৌকোর দিকে এগিয়ে আসছে। নদী নৌকোকে ডাকছে, 'চলে এস চলে এস।' নৌকো ডাকছে জলকে, 'কাছে এস কাছে এস।' যেন বাইরে থেকে বাপের বাড়ি সোনার মাকে আজ ডাকছে, সরল পথে তরল গাছের হাতছানি দিয়ে, 'এস এস,' আর বলছে, 'হিম জল হিম থল হিম শীতল পাটি, তোমার জন্যে বিছিয়ে বসে আছি, কখন তোমার হিম বুকের ছাতি' এসে লাগবে বাপের বাড়ির লোকের বুকে আর একটিবার।

ঠিক এই সময় খাতাঞ্চিমশায় ডাকলেন, 'অগো শুনে যাও।'

সোনার মা এক হাতে কাঁসার রেকাবিতে আকের কুচি, এক

ডেলা ছানা, খানিক কাশীর চিনি, আর এক হাতে জলের ঘটি নিয়ে এসে বললেন, 'ডাকলে কেন ?'

খাতাঞ্চিমশায় আক চিবোতে-চিবোতে বললেন, 'চক্কোত্তিদের ওখানে আজ উড়ে-যাত্রা হবে, শিগগির আমার চাদরখানা সোনা-তোনকে চট্ করে কুঁচিয়ে দিতে বলো।'

সোনার মা বললেন, 'সোনাতোন যে আজ ক'দিন হল দেশেগেছে।'

খাতাঞ্চিমশায় বলে উঠলেন, 'বড়ো তো মুশকিল! দাও চাদরখানা আমি কুঁচিয়ে নিচ্ছি।' খাতাঞ্চিমশায় চাদর কোঁচাতে বসলেন।

সোনার মা বললেন, 'আমিও যাত্রায় যাব।'

খাতাঞ্চি বলে উঠলেন, 'তুমি আমি সবাই যাব তো ছেলেদের দেখে কে, সোনাতোন নেই ?'

সোনার মা বললেন, 'বোহিম দেখবে এখন।'

বোহিমের নাম শুনেই খাতাঞ্চি চটেছিলেন, বললেন, 'বটে! আমার লণ্ঠন বইবে কে ? আমি কি অন্ধকারে পড়ে মরব ? আমি এখনি যাচ্ছি, বোহিমকে লণ্ঠন নিয়ে পরে পাঠিয়ে দিও।'

সোনার মা বললেন, 'বাঃ। তুমি তো ঢের যাত্রা দেখেছ। তুমি ঘরে থাক না, আমি যাই।'

খাতাঞ্চি আপত্তি করলেন, তিনি না গেলে চক্কোত্তিমশায় ভারি দুঃখিত হবেন। আর হয়তো দেখবার শোনবার লোক অভাবে আসরই মাটি হবে। উড়ে-যাত্রা সোনার মা কখনো দেখেননি, তিনি ঝগড়া করে চক্কোত্তিদের বাড়ি চলে গেলেন সন্ধে হতেই চুপি-চুপি। সোনার মা যাত্রা দেখতে গেলেন বটে কিন্তু রাগ করে কাউকে না বলে ছেলেমেয়েদের একলা রেখে এসেছেন, মনটি তাঁর বাড়িতেই পড়ে রইল।

চক্কোত্তিদের বাড়ি যেতে চক্কোনী তাঁকে বললেন, 'ও সোনার মা, তোর চোখ লাল কেন ? কেঁদেছিস বুঝি ?'

সোনার মা'র আরো কান্না পেল, আঁচলে চোখ মুছে বললেন, 'না পিসিমা, চোখ উঠবে বোধহয়।'

'একটু মনসার কাজল দিস,' বলে পিসিমা মুখে সর ঘষতে-ঘষতে পুকুরঘাটে গেলেন। চক্কোত্তির বড়োবৌ সোনার মা'র হাত ধরে ঘরে বসালে।

ওদিকে উঠোনে যাত্রাওয়ালারা ঢোলে চাঁটি দিলে, 'নাগ ধূম নাগ ধূম।'

খাতাঞ্চিমশায় গলা চিরে একবার ডাক দিলেন, 'বলি ও হরিকিষ্ট, গিরিনরুমে একটা মোমবাতি।'

সোনার মায়ের বুকটা ধড়াস করে উঠল। তবে তো তিনিও এসেছেন। বাড়িতে কেউ নেই, যদি চোর ঢোকে! যদি ছেলেধরা—

যাত্রার অধিকারী গান ধরলে, 'নীলরতন, কিবা নবঘন, নীল নবদল হারে।' বেওলাওয়ালা ছড়ি টানলে, 'সাসা নিনি ধাপা গাগা ধাধা মামা মাগাগা মারে সানি।'

সোনার মা ঘুলঘুলিতে বসেই দেখতে পেলেন খাতাঞ্চিমশায় গলায় চাদর ঝুলিয়ে আসরে বসে ডাবা হুঁকো টানছেন, আর তাঁর টাক বাতির আলোয় চকচক করছে, যেন সাটিনের টুপি। সোনার মা খুঁজলেন, বোহিম কুকুরটাও এসেছে কিনা। বোহিম নেই দেখে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে যাত্রা শুনতে গুছিয়ে বসলেন। খাতাঞ্চিমশায় ওদিকে বাড়িতে যে কী কাণ্ড করে এসেছেন তা তো সোনার মা জানেন না।

খাতাঞ্চিমশায় চাদর কুঁচিয়ে কাঁধে ফেলে ঘরের মধ্যে আফিমের কৌটো চাইতে এসে সোনার কাছে শুনলেন, মা চাবি নিয়ে চলে গেছেন। খাতাঞ্চি বসে পড়লেন। তিনি সোনাকে শুধোলেন, মা তাদের দুধ খাইয়ে গেছেন, না এসে খাওয়াবেন? তখনো খাতাঞ্চির আশা ছিল, হয়তো ইনি পাড়া বেড়াতে গেছেন এখনি আসবেন।

কিন্তু সোনা বললে, 'মা ওইখানে দুধ ঢাকা দিয়ে গেছেন, বললেন বাবার কাছে খেয়ে নিস।'

খাতাঞ্চি বললেন, 'তবে দুধ খেয়ে নে, আমি এখনি চক্কোত্তির বাড়ি গিয়ে তোর মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

দুধের পোলো খুলে সোনা দেখলে দুধের বাটির পাশে চাবি কাঠিটি রয়েছে। চাবি পেয়ে খাতাঞ্চি তাড়াতাড়ি দেরাজ খুলে আফিমের কৌটো নিয়ে টেকে গুঁজলেন আর দেরাজটা বন্ধ করে দিতে ভুলে গেলেন। আফিমের কৌটোটা পেয়ে খাতাঞ্চিমশায়ের মেজাজ ঠাণ্ডা হয়েছিল। তিনি সোনার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'লক্ষ্মী সোনা, ছেলেদের দুধ খাইয়ে, ঘুম পাড়াও।'

সোনা গিন্নীপনা করতে পেয়ে ভারি খুশি। গম্ভীর হয়ে বললে, 'বাবা, পাণ্ডুটির যে এখনো পাঁচন খাওয়া হয়নি।'

খাতাঞ্চি ভাবছিলেন, পাঁচন আজ থাক কিন্তু এই সময় পাণ্ডুটি বলে উঠল, 'না আমি খাব না।'

যেমন খাব না বলা, অমনি খাতাঞ্চি তাকের উপর থেকে ভাঁড় নিয়ে সোনাকে বললেন, 'দে খাইয়ে।'

সোনা গিন্নীপনা করে বললে, 'আজ না হয় নাই খেলে।'

খাতাঞ্চি ধমকে বললেন, 'ফের আদর দেওয়া! অমন বয়সে কত পাঁচন খেয়েছি, কোনোদিন না করিনি, উল্টে বরং যে কবিরাজ পাঁচন দিত তাকে আশীর্বাদ করেছি।'

খাতাঞ্চি পষ্ট মিছে কথা বললেন, কিন্তু একবারও তাঁর মনে হল না যে সেটা মিছে কথা বরং ভাবলেন সত্যিই বলছি। সোনাও তাই বিশ্বাস করলে, সে ঘাড় নেড়ে বললে, 'বাবা তুমি এখন যে কুইনান দেওয়া ওষুধটা খাও, সেটা পাঁচনের চেয়ে তেতো, নয়?'

খাতাঞ্চি পাণ্ডুটির দিকে চেয়ে বললেন, 'তেতো বলে তেতো! শিশিটা যে হারিয়ে ফেলেছি, না হলে দেখতিস এখনি ঢক করে তোর সামনে একদাগ খেয়ে ফেলতুম, একটুও মুখ না সিঁটকে।' শিশিটা হারায়নি, সোনার মা সেটা তক্তার নিচে শিশিবিক্রিওলার জন্যে রেখেছিলেন, আণ্ডুটি জানত। সে আস্তে আস্তে শিশিটা বার করে বললে, 'এই নাও, এক দাগ আছে।'

খাতাঞ্চির মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'যে তেতো ডাক্তারটা দিয়েছে!'

সোনা বললে, 'বাবা, ঢক করে গলায় ঢেলে দাও না, কিছু হবে না।' খাতাঞ্চি খানিক ভেবে বললেন, 'আগে ও পাঁচন খাক।'

পাঙুটি বলে উঠল, 'দুজনেই একসঙ্গে খাও বাবা।'

খাতাঞ্চি বললেন, 'আচ্ছা তুই এক দুই গোন।'

সোনা গুনতে থাকল, এক দুই তিন, পাঙুটি ঢক করে পাঁচন গিলে ফেলল। খাতাঞ্চিমশায় শিশিটা ফস করে চাদরে লুকিয়ে ফেললেন। পাঙটি প্যাঁ করে কেঁদে উঠল। সোনা তাকে ভোলাতে লাগল আর বলতে লাগল, 'কেন কাঁদালে বাবা? ও আর দুধ খেতে চাইবে না, ঘুমোবেও না।'

খাতাঞ্চি বিপদে পড়লেন। তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমি তো খাচ্ছিলুম, হাতটা ফসকে গেল। আচ্ছা দেখ মজা করছি।' খাতাঞ্চি মাটিতে ওষুধটা ঢেলে দিয়ে ডাকলেন, 'বোহিম আয় দুধ খাবি।' বোহিম লেজ নেড়ে ওষুধটা চেটেই মাটিতে মুখ ঘষতে লাগল। সোনা তার চোখটা দেখলে, যেন বলছে, 'আমি আর তোমাদের বিশ্বাস করব না।'

সোনা শুকনো মুখে বললে, 'ছি বাবা! তুমি ভারি লোককে ঠকাও।'

খাতাঞ্চি বললেন, 'আরে তামাশা করলুম বুঝলিনে?'

সোনা বোহিমের গলা জড়িয়ে বলতে লাগল, 'কাঁদিসনে বোহিম। আমি তোকে আমার বাটি থেকে দুধ দেব।'

পাঙুটি বললে, 'বাবা ভারি দুষ্টু।'

খাতাঞ্চির ভারি রাগ হল, তিনি কুকুরটাকে এক লাথি দিয়ে বললেন, 'দূর তোর কুকুর! ওর আবার আদর দেখ!'

বোহিম কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ির বাইরে চলে গেল। খাতাঞ্চি রেগে সদর দরজাটা ধমাস করে খুলে চক্কোত্তির বাড়ি চলে গেলেন।

চক্কোত্তিদের বাড়ি বেশি দূরে ছিল না, কিন্তু মাঝপথে খাতাঞ্চির মেজাজটা ঠাণ্ডা করে দেবার জন্যেই যেন এক পশলা বিষ্টি রাস্তা কেবল কাদা করে দিয়ে গেল। খাতাঞ্চিমশায় চটি জুতো হাতে

নিয়ে যখন যাত্রাবাড়িতে উপস্থিত হলেন, তখন ঢোলে চাঁটি পড়েছে, সোনার মাকে আর খবর পাঠানোর সময় হল না। খাতাঞ্চি কোমর বেঁধে যাত্রাওয়ালাদের গ্রীনরুমের তদ্‌বির করতে গেলেন। খাতাঞ্চি চলে যাবার পরেই সন্ধেবেলার যেটুকু আলো ঘরের মধ্যে ছিল, আস্তে-আস্তে জানলা গলে সেটুকু বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করল। দিনটা যেন দু-একবার হাই তুলে চোখ বুজলে। সঙ্গে-সঙ্গে আঙুটি পাঙুটি আঙুল চুষতে-চুষতে ঘুমিয়ে পড়ল। সোনা অন্ধকারে রাজ্যের জিনিস দেখতে পেত, অনেক ছেলেমেয়েই পায়। আঙুটি অন্ধকার হলেই দেখত কে যেন দুটো চোখ বের করে জলের কুঁজোটার পাশ থেকে একটা লম্বা হতে বাড়িয়ে তার পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে আর একহাতে তার পা এমন চেপে ধরেছে যে আঙুটি আর টেনে নিতে পারছে না। পাঙুটি দেখে, মস্ত পেট নিয়ে মোটা কলসীটা আর লম্বা গলা নিয়ে জলের কুঁজোটা জলচৌকির দুপাশে বসে সিঁদুরের কৌটো, চুমকি ঘটি, ছোটো শিশি, মলমের বাটি, জিনতানের ডিবে, তাম্বুলিনের চোঙা, দেশলাইয়ের বাক্স, সুতোর রিল, এমনি সব টুকিটাকি নিয়ে দাবা খেলতে বসে গেছে। কিন্তু আজ আঙুটি পাঙুটি দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেবল সোনা জেগে-জেগে যাত্রা শুনছে।

খোল বললে প্রথমে, 'থাক থাক সিন সিন,' ঢোল অমনি বলে উঠল, 'সাজ সাজ সাজ যুগল যুগল।' বাঁয়া তবলা অমনি বলে উঠল, 'চুনকালিতে চুনে হলুদে, গোঁফ ফেলে দে' মৃদং অমনি বলে উঠল, 'দাড়ি দেখা যাক, ক্ষতি নাই থাক, নথ পরানো নথ পরানো,' মন্দিরে বুলি ধরলে, 'টিকিটি কাটি, টিকিটি কাটি, না হলে মাটি,' করতাল বলে উঠল, 'রয়েছে ফাঁক রয়েছে ফাঁক, চুলেতে ঢাক মাথার টাক।' এইবার ঐকতান বাদন বলতে লাগল, 'পালকের বগ দেখানো বালকের মাথায় টুপি, মোগলের কেষ্ট চুড়ো দু গালে রোঁয়ার থুপি। রাধিকের অধিক শোভা গোঁফের আড়ে ঝুটো মতি, সখিদের মনোলোভা মোজার উপর পীতোধোটি।' এইবার কেষ্ট এলেন অমনি

হারমোনিয়ার সঙ্গে সখীরা গাইলে, 'এল কিষ্ট এল ওই বাজল বাঁশরী।' কেষ্টর হাতে নাল কাটির বাঁশি তো বাজল না। বেহালা তাই বাজতে লাগল, 'কানে কানে একবার বল তারে, যেন সে ছড়ি ধরে দ্বারী হয়ে থাকে প্রবাসে, কেন বাজাতে আসে, ও কেন বা আসে।'

হঠাৎ বেহালার তার পটাং করে ছিঁড়ে গেল অমনি সোনা দেখলে, কিচ করে জানলাটা ফাঁক হতে-হতে সবটা খুলে গেল, হুয়া-হুয়া বলে শেয়াল ডাক দিলে আর পুতু খোলা জানলা দিয়ে ঝুপ করে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে বললে, 'কী দেখছ ?'

সোনা চুপি-চুপি বললে, 'যাত্রা শুনছি।'

পুতু বললে, 'এখানে কী দেখবে ? গিরিনরুমে চলো দেখবে সেখানে কত ভালো-ভালো সঙ আর কত মজা।'

সোনা বললে, 'গিরিনরুমে ঢুকতে দেবে কেন ? আমাদের তো টিকিট নেই।'

পুতু বললে, 'আমার পাশ আছে, আর আমাকে তারা চেনে, কিছু বলবে না।'

সোনা পাশ দেখতে চাইলে। পুতুর সবুজ বইখানার মধ্যে পাশ ছিল, বুকের পকেটে বইখানা খুঁজতে গিয়ে পুতু দেখে কোথায় সেখানা পড়ে গেছে। সে চারদিকে খুঁজতে লাগল। সোনা বললে, 'কী খুঁজছ ?'

পুতু কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'আমার পকেট বইটা।'

সোনার মুখ শুকিয়ে গেল, বুঝিবা আর গিরিনরুমে যাওয়া হল না। পুতু খানিক ভেবে বললে, 'নিশ্চয় সেদিন যখন কুকুরটা তেড়ে এল তখন এই ঘরে পড়েছে।'

সোনা বললে, 'তবে হয়তো মা সেটা কুড়িয়ে তুলে রেখেছেন। চলো তো খুঁজি।'

খাতাঞ্চি যাবার সময় দেরাজে চাবি দিতে ভুলেছিলেন, পুতু তাড়াতাড়ি সেটার মধ্যে ঢুকে খুঁজতে আরম্ভ করলে। দেরাজের মধ্যে

অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, পুতু তার মধ্যে পকেট বই খুঁজে বেড়াতে-বেড়াতে একটা এসেন্সের শিশি উল্টে পড়ে পুতুকে নাইয়ে দেবার যোগাড় করলে। সে একখানা রুমালে তাড়াতাড়ি মাথা মুছে যেমন উঠে দাঁড়াবে, অমনি মাথাটা ঠক করে দেরাজের ডালায় ঠুকে গেল। পুতু তখন হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজতে-খুঁজতে একটা খালি সাবানের বাক্সর মধ্যে যেমন হাত দিয়েছে, অমনি এক আরশোলা কট করে তার আঙুল চেপে ধরলে। পুতু তাড়াতাড়ি সেটাকে ঝেড়ে ফেলে পালাতে গিয়ে, কাগজের ঠোঙায় কাপড় রাঙাবার গিরিন রঙ ছিল, উল্টে তারি মধ্যে পড়ল। পুতু হাতে মুখে রঙ মেখে সঙ সেজে হাঁপাতে-হাঁপাতে দেরাজ থেকে বেরিয়ে বললে, 'আমি তো পেলুম না, তুমি দেখ।'

সোনা দেরাজে হাত দিতেই এক পেকেট ছুঁচ তার হাতে ঠেকল, সে সেইটে পুতুর হাতে দিতেই, 'তবে চলো' বলে পুতু একেবারে টেনে জানলার ধারে নিয়ে গেল।

সোনা বললে, 'ওমা! আমি তো উড়তে পারিনে পড়ে যাব যে।' পুতু সোনার হাত ধরে বললে, 'ভয় কী? উড়তে শিখিয়ে দেব। পক্ষিরাজ ঘোড়ার মতো আকাশ দিয়ে বোঁ করে উড়ে যাবে।'

সোনা বললে, 'উঃ বাবারে! আমার মাথা ঘুরবে।'

পুতুর ভয় হল বুঝি সোনা না-যেতে চায়। গল্প তা হলে কে বলবে? সে সোনাকে লোভ দেখাতে লাগল, 'আমরা মেঘের উপরে গদি বিছিয়ে শুয়ে-শুয়ে তারাগুলোর সঙ্গে গল্প করতে-করতে উড়ে চলব, আর যখন সমুদ্দুরের উপর দিয়ে চলব তখন দেখতে পাবে মৎস্যকন্যারা সব ঝিনুকের নৌকোয় করে মুক্তো ধরতে বেরিয়েছে।'

সোনা বলে উঠল, 'কী মজা! মৎস্যকন্যাদের নেজ আছে?'

পাছে 'না' বললে সোনা যেতে না চায়, তাই পুতু চালাকি করে বললে, 'তাদের মাথায় যে বারো হাত বিনুনি, তাতেই হীরে মুক্তোর ঝাপটা, তাই দিয়ে জল কেটে তারা চলে। চলো, দেখবে কী মজা।'

আর বলতে হল না, সোনা পুতুর হাত ধরে বললে, 'আঙুটি পাঙুটিকেও উড়তে শেখাও। ছেলেমানুষ ওদের একলাটি ফেলে আমি তো যেতে পারব না।'

পুতু বললে, 'ওরা ছেলেমানুষ, তা তুমি যখন বলছ, তখন চলুক।' আঙুটি তক্তা থেকে আধখানা ঝুলে আর পাঙুটি একেবারে তক্তার নিচে চিৎপাত হয়ে নাক ডাকাচ্ছিল, সোনা ঠেলা দিয়ে তুলে দিয়ে বললে, 'ওঠো, পুতু আমাদের উড়তে শেখাবে।'

পাঙুটি চোখ রগড়ে বললে, 'আমাকে তক্তায় উঠিয়ে দাও দিদি।' আঙুটি অমনি তক্তার উপর সোজা দাঁড়িয়ে বললে, 'কই দেখি, ওড়াও দেখি।'

পুতু জোরে এক ফুঁ দিলে, অমনি আঙুটি বেলুনের মতো ঘরের কড়িকাঠে কেবল মাথা ঠুকে-ঠুকে বেড়াতে লাগল আর পা দুটো সুতোর মতো নিচে ঝুলতে লাগল। পুতু তার পা ধরে নামিয়ে, একটা বালিস চাপা দিয়ে রেখে, কী করে দুই কাঁধে ডাইনে বাঁয়ে, কী করে দুহাত ঝুলিয়ে নিচে, দুপা ছড়িয়ে চিৎ কিম্বা উপুড় হয়ে উড়তে হয়, কেমন করে বাঁ হাত ঝুলিয়ে বাঁ কাত বা ডান হাত ঝুলিয়ে ডান কাত মেরে বাতাস কেটে যেতে হয়, সব দেখিয়ে দিলে।

আঙুটি বললে, 'চলো বেরিয়ে পড়ি।'

পাঙুটি বললে, 'চলো না, চাঁদের মধ্যে কী আছে দেখি।'

সোনা তখনো এদিক-ওদিক চাইছে, আঙুটিকে চুপিচুপি বললে, 'ভাই, বড়ো ভয় হচ্ছে, কোথায় যেতে কোথায় নিয়ে যাবে, আর বাড়ি ফেরা যাবে না।'

আঙুটি বড়ো হয়ে একজন মহাপণ্ডিত ভূতত্ত্ববিদ হবে, তাই পৃথিবীর একটা পরিষ্কার ম্যাপ বিধাতা খাতাঞ্চিমশায়ের খাগড়ার কলম দিয়ে মোটা-মোটা লাইনে তার কপালে আঁচড়ে দিয়েছিলেন। সে বললে, 'কিছু ভয় নেই! সোজা উড়ে চলো, পৃথিবী যখন গোলাকার, তখন যেখান থেকে বেরিয়েছি ঘুরে ঠিক সেই শোবার ঘরেই পৌঁছব দেখো।'

পাঙটি একজন হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো ছেলে থেকে শেষে গাজনের সন্নেসী হবে। তাই তার মাথায় বিধাতা অর্ধচন্দ্র লিখেছিলেন। সে বলে উঠল, 'ফেরবার কী দরকার? সোজা চাঁদের মধ্যে গিয়ে বোম মহাদেব হয়ে বসে থাক।' সোনা একজন পাকা গিন্নী হবে, বিধাতা তার কপালে হেঁসেল, হাতা, বেড়ি, বঁটি, ঢেঁকি, এককড়া দুধ আর বাজার খরচের ধারাপাত লিখেছিলেন, সে বললে, 'যাবে তো চাঁদে, খাবে কী সেখানে?' সেই সময় একটা চলতি বাতাস হুস করে ঘরে ঢুকে তাদের ক'জনকে উড়িয়ে নিয়ে চলল আর বেরিয়েই একটা মেঘে পাঙটি এমনি ধাক্কা খেলে, যে মনে হল যেন কে তার মাথায় এক থাবড়া বসিয়ে দিলে। সকলে মেঘের উপরে একটু জিরোতে বসল। এই সময় সোনার গল্প বলবার কথা ছিল কিন্তু পুতু নিজেই গল্প শুরু করে দিলে, জম্বুদ্বীপে কাক বকের সঙ্গে কী হয়েছিল, বাবুইবাসার নৌকো কোথায় গেল, শ্বেতদ্বীপে পরীরা কী বর দিলে ইত্যাদি। পুতুর মায়ের কথা যখন সে বলছিল তখন সোনার ভয় হল; সে বললে, 'আমরাও ফিরে এসে যদি দেখি আমাদেরও জানলা বন্ধ হয়ে গেছে, তা হলে কী হবে?'

আঙুটি পাঙুটি দুজনেরই মন ভারি খারাপ হতে আরম্ভ হল, আর অমনি তারা পড়তে আরম্ভ করলে মাটির দিকে। সোনা দেখে ভারি ভয় পেলে, সেও সঙ্গে-সঙ্গে পড়তে থাকল। পুতু সাবধান করে দিলে, অত মন ভারি করলে তো চলবে না, মন হাল্‌কা কর। কিন্তু মন কেমন করে হাল্‌কা হয়, সোনা আঙুটি পাঙুটি তা জানে না। আঙুটি গায়ের জামাটা খুলে ফেলে দিলে, পাঙুটির গলায় একটা ঢোলের মতো মাদুলি ঝুলছিল সে সেটা ছিঁড়ে ফেললে, সোনা তার পায়ের মল দুগাছা ঝেড়ে ফেলে, কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না, তিনজনে চুপসোনো মানুষবেলুনের মতো হাত পা লটপট করতে-করতে চক্কোত্তিদের যাত্রার আসরের ঠিক ধারটিতে নেমে পড়ল।

ঠিক সেই সময় দুগগাঠাকুরের শাদা সিংহীর মতো ঝাঁকড়া জটা

দাড়ি নিয়ে যাত্রার নারদ মুনি একতারা বাজিয়ে সভার মধ্যিখানে হরিবোল হরিবোল বলে নাচ শেষ করলেন, আর অমনি উপর থেকে মেয়েরা খই বাতাসা ছড়াতে আরম্ভ করলে। একটা বাতাসা সোনার কোলে এসে পড়ল, সে সেটি গালে দিয়ে চুপ করে যাত্রা দেখতে লাগল। আঙটি পাঙটি যাত্রা কখনো দেখেনি, হাঁ করে বসে রইল, আর সোনা অনেকবার যাত্রা দেখেছে তার একটুও ভালো লাগল না, বাতাসা চুষতে-চুষতে ঘুমিয়ে পড়ল। বাতাসা গলে যেমন গলার মধ্যে গেছে, অমনি বাতাসে সোনার গাল দুটো বেলুনের মতো ফুলে উঠেছে আর অমনি সে আবার উড়তে আরম্ভ করেছে।

সবাই যাত্রা দেখেছে, কিন্তু যেখান থেকে যাত্রাগুলো জ্যান্ত হয়ে, নানারকম সঙ সেজে, শাদা ফরাসপাতা আসরে এসে রঙ্গ-ভঙ্গ দেখায়, সেই গিরিনরুম কটা লোক দেখেছে? ওই যে সবুজ পর্দা, কী ছেলে কী বুড়ো, যাত্রাওলা না হলে ওর ওদিকে যাবার যো নেই, আর ওদিকে কী হয় তা দেখবারও উপায় নেই। চারদিকে কাঠগড়া, শাদা ফরাস পাতা জায়গাটা হল আসর, সেখানে কাদা পায়ে যদি ছেলেরা ঘুরে বেড়ায় তাতে কেউ আপত্তি করবে না, এমন কি যাত্রার ঢোল, বেহালা, হারমোনিয়া, অধিকারীর খাতা, সব তুমি খুব কাছে থেকে গিয়ে ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখতে পার কিন্তু গিরিনরুমের দিকে এক পা বাড়িয়েছ কি অমনি, 'এদিকে নয়—ওদিকে যাও।' তাতেও যদি আর এক পা এগোও তবে শুনতে হবে, 'এখানে কী করছ ছোকরা? পালাও।' কিন্তু পর্দায় হাত দিয়েছ কি, রাবণ, হনুমান, জাম্বুবান, রাক্ষস, খোক্কস যে যেখানে আছে হাঁ-হাঁ করে তেড়ে আসবে, মায় তামুক-সাজিয়ে ছোঁড়াটা পর্যন্ত।

বোকোস্‌রা যেমন গাছ চালিয়ে স্বর্গ মর্ত পাতাল ঘুরে বেড়াতে পারে, তেমনি যাত্রাওলারা ইচ্ছে করলে গিরিনরুম নিয়ে এ-পাড়া ও-পাড়া, এ-গ্রাম ও-গ্রাম, এ-দেশ সে-দেশ করতে পারে। অত বড়ো গিরিনরুম তো দেখেছ, যাত্রা শেষ হলে সব একটি ছোটো সিন্দুকে ভরে নিয়ে অধিকারী তোমাকে নমস্কার করে চলে যাবে। তেমনি হিজলীর বনটা হল পুতু অধিকারীর গিরিনরুম, আর যত বেওয়ারিশ ছেলে নিয়ে তার যাত্রার দল। থিয়েটারের স্টেজ দেখেছ তো, তার মধ্যে জল আছে, বন আছে, বাড়ি আছে, শহর আছে, কী যে নেই তা বলা যায় না। আবার ইচ্ছে করলে ছাতার মতো সব গুটিয়ে

নিয়ে চলে যাও। তেমনি সবুজ তাঁবুর মতো হিজলী বন পুতুর গিরিনরুম আর আসর, দুই। পুতু যেখানে খুশি মুড়ে এটাকে নিয়ে গিয়ে যেখানে খুশি আবার খাটাতে পারে। তিনশো পঁয়ষট্টি ডাল, এক-এক ডালে একটি শাদা আর একটি লাল লণ্ঠন ফানুসের তারার মতো ঝোলানো, প্রত্যেক ডালে আবার এক হাজার চারশো চল্লিশটা করে কাঁচের কলম, চব্বিশ রঙের রামধনুকের মতো আভা দিচ্ছে। প্রত্যেক ষাট ডাল আবার রকম-রকম রঙের সাজে সাজানো, যেন ছয় রঙের থাম দেওয়া ছটা আসর। প্রথমটা পোড়া মাটির লাল দিয়ে আগাগোড়া মোড়া, রগ-রগ করছে, আসর সরগরম। তারপর ভিজে মাটির ঠাণ্ডা রঙের সপ দিয়ে মোড়া, আসর সপসপ করছে গোলাপ জলের পিচকিরিতে। তারপরের আসর সব নীলের উপরে তারা পদ্মফুল দিয়ে আগাগোড়া মোড়া। এরপর সবুজ আর ধানি রঙের সাজে মোড়া আসর, তারপর কুয়াশা আর বরফের মতো শাদা সাজানো আসর। এরপর বাসন্তি রঙ দিয়ে মোড়া ফুলে-ফুলে সাজানো আসর। মাঝে পাঁচরঙা পর্দা, তারই আড়ালে পাঁচ ডালের থাম দেওয়া পুতুর গিরিনরুম। পোড়ামাটির আসরে বোশেখ জষ্টি, ভিজে মাটির আসরে আষাঢ় শ্রাবণ, পদ্মফুলের আসরে ভাদ্র আশ্বিন, ধানি আসরে কার্তিক অঘ্রাণ, শাদা আসরে পোষ মাঘ, হলদে আসরে ফাগুন চৈত, দুমাস করে পুতুর যাত্রা বসে। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত, এই ছমাসে ছয় ঋতুর পালা বা মেলা দেখান পুতু অধিকারী, ষাট-ষাট থামের ছটা আসরে।

তখন শীতকাল, পুতু সোনাকে নিয়ে শীতকালের শাদা আসরের একধারে শুইয়ে দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে দিলেন, আর একধার থেকে শীতের কনসার্ট বেজে উঠল, 'হিম সিম হিম সিম।' অমনি রোঁয়ার টুপি তুলোর কাপড় গলাবন্ধ জড়ানো, কান ঢাকা, যেন ভালুকের ছানার মতো, ইচিং বিচিং চাঁচি মুচি নুমু ননরু বেরিয়ে এল শীতের শাদা আসরে জুড়ি-জুড়ি। অমনি শীতের ঝিঁঝিঁ পোকা চারদিকে

কেবল সোনাতোন তখনো দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে ইঁটের বালিশে মাথা রেখে। [পৃঃ ১১৬]
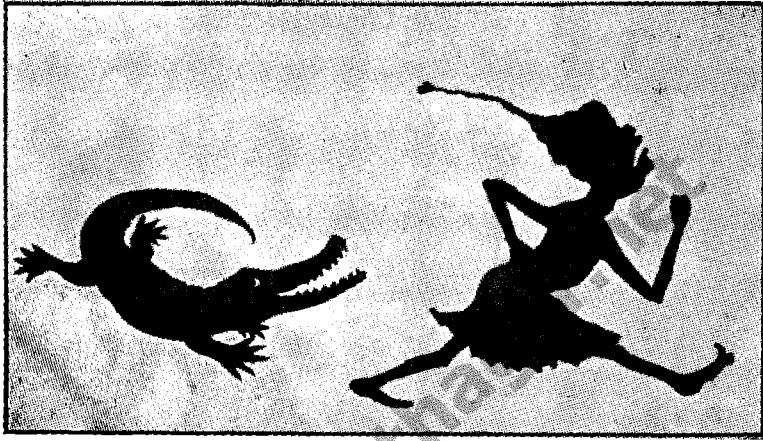
ভ্যালা এক কুমীর সঙ্গে লেগেছে, তিষ্ঠতে দেবে না দেখছি। [পৃঃ১৭৩]

যাত্রার নারদ [পৃঃ ১৬৬]

(নারদের প্রবেশ) এই যে নারদ-ঠাকুর আসছেন। [পৃঃ ১৭২]

বাজনা বাজিয়ে দিলে, 'হিম সিম হিম সিম, শিল শিলাতি শিলাতা শিলা, ঝিম ঝিমাতি ঝিমাতা ঝিমা,' আর ছেলেরা গান ধরলে,

'সোনার আলো পড়ুক এসে, হিমে ঢাকা বনের তলে
সোনার পাখি পড়ুক উড়ে, শুকনো গাছের ডালে ডালে
সোনার কাটি, ছুঁইয়ে এস সোনার কাটি
মাটির বুকে জলে স্থলে
ঘুম ভাঙিয়ে, রঙ ধরিয়ে, ফুলে ফুলে ফলে ফলে ॥'

আঙুটি পাঙুটিকে ঘিরে ছেলে বুড়ো পশু পক্ষী সবাই গান শুনে বাহবা দিতে লাগল। সা-মোরগ লম্বা গলা নেড়া মাথা কেবলি নাড়তে থাকলেন, হাড়গিলে গলার থলি দুলিয়ে গম্ভীর হয়ে কেবলি দুপায়ে তাল দিতে লাগলেন। সেই সময় সবাইকে চমকে দিয়ে গুড়ুম করে অন্ধকার কাঁপিয়ে তোপ পড়ল, অমনি রাজ-পুত্তুর হয়ে পুতু আসরে এসে বললেন, 'বন্ধুরা, আর এখন গান গাইবার সময় নেই, ঐ দেখ তোপ পড়ল, এই রাতের মধ্যে সোনার কাটি দিয়ে সব জাগিয়ে তুলতে হবে।'

সোনার কাটি ছুঁইয়ে সমস্ত বনকে না জাগালে সবাই যে ঘুমিয়ে থাকবে অন্ধকারে হিমের চাদর মুড়ি দিয়ে। এদের আগে জাগানো চাই। পুতুর বন্ধু ইচিং বিচিং চাঁচিমুচি অমনি এগিয়ে বললে, 'সোনার কাঠি পেয়েছ বন্ধু ?'

পুতু গম্ভীর হয়ে টেঁক থেকে ছুঁচ বার করে বললেন, 'এই সেই সোনার কাটি যার সন্ধান করে দেশবিদেশে রাজপুত্তর হয়ে স্যন্নাসীর মতো এতদিন ফিরেছি।'

অমনি ইচিং বিচিং চাঁচিমুচি উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম চারকোণে দাঁড়িয়ে গান ধরলে,

'নিঠুর নিরদয় তোমায় দয়াময় বলাও বল কোন গুণে !
হয়ে রাজপুত্র বনবাসী দাসী হয় রাজমহিষী
সকলি তোমারি কৃপায়।

যারে রাখ পায় সে কী না পায়
যারে না রাখ পায় বিপদ ঘটাও পায় পায়।'

টিয়েপাখি থেকে টিকটিকি পর্যন্ত আহা আহা করতে লাগল। পুতুলাল রুমালে চোখ মুছে বললেন, 'অহে শুক, বিধাতার দোষ দাও কেন সকলি আমার অদৃষ্টের ফের। না হলে যে স্বর্ণসীতাকে নিয়ে এই দণ্ডকারণ্যে স্বর্গতুল্য বলে জ্ঞান করেছিলুম, কেন তিনি আজ আমাকে অকূল শোকসাগরে ভাসিয়ে ইন্দ্রজিতের রাক্ষসী মায়ায় মূর্ছিতা হয়ে একটিও কথা কইছেন না? হায় আমি কী করি, কোথায় যাই?'

অমনি নমু ননরু হনুমান আর বিভীষণ হয়ে বললে, 'হনু থাকতে কিসের ভাবনা! প্রভু অনুমতি করুন আমি এখনি বিশল্যকরণী এনে আমার মাকে বাঁচাই। বলুন তিনি কোথায়?'

বিভীষণ অমনি এগিয়ে এসে বললেন, 'সখে, কিসের ভাবনা? বিভীষণ থাকতে কিসের ভাবনা? বলো সে কোন মায়াবী, আমি এখনি তার শিরশ্ছেদ করে তোমার সখে নাম সার্থক করি।'

পুতু বললেন, 'সখে, আমার স্বর্ণলতা এই মোর অরণ্যে এসে মূর্ছিতা হয়েছেন; তোমরা তাঁকে এনে দিয়ে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করো।'

হনু বললে, 'কী! মা আমার ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছেন? খুড়োমশায় আর বিলম্ব করবেন না; আপনার নিশাচরগণকে নিয়ে তথায় অগ্রসর হন আমি আমার তালগাছের মুগুরটা নিয়ে এখনি এলেম বলে।'

পুতু বললেন, 'দেখো বাপু হনু, মুগুর নিয়ে আর নিশাচর নিয়ে হঠাৎ উপস্থিত হলে বিদেহ রাজ নন্দিনী ভীতা হবেন; বুঝে সুঝে কাজ করো বাপু। হায় ভাই লক্ষ্মণ যদি শক্তিশেলে না পড়তেন তবে আজ কি সেই দুরাত্মা মায়াবী স্বর্ণসীতার একটি কেশ স্পর্শ করতে পারত?'

বিভীষণ অমনি পুতুর গলা জড়িয়ে রোদন করে বললেন, 'সখে, রোদন কোরো না; তোমার অশ্রুবারি দেখলে আমি মরমে মরে যাই।

চলো সখা গৃহে চলো আমি নিশাচরদের বলছি এখনি তারা স্বর্ণ-সীতাকে এই দণ্ডকারণ্যে এনে উপস্থিত করবে।'

পুতু বললেন, 'সখে, তিনি রাজকুমারী আমি অরণ্যবাসী, তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে যা কিছু করতে হয় তুমি করো।'

বিভীষণ বললেন, 'সখে, মা জানকীর জন্যে আমি এক অপূর্ব প্রাসাদ এখনি প্রস্তুত করে দেব। ওরে কে আছিস লঙ্কা থেকে প্রধান-প্রধান ভাস্কর কারিগর আর শিড়পিগণকে আহ্বান করো, এই রাত্রের মধ্যে মায়ের জন্যে সোনার পুরী প্রস্তুত করে দিতে আজ্ঞা করো। চলো সখে রাত্রি অধিক হল একটু বিশ্রাম করবে।'

প্রথম দৃশ্য শেষ হল ; সকলে প্রস্থান করলেন।

অমনি মোটা গলায় আর্গিন পাখির সুরে বেহাগ রাগিণীতে গান হল ; একে ঘোরা রজনী গাঢ় তমস্বিনী ইত্যাদি।

জোনাক পরীকে পুতু সত্যভামার পাঠ দিয়েছিলেন, তিনি আলেয়া আর ফুলকি দুই সখী সঙ্গে আসরে এলেন। সত্যভামার গেরুয়া কাপড়, এলোচুল, কপালে সিঁদুরের টিপ, ঠোঁটে আলতা, মুখে পাউডার, হাতের কনুই পর্যন্ত শাদা, বাকিটা কালো, তাতে হরিনামের মালা জড়ানো, পায়ে ঘুঙুর।

সখীদের মাথায় কাগজের ফুলের চেঙারি, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত বিবিয়ানা ঘাঘরা, উকিল ধরনে দুকাঁধে সবুজ চাদর, নাকে নোলক, কালো চামরের চুল ঘাড় পর্যন্ত, হাতে রুমাল।

সত্যভামা শুরু করলেন, 'সখী! তোমরা আমাকে আর অনুরোধ কোরো না, আমি এবার নিশ্চয় বনবাসিনী হব। তোমরা ঘরে যাও সেই নির্দয়কে বলো, সত্যভামা মরেছে এখন রুক্মিনীকে তিনি দ্বারকা-পুরে আনাতে পারেন।'

সখীরা অমনি ভাঙা গলায় বলে উঠলে, 'সখী সত্যভামা, ওগো রাজনন্দিনী, অমন কথা বোলো না। শুনলে আমাদের বুক ফেটে যায়। কী ছলে সন্ন্যাসিনী হবে, শিবপুজো করো 'দেবাদিদেব মহাদেব খুশি হলে কী না করতে পারেন?'

সত্যভামা চোখে আঁচল দিয়ে বললেন, 'শিবপুজো আর করব না। ফল হাতে হাতে পাচ্ছি ; আর কোনো উপায় থাকে তো বলো।'

প্রথম সখী বলে উঠল, অন্য সখীকে, 'কি লো তুই তো অনেক ব্রত করেছিস, বল না সখী আমাদের কী ব্রত করলে রাজরানী হবেন ?'

অন্য সখী অমনি গালে হাত দিয়ে বললে, 'ওমা আমি আবার কবে ব্রত করলাম লো ? ব্রত-ট্রত আমি জানিনে। ছেলেবেলায় করেছি এখন কি আর মনে আছে ? (নারদের প্রবেশ) এই যে নারদ-ঠাকুর আসছেন, ওঁকে শুধানো যাক। পেন্নাম হই দাদাঠাকুর।'

নারদ অমনি আশীর্বাদ করে বললেন, 'বুঝেছি পেন্নামের ঘটা দেখেই বুঝেছি, বর-টর কিছু চাই নাকি ?'

সখীরা অমনি গালে আঙুল ঠেকিয়ে বলে উঠলে, 'না ঠাকুর বর চাইনে, আমাদের সখী কোন ব্রত করলে রাজরানী হবেন তাই বলে দিন।'

নারদ চোখ বুজে মালা ঘোরাতে-ঘোরাতে বললেন, 'কলিতে সেঁজুতি ব্রত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। সত্যভামাকে সেই ব্রত করতে বলো, আমি কর্তার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।' সত্যভামা যেমনি নারদকে প্রণাম করলে অমনি নারদ বললেন, 'মা! বড়ো ক্ষুধা লেগেছে, আজ তোমার এখানে ফলার করে তবে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল নিমন্ত্রণ করতে বার হব।'

সখীরা অমনি বলে উঠল, 'কার বিয়ে ঠাকুর ?'

নারদ 'রুক্মিণী' বলেই অমনি মাথা চুলকে, 'তা মা তা আমি তবে এখন আসি।' বলে তো প্রস্থান করলেন।

সত্যভামা মুখ গম্ভীর করে বললেন, 'শুনলে সখী আমি এ প্রাণ রাখব না।'

সখীরা বললে, 'সখী সেঁজুতি ব্রতের সব গুছিয়ে দিয়েছি, এস এই বেড়ির উপর ফুল ধরে বলো, বেড়িবেড়ি সতীনের দাঁতে মারি নুড়ি।' সত্যভামা আসরের এক ধারে ব্রত করতে বসলেন।

ওধারে সুর্পনখা খর দূষণ দুই ভাই নিয়ে উপস্থিত হয়ে নাকি সুরে আরম্ভ করলে, 'আমার নাক কেটে সে স্বর্ণসীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় যাবে, সুর্পনখা বেঁচে থাকতে তা হবে না।'

খর দূষণ বলে উঠল, 'দিদি তোমার নাকটা নাকি সে কেটে নিয়ে কুমিরকে খাইয়েছে শুনতে পাচ্ছি?'

সুর্পনখা রেগে উত্তর করলে, 'সে কথায় আর কাজ নেই, নাকের মাংস খেয়ে কুমিরটার লোভ বেড়েছে, সেই থেকে সে রোজ আরো মাংসের চেষ্টায় টিকটিক করে ফিরছে আমার সঙ্গে দিনরাত।'

খর দূষণ বললে, 'দিদি ওই শোনো একটা যেন টিকটিক শব্দ পাচ্ছি।'

সুর্পনখা বললে, 'চলো চলো পালাই তবে, স্বর্ণসীতা কেমন করে হরণ করব ভ্যালা এক কুমির সঙ্গে লেগেছে, তিষ্ঠতে দেবে না দেখছি।' সুর্পনখা চলে গেল খর দূষণকে নিয়ে।

সখীরা বলে উঠল, 'শুনলে সখী বাঘের শত্রু সাপে খাবে, ভাবনা নেই।'

সত্যভামা জবাব দিলেন, 'সহচরী, তোমাদের ব্রতের ফল ফলেছে। চলো এখন নারদ মুনিকে খাইয়ে-দাইয়ে তুষ্ট করি গে।'

এইবার তৃতীয় দৃশ্য; যুদ্ধের বাজনা বাজছে; নিশাচর নিশাচরী-দের নাচতে-নাচতে প্রবেশ; ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নিচন্দ্র ভালিকে, অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস্য হাসিকে।

দূরে দেখা গেল সুর্পনখা স্বর্ণসীতা হরণ করে পালাচ্ছে অমনি হনুমান, বিভীষণ, পুতু, ইচিং বিচিং সবাই ধনুক আস্ফালন করতে-করতে আসরে নামলেন, মার-মার ফের-ফের হিন্দি-ভিন্ধি-ভাষিকে, এহি-এহি দেহি-দেহি গর্ব-খর্বকারিকে, সিংহভাব ফেরু-বার ফেরুপাল পালিকে। লড়াই চলল। ঢক্ক ঢক্ক হক্ক হক্ক চক্ক চক্ক ভক্ক ভক্ক।

পুতু ধনুক আস্ফালন করে বললেন, 'তিষ্ঠ-তিষ্ঠ রে দুষ্টগণ, এখনি উচিতমতো শাস্তি দিচ্ছি। এই ব্রহ্মাস্ত্র জুড়লেম আর তুই কোথায় পলায়ন করবি?'

স্ুর্পনখা সোনাকে কাঁধ থেকে আসরে নামিয়ে মেঘ গর্জন করে বললে, 'আয় দেখি, নরাধম আজ অযোধ্যার রাজবংশ নির্মূল করব। যুদ্ধং দেহি আয়।' একটা পাথর নিয়ে স্ুর্পনখা এগিয়ে এল, অমনি পুতু ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন। স্ুর্পনখা পড়ল। কুমির এসে তাকে খেয়ে ফেলল।

পুতু সোনার পাশে 'হা সীতে' বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে গাইলেন।

'হায় রে বিধাতা নিদারুণ, কোন দোষে হইলি বিগুণ,
বনে দিয়া নানা দুখ দেখায়ে সীতার মুখ,
শেষে দুঃখ বাড়ালি দ্বিগুণ।
হায় হায় কী কব বিধিরে
সম্পদ ঘটায় ধীরে ধীরে
কেড়ে নেয় সুখের নিধিরে।'

এই সময় হরিগুণ গান করতে করতে নারদ আসছেন। ইজার চাপকান-পরা জুড়ি অমনি কানে হাত দিয়ে গান ধরলে,

জয় জগদীশ্বর জয় জগদম্বে
জয় ভবরানী ভব অবলম্বে
যদি কর মমতা হত হয় যমতা
পরিহার মায়া তব অবিলম্বে।

নারদ পুতুকে উঠিয়ে চৌকিতে বসিয়ে বললেন, 'রামচন্দ্র বৃথা মায়ায় মোহিত হয়ে মূঢ়ের মতো রোদন করছ কেন? সকলি সেই মহামায়ার লীলাখেলা বই কিছু নয়। ভেবে দেখ কে তুমি কোথায় ছিলে কোথায় বা এলে আর কোথায় বা যাবে। রাম তোমাকে আর কী বুঝাব সবই তো জানছ। প্রভু সোনার কাটি স্পর্শ করাও স্বর্ণলতা পুনর্জীবিত হবেন।'

পুতু অমনি বলে উঠল, 'ঠাকুর ভালো কথা মনে করে দিয়েছেন।' বলে পকেট থেকে একটি সুঁচ নিয়ে সোনার পায় ফুটিয়ে দিলে।

সোনা অমনি জেগে উঠে পায়ের বুড়ো আঙুল চুলকোতে

চুলকোতে বললে, 'কে অকালে আমার নিদ্রাভঙ্গ করলে ? হে রাম আমি তোমার কাছে কী অপরাধে অপরাধিনী যে আমাকে বনবাসে দেবে ? হায় কুশি লব তোরা আজ অনাথ হলি। অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী আমাকে বিদায় দাও। মা পৃথিবী কোলে নাও মা'—বলে সোনা আবার মূর্ছিতা হয়ে পড়ল।

যত লোক ছিল কেঁদে ভাসিয়ে দিলে যাত্রা শুনে। সোনা যে পাঠ ভুলে সীতাহরণ থেকে লক্ষ্মণ বর্জন-তারপর একেবারে লব কুশকে নিয়ে পাতাল প্রবেশ করবে এটা পুতুরও আন্দাজ হয়নি। হরিবোল দিয়ে আসর ভেঙে গেল, যারা বাঁদর আর রাক্ষস হয়েছিল সীতা উদ্ধারের পর তাদের নাচ ছিল। যেমনি মা বলে সোনা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন অমনি তারা অসময়ে ভাঙা আসরেই নাচ শুরু করে দিলে। পুতু চৌকি ছেড়ে গিরিনরুমের মধ্যে চলে গেল।

বহুরূপী জুতো চোর ঢাকা দেওয়া খাঁচায় পাখির বদলে একজোড়া পম্পসু নিয়ে মুখে শামা পাখির শিশ দিতে লাগল।

সোনার মা যাত্রা দেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে প্রথমেই ছেলেদের ঘরে গেলেন। দেখলেন আঙুটি পাঙুটি বিছানার চাদরে পা ছড়িয়ে কাঁদছে ফোঁস-ফোঁস করে আর সোনা বিছানায় মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠছে এক-একবার। এমন সময় সোনাতোন এসে বললে, 'দিদিমণি কাঁদ কেন ? কাল তোমাকে ভালো যাত্রা আমি দেখিয়ে আনব।'

আঙুটি পাঙুটি বলে উঠল, 'সোনাতোন আমরা যাত্রা দেখেছি।' সোনাতোন অমনি বললে, 'তবে আর কী ? পাঠশালায় যাবার সময় হয়ে এল, এখন উঠে এসে দুধ খাও।'

সোনা তখনো কাঁদছে দেখে সোনার মা বললেন, 'ওদের ঘুমোতে দে, আজ পাঠশালায় যাবে না, সারারাত যাত্রার কথা ভেবে বোধহয় ঘুমোয়নি।' সোনার মা ছেলে-মেয়েদের চাপড়ে ঘুম পাড়াতে লাগলেন।

•

'ধন ধন ধন, এতদিন ছিলে ধন কোন হিজুলীর বনে
দুখিনীর দুঃখ দেখে এলে ভেসে বানে।'

সোনা বলে উঠল, 'জলে ভেসে তো আসিনি মা, আমি যে পাতাল থেকে মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে এলুম, ওদিকের হিজুলী বন থেকে এদিকে একেবারে ঘরের মধ্যে।'

মা বললেন, 'তুই তবে ভুঁইফোঁড় মেয়ে। এখন ঘুমো,

ধন ধন ধন
আমার কত তুখের ধন
তুঃখু-হরা তুখ-পাসরা তুঃখ-নিবারণ।'

সোনা তুটি ভায়ের সঙ্গে মায়ের কোলের কাছটিতে ঘুমিয়ে পড়ল দেখে পুতু চোখ মুছতে-মুছতে সোনাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল— একলা সেই হিজুলী বনের দিকে। তখন ফাগুন মাস পড়ে গেছে, হিজুলী বনে এবার বসন্তের আসর সাজানো হচ্ছে, নতুন পালা আরম্ভ হবে।

পুতু বাঁশিতে বসন্তবাহার সুর ধরলে। দেখতে-দেখতে দিক-বিদিক সবুজে-সবুজে আলো হয়ে উঠল।

এদিকে খাতাঞ্চিমশায়ের নতুন খাতার এখনো দেরি তুমাস। তিনি সেই কালিমাখা খেরোর খাতার একটা নতুন পাতার শিয়রে লিখলেন, ১লা ফাল্গুন। চক্কোত্তিমশায়ের উড়ে যাত্রা দেখার খরচ তুইজনের একুনে মাত্র তুই আধুলি। হিসেব লিখেই খাতাঞ্চির কপালের মাংস তুজায়গায় কুঁচকে যেন তুটো নালা দেখা দিলে। তিনি কপালের নালায় হাত বুলিয়ে একবার দেখলেন আধুলি তুটো যদি গড়িয়ে সেখানে পড়ে থাকে, কিন্তু তুফোঁটা ঘাম ছাড়া সেখানে আর কিছু হাতে ঠেকল না। সেই সময় সোনাতোন এসে ঢিপ করে নমস্কার করে খাতাঞ্চির পায়ের ধুলো বুকে বুলিয়ে নিলে। খাতাঞ্চি তার দিকে কটমট করে চেয়ে বললেন, 'বিয়ে-থাওয়া করিসনি তো?'

সেই সময় উঠোন থেকে সোনা চেঁচিয়ে বললে, 'সোনাতোনের বেড়ালবৌ ফিরে এসেছে মা দেখ-সে।'

আঙুটি পাঙুটি ডাকতে লাগল, 'আয় পুতু-তু-তু।'

নোটো তাঁতির সেই কালো-কোলো মোট্টা-সোট্টা মেয়েটিকে সত্যিই সোনাতোন দেশের এক কাঠা ধেনো জমি বিক্রি করে বিয়ে করে এনেছিল কিন্তু ভয়ে খাতাঞ্চিকে কিছু বলতে পারছে না। এমন সময় বোহিম কুকুর রান্নাবাড়ি থেকে নোলা সক-সক করতে-করতে সোনাতোনের ঘরে এসে উপস্থিত। সোনাতোনের বৌ যেমন তাকে দেখা অমনি উঁমা উঁমা করে কাঁদতে-কাঁদতে একেবারে তক্তার নিচে গিয়ে সেঁধোল। সোনা তার মাকে বেড়াল বৌ এসেছে খবর দিয়ে সোনাতোনের ঘরে এসে দেখলে বৌ কোথাও নেই, বোহিম তক্তার সামনে মাটিতে শুয়ে আছে।

'সোনাতোন, ও সোনাতোন, তোমার বৌ পালিয়েছে!' বলে সোনা আঙটি পাঙটি একেবারে খাতাঞ্চির ঘরে উপস্থিত। এসেই খাতাঞ্চিকে দেখে তিনজনেই থমকে দাঁড়াল।

তারপর সোনা বললে, 'বাবা! তুমি এখানে এলে কেমন করে?'

খাতাঞ্চি চশমাটা কপালে তুলে বললেন, 'আমি যেখানকার সেইখানেই আছি, তোরা আকাশ থেকে পড়লি নাকি?'

বাস্তবিকই তারা আকাশ থেকে পড়ল। এতক্ষণ তারা ভাবছিল যা কিছু ঘটছে সবই রাতের বেলায় পুতুর গিরিনরুমে হচ্ছে। মা এলেন, সোনাতোন এল, বৌ এল আবার পালাল, এসব কিছুই আশ্চর্য ঠেকল না কিন্তু ভয়ংকর সত্যি হয়ে বাবা এসে উপস্থিত হলেন দেখেই তাদের চটকা ভেঙে গেল। তখন তারা ভয় পেয়ে বললে, 'বাবা, সোনাতোনের বেড়াল বৌ আবার পালিয়েছে।'

খাতাঞ্চি বললেন, 'পালিয়েছে আপদ গেছে। এবার এলে এই লাঠি দিয়ে তার কোমর ভাঙব না?'

সোনাতোনের ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল, সে সোনাকে চুপি-চুপি বললে, 'চল দিদিমণি বৌ কোথা গেল দেখি।' সোনাতোন রান্না-বাড়িতে সোনার মাকে এসে শুধোলে, 'মা আমার বৌ কোথা গেল দেখেছ কি?'

সোনার মা বললেন, 'সোনাতোন। তুইও যে ছেলেদের সঙ্গে ছেলে হলি।'

সোনা বলে উঠল, 'সত্যি মা সোনাতোনের বৌ ঘরে বসে ছিল এই একটু আগে আমি দেখেছি।'

সোনাতোন বললে, 'চল দিদিমণি, খিড়কির পুকুরটা খুঁজে আসি। ছেলেমানুষ, হয়তো জলে-টলে পড়ে গেছে।' খিড়কি পুকুরে কোথাও বৌকে দেখা গেল না। তখন সোনাতোন বুক চাপড়ে কাঁদতে-কাঁদতে খাতাঞ্চির কাছে উপস্থিত।

খাতাঞ্চি রেগে বললেন, 'বৌকে নজরে-নজরে রাখতে পারবি না তো বিয়ে করেছিলি কী করতে? সে পুকুরে ডুবেছে, খানিক পরে ভেসে উঠবে এখন।'

সোনাতোন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'এই বেলা ডুবুরি নামালে হয়তো সে বাঁচতে পারে। তুটো টাকা দিন কর্তা আমি ওমাসে শোধ করব।'

খাতাঞ্চি বাক্স থেকে তুটো টাকা দিয়ে বললে, 'এই হল, আর কিছু চেও না।' গোলমাল শুনে বোহিম উঠোনে বেরিয়ে এল। সেই সময় সোনাতোনের বৌ এক দৌড়ে ঢুকবি তো ঢোক গিয়ে খাতাঞ্চির ঘরে। খাতাঞ্চি তাড়াতাড়ি কলম ফেলে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে রে তুই? ও সোনাতোন এই তোর বৌ নাকি রে?'

খাতাঞ্চির রকম দেখে সোনাতোনের বৌ আরো ভয় পেয়ে কেঁদে উঠে যেমন আবার তক্তার নিচে সেঁধোতে যাবে, ছিল সেখানে কর্তার তুধের বাটি, গেলাস, থালা, ঝনঝন করে উল্টে পড়ল।

সোনাতোন কপাল চাপড়ে বললে, 'এই বৌটা মরেছে!'

সোনার মা, 'কি পলোরে' —এই বলে ছুটে এলেন।

খাতাঞ্চি কানে কলম, হাতে খাতা নিয়ে উঠোনে এসে বললেন, 'এই আজ থেকে রইল হিসেব, তোমাদের যা খুশি করো গে।' খাতাঞ্চি খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে চক্কোত্তির বাড়ি চলে গেলেন।

সোনাতোন বৌকে টানতে-টানতে উঠোনে এনে পিঠে থাবড়া

বসিয়ে বললে, 'আর জায়গা পাওনি মরতে গিয়েছিলে খাতাঞ্চি-খানায়।'

সোনার মা, 'করিস কী রে সোনাতোন?' বলে বৌকে হাত ধরে টেনে নিয়ে পালালেন।

বোহিম ঘেউ করে তেড়ে গেল কিন্তু কামড়ালে না।

সোনা চুপি-চুপি বললে, 'সোনাতোন, বোহিম নিশ্চয় তোমার এ বৌকেও সেই বেড়াল বৌ ভেবে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। দেখলে না ওকে দেখেই খেঁক করে তেড়ে গেল।'

সোনাতোন বললে, 'ঠিক বলেছ দিদিমণি, বোহিমটা তো বৌ নয় যেন বাড়ির কর্তা। আসুক এইবার আমার ঘরের দিকে কেমন ওকে ভাত দিই দেখব।'

বুড়ো আংলা

অবনীন্দ্রনাথ চিত্রিত বুড়ো আংলার প্রচ্ছদ

রিদয় বলে ছেলেটা নামেই হৃদয়, দয়ামায়া একটুও ছিল না। পাখির বাসায় ইঁদুর, গরুর গোয়ালে বোলতা, ইঁদুরের গর্তে জল, বোলতার বাসায় ছুঁচোবাজি, কাকের ছানা ধরে তার নাকে তার দিয়ে নথ পরিয়ে দেওয়া, কুকুর-ছানা বেড়াল-ছানার ল্যাজে কাঁকড়া ধরিয়ে দেওয়া, ঘুমন্ত গুরুমহাশয়ের টিকিতে বিচুটি লাগিয়ে আসা, বাবার চাদরে চোরকাঁটা বিঁধিয়ে রাখা, মায়ের ভাঁড়ার-ঘরে আমসির হাঁড়িতে আরশোলা ভরে দেওয়া —এমনি নানা উৎপাতে সে মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, সবাইকে এমন জ্বালাতন করেছিল যে কেউ তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না।

রিদয়ের মা-বাপ ছিল আমতলি গাঁয়ের প্রজা। দুজনেই বুড়ো হয়েছে। রিদয় তাদের এক ছেলে, বয়স হল প্রায় বারো বছর; অথচ ছেলেটা না শিখলে লেখাপড়া, না শিখলে চাষবাসের কাজ; কেবল নষ্টামি করেই বেড়াতে লাগল। শেষে এমন হল যে তার বাপ-মা বাইরে হাটে-মাঠে যাবার সময় রিদয়কে ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে যেত।

তখন শীত গিয়ে গরম পড়তে আরম্ভ হয়েছে। গাছে-গাছে আমের বোল আর কাঁচা-আমের গুটি ধরেছে, পানাপুকুরের চারধার আমরুলি শাকের সবুজ পাতায় ছেয়ে গিয়েছে; আলের ধারে-ধারে নতুন দুর্বো, আকন্দফুল সবে দেখা দিয়েছে; দূরে শাল-পিয়ালের তেঁতুল-তমালের বনে নতুন পাতা লেগেছে, আর দেখতে-দেখতে সমস্ত বন যেন দুরন্ত বাড়ন্ত হয়ে উঠছে; রোদ পাতায়-পাতায় কাঁচা-সোনার রঙ ধরিয়ে দিয়েছে; কুয়াশা আর মেঘ সরে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন নীল আকাশের কপাট হঠাৎ খুলে গেছে আর

বাতাস ছুটে বেরিয়ে এসেছে—বাইরে! রিদয়ের কুলুপ-দেওয়া ঘরেও আজ দরমার ঝাঁপগুলোর ফাঁক দিয়ে রোদ উঁকি দিচ্ছে, বাতাস সরু সুরে বাঁশি দিয়ে ঢুকছে। রিদয় কিন্তু এসব দেখছে না, শুনছেও না। সে চুপটি করে বসে নষ্টামির ফন্দি আঁটছে। কিন্তু গর্ত ফেলে ইঁদুর যে আজ নতুন বসন্তে শুকনো পাতায় ছাওয়া বাদামতলায় রোদ পোহাতে বেরিয়ে গেছে, বেড়াল-ছানাটা কাঁঠাল-তলায় কাঠবেড়ালির সঙ্গে ভাব করতে দৌড়েছে, গোয়াল ঘরের কপ্‌লে গাই তার নেয়াল বাছুরটাকে নিয়ে ল্যাজ তুলে ঢেঁকির মতো লাফাতে-লাফাতে মাঠের দিকে দৌড় দিলে, ঘুলঘুলি দিয়ে সেটা হৃদয় স্পষ্ট দেখলে।

ঘুলঘুলিটার বাইরে একটা ডালিম গাছ। ডালিমের উপরে ময়ূরের মতো রঙ একটা ছোটো কি পাখি এসে শিস দিতে লাগল —রিদয়ের নাগালের ঠিক বাইরেটিতে বসে—'ও হিরিদয়! ও হিরিদয়!' রিদয় ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েও মাঝের আঙুলের ডগাটি দিয়ে ডালিমটিকে ছোঁয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারলে না। পাখি ডালিমের আর এক ডালে সরে বসে এমন খিট্‌খিট্‌ খিট্‌খিট্‌ করে হেসে উঠল যে রিদয় একেবারে লজ্জায় মাটি!

সে পাখিটাকে ছুঁড়ে মারবার জন্যে একটা কিছু খুঁজতে চারদিকে চাইছে, এমন সময় ঘরের কোণে মস্ত জুটো মরচে-পড়া তালা-আঁটা সুঁদ্‌রি কাঠের উপরে পিতলের পাৎ আর পেরেকের নক্সা-কাটা বহুকালের সিন্দুকটার দিকে তার নজর পড়ল। যে কুলুঙ্গিতে ইঁদুরে-চড়া লাল-মাটির গণেশ ছোটো ঢোলক বাজাচ্ছেন, ঠিক তারি নিচে, ঘরের একদিকের দেয়াল জুড়ে সিন্দুকটা রয়েছে। এতবড়ো যে মনে হচ্ছে যেন একটা রত্নবেদী!

এই সিন্দুকে কী যে আছে,'তা রিদয় এ পর্যন্ত দেখেনি; কিন্তু সে জানে তার ঠাকুরদাদা, তার দাদা, তার আবার দাদার দাদা—এমনি কত পুরুষের বাসন, গয়না আর যা-কিছু ভালো দামী আশ্চর্য সামগ্রী

এই সিন্দুকটায় জমা আছে। লক্ষ্মীপুজোর দিন রিদয়ের মা এই সিন্দুককে সিঁদুরের ফোঁটা, ধানের শীষ দিয়ে সাজিয়ে পুজো করে, টিপটিপ প্রণাম করে কতবার রিদয়কে বলেছেন —'দেখিস, সিন্দুকে পা ঠেকাসনে, ওতে লক্ষ্মী আছেন!'

সিন্দুকটা রিদয়ের বাপ-মা এক-একদিন ভাদ্দর মাসে ঠেলাঠেলি করে খুলে, তার থেকে ভারি-ভারি রুপোর গয়না, বেনারসী শাড়ি, কাঁসার বাসন বার করে, ঝেড়ে-পুঁছে যেখানকার যা গুছিয়ে রাখতেন; কিন্তু সিন্দুকের মধ্যেটায় যে কী, রিদয় এ পর্যন্ত একদিনও দেখতে পেলে না। সে দু'পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে খুব চেষ্টা করে মরচে-ধরা তালা দুটোর ফুটোয় চোখ দিতে পারত; তার উপর তার মাথা উঠত না। তালার ফুটোর মধ্যে অন্ধকারে একটা-কী চকচক করছে দেখা যায়, কিন্তু সেটাকে আঙুল দিয়ে টেনে বার করবার অনেক চেষ্টা করেও রিদয় পেরে ওঠেনি। তালা-দুটোকে যদি ভেঙে ফেলা যেত, তবে তালার মধ্যের জিনিস, সেই সঙ্গে সিন্দুকের মধ্যেটাও সে দেখে নিতে পারত। তালাটা কী করে ভাঙা যায় ভাবতে-ভাবতে রিদয়ের হাই উঠতে লাগল, আর চোখও ঢুলে এল।

সেই সময় কুলুঙ্গি থেকে গণেশের ইঁদুরটা জ্যান্ত হয়ে ঝুপ করে সিন্দুকের ডালায় লাফিয়ে পড়ে ল্যাজ উঠিয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করলে। রিদয় পষ্ট দেখতে পেলে গণেশ মোটা-পেটটি নিয়ে শুঁড় দোলাতে-দোলাতে সিংহাসন থেকে নেমে কুলুঙ্গির ধারে পা ঝুলিয়ে বসে ঢোল বাজাতে লাগলেন আর ইঁদুরটা তালে-তালে ল্যাজ নেড়ে গলার ঘুঙুরের ঝুমঝুম শব্দ করে-করে নাচতে থাকল।

রিদয় ইঁদুর অনেক দেখেছে, গণেশের গল্পও অনেক শুনেছে, কিন্তু জ্যান্ত গণেশ সে কখনো দেখেনি! এই বুড়ো-আঙুল যতটুকু, গণেশটি ঠিক ততটুকু! পেটটি বিলিতি-বেগুনের মতো রাঙা চিকচিকে, মাথাটি শাদা, শুঁড়টি ছোটো-একটি কেঁচোর মতো পেটের উপর গুটিয়ে রয়েছে; কান-দুটি যেন ছোটো দুখানি কুলো, তাতে সোনার মাকড়ি দুলছে; গলায় একগাছি রুপোর তারের পৈতে

ঝোলানো; পরনে লাল-পেড়ে পাঁচ-আঙুল একটি হলদে ধুতি, গলায় তার চেয়ে ছোটো একখানি কোঁচানো চাদর; মোটা-সোটা এতটুকু ছুটি পায়ে আংটির মতো ছোটো-ছোটো ঘুঙুর, গোলগাল চারটি হাতে বালা, বাজু, তাড়; গলা থেকে লাল সুতোয় বাঁধা ছিটমোড়া ছোট্টো ঢোলকটি ঝুলছে। কথকঠাকুর সম্‌সকৃতে গণেশ-বন্দনা করতেন :

গণেশায় নমঃ নমঃ আদিব্রহ্ম নিরুপম পরমপুরুষ পরাৎপর।
খর্ব-স্থূলকলেবর গজমুখ লম্বোদর মহাযোগী পরমসুন্দর॥
হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া সংসার সমুদ্র পিয়া খেলাছলে করহ প্রলয়।
ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি পুনঃ কর বিশ্বসৃষ্টি ভালো খেলা খেল দয়াময়॥

এই বন্দনা শুনে সে গণেশকে মনে করেছিল না-জানি কতই বড়ো! একেবারে পদভরে মেদিনী কম্পমানা! মেঘগর্জনের মতো ঢোল বাজিয়ে—তালগাছের শুঁড়ির মতো মোটা শুঁড় দোলাতে-দোলাতে, কানের বাতাসে ঝড় বইয়ে গণেশ নেচে বেড়াচ্ছেন! আসলে গণেশ যে গণেশ-দাদা পেটটি নাদা, গলায় একটি ঢোলক বাঁধা—পিটুলির পুতুলটির মতো একেবারে ছোটো, ঢোলকটি মাছুলির চেয়ে বড়ো নয়, আর তিনি নিজে তাঁর ইঁতুরটির চেয়ে একটু ছোটো, এটা রিদয় এই প্রথম দেখলে।

রিদয়ের এক-খাঁচা বিলিতি-ইঁতুর ছিল। না খেতে পেয়ে সেগুলো মরেছে! এখন গণেশের সঙ্গে ইঁতুরটিকে ধরবার ফন্দি সে মনে-মনে আঁটতে লাগল। ঘরের মধ্যে নানা জিনিস ছিল, কোনটা গণেশ-ধরার কাজে লাগে, তাই রিদয় দেখতে লাগল। তার এমন সাহস ছিল না যে গণেশকে গিয়ে চেপে ধরে—যদি দাঁত ফুটিয়ে দেয়! বাটনা-বাটা নোড়াটা হাতের কাছে পড়েছিল কিন্তু সেটা ছুঁড়ে মারলে গণেশ এত ছোটো যে চেপ্টে যাবার ভয় আছে; পিতলের বোকনোটা চাপা দেওয়া যায় কিন্তু গণেশকে তা থেকে বার করে খাঁচায় পোরা মুশকিল; আটাকাঠিটা পেলে ঠিক হত কিন্তু রিদয়ের বাবা সেটা চালের মটকায় তুলে রেখেছেন; লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা কাজে লাগতে

পারে কিন্তু গণেশ তো তার মধ্যে ইচ্ছে করে না সেঁধোলে জোর করে ঢোকানো যায় না! চারদিকে দেখতে-দেখতে কোণে ঠেসানো চিংড়ি-মাছ-ধরা কুঁড়োজালিটার দিকে রিদয়ের চোখ পড়ল।

তখন গণেশ সিন্দুকের উপরে নেমে, উপরের দু'হাতে তুড়ি দিয়ে, নিচের দু'হাতে ঢোলে চাঁটি মেরে, ইঁদুরের সঙ্গে-সঙ্গে ঢোল বাজিয়ে নৃত্য করছেন। রিদয় সাঁ-করে কুঁড়োজালি যেমন চাপা দেওয়া অমনি গণেশ তার মধ্যে আটকা পড়ে যাওয়া!

ইঁদুরটা টপ করে লাফিয়ে কুলুঙ্গির উপরে একেবারে সিংহাসনের তলায় যেমন ঢুকেছে, অমনি মাটির সিংহাসন দুম করে উল্টে চুরমার হয়ে গেল। ইঁদুর ভয় পেয়ে ল্যাজ তুলে কোথায় যে দৌড় দিলে তার ঠিক নেই!

গণেশ জালের মধ্যে মাথা নিচু করে দু-পা আকাশে ছুঁড়তে লাগলেন আর বলতে থাকলেন —'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি!' কিন্তু দাঁতে-শুঁড়ে-ঢোলকে-জালে এমনি জড়িয়ে গেছেন যে গণেশের নড়বার সাধ্যি নেই। তালের নুটির মতো জালের মধ্যে আটকা পড়ে গণেশ হাঁপাতে-হাঁপাতে মা-দুর্গাকে স্মরণ করতে লাগলেন; সেই সময় ইঁদুর অন্ধকারে আস্তে আস্তে এসে কটাস-করে রিদয়ের পায়ে এমনি দাঁত বসিয়ে দিলে যে যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগল।

রিদয় জাল ফেলে পায়ে হাত বুলোচ্ছে, এমন সময় গণেশ শুঁড়ে-দাঁতে জাল কেটে বেরিয়ে নিজমূর্তি ধরলেন:

মার-মার ঘের-ঘার হান-হান হাঁকিছে,
হুপ-হাপ দুপ-দাপ আশ-পাশ ঝাঁকিছে!
অট্ট-অট্ট ঘট্ট-ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে,
হুম-হাম খুম-খাম ভীম শব্দ ভাসিছে!
উর্ধ্ববাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য পাড়িছে,
লম্ফ-ঝম্ফ ভূমিকম্প নাগ-দন্ত লাড়িছে!
পদ ঘায় ঠায়-ঠায় জোড়া লাথি ছুটিছে,
খণ্ড-খণ্ড লণ্ড-ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ উঠিছে!

হুল-থুল কুল-কুল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে,
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু-রেণু উড়িছে !

দেখতে-দেখতে চালে গিয়ে গণেশের মাথা ঠেকল। তিনি দাঁত কড়-মড় করে বললেন —'এতবড়ো আস্পর্ধা! —ব্রাহ্মণ আমি, আমার গায়ে চিংড়ি-মাছের জাল ছোঁয়ানো! যেমন ছোটোলোক তুই, তেমনি ছোটো বুড়ো-আংলা যক্ হয়ে থাক !' বলেই গণেশ শুঁড়ের ঝাপটায় রিদয়কে সাত-হাত দূরে ঠেলে ফেলে ভুস করে চণ্ডীমণ্ডপের চাল ফুঁড়ে অন্তর্ধান হলেন।

রিদয় একদিকের দেয়ালে মাথা ঠুকে ঘুরে পড়ল আর দেখতে-দেখতে তার কপাল ফুলে বেল হল। সে বিষম ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে উঠে দেখলে —কেউ কোথাও নেই, মেঝেতে ভাঙা-গণেশের একরাশ রাঙা-মাটি ছড়ানো রয়েছে! গণেশ ভেঙেছে দেখলে বাবা আর তাকে আস্ত রাখবেন না ভেবে রিদয় মাটিগুলো কুড়িয়ে সিন্দুকের পাশে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে দেখে সিন্দুকটা এত বড়ো হয়ে গেছে আর সে এত ছোটো হয়ে গেছে যে অনায়াসে সিন্দুকের তলায় সে গলে গেল! মাথার উপর কড়ি-কাঠের মতো সিন্দুকের তলাকার তক্তাগুলো, তার থেকে আরশোলা ঝুলছে। একটা আরশোলা শুঁড় উঁচিয়ে তাকে তেড়ে এল। রিদয় ভাবছে তখনো সে বড়োই আছে; যেমন আরশোলাকে মারতে যাবে, অমনি সেটা উড়ে এসে এক ডানার ঝাপটায় তাকে উল্টে ফেলে বল্লে —'ফের চালাকি করবি তো কামড়ে দেব! এখন তুই ছোটো হয়ে গেছিস মনে নেই? আগের মতো আর বাহাদুরি চলবে না বলছি।'

রিদয় ভয়ে তাড়াতাড়ি সিন্দুকের তলা থেকে বেরিয়ে নিজের তক্তায় উঠতে গিয়ে দেখে তক্তার খুরোটা তার মাথার থেকে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। তখন রিদয় বুঝলে গণেশের শাপে সে বুড়ো-আঙুলের মতো ভয়ানক ছোটো হয়ে একেবারে বুড়ো-আংলা হয়ে পড়েছে! রিদয় প্রথমটা ভাবল সে স্বপন দেখছে, কিন্তু তিন-চারবার

চোখ বুজে, খুলে, নিজের গায়ে চিমটি কেটে যখন সে বুঝলে সব সত্যি—একটুও স্বপ্ন নয়, তখন রিদয় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ভাবতে লাগল —কী করা যায় এখন ?

গণেশ তো শাপ দিয়ে গেলেন —যক্ হয়ে থাক ! কিন্তু যক্ বলে কাকে ? এই বুড়ো আঙুলটির মতো ছোটো থাকা ? না, আর-কিছু ভয়ানক হবে ?

অন্য ছেলে হলে ভয়ে-ভাবনায় একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকত, কিন্তু রিদয় ছিল নির্ভয়। সে যক্ কাকে বলে কারো কাছে জানবার জন্যে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল।

ছোটো হবার সঙ্গে রিদয়ের দুষ্টুবুদ্ধিও ছোটো হয়ে গেছে, কাজেই সে মাটিতে মাথা ঠুকে গণেশকে মনে-মনে প্রণাম করতে লাগল আর বলতে থাকল —'ঠাকুর, এবারকার মতো মাফ কর। আর আমি এমন কাজ করব না। ঘাট হয়েছে। যক্ কাকে বলে ব'লে দাও।' কিন্তু গণেশ কোনো সাড়া-শব্দ দিলেন না।

গণেশের ইঁদুর রিদয়ের উপর ভারি চটেছিল, এতক্ষণ তার ভয়ে সে মটকা থেকে নামতে পারেনি, রিদয় ছোটো আর ভালোমানুষ হয়ে গেছে দেখে সে গোঁফ-ফুলিয়ে কাছে এসে বললে —'কেমন ! যেমন কর্ম তেমনি ফল ! এখন থাকোগে পাতালে যক্ হয়ে অন্ধকারে বসে ! আর আলোতেও আসতে পাবে না, বাপ-মাকেও দেখা হবে না।'

বাপ-মায়ের উপর রিদয়ের বড়ো-একটা টান ছিল না, কিন্তু পাতালে চুপটি করে থাকা কিছুতেই সে পারবে না। সে ইঁদুরকে শুধোলে —'ভাই, যক্ কী রকম ?'

ইঁদুর উত্তর করলে —'সেকালে লোকে ছেলে-পিলে না হলে বুড়ো হয়ে মরবার সময় যক্ বসাত, —জোঁক বসানো নয়, যক্ বসানো ! আগে সব বাড়িতে একটা করে চোর-কুটরি ছিল, ডাকাত পড়লে সেই ঘরে মেয়ে-ছেলেদের নিয়ে গেরস্তরা গিয়ে লুকিয়ে থাকত। এই চোর-কুটরির নিচে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে পাতালের মধ্যে একটা কুয়োর মতো অন্ধকার জায়গায় লোকে কখনো-কখনো যক্

বসাত। ছেলেধরা দিয়ে খুঁজে খুঁজে তোমার মতো নিডর দুষ্ট ছেলে তারা ধরে এনে, তাকে ভালো কাপড়, সিঁদুরের টিপ দিয়ে বলির পাঁঠা যেমন করে সাজায় তেমনি করে সেই অন্ধকার পাতাল-পুরীতে এক থালা খাবার, এক ভাঁড় জল দিয়ে, নিজে না খেয়ে, দানধ্যান না করে যে-সব ধন-দৌলত জমা করেছে তারই কাছে বসিয়ে দিয়ে, একটি পিদিম জ্বালিয়ে তারই নিচে একটা গোখরো সাপের হাঁড়ি রেখে বলত—'এই যকের ধন তুমি আগলে থাক। যে এখানে ঢুকবে, তাকে যেন সাপে খায়।' হ্রিং টিং ফট এই মন্তর বলে বুড়ো গর্তের মুখে একটা মস্ত পাথর চাপা দিয়ে বেরিয়ে আসত।'

রিদয় বিষম ভয় পেয়ে বলে উঠল —'তারপর ?'

'তারপর আর কী ? দু'চার দিনে থালার খাবার, ভাঁড়ের জল ফুরিয়ে গেলে ছেলেটা রোগা হয়ে শুকিয়ে-শুকিয়ে মরে যেত! পিদিমটাও তেল ফুরিয়ে নিভে গেলে অন্ধকারে ডাঁশ-পোকা সব বেরিয়ে তার গায়ের মাংস ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত। সেই সময় গোখরো সাপ ডাঁশের লোভে হাঁড়ি ভেঙে বেরিয়ে এসে মরা-ছেলের ফাঁপা-মাথার খুলিটার মধ্যে বাসা বেঁধে ধন-দৌলত আগলাত। আর ছেলেটা যক্ হয়ে সেই অন্ধকারে খিদের জ্বালায় কেবলি কাঁদত আর...'

এই পর্যন্ত শুনেই রিদয়ের এমন ভয় হল যে সে ভাবলে যেন তার চারদিকে অন্ধকারে ডাঁশ-পোকাগুলো বেরিয়েছে, আর যেন লক্ষ্মীর ঝাঁপিটার মধ্যে থেকে গোখরো সাপ ফোঁসলাচ্ছে!

ইঁদুর রিদয়কে ভয় দেখিয়ে বললে—'শুনলে তো? এখন ছেলে-ধরা তোমাকে দেখেছে কি ধরে যকে বসিয়েছে! পালাও এইবেলা, মানুষের কাছে আর এগিয়ো না, ধরা পড়লে মুশকিল!' বলেই ইঁদুর কুলুঙ্গিতে উঠে বসল।

রিদয় কেঁদে বললে—'আর কি আমি মানুষ হব না?'

ইঁদুর হেসে বললে—'গণেশঠাকুরের দয়া না হলে আর মানুষ হওয়া হচ্ছে না।'

রিদয় আরো ভয় পেয়ে শোধালে —'গণেশ গেলেন কোথা ? তাঁর দেখা পেলে যে আমি পায়ে ধরে মাপ চাই। এবার যদি তিনি আমায় মানুষ করে দেন, তবে নিশ্চয় বলছি কোনো দিন সন্দেশ চুরি করে খাব না, খেয়ে আর মিছে কথা বলব না, পড়বার সময় আর মিছি-মিছি মাথা ধরবে না, তেষ্টাও পাবে না ; গুরুমশায়কে দেখে আর হাসব না, বাপ-মায়ের কথা শুনব ; রোজ তোমার চন্নামেত্তো খাব, একশো দুর্গানাম লিখব। এবার থেকে বামুনের দোকানের পাঁউরুটি আর হাঁসের ডিম ছাড়া অন্য কিছু ছুঁই তো গঙ্গাস্নান করব।'

এমনি ভালোমানুষ হবার যত-কিছু প্রতিজ্ঞা কোনোটা করতে রিদয় বাকি রাখলে না! কিন্তু এতেও গণেশ খুশি হয়ে তাকে মানুষ করে দিতে ঘরে এলেন না দেখে বাইরেটায় সে একবার গণেশকে খুঁজে দেখবার মতলবে দরজার ফাঁক দিয়ে গলে বেরুল।

পাড়াগাঁয়ের সব বাড়ি যেমন, রিদয়দের বাড়িও তেমনি ছিল —'পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ ছেড়ে!' ঘরের দাওয়া থেকে নেমেই একহাত-অন্তর একখানা চৌকো টালি পাতা রয়েছে। এমনি নানা দিকে সোজা-বাঁকা, ভাঙা আস্ত টালিগুলো মাটির উপরে যেতে রাস্তা হয়েছে —পুকুর-পাড়ে যাবার, গোয়ালে যাবার, হেঁসেলে ঢোকবার। বর্ষার সময় যখন জলে সব ডুবে যায়, তখন এই টালির উপর পা ফেলে চলে যাও, একটুও পায়ে জল লাগবে না। আবার যেখানে জল যাবার নালা, তার উপরে এপার-ওপার করবার জন্যে দু'টুকরো নারকোল-গাছের গুঁড়ি পাটাতন করে পাতা, পুলের মতো তার উপর দিয়ে সোজা চলে যাও।

রিদয় এখনো থেকে-থেকে ভুলে যাচ্ছে যে সে আর বড়ো নেই, ঘরের দাওয়া থেকে আগেকার মতো লাফিয়ে নামতে গেছে, আর অমনি চিৎপাত! মনে হল যেন একতলার উপর থেকে পড়েছে! ভাগ্যি এক-আঁটি খড়ের উপরে পড়েছিল, না হলে রিদয় সেদিন টের পেতেন বেড়াল-ছানাকে দাওয়া থেকে হঠাৎ ঠেলে ফেললে, কতটা তার লাগে।

গোটাকতক ছাতারে-পাখি বাঁশঝাড়ের তলায় শুকনো পাতা উল্টে-উল্টে ফড়িং খেয়ে বেড়াচ্ছিল, বুড়ো-আংলাকে ডিগবাজি-খেয়ে পড়ে যেতে দেখে বলে উঠল —'ছি-ছি! ও হিরিদয় হল কী? ছি-ছি।' অমনি কুবো-পাখি বাঁশের ডগা থেকে বলে উঠল —'তুয়ো, বেশ হয়েছে, তুয়ো!' আর অমনি চারদিক থেকে হাঁস, হাঁসের ছানা, মুরগি, মুরগির ছানা, কাঁদাখোঁচা, পানকৌড়ি এমনি সব ঘরের আশপাশের পোষা-পাখি, বুনো-পাখি, মজা দেখতে ছুটে এসে রিদয়কে ঘিরে চেঁচাতে লাগল, হাসতে থাকল —'ছি-ছি, ছ্যা-ছ্যা, দেখ-দেখ! ঠিক হয়েছে! বেশ হয়েছে! বুড়ো-বুড়ো-বুড়ো-বুড়ো-আংলা! ও হিরিদয় হল কী?' কুঁকড়ো ঘাড় ফুলিয়ে বললে —'কী হল।' চড়াই ল্যাজ নেড়ে বললে —'এ কী, যক্ নাকি?'

রিদয় যখন মানুষ ছিল, তখন পাখিদের কিংবা জানোয়ারদের কথা একটুও বুঝত না, কিন্তু যক্ হয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

কুঁকড়ো বলছে —'কেমন, আর আমার ঝুঁটি ধরে টানবে?'

মুরগি অমনি বললে —'যেমন দুষ্টুমি, তেমনি শাস্তি হয়েছে। চুরি কর আমার ছানা! এইবারে এক ঠোকরে মাথা ফুটো করে দেব।' বলে মুরগিটা রিদয়কে ঠোঁট বাড়িয়ে তেড়ে গেল।

পাতি-হাঁস অমনি বলে উঠল —'থাক, থাক, এবার মাপ করো!'

কুঁকড়ো মাথা নেড়ে বললে —'তোর এমন দশা করলে কে?'

রাজহাঁস অমনি নাক-তুলে শুধোল —'এ্যাঁঃ?'

রিদয় পাখিদের কথা বুঝতে পারছে জেনে মনে-মনে খুশি হল বটে, কিন্তু মুরগি, হাঁস —যারা একদিন তাকে দেখলে ভয়ে দৌড় দিত, এখন তারা মুখের সামনে দাঁড়িয়ে হাসবে, এটা রিদয় সইতে না পেরে, এক ঢিল ছুঁড়ে ধমকে উঠল —'প্যাঁক-প্যাঁক করিসনে বলছি —পালা!'

রিদয় যে এখন এতটুকু হয়ে গেছে! পাখিরা তাকে ভয় করবে কেন? সব পাখি একসঙ্গে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে তেড়ে উঠল —'দূর হ, দূর হ! পালা!' ধাড়ি-বাচ্ছা সব পাখি চারদিকে ঘিরে এমনি চেঁচামেচি

করতে থাকল যে রিদয়ের কানে তালা ধরবার যোগাড়! বেচারা কোথায় পালাবে ঠিক পাচ্ছে না, এমন সময় আঁস্তাকুড় থেকে ছাই-পাঁশ মেখে বাঘের মতো ডোরা-টানা এক বেড়াল, চান সেরে সেই-দিকে আসতে লাগল—'কিও কিও' বলতে-বলতে! বেড়ালের সাড়া পেয়েই পাখিরা যেন কত ভালো মানুষের মতো, মাটিতে যেন পোকাই খুঁজছে, এই ভাবে পায়ে-পায়ে রিদয়ের কাছ থেকে সরে পড়ল।

বেড়াল ষষ্ঠীর বাহন, ইঁদুরের সঙ্গে গণেশ কোথায় লুকিয়ে আছেন নিশ্চয় সে জানে, ভেবে রিদয় দৌড়ে গিয়ে বেড়ালকে গণেশের কথা শুধোলে। বেড়াল অমনি ল্যাজ ঘুরিয়ে, সামনে দুই থাবা রেখে, গম্ভীর হয়ে বসে চোখ পিট-পিট করতে-করতে যেন রিদয়ের কথা শুনেও শুনলে না—এইভাবে পায়ের আঙুল থেকে ল্যাজের ডগাটি পর্যন্ত রোদে বসে চেটে-চেটে সাফ করতে লাগল। রিদয় একবার পাখিদের রাগিয়ে জব্দ হয়েছে; সে বেড়ালকে খুব মিষ্টি করে আবার শুধোল—'বল না মেনি, গণেশঠাকুর কোনদিকে গেলেন?'

মেনি বললে—'গণেশঠাকুর কাছেই এক-জায়গায় আছেন, কিন্তু তোমাকে বলছিনে বাপু!'

রিদয় আরো নরম হয়ে বললে—'লক্ষ্মীটি, বল, কোথায়? তিনি আমার কী দশা করেছেন দেখছ!'

বেড়াল যেন অবাক হয়ে সবুজ চোখ-দুটো বড়ো করে রিদয়ের দিকে চাইলে; তারপর গোঁফ ফুলিয়ে ফ্যাঁচ করে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে—'তোমায় দেখে দুঃখু হবে না? আমার ল্যাজে কত কাঁকড়া ধরিয়েছ তুমি! তোমাকে গণেশের খবর দেব না তো দেব কাকে? হুঁঃ!' বলে বেড়াল একবার গা-ঝাড়া দিলে।

রিদয় আর রাগ সামলাতে না পেরে 'দেখবি ল্যাজ ধরে টানি কি না' বলে যেমন বেড়ালের দিকে এগিয়ে গেছে অমনি বেড়াল বাঘের মতো ফুলে উঠল! তার রোঁয়াগুলো সজারুর কাঁটার মতো

সোজা হয়ে উঠেছে, পিঠ ধনুকের মতো বেঁকেছে। ল্যাজ ফুলিয়ে কানদুটো সটান করে কটমট করে চেয়ে বেড়াল নখে মাটি আঁচড়াতে লাগল।

রিদয় বেড়াল দেখে ভয় পাবার ছেলে নয়। যেমন সে তেড়ে বেড়ালকে ধরতে গেছে, অমনি বেড়াল ফাঁচ করে হেঁচে এক থাপ্পড়ে রিদয়কে উল্টে ফেলে তার বুকে দুই পা দিয়ে চেপে বসে দাঁত-খিচিয়ে বললে —'আবার বজ্জাতি! এখনো বুঝি শিক্ষা হয়নি? বুড়ো-আংলা কোথাকার! জানিস, এখন নেংটি ইঁদুরের মতো তোকে ঘাড়-মটকে খেয়ে ফেলতে পারি!'

বেড়াল যে ইচ্ছে করলে এখনি নখ দিয়ে তার বুকটা চিরে, দাঁত দিয়ে তার কান দুটি কেটে নিতে পারে, তা বাঘের মতো বেড়ালের নিজ-মূর্তি দেখে রিদয় আজ বেশ বুঝলে। সে নিজে যে আজ কত ছোটো হয়ে গেছে, তাই ভেবে রিদয়ের চোখে জল এল। চোখে জল দেখে বেড়াল বিদয়কে ছেড়ে দিয়ে বললে —'ব্যাস! আজ এইটুকু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিলুম —তোর মায়ের অনেক নিমক খেয়েছি! আজ দেখিয়ে দিলুম তোর জোর বেশি, না আমার জোর বেশি! আর কখনো পশুপাখির সঙ্গে লাগতে যাসনে —যাঃ!' বাঘের মাসি বেড়াল চারপায়ে দাঁড়িয়ে একবার গা ঝাড়া দিয়ে ল্যাজটা বুড়ো-আঙুলের মতো দুবার রিদয়ের মুখের সামনে নেড়ে আবার ভালোমানুষটির মতো আস্তে-আস্তে হেঁসেলের দিকে চলে গেল। রিদয় লজ্জায় মাথা হেঁট করে আস্তে-আস্তে গোয়াল-বাড়িতে গণেশকে খুঁজতে চলল।

ধলা গাই, কপ্‌লে গাই, কালো গাই—তিন গাই গোয়ালে বাঁধা। রিদয় কাছে আসতেই এই তিন গাই এমনি দাপাদাপি হামাহামি শুরু করে দিলে যে মনে হল তিরিশটা ষাঁড় সেখানে ছুটোপাটি লাগিয়েছে! রিদয় শুনলে ধলা বলছে —'হবে না? মাথার উপর ধর্ম আছেন। হুঁহুঁ!'

কপ্‌লে গাই বললে—'আমার কানে বোলতা ছাড়া? হুঁহুঁ!'

এই সময় রিদয়কে গোয়ালের দুয়োরে দেখে কালো গাই লাথি ছুঁড়ে বললে —'খবরদার! দেখেছ, এক লাথিতে মাথার খুলি ফাটিয়ে দেব।'

ধলা বললে —'আয় না, এইবার একবার শিং ধরে নাড়া দিবি!'

কপ্‌লে বললে —'একবার বোলতা নিয়ে কাছে এস না, মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি!'

কালো —সে সব-চেয়ে বুড়ি, সব-চেয়ে জোরালো গাই, সে বললে —'বড়ো যে আমাকে ঢিল মারা হত। আবার সেদিন আমাকে জুতো ছুঁড়ে মারা হয়েছিল! আয়, একবার আমার খুরের ঘা খেয়ে যা! রোজ দুধ-দুইবার সময় দুধের কেঁড়ে উল্টে দিয়ে মাকে নাস্তানাবুদ করে তবে ছাড়তিস। আহা, এমন দিন নেই যে তিনি তোর জন্যে না কেঁদেছেন। আয় আজ একবার তার শোধ তুলব। বাপরে বাপ, কী দুষ্টু ছেলে গো! গণেশঠাকুর —তাঁর সঙ্গে লাগা!'

রিদয় গরুদের সঙ্গে ভাব করে বলতে চাইছিল —যদি তারা গণেশ-ঠাকুরকে দেখিয়ে দেয়, তবে কোনোদিন আর সে কারো কাছে কোনো অপরাধ করবে না; কিন্তু গাই তিনটে এমনি ঝাঁপাঝাঁপি আরম্ভ করলে যে রিদয়ের ভয় হল যদি দড়ি ছিঁড়ে এরা বেরোয়, তবে আর রক্ষে রাখবে না। সে আস্তে-আস্তে গোয়াল ছেড়ে সরে পড়ল।

পশু-পাখি কেউ তাকে তো দয়া করলে না। গণেশের দেখা যদিই বা পাওয়া যায়, তবে তিনিও যে এদেরই মতো তাকে খেদিয়ে দেবেন না, তারই বা ঠিক কী! সবার কাছে তাড়া খেয়ে বেচারা রিদয় বেড়ার ধারে মুখ-চুন-করে এসে বসল। এ-জন্মে আর সে মানুষ হবে, এমন আশা নেই। মা-বাপ হাট থেকে যখন এসে দেখবেন ছেলেটি যক্ হয়ে গেছে, তখন তাঁদের দুঃখের আর সীমা থাকবে না। সে তো জানা কথা। কিন্তু পাড়ার লোক, এমন কী ভিন্‌-গাঁ থেকে ছেলে-বুড়ো সবাই বুড়ো-আংলা দেখতে দলে-দলে এসে তাকে ঘেরাও করবে। হয়তো কাগজওয়ালারা তার ছবি তুলে

ছাপিয়ে দেবে নিচে বড়ো-বড়ো করে লিখে—'আমতলিতে এই অবতারটি নষ্টামির ফল পেয়েছেন—ইনি দ্বিতীয় কালাপাহাড়, হিন্দুকুলকলঙ্ক!' হয়তো বা কোনোদিন আলিপুরের চিড়িয়াখানায় নতুন জানোয়ার বলে টিকিট-মারা খাঁচায়, নয়তো তেলে ভেজে যাদুঘরের কাঁচের সিন্দুকে চাবি দেওয়া হবে! রিদয় আর ভাবতে পারলে না, দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। আর সে মানুষের ছেলেদের সঙ্গে খেলতে পাবে না, সবাই তাকে দেখলে যক্ বলে সরে যাবে, কেউ তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না, আর এই ঘর-বাড়ি—রিদয় তাদের বাড়ির দিকে চেয়ে দেখলে। খড়ের চাল ছোটো-ছোটো তিনখানি থাকবার ঘর; তার চেয়ে ছোটো রান্না-ঘরখানি; তার চেয়ে ছোটো গোয়াল-ঘর; ঢেঁকিশাল, ধানের মরাই, আর এতটুকু সেই পুকুর; তার চারিদিকে চারটিখানি শাক-সবজী। রিদয়দের বাড়ি নেহাত সামান্য-রকমের, কিন্তু তা হলেও এই সামান্য জমিটুকু—ক'খানি ঘর, হাঁসপুকুর, বাঁশঝাড়, তেঁতুল-গাছটি নিয়ে কী সুন্দরই ঠেকল। যেন একখানি ছবি। অথচ এই বাড়ি ছেড়ে কতবার রিদয় মনে করেছে পালাবে; আজ কিন্তু সেই বাড়ির দিক থেকে তার চোখ আর ফিরতে চায় না!

দিনটি আজ আমতলি গ্রামখানির উপর, তাদের এই ঘর ক'খানির উপর কী আলোই ফেলেছে! চারদিক ঝকঝক করছে, ঝুরঝুর করছে! পাখি গাইছে, ভোমরা উড়ছে, বাতাস ছুটেছে, নদী চলেছে—কল-কল, কুল-কুল, ফুর্‌ফুর্! চারদিক আজ উল্‌সে উঠেছে, কেবল মাঝে বসে রয়েছে রিদয়—একলাটি মুখ-চুন করে। সে ভাবছে, কোথায় যাবে—কী করবে? সে যক্ হয়েছে, মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক উঠে গেছে। গণেশের অভিশাপে এখন অন্ধকার পাতালপুরীতে সাপের সঙ্গে যক্ হয়ে থাকা ছাড়া আর কী উপায় আছে? গণেশের সন্ধান করে শিবের বাড়ি কৈলাস-পর্বত পর্যন্ত যদি তাকে হেঁটে যেতে হয়, তাও স্বীকার, কিন্তু পাতাল-পুরীতে সে কিছুতে যেতে পারবে না! এই প্রতিজ্ঞা করে রিদয় কোমর-বেঁধে উঠে দাঁড়াল! এই সময়

শেওলায়-পিছল রাস্তা দিয়ে গুগলী আস্তে আস্তে চলেছে। রিদয়কে গুগলী শুধোলে —'কোথায় যাওয়া হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি?'

রিদয় পাখিদের কাছে, পশুদের কাছে দাবড়ি খেয়ে টিট হয়ে গিয়েছিল, এবারে সে খুব ভদ্রতা করে উত্তর দিলে —'আজ্ঞে, আমি কৈলাস-পর্বতে শ্রীশ্রীগণেশঠাকুরের ছি-চরণে কিছু নিবেদন করতে যাচ্ছি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

গুগলী উত্তর করলে—'আমি গঙ্গাসাগরে ছান কত্তি যেতেছি।'

রিদয় মুচকে হেসে শুধোলে —'কতদিনে সেখানে পোঁছবেন?'

'যে কয়দিনে পারি।' বলে গুগলী রিদয়কে শুধোলে —'কৈলাস-পর্বতে তুমি কহন পোঁছাবে?'

'বোধ হয় দুচারদিনে।' বলে রিদয় আস্তে-আস্তে গুগলীর সঙ্গে চলল।

গুগলী খানিক চুপ করে থেকে বললে—'আমি বোধকরি দেড় দিন-টেক্যের মধ্যেই গঙ্গাসাগরে পোঁচে যাব, কী বল?'

রিদয় এবার ঘাড়-নেড়ে বললে—'তা কেমন করে হবে? যে গুটিগুটি আপনি চলেছেন, তাতে ঐ হাঁসপুকুরে পোঁছতেই তো আপনার একদিন লাগবে।'

গুগলী বললে—'ওহান থিকে না হয় বড়ো জোর একটা দিন লাগুক। পুকুরের ওপারটাতেই তো সুমুদ্দুর।'

রিদয় হেসে বললে—'তবেই হয়েছে! পুকুরের ওধারে পুকুরের পাড়, তারপরে সবজী-খেত, তার ওধারে তেপান্তরের মাঠ, মাঠের ওধারে সব গ্রাম, গ্রামের পর বন, বনের পর নদী, নদীর ওপারে নগর, নগরের পরে উপনগর, তার পরে উপবন, উপবনের পরে উপদ্বীপ, তারপর উপসাগরের উপকূল, তারপর উপসাগর—যেখানে গঙ্গার স্রোত গিয়ে পড়েছে। দেড়-দিন কি, দেড়-বছরে সেখানে পোঁছতে পারেন কিনা সন্দেহ। কেন মিছে হাঁটছেন? নিজের ঘরে ফিরে যান!'

গুগলী ভাবলে রিদয় তার সঙ্গে মস্করা করছে। সে আকাশে

নাক তুলে বললে —'আর তুমি ভাবছ দিন চারেকে কৈলাস-পর্বতে যাবা —এই পিঁপড়ার মতো সরু-সরু ঠ্যাং চালিয়ে ? যদি দিন রাত চলে যাতি পার, তথাপি চার-বছরে তুমি সেহানে পৌঁছতি পার কিনা সন্দেহ। এই আমতলি, ইহার পর জামতলি, তেঁতুলতলি, বটতলি —অমনি পর-পর কত যে গ্রাম তার ঠিকানা মেলে না। তারপর নদীর ধারে এ নগর, সে নগর ; উপনদীর ধারে সকল উপনগর ; তৎপরে এ-ঘাট, ও-ঘাট, সে-ঘাট ; এ-মাঠ, ও-মাঠ, সে-মাঠ ; এ বন, ও-বন, সে-বন ; তাহার পর উপত্যকা, উপত্যকা বাদ পাহাড়তলি, তৎপরে চিত্রকূট, পরেশনাথ, চন্দ্রনাথের পাহাড়-পর্বত ; তাহার পর বিন্ধ্যাচল, তাহার পর সীমাচল তবে হিমাচল। তৎপরে রামগিরি, তাহার পরে ধবলাগিরি, তৎপরে মানস-সরোবর, উহার ওধারে তিব্বত, আরো ওধারে কৈলাস-পর্বত। এই নদ নদী পাহাড়-জঙ্গল ভাংতি-ভাংতি সেহানে যাওয়া গঙ্গা-ফড়িংটির-প্রায়-তোমার কর্ম ! পক্ষী-রাজ-ঘোড়া যে, সেও সেহানে যাতি পারে না চার হপ্তায়, তুমি তো তুমি ! ঘরের ছেলে ঘরে গিয়া বৈসা থাহ ; কৈলাসের আশা ছাড়ি দ্যেও।'

রিদয় বললে —'আমি যেখানে যাব বলে বেরিয়েছি সেখানে যাবই !'

গুগলীও বললে —'আমিও যেহ্যনে যাত্রা করি বাইরেচি, এই বেদ্ধোকালে, সেহেনে গঙ্গাসাগরে না যাইয়া আমি ছাড়মুনি।'

ঠিক সেই সময় খোঁড়া-হাঁস পুকুর থেকে ছপছপ করে উঠে এসে টুপ করে গুগলীটিকে খেয়ে মাঠের দিকে চলল। রিদয় তাকে শুধোলে —'কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?'

'মানস-সরোবর !' বলে হাঁস হেলতে-দুলতে আগুয়ান হল।

রিদয় দেখলে বড়ো সুবিধে, মানস-সরোবর পর্যন্ত হাঁসের সঙ্গে যাওয়া যাবে ; তারপর তিব্বত, তারপরেই কৈলাস। সে আর কোনো কথা না বলে তার মা সুবচনী-ব্রত করতে যে খোঁড়া হাঁস পুষেছিলেন, তারি সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

মানুষ যেমন, গুগলীও তেমনি হাঁটা-পথে চলে, কাজেই কৈলাস যাবার হাঁটা-পথের খবরই গুগলী রাখত। কিন্তু মাটির উপর দিয়ে হাঁটা-পথ যেমন, তেমনি আকাশের উপর দিয়ে জলের নিচে দিয়ে সব পথ আছে, সেই রাস্তায় পাখিরা মাছেরা দূর-দূর দেশে যাতায়াত করে। মানুষ, গরু, গুগলী, শামুক —এরা সব পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে, নদী পেরিয়ে চলে, কাজেই কোথাও যেতে এদের অনেক দিন লাগে। মাছেরা এঁকে-বেঁকে এ-নদী সে-নদী করে যায়, তাদের ডাঙায় উঠতে হয় না, কাজেই তারা আরো অল্পদিনে ঠিকানায় পৌঁছয়। আর পাখিরা নদী-ডাঙা দুয়েরই উপর দিয়ে সহজে উড়ে চলে — সব চেয়ে আগে চলে তারা! কিন্তু তাই বলে পাখিরাও যে পথের কষ্ট একেবারেই পায় না, এমন নয়। আকাশের নানাদিকে নানা-রকম নরম-গরম হাওয়া নদীর স্রোতের মতো বইছে —এই সব স্রোত বুঝে পাখিদের যাতায়াত করতে হয়। এ ছাড়া বড়ো পাখিরা যে রাস্তায় চলে ছোটো পাখিরা যে সব রাস্তায় গেলে, তাদের বিপদে পড়তে হয় —হয়তো ঝোড়ো হাওয়াতে যেতে কোথায় গিয়ে পড়ল তার ঠিক নেই!

আবার বড়ো পাখিদের যে-পথে কম বাতাস, সে-পথে গেলে ওড়াই মুশকিল —ডানা নাড়তে-নাড়তে কাঁধ ব্যথা হয়ে যায়! বাতাসের এক-একটা পথ এমন ঠাণ্ডা যে সেখানে খুব শক্ত পাখিরা ছাড়া কেউ যেতে পারে না —শীত জমে যাবে। কোনো রাস্তায় এমন গরম বাতাসের স্রোত চলেছে যে সেখানে আগুনের ঝলকে পাখা পুড়ে যায়। এ ছাড়া জোয়ার-ভাঁটার মতো অনুকূল-প্রতিকূল দু'রকম হাওয়া বইছে —যেটা বুঝেও পাখিদের যাওয়া-আসা করতে হয়। সব পাখি আবার রাতে উড়তে পারে না, সেজন্য যে-দিক দিয়ে

গেলে বন পাবে, নদী পাবে, আকাশ থেকে নেমে দু'দণ্ড বসে জিরোতে পাবে—এমন সব যাবার রাস্তা তারা বেছে নেয়। এর উপরে আকাশ দিয়ে মেঘ চলাচল করছে ; জলে-ধোঁয়ায়-ঝাপসা এই সব মেঘের রাস্তা কাটিয়ে পাখিদের চলতে হয় ; না হলে ডানা ভিজে ভারি হয়ে, কুয়াশায়, ধোঁয়ায় দিক ভুল হয়ে, একদিকে যেতে আর-এক-দিকে গিয়ে পড়বে। এমনি সব নানা ঝনঝট বাতাসের পথে আছে ; কাজেই পাখিদের মধ্যে পাকা মাঝারি মতো সব দলপতি-পাখি থাকে। পাণ্ডারা যেমন দলে-দলে যাত্রী নিয়ে তীর্থ করাতে চলে, তেমনি এরাও ভালো-ভালো রাস্তার খবর নিয়ে দলে-দলে নানা পাখি নিয়ে আনাগোনা করে—উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে, পুব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পুবে, সমুদ্র থেকে পাহাড়ের দিকে, পাহাড় থেকে সমুদ্রের দিকে, পৃথিবীর একধার থেকে আর-একধারে নানা-দেশে নানা-স্থানে।

মানুষ যখন একদেশ থেকে আর-একদেশে চলে, সে নিজের সঙ্গে খাবার, জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিয়ে চলে। খুব যে গরীব, এমন কি সন্ন্যাসী সেও এক লোটা, এক কম্বল, খানিক ছাতু, ছোলা, আটা, দুটো মোয়া, নয়তো দুমুঠো মুড়িও সঙ্গে নেয় ; কিন্তু পাখিদের এখান থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে, সেখানে নেমে, সেখানে কিছু খেয়ে নিয়ে—এমনি খানিক পথ উড়ে, খানিক আবার ডাঙায় কিংবা জলায়, কোথাও বা চরে, ঘাটে-ঘাটে জিরিয়ে খেয়ে-দেয়ে না নিলে চলবার উপায় নেই। বাচ্ছাদের জন্যে দূর থেকে পাখিরা মুখে করে, গলার থলিতে ভরে খাবার আনে ; আর টিয়ে পাখি ঠোঁটে ধানের শিষ, হাঁস পদ্মফুলের ডাঁটা নিয়ে সময়-সময় এদিকে-ওদিকে উড়ে চলে বটে, কিন্তু দল-বেঁধে যখন তারা পাণ্ডার সঙ্গে দূর-দূর দেশে যাত্রা করে বেরোয় তখন কুটোটি পর্যন্ত সঙ্গে রাখে না—একেবারে ঝাড়া-ঝাপটা হালকা হয়ে উড়ে যায়। রেলগাড়ি যেমন দেশ-বিদেশের মধ্য দিয়ে বাঁশি দিতে-দিতে স্টেশনে-স্টেশনে নতুন-নতুন লোক ওঠাতে-ওঠাতে চলে, এই পাখির দলও তেমনি আকাশ

দিয়ে ডাক দিতে-দিতে চলে; আর এ গ্রাম সে-গ্রাম এ-দেশ সে-দেশ এ-বন ও-বন থেকে যাত্রী-পাখি সব উড়ে গিয়ে ঝাঁকে মিশে আনন্দে মস্ত-এক দল বেঁধে চলতে থাকে। আকাশ দিয়ে একটার পর একটা ডাকগাড়ির মতো সারাদিন এমনি দলে-দলে যাতায়াত করে ডাক-হাঁক দিতে-দিতে—হাঁস, বক, সারস, পায়রা, টিয়া, শালিক, ময়না, ডাহুক-ডাহুকী—ছোটো বড়ো নানা পাখি!

খোঁড়া হাঁসের সঙ্গে মানস-সরোবরে যাবার জন্যে রিদয় ঘর ছেড়ে মাঠে এসে দেখলে নীল আকাশ দিয়ে দলে-দলে বক, সারস, বুনোহাঁস, পাতিহাঁস, বালুহাঁস, রাজহাঁস সারি দিয়ে চলেছে। এই সব পাখির দল পুবে সন্দ্বীপ থেকে ছেড়ে আমতলির উপর দিয়ে দুভাগ হয়ে, এক ভাগ চলেছে—গঙ্গাসাগরের মোহানা ধরে গঙ্গা-যমুনার ধারে-ধারে হরিদ্বারের পথ দিয়ে হিমালয় পেরিয়ে মানস-সরোবরে; আর-একদল চলেছে—মেঘনানদীর মোহানা হয়ে আমতলি, হরিংঘাটা, গঙ্গাসাগর বাঁয়ে ফেলে, আসামের জঙ্গল, গারো-পাহাড় খাসিয়া-পাহাড় ডাইনে রেখে, ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁকে-বাঁকে ঘুরতে-ঘুরতে হিমালয় পেরিয়ে তিব্বতের উপর দিয়ে কাঞ্চন-জঙ্ঘা ধবলাগিরির উত্তর-গা ঘেঁষে সিধে পশ্চিম-মুখে মানস-সরোবরে। সমুদ্রের দিক থেকে গঙ্গাসাগরের পথ পশ্চিম-উত্তর হয়ে হিমালয় পেরিয়ে পুবে ঘুরে পড়েছে মানস-সরোবরে; আর ব্রহ্মপুত্রের পথ উত্তর-পুব হয়ে পশ্চিম ঘুরে শেষ হয়েছে মানস-সরোবরে—যেন বেড়ির দুই মুখ একটি জায়গায় গিয়ে মিলেছে। এই বেড়ির মিলের কাছে রয়েছে সুন্দর-বন আর আমতলি; মাঝখানে অন্নপূর্ণার অন্নপাত্র সুজলা-সুফলা সোনার বাঙলা-দেশ; ডাইনে আসাম; বাঁয়ে বেহার অঞ্চল।

সুবচনীর খোঁড়া হাঁস রিদয়ের সঙ্গে মাঠে বেরিয়ে প্যাঁক-প্যাঁক করে আপনার মনেই বকতে-বকতে চলল—'উঃ বাবারে! আর যে চলতে পারিনে! পা ছিঁড়ে পড়ছে! কেন এলুম গো, মরতে ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম! এতদূরে মানস-সরোবর কে জানে গো—এ্যঃ!'

খোঁড়া হাঁস হাঁপাচ্ছে আর চলেছে আর বকছে। বাতে বেচারার পা-টি পঙ্গু। সে অনেক কষ্টে খাল-ধারে —যেখানে গোটাকতক বক, গোঁটাকতক পাতিহাঁস চরছিল, সেই পর্যন্ত এসে উলুঘাসের উপরে খোঁড়া পা রেখে জিরোতে বসল।

রিদয় কী করে? একটা কচু-পাতার নিচে বসে আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল —দলে-দলে হাঁস উত্তর-মুখে উড়ে চলেছে —নানা কথা বলাবলি করতে-করতে! রিদয় শুনলে হাঁসেরা বাজে বকছে না; কাজের কথাই বলতে-বলতে পথ চলেছে।

সেথো হাঁসেরা বললে —'থাকে-থাকে ফুলের গন্ধ লাগছে নাকে!'

অমনি পাণ্ডাহাঁস যে সব আগে চলেছে, জবাব দিলে —'ছুটলে খোসবো বাদলা রাখে।'

সেথোরা বললে—'নিচে-বাগে নামল তাল-চড়াই!'

পাণ্ডা উত্তর করলে —'উপরে বড়োই ঠাণ্ডা ভাই!'

সেথোরা বললে —'জাল টেনে মাকড় দিল চম্পট!'

পাণ্ডার জবাব হল —'এল বলে বৃষ্টি —চলো চটপট!'

সেথোরা বলে—'ফুল সব দিল ঘোমটা টেনে।'

পাণ্ডা বললে —'এল বিষ্টি এল হেনে!'

'ছুঁচোয় গড়েছে মাটির ঢিপি।'

'বিষ্টি পড়বে টিপিটিপি।'

'সাগরের পাখি ডাঙায় গেল।'

'ঝড়-জল বুঝি এবার এল।'

'কাক যে বাসায় একলা বড়ো?'

'গতিক খারাপ; নেমে পড়ো, নেমে পড়ো।'

অমনি সব হাঁস ঝুপ-ঝুপ করে খালে-বিলে নেমে পড়ে আপনার-আপনার পিঠের পালকগুলো জল দিয়ে বেশ করে ভিজিয়ে নিলে, পাছে পালকগুলো শুকনো থাকলে বিষ্টির জল বেশি করে চুষে নেয়। দেখতে-দেখতে ঝড়ো-বাতাস ধুলোয়-ধুলোয় চারদিক অন্ধকার

করে দিয়ে বড়ো-বড়ো গাছের আগ দুলিয়ে শুকনো ডাল-পাতা উড়িয়ে হুহু করে বেরিয়ে গেল। তারপরই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল —খাল-বিল ভর্তি করে দিয়ে। একটু পরে বিষ্টি থেমে আবার রোদ উঠল ; তখন দলে-দলে হাঁস, বক, সারস আবার চলল—আকাশ পথে আগের মতো বলাবলি করতে-করতে—

'মাকড় আবার জাল পেতেছে।'

'আর ভয় নেই—রোদ এসেছে।'

'মৌচাক ছেড়ে মাছিরা ছোটে।'

'বাদলের ভয় নাইকো মোটে।'

'বনে-বনে ওঠে পাখির সুর।'

'উড়ে চলো, পার যতদূর।'

'আকাশ জুড়িল রামধনুকে !'

'চলো —গেয়ে চলো মনেরি সুখে।'

আগে-আগে পাণ্ডা-হাঁস চলেছে, পিছে-পিছে তীরের ফলার মতো দু'সারি হাঁস ডাক দিতে-দিতে উড়ে যাচ্ছে। অনেক উপর দিয়ে একদল ডাক দিয়ে গেল —'পাহাড়তলি কে যাবে ? পাহাড়তলি !' বুনো হাঁসের ডাক শুনে পোষা-পালা খালের বিলের হাঁস, তারা ঘাড় তুলে যে যেখানে ছিল জবাব দিলে —'যে যাক, আমরা নয়।' মাটির উপরে যারা, তারা মুখে বলছে —'যাব না' কিন্তু আকাশ এমনি নীল, বাতাস এমনি পরিষ্কার যে মন তাদের চাচ্ছে উড়ে চলি —ঐ আলো-মাখা হাওয়ায় ডানা ছড়িয়ে হুহু করে! যেমন এক-এক দল বুনোহাঁস মাথার উপর দিয়ে ডাক দিয়ে যাচ্ছে, আর অমনি যত পালা-হাঁস তারা চঞ্চল হয়ে পালাই-পালাই করছে। দু'চারটে বা ডানা ঝটপট করে এক-একবার উড়ে পড়তে চেষ্টা করলে, অমনি বুড়ি হাঁস ঘাড় নেড়ে বলে উঠল —'এমন কাজ কোরো না, আকাশ-পথে চলার কষ্ট ভারি, পাহাড় দেশে শীত বিষম, কিছু মেলে না গো, কিছু মেলে না।'

বুনো-হাঁসের ডাক শুনে সুবচনীর খোঁড়া হাঁস উড়ে পড়তে

আনচান করতে লাগল। সে বকতে লাগল—'এইবার একদল হাঁস এলে হয়, ঝপ করে উড়ে পড়ব! আর পারিনে বাপু মাটিতে খুঁড়িয়ে চলতে!'

সন্দ্বীপ থেকে বালু-হাঁসের দল হিমালয় পেরিয়ে একেবারে মানস-সরোবর পর্যন্ত যাবার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়েছে; এবারে সেই দূর দূরের যাত্রীরা, আমতলির ঠিক উপর দিয়ে চলতে-চলতে ডাক দিতে থাকল টানা স্বরে—'মানস-সরেবার! ধৌলাগিরি!'

খোঁড়া হাঁস অমনি উলু ঘাসের ঝোপ ছেড়ে গলা তুলে ডাক দিলে—'আসছি, একটু রও, একটু রয়ে ভাই, একটু রয়ে চল!' তারপর সে তার শাদা দু'খানা ডানা মেলে বাতাসে গা ভাসিয়ে দু-চার-হাত গিয়ে আবার ঝুপ করে মাটিতে পড়ল—বেচারা কতদিন ওড়েনি, ওড়া প্রায় ভুলে গেছে! খোঁড়া হাঁসের ডাক বালু-হাঁসেরা শুনেছিল বোধ হয়, তাই মাথার উপরে ঘুরে-ঘুরে তারা দেখতে লাগল যাত্রী আসছে কি না! সুবচনীর হাঁস আবার চেঁচিয়ে বললে—'রও ভাই, একটু রয়ে!' তারপর যেমন সে উড়তে যাবে, অমনি রিদয় লাফ দিয়ে তার গলা জড়িয়ে—'আমিও যাব' বলে ঝুলে পড়ল।

খোঁড়া হাঁস তখন বাতাসে ডানা ছড়িয়ে উড়তে ব্যস্ত, রিদয়কে নামিয়ে দেবার সময় হল না, দু'জনেই মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল। রিদয়কে নিয়ে খোঁড়া হাঁস বাতাস কেটে উপরে উঠেছে—এমনি বেগে যে, মনে হল ডগায় ঝোলানো একটা টিকটিকি নিয়ে হাউই চলেছে। হঠাৎ সেই খোঁড়া হাঁস এমন তেজে মাটি ছেড়ে এত উপরে উঠে পড়বে, এটা হাঁসটা নিজেও ভাবেনি; রিদয় তো মনেই আনতে পারেনি—এমনটা হবে! এখন আর নামবার উপায় নেই—পায়ের তলায় মাটি কতদূরে পড়ে আছে তার ঠিক নেই, ডানার বাতাস ক্রমাগত তাকে ঝাপটা দিচ্চে। রিদয় হাঁফাতে-হাঁফাতে অতি-কষ্টে গাছে-চড়ার মতো হাঁসের গলা ধরে আস্তে-আস্তে তার পিঠে চেপে বসল। কিন্তু এম্‌নি গড়ানো হাঁসের পিঠ যে সেখানেও ঠিক বসে থাকা দায়—রিদয় ক্রমেই পিছনে পড়তে যাচ্ছে! দুখানা শাদা ডানার

ওঠা-পড়ার মধ্যে বসে তার মনে হতে লাগল যেন শাদা ছুটো সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে সে ছুলতে ছুলতে চলেছে। প্রাণপণে খোঁড়া হাঁসের পিঠের পালক ছুই মুঠোয় ধরে, ছুপায়ে গলা জড়িয়ে রিদয় স্থির হয়ে বসবার চেষ্টা করতে লাগল।

মাটির উপর দিয়ে খোঁড়া হাঁসের সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাওয়া এক, আর এক-কুড়ি-একটা উড়ন্ত হাঁসের হাঁক-ডাক, চলন্ত ডানার ঝাপটার মধ্যে বসে ঝড়ের মতো শূন্যে উড়ে চলা আর এক! বাতাস তোলপাড় করে চলেছে হাঁসের দল! কুড়ি-জোড়া দাঁতের মতো ঝপাঝপ উঠছে-পড়ছে জোরালো ডানা! রিদয় দেখছে কেবল হাঁস আর পালক বিজবিজ করছে! শুনছে কেবল বাতাসের ঝপঝপ, সোঁ-সোঁ, আর থেকে-থেকে হাঁসেদের হাঁক-ডাক। উপর-আকাশ দিয়ে যাচ্ছে, না মেঘের মধ্যে দিয়ে চলেছে, কি মাটির কাছ দিয়ে উড়ছে, রিদয় কিছুই বুঝতে পারছে না।

উপর-আকাশে এমন পাতলা বাতাস যে হঠাৎ সেখানে উঠে গেলে দম নিতে কষ্ট বোধ হয়, কাজেই নূতন-সেথো —খোঁড়া-হাঁসকে একটু সামলে নেবার জন্যে বালু-হাঁসের দল নিচেকার ঘন হাওয়ার মধ্যে দিয়ে বরং আস্তেই চলেছে, এতেই রিদয়ের মনে হচ্ছে যেন পাশাপাশি ছুটো রেল-গাড়ি পুরোদমে ছুটেছে আর তারি মাঝে এতটুকু-সে ছুলতে ছুলতে চলেছে! ওড়ার প্রথম চোটটা কমে এলে রিদয়ের হাঁস ক্রমে টাল সামলে সোজা তালে-তালে ডানা ফেলে চলতে শুরু করলে। তখন রিদয় মাটির দিকে চেয়ে দেখবার সময় পেলে। হাঁসের দল তখন সুন্দরবন ছাড়িয়ে বাঙলাদেশের বুকের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। রিদয় আকাশ থেকে দেখছে যেন সবুজ-হলদে-রাঙা-মেটে-নীল এমনি পাঁচ-রঙের ছক-কাটা চমৎকার একখানি কাঁথা রোদে পাতা রয়েছে। রিদয় ভাবছে এ কোনখানে এলেম? সেই সময় বাখরগঞ্জের ধানখেতের উপর দিয়ে হাঁসেরা চলল। রিদয় দেশটা দেখে ভাবলে প্রকাণ্ড একটা যেন শতরঞ্জ-খেলার ছক নিচের জমিতে পাতা রয়েছে।

রিদয় ভাবছে —'বাস রে! এত বড়ো খেলার ছক, রাবণে দাবা খেলে নাকি?' অমনি যেন তার কথার উত্তর দিয়ে হাঁসেরা হাঁক দিলে —'খেত আর মাঠ, খেত আর মাঠ —বাখরগন্‌জো!' তখন রিদয়ের চোখ ফুটল। সে বুঝলে সবুজ ছকগুলো ধান-খেত —নতুন শিষে ভরে রয়েছে! হলদে ছকগুলো সরষে-খেত —সোনার ফুলে ভরে গিয়েছে! মেটে ছকগুলো খালি জমি—এখনো সেখানে ফসল গজায়নি। রাঙা ছকগুলো শোন আর পাট। সবুজ পাড়-দেওয়া মেটে-মেটে ছকগুলো খালি জমির ধারে-ধারে গাছের সার। মাঝে-মাঝে বড়ো-বড়ো সবুজ দাগগুলো সব বন। কোথাও সোনালি, কোথাও লাল, কোথাও ফিকে নীলের ধারে ঘন সবুজ ছককাটা ডোরা-টানা জায়গাগুলো নদীর ধারে গ্রামগুলি—ঘর-ঘর পাড়া-পাড়া ভাগ করা রয়েছে। কতকগুলো ছকের মাঝে ঘন সবুজ, ধারে-ধারে খয়েরী রঙ —সেগুলো হচ্ছে আম-কাঁঠালের বাগান —মাটির পাঁচিল-ঘেরা। নদী, নালা, খালগুলো রিদয় দেখলে যেন রুপোলি ডোরার নক্সা —আলোতে ঝিকঝিক করছে। নতুন ফল, নতুন পাতা যেন সবুজ মখমলের উপরে এখানে-ওখানে কারচোপের কাজ!—যতদূর চোখ চলে এমনি! আকাশ থেকে মাটি যেন শতরঞ্চি হয়ে গেছে দেখে রিদয় মজা পেয়েছে; সে হাততালি দিয়ে যেমন বলেছে—'বাঃ, কী তামাশা!' অমনি হাঁসেরা যেন তাকে ধমকে বলে উঠল —'সেরা দেশ—সোনার দেশ—সবুজ দেশ—ফলন্ত-ফুলন্ত বাঙলা-দেশ!'

রিদয় একবার গণেশকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে গিয়ে বিপদে পড়েছে, হাঁসের ধমক শুনে মুখ বুজে গম্ভীর ভালোমানুষটির মতো পিটপিট করে চারদিকে চাইতে লাগল আর মিটমিট করে একটু-আধটু হাসতেও থাকল —খুব ঠোঁট চেপে। দলে-দলে কত পাখি —কেউ চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, কেউ উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পুবে; আর পথের মাঝে দেখা হলেই এদল ওদলকে শুধাচ্ছে —এদিকের খবর, ওদিকের খবর—

খবর কী ভাই, খবর কী? অমনি বলাবলি চলল ‘ওধারে জল হচ্ছে।’ ‘এধারে রোদে পুড়ছে।’ ‘সেধারে ফল ফলেছে।’ ‘এধারে বউল ধরেছে।’ রিদয়কে নিয়ে চলতি হাঁসেরা পাহাড় থেকে একদল ফিরতি হাঁসকে শুধিয়ে জানলে —ওধারে এখনো কুয়াশা কাটেনি ; শিল পড়ছে ; জল হিম ; গাছে এখনো ফল ধরেনি ! অমনি তারা ঢিমে চালে চলতে আরম্ভ করলে। তাড়াতাড়ি পাহাড়-অঞ্চলে গিয়ে লাভ কী, বলে তারা এগ্রাম-সেগ্রাম, নদীর এপার-ওপার করতে-করতে ধীরে সুস্থে এগোতে থাকল।

গ্রামে-গ্রামে ঘরের মটকায় কুঁকড়ো সব পাহারা দিচ্ছে। ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে চলন্ত পাখিরা তাদের কাছে খবর পাচ্ছে। ‘কোন গ্রাম ?’ ‘তেঁতুলিয়া, সাবেক তেঁতুলিয়া, হাল তেঁতুলিয়া।’ ‘কোন শহর ?’ ‘নোয়াখালি—খটখটে।’ ‘কোন মাঠ ?’ ‘তিরপুরনীর মাঠ—জলে থৈথৈ।’ ‘কোন ঘাট ?’ ‘সাঁকের ঘাট—গুগলী ভরা।’ ‘কোন হাট ?’ ‘উলোর হাট—খড়ের ধুম।’ ‘কোন নদী ?’ ‘বিষনদী—ঘোলা জল।’ ‘কোন নগর ?’ ‘গোপাল নগর—গয়লা ঢের।’ ‘কোন আবাদ ?’ ‘নসীরাবাদ—তামুক ভালো।’ ‘কোন গঞ্জ ?’ ‘বামুনগঞ্জ—মাছ মেলা দায়।’ ‘কোন বাজার ?’ ‘হালতার বাজার—পলতা মেলে।’ ‘কোন বন্দর ?’ ‘বাগা বন্দর—হুক্কাহুয়া।’ ‘কোন জেলা ?’ ‘রুরুলী জেলা—সিঁদুরে মাটি।’ ‘কোন বিল ?’ ‘চলন বিল—জল নেই।’ ‘কোন পুকুর ?’ ‘বাঁধা পুকুর—কেবল কাদা।’ ‘কোন দীঘি ?’ ‘রায় দীঘি—পানায় ঢাকা।’ ‘কোন খাল ?’ ‘বালির খাল—কেবল চড়া।’ ‘কোন ঝিল ?’ ‘হীরা ঝিল—তীরে জেলে।’ ‘কোন পরগনা ?’ ‘পাতলে দ—পাতলা হ।’ ‘কোন ডিহি ?’ ‘রাজসাই—খাসা ভাই।’ ‘কোন পুর ?’ ‘পেসাদপুর—পিঁপড়ে কাঁদে।’ ‘কার বাড়ি ?’ ‘ঠাকুর বাড়ি।’ ‘কোন ঠাকুর ?’ ‘ওবিন ঠাকুর—ছবি লেখে।’ ‘কার কাচারি ?’ ‘নাম কোরো না, ফাটবে হাঁড়ি !’

এমনি দেশের নাম, লোকের নাম, বাড়ির নাম, আর নামের

সঙ্গে একটা করে বিশেষণ দিয়ে কুঁকড়ো, সব যেমন-যেমন প্রশ্ন হচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীরাও বুঝে নিচ্ছে কোন জায়গায় কী পাওয়া যায়, কোথায় নামলে বিপদ—কোথায় কী খাওয়া পাওয়া যায় তা পর্যন্ত ! মানুষে হয়তো দিয়েছে গ্রামের নাম 'ভদ্রপুর' কিন্তু সেখানে না আছে ফলের বাগান, চরবার খাল, বিল, মাঠ ; লোকগুলোও চোয়াড় ; পাখির ভাষায় সে গ্রামের নাম হল —'নরককুণ্ড'। কোনো দুঁদে জমিদার প্রজার সর্বনাশ করে তেতলা বাড়ি ফেঁদে তার নাম দিয়েছে, 'অলকাপুরী' ; কিন্তু সেখানে কোনোদিন কারু পাত পড়ে না ; শেয়াল-কুকুর কেঁদে যায় ; পাখিরা মিলে সে বাড়ির নাম দিলে 'পোড়াবাড়ি'। হয়তো একটা পাড়া—সেখানে ভণ্ড বৈরাগীর আড্ডা ; তারা দিনে মালা জপে, রাতে বাড়ি-বাড়ি সিঁদ দিয়ে আসে ; সে জায়গাটার নাম মানুষ দিলে 'বৈরিগি পাড়া' ; কিন্তু পাখিরা তাকে বললে নিগিরিটিং—ভাবটা যে কেবল এদের খঞ্জনীই সার ! হয়তো এক ভালো পরগনার জমিদার কিন্তু পরগনার নাম মানুষে বলছে 'খোলা মুচি' ; কিন্তু পাখিরা দেখচে সেখানে ধান খুব, ফল ভালো, ভালো জমিদার ; বন্দুক-হাতে শিকারে বেরোয় না ; অমনি সে পরগনার নাম তারা হাঁকলে —'রাজভোগ— সাবেক রাজভোগ—হাল রাজভোগ।' হয়তো 'রাজভোগ' যেমন, তেমনি কোনো ভালো পরগনা নষ্ট জমিদারের হাতে পড়ে উচ্ছন্ন গেল—সেখানে না মেলে ঘাস, না আছে ভালো জল, না আছে বাগান, থাকবার মধ্যে মাতাল জমিদারের বন্দুকের গুলি, দুঁদে নায়েবের লাঠি-সোটা ; মানুষ সে পরগনার নাম 'লক্ষ্মীপুর' দিলেও পাখিরা তাকে বললে 'মশাল-চুলি'।

কোনো-কোনো জায়গায় সাতপুরুষ ধরে ভালো মানুষ, ভালো আবহাওয়া, ভালো খাওয়া-দাওয়া, খালবিল হাটবাজার গুলজার ; সেখানকার কুঁকড়ো বুক-ফুলিয়ে হাঁকলে—'মনোহর নগর—সাবেক মনোহর নগর—হালে মনোহর।' এমনি যেখানে পাখিদের সুখ, সে সব জায়গার নাম এক-এক কুঁকড়ো হেঁকে দিচ্ছে—যেমন-যেমন

হাঁসের দল, সারসের দল, মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে —'সোহাগদার, দৌলতপুর, সুনামগঞ্জ!' যেখানে ফলফুলুরী ফসল ঢের, সে সব জায়গার কুঁকড়োরা হাঁকছে—দানাসিরি, লাঙ্গলবাঁধ, উলুর হাট, আমতাজুড়ি, জাঙ্গিপুর!' হাঁস—পদ্মনাল এমনি সব খেতে পছন্দ করে, যেখানে খালে-বিলে এসব জন্মেছে, সেখানকার কুঁকড়ো হাঁকছে—'সাতনল, নলচিটে, পাতের হাট, বেতগাঁ, বেতাজী, সোলাভাঙা, শাকের হাট।' যেখানে খাবার নেই, তার কুঁকড়ো হাঁকলে—'ঝালকাটি, কাটিপাড়া, আশাশূন্যি, সন্ন্যাসীহাট।' যেখানে ছায়া-করা বন অনেক, সেখানকার নাম হাঁকলে কুঁকড়ো—'কমলাবাড়ি, ফুল-ঝুরি, ডাকেটিয়া, শিরিশদিয়া, কোকিলামুখ।' যেখানে ছোটো-বড়ো নদী, ছোটো-বড়ো মাছ, কুঁকড়ো হাঁকলে—'চাঁদপুর, ইল্‌শেঘাট, ব্যাঙধুই, বোরালিয়া, বোয়ালমারি।'

বিদয় দেখলে হাঁসেরা সোজা যে উত্তর-মুখো চলেছে, তা নয়। তারা এ-গ্রাম সে-গ্রাম, এ-খেত ও-খেত, এ-বিল ও-বিল, করে হরিংঘাটা, মেঘনা—এই দুই নদীর মাঝে যা কিছু আছে সব যেন দেখতে-দেখতে চলেছে—বাঙলাদেশের সুন্দরবন, ধানখেত, পদ্মদিঘি, বালুচর, খালবিল ছাড়তে যেন তাদের মন উঠছে না। বাখরগঞ্জ, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর হয়ে ধলেশ্বরী নদী পেরিয়ে ক্রমে হাঁসের দল চাঁদপুরের দিকে চলল—পুবমুখে।

হাঁসের মধ্যে ঘেংরাল আর সরাল দু-জাতের হাঁস—এরা কোনোদিন কোথাও যেতেও চায় না, নড়তেও চায় না—ভারি কুনো! বুনো হাঁস এদের দেখলেই তামাশা করতে ছাড়ছে না। তারা উপর-আকাশ থেকে একের পর একে ডেকে চলল—'পাহাড়তলি, কামরূপ, ধৌলাগিরি, মানস-সরোবর—চলেছি, চলেছি!' অমনি সরাল, ঘেংরাল এরা উত্তর দিচ্ছে—'যেও না যেও না, বড়ো শীত। যেও পরে, যেও পরে।'

বুনো হাঁসের দল আরো নিচে নেমে এক সঙ্গে বলে উঠল—

'ভারি মজা, উড়তে মজা —শীতে মজা —পাহাড়ে মজা। উড়তে শেখাব ; চলে এস না!'

সরাল, ঘেংরাল কোথাও উড়ে যাবে না ; যেখানকার সেখানে থাকবে, অথচ উড়তে পারে না বললে তারা ভারি চটবে ; এবারে বুনো হাঁসের কথায় তারা জবাবই দিলে না। তখন বালু-হাঁসের দল একেবারে মাটির কাছে নেমে এসে বলে উঠল—'ওরে হাঁস নয় রে—ভেড়া!' তারপর হাঃ-হাঃ করে হাসতে-হাসতে ডানায় তালি দিতে-দিতে আবার আকাশে উঠল। নিচে থেকে ঘোরা-হাঁস তারা গলা চিরে গালাগালি শুরু করলে —'মর, মর! গুলি খেয়ে মর, শিল পড়ে মর, বাতে ধরে মর, বাজ পড়ে মর, বিদেশে মর, বিভুঁয়ে মর!'

এমনি হাসি-তামাশার মধ্যে রিদয় আনন্দে চলেছে। কিন্তু তবু নিজের দুরবস্থা ভেবে—সে যে মা-বাপ ঘর-বাড়ি ছেড়ে কোথায় নির্বাসনে চলেছে, সে কথা মনে করে —এক-একবার তার চোখে জলও আসছে। কিন্তু তবু এই আকাশ দিয়ে একেবারে হু-হু করে উড়ে চলায় কী মজা, কত আনন্দ! বাতাসে কোথাও ভিজে মাটির গন্ধ, কোথাও ফোটা-ফুলের খোসবো, কোথাও পাকা ফলের কী মিঠে বাসই আসছে! পৃথিবীর গায়ের বাতাস যে এমন সুগন্ধে ভরা রিদয় আগে তো জানেনি! মেঘের উপর দিয়ে জলের চেয়ে পরিষ্কার বাতাসের উপর দিয়ে ভেসে চলতে-চলতে রিদয়ের মনে হতে লাগল যেন সব দুঃখ, সব কষ্ট, পৃথিবীর যত কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা ছেড়ে সে সত্যি উঠে এসেছে সেইখানে, যেখানে ধুলো নেই, বালি নেই, ভয় নেই, ভাবনা নেই, রোগ নেই, শোক নেই—কেবলি আনন্দে উড়ে চলা দিন-রাত!

সুবচনীর খোঁড়া হাঁস এই সব বুনো-হাঁসদের দলে ভিড়ে উড়তে, আর এ-গ্রামের সে-গ্রামের সব সরাল, ঘেংরালদের দেখে হাসি-মস্করা করতে পেয়ে, ভারি খুশি হয়েছে। সে ভুলে গেছে যে নিজেই সে এত-কাল পালা-হাঁসই ছিল —ঐ সরাল-ঘেংরালের মতো ঘর আর পুকুর করে কাটিয়েছে। তার উপর সে আজন্ম-খোঁড়া, সবে আজ নূতন উড়ছে। বুনো হাঁসের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলা তার কর্ম নয়! খোঁড়ার ডানার তেজ ক্রমেই কমছে আর দমও ক্রমে ফুরিয়ে আসছে, সে হাঁপাতে হাঁপাতে তাড়াতাড়ি ডানা ঝাপটেও আর পেরে উঠছে না। মধ্যে থেকে এক-এক-করে প্রায় আটহাঁস পিছিয়ে পড়েছে। সেথো হাঁসরা যখন দেখলে খোঁড়া পিছিয়ে পড়ে, আর পারে না, তখন পাণ্ডা-হাঁসকে ডাক দিয়ে জানালে —'চকা-নিকোবর, চকা-নিকোবর!'

চকা উড়তে-উড়তেই শুধোলে—'কেঁ্যন্-কেঁ্যন্ কও কেঁ্যন্?'

সেথোরা বললে —'পিছিয়ে পোলো খোঁড়া ঠ্যাং!'

আগের মতো সোঁ-সোঁ করে চলতে-চলতেই চকা বলে উঠল—

জোরে চলায় নাই কোনো দায়,
আস্তে গেলেই হাঁপ লেগে যায়!

অমনি সব হাঁস এক সঙ্গে বলে উঠল —'চলে চল, চলে চল, ভাই, চলে চল।'

চকার কথা-মাফিক খোঁড়া হাঁস জোরে চলতে চেষ্টা করতে দুগুণ হাঁপিয়ে পড়ল; আর সে আস্তে-আস্তে ক্রমে মাঠের ধারে-ধারে নারকোল গাছের প্রায় মাথা পর্যন্ত নেমে পড়বার মতো হল। তখন সেথো হাঁসরা আবার ডাক দিলে —'চকা-নিকোবর —চকা-চকা-চকা!'

এবার চকা গরম হয়ে বললে —'কেঁ্যন্ কর ভ্যেন্ ভ্যেন্ ?'

সেথোরা বলে উঠল —'খোঁড়া হাঁস তলিয়ে যায় !'

চকা একবার চেয়েও দেখলে না, যেমন বেগে চলেছিল তেমনি পুরো দমে যেতে-যেতে বললে —'বলো ওকে হালকা হাওয়ায় উঠে আসতে।'

নিচের বাতাস ঠেলা মুশকিল,
ডানা নেড়ে-নেড়ে লাগে ঘাড়ে খিল।
উপর বাতাস পাতলা ভারি,
এক ঝাপটে বিশ হাত মারি।

খোঁড়া হাঁস চকার কথায় উপরে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল ; কিন্তু এবার বাতাস ঠেলে উঠতে বেচারার দম নিকলে যাবার যোগাড় হল।

আবার সেথোরা ডাক দিলে —'চকা ! চকা !'

'কেনে ? চলতে দিবে না নাকি !' —বলে চকা গোঁ হয়ে উড়ে চলল।

সেথোরা বললে —'খোঁড়া-বেচারার প্রাণসংশয় !'

চকা রেগে উত্তর দিলে —

উড়তে না পারে ঘরে যাক,
খাক-দাক বসে থাক।
কে বলেছে উড়তে ওরে,
ভিড়তে দলে রঙ্গ করে ?

খোঁড়া হাঁসের জানতে বাকি রইল না যে বুনো হাঁসরা কেবল তামাশা দেখবার জন্যে তাকে এতটা সঙ্গে এনেছে —মানস-সরোবরে নিয়ে যেতে নয়। আঃ কী আপসোস ! ডানা যে তার আর চলছে

না! না হলে খোঁড়া হাঁসও যে উড়তে পারে, সেটা একবার বুনো হাঁসদের সে দেখিয়ে দিত। তা ছাড়া এই চকা-নিকোবর — এমন হাঁস নেই যে একে জানে না; এই একশো বছরের বুড়ো হাঁস, যার সঙ্গে পয়লানম্বর হাঁসও উড়ে পেরে ওঠে না, পড়বি তো পড় তারি পাল্লায়! যে চকা পোষা হাঁসকে হাঁসের মধ্যেই ধরে না, লজ্জা পেতে হল কিনা তারি সামনে! এ দুঃখু সে রাখবে কোথায়!

খোঁড়া সবার পিছনে ভাবতে ভাবতে চলল—বাড়ি ফিরবে, কি, প্রাণ যায় তবু সমানে বুনো হাঁসের সঙ্গে চলে সে দেখিয়ে দেবে যে সেও জানে উড়তে! রিদয় এই সময় খোঁড়াকে বললে—'সুবচনীর কৃপায় এতদূর এসেছ, আর কেন? এইবার ফের। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে শেষে দম-ফেটে মরবে নাকি! আমি তো ওদের মতলব ভালো বুঝছিনে!'

রিদয় কিছু না বললে হয়তো খোঁড়া আপনা-হতেই বাড়ি-মুখো হত; কিন্তু এই বুড়ো-আংলা, এও ভাবছে তাকে কমজোর! খোঁড়া বিষম রেগে ধমকে উঠল—'ফের কথা কইলে মাটিতে ঝেড়ে-ফেলে চলে যাব।' বলেই রেগে ডানা আপসে খোঁড়া এমনি তেজে উড়ে চলল যে বুনো হাঁসরাও একেবারে অবাক হয়ে গেল। রাগের মুখে গোঁ-ভরে যেমন তেজে খোঁড়া চলেছিল, রাগ পড়লে সে তেজ থাকত কিনা সন্দেহ। কিন্তু ঠিক সেই সময় সূর্য পাটে বসতে চললেন। দেখতে-দেখতে বেলা পড়ে এল। অমনি হাঁসরা সবাই জমি মুখো হয়ে ঝুপ-ঝাপ আকাশ থেকে চাঁদপুরের সামনে মেঘনার মাঝে বাগদী চরে নেমে পড়ল। চরে উড়ে বসতেই রিদয় হাঁসের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ল।

তখন চরের উপর থেকে সবেমাত্র জল সরে গেছে, ভিজে কাদা তখনো কালো প্যাচ-প্যাচ করছে—মাঝে-মাঝে ডোবায় এখনো জল বেঁধে আছে। এবড়ো-খেবড়ো ভাঙা-চোরা পিছল চর; খানা, ডোবা, নালা, এখানে-ওখানে, এরি উপরে সন্ধ্যের হিম হাওয়া বইছে। রিদয়ের গা কাঁটা দিয়ে উঠল শীতে। নদীর কিনারায়

যেদিকে হাঁসরা নেমেছে, সেদিকে খানিক জঙ্গল অন্ধকারে কালো দেখাচ্ছে। জঙ্গল ছাড়িয়ে খোলা মাঠ, সেদিকে মানুষ কি গরু কিছুই নেই। চারিদিক সুনসান! মেঘনার মাঝে লাল ফানুসের মতো রাঙা সূয্যি পশ্চিম-আকাশে রামধনুকের রঙ টেনে দিয়ে আস্তে-আস্তে জলে ডুবছে।

রিদয়ের মনে হল সে যেন কোথায় কতদূরে মানুষের বসতি ছেড়ে পৃথিবীর শেষে এসে পড়েছে! বেচারা সমস্ত-দিন খেতে পায়নি। তার কেবল কান্না আসতে লাগল। এই একলা চরে কেউ কোথাও নেই —কোথায় খায়, কোথায় যায়? আর যদি বাঘ আসে, কে তাকে বাঁচায়? আর যদি বিষ্টি আসে, কোথায় সে মাথা গুঁজবে? কোথা রইলেন বাপ-মা, কোথা রইল ঘর-বাড়ি! সূর্য লুকিয়ে গেছেন; জল থেকে উঠছে কুয়াশা; আকাশ থেকে নামছে অন্ধকার; চারদিকে ঘনিয়ে আসছে ভয়! ওধারে বনের তলাটা যেন নিঝুম হয়ে আসছে! ঝিমঝিম সেখানে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, আর লতায়-পাতায় খুসখাস শব্দ উঠছে।

রিদয়ের মনে আকাশে উঠে যে ফুর্তিটা হয়েছিল, এখানে নেমে সেটুকু একবারে নিভে গেল। এখন এই হাঁসগুলো ছাড়া সঙ্গী আর কেউ নেই। রিদয় দেখলে সুবচনীর হাঁস একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে। বেচারা মাটিতে পা দিয়েই শুয়ে পড়েছে। কাদার উপর গলা বাড়িয়ে দুই-চোখ বুজে সে কেবলি জোরে-জোরে শ্বাস টানছে—যেন আধ-মরা!

রিদয় তার সঙ্গের সাথী খোঁড়া হাঁসকে বললে—'একটু জল খেয়ে নাও—এই তো দু'পা গেলেই নদী!' কিন্তু খোঁড়া সাড়া-শব্দ দিলে না। রিদয় আর এখন দুষ্টু নেই। এই খোঁড়া হাঁস এখন আর শুধু হাঁস নয়—তার বন্ধু, সাথী সবই। সে আস্তে-আস্তে তার গলাটি ধরে উঠিয়ে জলের ধারে নিয়ে চলল। রিদয় ছোটো, হাঁস বড়ো; কিন্তু প্রাণপণে সে হাঁসকে টেনে নিয়ে জলের কাছে নামিয়ে দিলে। হাঁস জলে কাদায় খানিক মুখ ডুবিয়ে চুক-চুক-করে জল খেয়ে নিয়ে

গা-ঝাড়া দিয়ে জলে নেমে শর-বেণার ঝাড় ঠেলে সাঁতরে-সাঁতরে খাবারের সন্ধান করতে লাগল।

বুনো হাঁসগুলো নেমেই জলে গিয়ে পড়েছিল ; খোঁড়া হাঁসের কোনো খবরই নেয়নি ; দিব্যি চান করে ডানা ঝেড়ে গুগলি-শামুক শাক-পাতা খেয়ে বেড়াচ্ছে। রিদয়ের হাঁস জলে নেমেই সুবচনীর কৃপায় একটা পাঁকাল মাছ পেয়ে গেল। সে সেইটে মুখে নিয়ে ডাঙায় এসে রিদয়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললে —'এই নাও, মাছটা তোমায় দিলুম। আমার যে উপকার করেছ, তা চিরদিন মনে থাকবে। খেয়ে নাও মাছটা!'

হাঁসের কাছে দুটো মিষ্টি কথা পেয়ে রিদয় একেবারে গলে গেল। তার মনে হল সেই খোঁড়া-হাঁসের গলা ধরে তার দু'ঠোঁটে দুটো চুমু খায়। রিদয় কাদা থেকে মাছটি তুলে একবার ভাবলে —রাঁধি কিসে? অমনি মনে পড়ল—সে যে, এখন আর মানুষ নেই, যক্ হয়েছে ; হয়তো কাঁচা মাছ খেতে পারবে। রিদয়ের ট্যাঁকে এটা ওটা কাটতে একটা ছুরি থাকত ; সে সেইটে টেনে বার করে মাছটা কুটতে বসল। ছুরিটা এখন একটা খড়কে-কাঠির মতো ছোটো হয়ে গেছে, কিন্তু তাতেই কাজ চলে গেল। মাছটা ছোটো-ছোটো করে বানিয়ে কতক-কতক হাঁসকে খাইয়ে দিয়ে, নিজে খেতে বসল। তার যকের মুখে কাঁচা মাছ নেহাত মন্দ লাগল না। রিদয়ের খাওয়া হলে খোঁড়া তাকে চুপি-চুপি বললে যে চকা-নিকোবরের দল পোষা হাঁসকে হাঁসের মধ্যে গণ্য করে না। রিদয় চুপি-চুপি বললে —'তা তো দেখতে পাচ্ছি।'

খোঁড়া হাঁস গলা-ফুলিয়ে বললে —'মজা হয়, যদি একবার এদের সঙ্গে সমানে আমিও মানস-সরোবর পর্যন্ত উড়ে যেতে পারি। পোষা হাঁস কী করতে পারে তবে ওরা টের পায়।'

'তা তো বটেই!' বলে রিদয় চুপ করলে।

খোঁড়া বলে চলল —'আমার মনে হয় একলা আমি এতটা যেতে পারি কি না! কিন্তু তুমি যদি সঙ্গে চল, তবে আমি সাহস করি।'

রিদয় ভেবেছিল এখান থেকেই সে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু হাঁসের ইচ্ছে শুনে সে একটু তা-না-না করে বললে—'ছাখো, আমার সঙ্গে তোমার বনবে কি? আমি তোমাকে আগে কত জ্বালাতন করেচি।' কিন্তু রিদয় দেখলে হাঁস আগের কথা ভুলে গেছে, রিদয় যে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে — জল খাইয়ে যত্ন করে, সেই কথাই সে খোঁড়া হাঁস মনে রেখেছে। একবার বাপ-মায়ের কথা তুলে রিদয় হাঁসকে বাড়ি ফেরাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাঁস বললে—'কোনো ভাবনা নেই, আসছে শীতে তোমায় আমি ঠিক বাড়িতে পৌঁছে দেব। তোমাকে ঘরের দরজায় নামিয়ে দিয়ে তবে আমার ছুটি। তার মধ্যে তোমায় একলা ছেড়ে আমি কোথাও নড়ব না — প্রতিজ্ঞা করছি!'

রিদয় ভাবছে—মন্দ না! এই যক্ হয়ে মা-বাপের কাছে এখন না যাওয়াই ভালো! কী জানি, মানস-সরোবর থেকে হয়তো কৈলাসেও গণেশের সন্ধান করা যেতে পারবে। এই ভেবে রিদয় খোঁড়া হাঁসকে জবাব দেবে এমন সময় পিছনে অনেকগুলো ডানার ঝটাপট শোনা গেল। এক-কুড়ি বুনো হাঁস একসঙ্গে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে গায়ের জল ঝাড়ছে। তারপর মাঝে চকা নিকোবরকে রেখে সারিবন্দী সব হাঁস তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। খোঁড়া হাঁস বুনো হাঁসদের চেহারা দেখে একটু ভয় খেলে। সে ভেবেছিল হাঁস-মাত্রে পোষা হাঁসের মতো দেখতে; আর ধরন-ধারণও সেই রকম। কিন্তু এখন দেখলে বুনো হাঁসগুলো বেঁটে-খাটো গাঁট্টা-গোঁট্টা-কাটখোট্টা-গোছের। এদের রঙ তার মতো শাদা নয়, কিন্তু ধুলো-বালির মতো ময়লা, পালক এখানে খয়েরী, খাকির ছোপ। আর তাদের চোখ দেখলে ভয় হয়—হলুদবর্ণ—যেন গুলের আগুন জ্বলছে! খোঁড়া বরাবর দেখে এসেছে হাঁস চলে হেলতে-দুলতে —পায়ে-পায়ে; কিন্তু এরা চলছে খটমট চটপট —যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। আর এদের পাগুলো বিশ্রী —চ্যাটালো, কেটো-কেটো, ফাটা-চটা — হতকুৎসিত! দেখলেই বোঝা যায় যেখানে-সেখানে শুধু-পায়ে এরা ছুটে বেড়ায়—জল-কাদা কিছুই বাছে না।

তাদের ডানার পালক, গায়ের পালক, ল্যাজের পালকগুলো পরিষ্কার ঝকঝক করছে বটে কিন্তু ধরন-ধারণ দেখলে বোঝা যায় এগুলো একেবারে বুনো আর জংলি! খোঁড়া তাড়াতাড়ি রিদয়কে সাবধান করে দিলে—যেন সে কে, কী বৃত্তান্ত, এসব কথা বুনো হাঁসদের না বলে। তার পর সে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এগিয়ে গেল। চকা-নিকোবর, খোঁড়াহাঁস আর বুনো-হাঁসদের মধ্যে খানিকক্ষণ ঘাড়-নেড়ে নমস্কার প্রতি-নমস্কার চলল। তারপর চকা শুধোলে—'এখন বলো তো, তোমরা কে? কোন জাতের পাখি?'

খোঁড়া আস্তে-আস্তে বললে—'কী আর পরিচয় দেব? গেল-বছর ফাগুন মাসে হরিংঘাটায় আমি ডিম-ভেঙে বার হই। জন্মাবধি পা-টি খোঁড়া। এই শীতে আমতলির হাটে আমি বিকোতে আসি; সেখান থেকে রিদয়ের বাপ আমায় সাত-সিকেতে কিনে আনে; তারপর তোমাদের দলে ভিড়েছি।'

চকা-নিকোবর নাক তুলে বললে—'তুমি তবে নেহাত সাধারণ-হাঁস দেখছি! খেতাব, মানসম্ভ্রম, বোলবোলা—কিছুই নেই! কোন সাহসে আমাদের দলে আসতে চাও শুনি?'

খোঁড়া হাঁস খোঁড়া পাটি নাচিয়ে বললে—'আমি দেখাতে চাই যে সাধারণ হাঁসও কাজের হতে পারে।'

চকা হেসে বললে—'সত্যি নাকি? কই, দেখাও দেখি কেমন কাজের কাজী তুমি?'

এক হাঁস অমনি বললে—'ওড়ার কাজে কেমন যে তুমি মজবুত তা তো দেখিয়েচ!'

অন্যে বললে—'হয়তো তুমি সাঁতারে পাকা।'

খোঁড়া ঘাড়-নেড়ে বললে—'না, আমি সাঁতারু মোটেই নয়। আমি বর্ষার সময় নালাগুলো এপার-ওপার করতে পারি, তার বেশি নয়।' খোঁড়া হাঁস ভাবছিল, চকা তো তাকে আমতলিতে ফিরে পাঠাবেই স্থির করেছে, তবে কেন মিছে-কথা বলা? পষ্ট জবাব দেওয়াই ভালো—যা থাকে কপালে।

চকা শুধোলে —'সাঁতার জানো না, তবে দৌড়তে মজবুত বোধ হয় ?' বলেই চকা একবার তার খোঁড়া পায়ের দিকে চেয়ে চোখ মটকালে।

খোঁড়া হাঁস গম্ভীর হয়ে বললে —'রাজহাঁস কোনো দিন ছুটে চলে না, তাই ছোটা আমার অভ্যেসই হয়নি।' বলে সে খোঁড়া-পা আরো খুঁড়িয়ে রাজহাঁস কেমন চলে একবার দেখিয়ে দিলে। তার মনে হচ্ছিল এইবার চকা বললে বুঝি —'তোমায় আমাদের দরকার নেই, ঘরে যাও।' কিন্তু ঠিক তার উল্টোটা হল। চকা-নিকোবর দু'চারবার ঘাড়-নেড়ে বলল —'তুমি তো বেশ সাফ-সাফ জবাব দিলে —একটু ভয় না করে! ভালো, ভালো, তোমার সাহস আছে —সময়ে লায়েক হতে পারবে —'বুকের পাটা শক্ত, সকল কাজে পোক্ত'। দু'দিন এদলে থাক, দেখি তোমার হিম্মৎ কতটা, তারপর যা হয় বিবেচনা করা যাবে। কী বল ?'

খোঁড়া হাঁস মাথা নেড়ে বললে —'আমি তো তাই চাই। এতেই আমি খুশি!'

এইবার চকা-নিকোবর বুড়ো-আংলা রিদয়ের দিকে ঠোঁট বাড়িয়ে বললে —'একী, এ কোন জানোয়ার ? ভারি তো অদ্ভুত!'

খোঁড়া হাঁস তাড়াতাড়ি বললে —'এটি আমার দেশের লোক, হাঁস চরাবার কাজ করে, সঙ্গে থাকলে কাজে লাগতে পারে।'

চকা নাক তুলে উত্তর করলে —'বুনো হাঁসের কোনো কাজে লাগবে না। ---পোষা হাঁসের কাজে লাগবে বটে! ওর নাম কী ?'

মানুষের নাম বললে পাছে বুনো হাঁসরা ভয় খায়, সেইজন্যে খোঁড়া হাঁস অনেক ভেবে বললে —'ওর নাম অনেকগুলো। আমরা ওকে ডাকি বুড়ো আংলা বলে। আঃ, বড়ো ঘুম পাচ্ছে।' বলেই খোঁড়া দুবার হাই তুলে চোখ বুজলে; পাছে চকা আর-কিছু প্রশ্ন করে তাই খোঁড়া আগে থাকতেই সাবধান হচ্ছে —'মাগো, চোখ আপনা-হতেই ঢুলে আসছে! চল্‌রে বুড়ো-আংলা, ঘুমোবি চল।'

চকা-নিকোবর বড়ো পাকা হাঁস; বুড়ো হয়ে তার মাথা থেকে

ল্যাজের পালক পর্যন্ত রুপোর মতো শাদা হয়ে গেছে; মাথাটা যেন চুনের হাঁড়ি; পা-দুটো যেন চ্যালা-কাঠ —বাঁকা, ফাটা-চটা; ডানা-দুটো যেন দুখানা ঝরঝরে বাঁশের কুলো; ঠোঁট ভোঁতা; গলা ছিনে-পড়া; কিন্তু চোখ এখনো জোয়ান-হাঁসের চেয়েও ঝকঝকে — যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে! চকা দেখলে খোঁড়া পাশ কাটাবার চেষ্টায় আছে, সে এগিয়ে এসে বুক-ফুলিয়ে খোঁড়াকে বললে — 'আমি কে, জানো তো? আমার নাম —চকা-নিকোবর! আর এই আমার ডাইনের হাঁস দেখেছ, ইনি আমার ডান-হাত বললেও চলে, এঁর নাম পাঁপড়া নান্‌কৌড়ি। এই আমার বাঁ-হাত, এঁর নাম নেড়োল-কাটচাল। তারপর ডাইনে হলেন লালসেরা আণ্ডামানি; বাঁয়ে হলেন —চোক-ধলা ডানকানি। তারপরে পাটাবুকো হামস্ত্রি, মারগুই চপড়া, তিরশুলী আকায়ব, সনদ্বীপের বাঙাল, ধনমানিকের কাওয়াজি, রাবণাবাদের রাজহাঁস, রায়-মঙ্গলার ঘেংরাল, চব্বিশ-পরগনার সরাল। আরো ডাইনে-বাঁয়ে দেখো —লুসাই, তিব্বতি, তাতারি —এমনি সব বড়ো-বড়ো খেতাবি হাঁস —কেতাবে যাদের নাম উঠেছে! আমরা কি যার-তার সঙ্গে আলাপ করি, না যাকে-তাকে দলে ভিড়তে দিই? আমাদের সঙ্গে যদি ওঠা-বসা করতে চাও তো পষ্ট করে ওই বুড়ো আংলাটির গাঁইগোত্তর পদবী-উপাধি বলো, নয় তো নিজের পথ দেখো!'

চকার দেমাক দেখে রিদয় আর চুপ করে থাকতে পারলে না; সে বুক-ফুলিয়ে এগিয়ে এসে বললে —'আমার নাম ছিল —ছিযুক্ত রিদয়নাথ পুততুণ্ড, ফুলুরী গাঁই, কাশ্যপ গোত্র —পুষ্যিপুত্র; ডিহি বাখরগঞ্জ, মোকাম আমতলি —হাঁসপুকুর, তেঁতুলতলা। জাতে আমি মানুষ ছিলেম, সকলে এখন —' আর বলতে হয় না; মানুষ শুনেই চকা-নিকোবরের দল দশ-হাত পিছিয়ে গিয়ে গলা বাড়িয়ে খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ করে বললে —'যা ভেবেছি তাই! সরে পড়। মানুষ আমরা দলে নিইনে। ভারি বজ্জাত তারা!'

খোঁড়া হাঁস আমতা-আমতা-করে বললে —'এইটুকু মানুষ, ওকে

আবার ভয় কী? কাল ও তো আপনিই বাড়ি চলে যাবে; আজ রাতটা এখানে থাক না! এইটুকু টিকটিকির মতো ওকে এই অন্ধকারে শেয়াল-কুকুরের মুখে ছেড়ে দেওয়া তো চলে না। তা ছাড়া ও আর এখন মানুষ নেই —যক্ হয়ে গেছে!'

চকা 'যক্' শুনে সাহস পেয়ে এগিয়ে এসে বললে —'বাপু, মানুষ-জাত খারাপ, বরাবর দেখে এসেছি। ওদের বিশ্বাস নেই। তবে তুমি যদি জামিন থাক, তবে রাতের মতো ওকে আমরা থাকতে দিই। এই হিমে চড়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে ও যদি অসুখে পড়ে, তার দায়ী আমরা হব না —এইবেলা বুঝে দেখো!'

খোঁড়া হাঁস পিছবার পাত্র নয়; সে বললে —'সে ভয় নেই। চড়ায় এক রাত কেন, সাত রাত কাটলেও ওর কিছু হবে না। এমন সৎসঙ্গ, ভালো জায়গা বনে আর পাবে কোথা? ওর বড়ো জোর-কপাল যে চকা-নিকোবরের সঙ্গে এক-চরে শুতে পেয়েছে! চকার বাছা বাগদী-চর; এতে শুয়ে আরাম কর।' বলে খোঁড়া রিদয়কে চোখ টিপলে।

চকা খোশামোদে খুশি হয়ে বললে —'তাহলে কাল কিন্তু ওর বাড়ি ফেরা চাই —কেমন?'

খোঁড়া বললে —'ওর সঙ্গে তাহলে আমাকেও ফিরতে হয়। আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি —ওকে ছাড়ব না।'

চকা-নিকোবর উত্তর দিলে —'তুমি যেমন বোঝো। ইচ্ছে হয় আমাদের সঙ্গে থাকতে পার, ইচ্ছে হয় ফিরতে পার।' এই বলে চকা চরের মধ্যিখানে উড়ে বসল।

একে-একে বুনো হাঁস চরে গিয়ে ডানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছে। খোঁড়া হাঁস রিদয়ের কানে কানে বললে —'চরে বড়ো হিম; যত পার শুকনো ঘাস কুড়িয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।' রিদয় দু বোঝা শুকনো কুটো-কাটি হাঁসের পিঠে দিয়ে চেপে বসল। হাঁস তাকে চরের একটা গর্তে নামিয়ে বললে —'ঘাসগুলো বালির উপর বিছিয়ে দাও; আমি ওর উপর বসি, তুমি আমার ডানার মধ্যে

ঢুকে পড়ো, আর ঠাণ্ডা লাগবে না।' রিদয়কে ডানার মধ্যে নিয়ে সুবচনীর খোঁড়া হাঁস—'এই আমায় তুমি আরামে রাখ, আমি তোমায় গরমে রাখি' —বলে খড়ের উপরে আরামে বসে ঘুম দিতে লাগল। রিদয়ের মনে হল যেন সে পালকের তোশকে শুয়েছে। সেও একটিবার হাই তুলেই চোখ বুজলে।

মেঘনার মোহনায় চর যে কখন কোথায় পড়ে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আজ যেখানে জল, কাল সেখানে দেখা গেল চড়া পড়ে বালি ধূ-ধূ করছে ; কাল যেখানে দেখেছি চরে উলু-ঘাস, বালু-হাঁস ; বছর ফিরতে সেখানে দেখলেম চরও নেই, হাঁসও নেই —অগাধ জল থৈ থৈ করছে ! এক-রাতের মধ্যে হয়তো নদীর স্রোত ফিরে গেল —জলের জায়গায় উঠল বালি, বালির জায়গায় চলল জল।

বাগদী-চরে হাঁসেরা যখন উড়ে বসল, তখন চরের চারদিকে জল —ডাঙা থেকে না সাঁতরে চরে আসা মুশকিল। অপার মেঘনার বুকে এক-টুকরো ময়লা গামছার মতো ভসেছিল চরটি, কিন্তু রাত হতেই জল ক্রমে সরতে লাগল, আর দেখতে-দেখতে সরু এক-টুকরো চরা ডাঙা থেকে বাগদীচর পর্যন্ত, একটি সাঁকোর মতো দেখা দিলে।

চাঁদপুরের জঙ্গলে বসে খেঁকশেয়ালী হাঁসের দলের উপরে নজর রেখে-ছিল ; কিন্তু চকা-নিকোবরকে সে চেনে ; এমনি বেছে-বেছে নিরাপদ জায়গায় চকা তার দল নিয়ে রাত কাটাত যে এ পর্যন্ত তার দলের একটি হাঁস শিয়ালে ধরতে পারেনি। মেঘনার পুব-তীরের জঙ্গল ভেঙে রাতের বেলায় খেঁকশেয়ালী শিকারে বেরিয়েছে, এমন সময় জলের বুকে কুমীরের পিঠের মতো সরু সেই চরটির দিকে চোখ পড়ল। এক লাফ দিয়ে সে চর ডিঙিয়ে পায়ে-পায়ে অগ্রসর হল। খেঁকশেয়ালী প্রায় হাঁসের দলে এসে পড়েছে, এমন সময় ছপ-করে একটা ডোবার জলে তার পা পড়ল ; অমনি চকা চমকে উঠে ডাক দিলে—'কেও ?' আর সব হাঁস ডানা ঝেড়ে উড়ে পড়তে আরম্ভ করলে ; সেই অবসরে তীরের মতো ছুটে গিয়ে শেয়াল লুসাই-হাঁসের ডানা কামড়ে ধরে হিড়-হিড় করে সেটাকে ডাঙার দিকে নিয়ে চলল।

সব হাঁসের সঙ্গে ভয় পেয়ে খোঁড়া হাঁসও ডানা ছাড়িয়ে আকাশে উঠল ; কেবল রিদয় হাঁসের ডানা থেকে ঝুপ-করে মাটিতে পড়ে চোখ রগড়ে চেয়ে দেখলে অন্ধকারে সে একা, আর দূরে একটা কুকুর হাঁস ধরে পালাচ্ছে। অমনি রিদয় হাঁসটা কেড়ে নিতে শেয়ালের সঙ্গে ছুটল। মাথার উপর থেকে খোঁড়া হাঁস একবার হাক দিলে— 'দেখে চলো !' কিন্তু রিদয় তখন হৈ-হৈ করে ছুটেছে। রিদয়ের গলা পেয়ে লুসাই কতকটা সাহস পেলে, কিন্তু বুড়ো-আঙুলের মতো ছেলে কেমন করে শেয়ালের মুখ থেকে তাকে বাঁচাবে, এটা তার বুদ্ধিতে এল না। এত দুঃখেও লুসায়ের হাসি এল। সে প্যাঁক-প্যাঁক করে হাসতে-হাসতে চলল।

মাথার উপরে খোঁড়া হাঁস রিদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে ; তার ভয়— পাছে রিদয় খানায়-ডোবায় পড়ে হাত-পা ভাঙে। কিন্তু যক্ হয়ে অবধি খুব অন্ধকার রাতেও যকের মতো রিদয় দেখতে পাচ্ছে। খানা-খন্দ-লাফিয়ে দিনের বেলার মতো রিদয় সহজে ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে— 'ছেড়ে দে বলছি, না হলে এক ইট মেরে পা খোঁড়া করে দেব !' কে তার কথা শোনে ? শেয়াল এক লাফে চড়া ছেড়ে পারে উঠে দৌড়ে চলল। রিদয়ও চলেছে হাঁকতে-হাঁকতে— 'মড়াখেকো-কুকুর কোথাকার ! ছাড় বলছি, না হলে মজা দেখাব।'

চাঁদপুরের খেঁকশেয়াল যার নাম, আসামের জঙ্গলে হেন পাখি নেই যে তাকে জানে না। সে শহরে গিয়ে কতবার মুরগি, হাঁস ধরে এনেছে। তাকে 'মড়াখেকো-কুকুর' বলে এমন সাহস কার ? শেয়াল একটু থেমে যেমন ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে, অমনি রিদয় গিয়ে তার ল্যাজ চেপে পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিলে। মানুষটি বুড়ো-আংলা, তার কিলটি কত বড়োই বা ? শেয়ালের পিঠে একটা যেন বেদানা-বিচি পড়ল ! কিন্তু মানুষের মতো গলার সুর শুনে শেয়াল সত্যি ভয় পেলে ; সে ল্যাজ তুলে বনের মধ্য দিয়ে পালিয়ে চলল ; আর রিদয় তার ল্যাজ ধরে ঠিক টিকির মতো ঝুলতে ঝুলতে চলল

—উলুঘাসের মধ্যে দিয়ে গা-ঘেঁষড়ে। কাঁকড়ার মতো ল্যাজে কী কামড়ে রয়েছে, সেটা দেখবার শেয়ালের অবসর ছিল না, সে একেবারে নিজের গর্তর কাছে এসে দাঁড়িয়ে, মুখ থেকে হাঁসটা নামিয়ে, সেটার বুকে পা দিয়ে দাঁড়াল, তখন তার চোখ পড়ল ল্যাজে গাঁথা বুড়ো-আংলার দিকে! এই টিকটিকির মতো ছেলেটা —ইনি চাঁদপুরি শেয়ালকে জব্দ করবেন ভেবে শেয়াল ফ্যাক করে মুখ-ভেংচে হেসে বলল— 'এইবার তোমার মনিবকে খবর দাওগে চাঁদপুরের শেয়াল হাঁস খেয়েছে।'

ছুঁচোলো-মুখ, নাটা-চোখ দেখে এতক্ষণে রিদয় বুঝলে এটা শেয়াল। কিন্তু শেয়াল তাকে ভেংচেছে, এর শোধ সে দেবেই-দেবে! রিদয় আরো শক্ত করে তার ল্যাজ চেপে, দুই পায়ে একটা গাছ আঁকড়ে, যেমন শেয়াল হাঁ করে হাঁসটার গলা কাটতে গেছে অমনি পিছনে এক টান দিয়ে, হাঁস থেকে শেয়ালকে দু-হাত তফাতে টেনে নিয়েছে! আর সেই ফাঁকে লুসাই হাঁসও ভাঙা ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে উড়ে পালিয়েছে।

'হাঁস যক্, আজ তোকে খাব!'—বলে খেঁকশেয়ালী দাঁত-খিচিয়ে রিদয়কে ধরবার জন্যে কেবলি নিজের ল্যাজটার সঙ্গে ঘুরতে লাগল। রিদয়ও ল্যাজ আঁকড়ে চরকি-বাজির মতো শেয়ালের সঙ্গে ঘুরতে থাকল, আর বলতে লাগল—'ধর দেখি মড়াখেকো কুকুর!'

বনের মধ্যে শেয়ালে-মানুষে চরক-বাজি এমনতর কেউ কোনো-দিন দেখেনি। প্যাঁচা, চামচিকে, এমন কী দিনের পাখিরাও তামাশা দেখতে বার হল। কিন্তু রিদয় দেখলে তামাশা ক্রমে শক্ত হয়ে উঠছে —সে নিজে শেয়ালের ল্যাজ ছাড়তে চাইলেও, শেয়াল তাকে সহজে ছাড়ে কিনা সন্দেহ! খেঁকশেয়ালী পাকা শিকারী; তার গায়ের শক্তিও যেমন, বুদ্ধিও তেমনি, সাহসও কম নয়। রিদয় বুঝলে ঘুরে-ঘুরে সে নিজে যেমনি হাঁপিয়ে পড়বে অমনি টুপ-করে তাকে ধরবে শেয়াল! রিদয় একবার চারদিক চেয়ে দেখলে, হাতের কাছে

কোনো বড়ো গাছ আছে কি না। কাছেই একটা সরু ঝাউ-গাছ বন ঠেলে আকাশে সোজা উঠেছে, ঘুরতে-ঘুরতে রিদয় সেই-দিকে এগিয়ে গেল, তারপর হঠাৎ একসময় শেয়ালের ল্যাজ ছেড়ে একেবারে ঝাউ-গাছটার আগ ডালে উঠে পড়ল। শেয়াল তখনো নিজের ল্যাজ কামড়াতে বোঁ-বোঁ লাটিমের মতো ঘুরছে। রিদয় গাছের উপর থেকে চেঁচিয়ে বললে :

তাকুড়-তাকুড় তাকা!
যাচ্ছে শেয়াল ঢাকা!
থাকে-থাকে-থাকে
হুক্কাহুয়া ডাকে!
চাঁদপুরের কাঁকড়া-বুড়ি
কামড়েছে তার নাকে!

শেয়াল দেখলে শিকার তাকে ঠকিয়ে পালাল! সে গাছের তলায় হাঁ-করে বসে রিদয়ের দিকে চেয়ে বললে—'রইলুম এইখানে বসে, কতক্ষণে নেমে আসিস দেখি! তোকে না খেয়ে নড়ছিনে!' এক-ঘণ্টা গেল, দু-ঘণ্টা গেল, শেয়াল আর নড়ে না। ঝাউ-গাছের সরু ডালে পা ঝুলিয়ে শীতের রাতে জেগে বসে থাকা যে কী কষ্ট আজ রিদয় বুঝলে। শীতে তার হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে, চোখ ঢুলে পড়ছে, কিন্তু ঘুমোবার যো নেই —পড়ে যাবার ভয়ে। আর বনের মধ্যে অন্ধকারই বা কত! দুহাত তফাতে নজর চলে না— মিশকালো ঘুটঘুটে চারিদিক! মনে হল যেন গাছপালা সব শীতে কালো পাথরের মতো পাষাণ হয়ে গেছে! একটি পাখি ডাকছে না, একটি পাতা নড়ছে না—সব নিথর নিঝুম! রিদয়ের মনে হচ্ছে রাত যেন ফুরোতে চায় না।—রিদয় আর না ঘুমিয়ে থাকতে পারে না! এই সময় ভোরের কনকনে বাতাস বইল, আর দেখতে-দেখতে ভুসো-কালির মতো রাতের রঙ ক্রমে ফিকে হতে-হতে মিশি থেকে রাঙা, রাঙা থেকে রুপোলি, রুপোলি থেকে

সোনালি হয়ে উঠল। তারপর বনের ওপারে সূর্য উঠলেন। বেলায় উঠত, কাজেই সূর্যকে চিরকাল রিদয় দেখে এসেছে কাঁচা-সোনার মতো হলুদ বর্ণ; সূর্য যে ক্ষেপা মোষের চোখের মতো এমন লাল টকটকে, তা তার জ্ঞান ছিল না; তার ঠিক মনে হল কে যেন রাত্তিরের কাণ্ডকারখানা শুনে রেগে তার দিকে চাচ্ছেন!

তারপর গাছের ফাঁকে-ফাঁকে সকালের আলো উঁকি মারতে লাগল—বনের গাছ-পালা, জীব-জন্তু রাতের আড়ালে আবডালে অন্ধকারে বসে কী কাণ্ড করেছে, তারি খোঁজ নিতে লাগল। বনের তলাকার চোরকাঁটা, শেয়াল-কাঁটা, কাটি কুটি, কাঁটা-খোচা, যা-কিছু সব যেন আলোর ধমকে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। ক্রমে মেঘে-মেঘে আলো পড়ল—রঙ ধরল; গাছের পাতা, ঘাসের শিষ, ফোটা-ফুলের পাপড়ি, তার উপরে শিশিরের ফোঁটা—সবই আলোতে ঝলক দিতে থাকল। যেন সবাই সিঁদুর পরে সাটিনের কাপড়ে সেজেছে! ক্রমে চারিদিক আলোতে আলোময় হয়ে উঠল; অন্ধকারের ভয় দেখতে-দেখতে কোথায় পালাল; আর অমনি কত পাখি, কত জীব-জন্তুই না বনে ছুটোছুটি আরম্ভ করলে! লাল-টুপি-মাথায় কাঠঠোকরা ঠকাস-ঠকাস গাছের ডালে ঘা দিতে বসে গেল, কাঠবেড়ালি অমনি খোপ ছেড়ে গাছের তলায় বসে কুটুস-কুটুস বাদাম ছাড়াতে লেগে গেল; গাং-শালিক, গো-শালিক, ছাতারে, গাছের তলায় নেমে শুকনো পাতা উল্টে-উল্টে কিড়িং ফড়িং ধরে-ধরে বেড়াতে লাগল; আগ-ডালে বসে শ্যামা-দোয়েল শিস দিতে আরম্ভ করলে। রিদয়ের মনে হল সূর্য যেন সব পশু-পাখি কীট-পতঙ্গদের জাগিয়ে দিয়ে অভয় দিতে থাকলেন—রাত পালিয়েছে, তোরা ঘর ছেড়ে বার হ, আমি এসেছি ভয় নেই!

রিদয় শুনলে মেঘনার চরে হাঁসেরা ডাকাডাকি, হাঁকাহাকি লাগিয়েছে, দল একত্র হচ্ছে। চকা-নিকোবর হাঁকলে—'মানস-সরোবর! ধৌলাগিরি! আও আও আও!' তারপর রিদয় দেখল তার মাথার উপর দিয়ে নিকোবরের পুরো দল উড়ে চলল—

খোঁড়া হাঁসটি সুদ্ধ। রিদয় তাদের একবার ডাক দিলে, কিন্তু এত উপর দিয়ে হাঁসেরা চলেছে যে তার ডাক শুনলে কি-না বোঝা গেল না —উড়তে-উড়তে আকাশে মিলিয়ে গেল। রিদয় স্থির করলে হাঁসেরা নিশ্চয়ই দেখেছে শেয়ালে তাকে খেয়েছে। সে হতাশ হয়ে আকাশে চেয়ে রইল। কিন্তু এত দুঃখেও সকালের আলো আর বাতাস, সে যেখানটিতে বসে আছে সেই ডালটি সোনার রঙে রাঙিয়ে ঝাউ-পাতার মধ্যে দিয়ে চুপিচুপি তাকে এসে বলতে থাকল —'ভয় কী? দিন হয়েছে —সূর্য উঠেছেন, আমরা থাকতে কিসের ভয়!' ঠিক সেই-সময় কমলা-লেবুর রঙের সাজ পরে হলুদবর্ণ যে সূর্য আমতলির মাঠে রোজ-রোজ রিদয়কে দেখা দিতেন, তিনি চাঁদপুরের জঙ্গলের উপরে দেখা দিলেন।

বেলা প্রায় এক প্রহর। রিদয় গাছের উপরে, শেয়াল নিচে বসে আছে, হাঁসের দলেরও কোনো খবর নেই, যে-যার খাবার সন্ধানে বেরিয়ে গেছে। ঠিক যখন বেলা ন'টা, তখন দেখা গেল, বনের মধ্যে দিয়ে একটিমাত্র হাঁস, যেন উড়তেই পারছে না, এই ভাবে আস্তে-আস্তে চলেছে। খেঁকশেয়ালী অমনি কান খাড়া করে হাঁসের দিকে নাক উঠিয়ে পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলল। হাঁসটা শেয়ালকে দেখেও দেখলে না, তার নাকের সামনে দিয়েই উড়ে চলল। হাঁসটাকে ধরবার জন্যে শেয়াল একবার ঝম্ফ দিলে, হাঁস অমনি ফিক করে হেসে, উড়ে গিয়ে চড়ায় বসল। এর পরেই আর-এক হাঁস ঠিক তেমনি করে আরো-একটু মাটির কাছ দিয়ে উড়ে চলল; শেয়ালটা লাফ দিলে; তার কানের রোঁয়াগুলি হাঁসের পায়ে ঠেকল, কিন্তু ধরতে পারলে না —হাওয়ার মতো হাঁস উড়তে-উড়তে চড়ার দিকে চলে গেল। একটু পরে আর-এক-হাঁস —এটা যেন উড়তেই পারছে না —একেবারে মাটির কাছ দিয়ে ঝাউগাছের গা-ঘেঁষে উড়ে চলল। এবারে প্রাণপণে শেয়াল ঝম্ফ দিলে। ধরেছে, এমন সময় হাঁস সোঁ-করে তার দাঁতে পালক বুলিয়ে দিয়ে একেবারে মুখের মধ্যে থেকে পালিয়ে গেল। এবার যে এল, সে

এমনি বেকায়দায় লটপট করে উড়ে আসছে যে খেঁকশেয়াল ভাবলে —একে তো ধরেছি! কিন্তু বারবার তিনবার ঠকে শেয়াল বিরক্ত হয়ে উঠেছে। সে হাঁসের দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে গোঁ হয়ে রইল। যে পথে আগের তিনটি হাঁস গেছে, এটাও সেই-পথ ধরে ঝাউ-তলায় এসে শেয়ালের এত কাছ দিয়ে চলল যে শেয়াল আর থির থাকতে না পেরে দিয়েছে লাফ এমন জোরে যে তার ল্যাজটা ঠেকল হাঁসের পিঠে। কিন্তু হাঁসও পাকা; সে সাঁ-করে শেয়ালের পেটের নিচে দিয়ে গলে তার ঝাঁটার মতো ল্যাজে ডানার এক থাপ্পড় বসিয়ে হাসতে-হাসতে চম্পট দিলে। শেয়ালের আর দম নেবার সময় হল না, ঝপ-ঝপ করে আরো গোটা-পাঁচেক হাঁস নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল, একটাকেও সে ধরতে পারলে না—লাফানি-ঝাঁপানি সার হল! এবারে পর-পর আবার পাঁচটা হাঁস একে একে শেয়ালকে লোভ দেখিয়ে সজোরে-তার পিঠে ডানার বাতাস দিয়ে হোঃ-হোঃ করে হাসতে-হাসতে একেবারে তার রগ ঘেঁষে চলে গেল; কিন্তু শেয়াল না-রাম, না-গঙ্গা—চুপ করে বসে রইল। সে বুঝেছে চকা-নিকোবরের দল কাল রাতে হাঁস নিয়ে যাওয়ার শোধ তুলতে মস্করা লাগিয়েছে।

অনেকক্ষণ আর হাঁসদের দেখা নেই, শেয়াল ভাবচে তারা গেছে, এমন সময় চকা-নিকোবর দেখা দিলেন। তার সেই পাকা পালক, ছিনে গলা দেখেই শেয়াল তাকে চিনে নিলে। একটা ডানা বেঁকিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এক-কাৎ হয়ে সে উড়ে এল—একেবারে যেন চলতেই পারে না, এই ভাবে। শেয়াল এবারে লাফ দিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত হাঁসটাকে তাড়িয়ে গেল; কিন্তু হাঁস যেন ধরা দিয়েও ধরা দিলে না; সোজা গিয়ে চরে বসে প্যাঁক-প্যাঁক করে হেসে উঠল। শেয়াল একেবারে লজ্জায় লাল হয়ে জঙ্গলের দিকে ফিরে দেখলে— এবার চমৎকার ধবধবে মোটা-সোটা রাজহাঁস তার দিকে উড়ে আসছে। বনের অন্ধকারে তার শাদা ডানা-দুখানা যেন রূপোর মতো ঝকঝক করছে। এবারে শেয়ালের নোলা সকসক করে উঠল।

সে এমন লাফ দিলে যে, ঝাউ-গাছের পাতাগুলো তার গায়ে খোঁচা মারলে, কিন্তু খোঁড়া রাজহাঁস ধরা পড়ল না—সোজা ঝাউ-গাছ ঘুরে চড়ায় গিয়ে উঠল।

এর পরে আর হাঁসের সাড়া-শব্দ নেই; সব চুপচাপ। শেয়াল ঝাউগাছের দিকে চেয়ে দেখলে, ছেলেটাও সেখান থেকে সরে পড়েছে। শেয়াল ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে চাইছে এমন সময় চড়ার দিক থেকে একে-একে হাঁস সব আগেকার মতো তাকে লোভ দেখিয়ে উড়ে চলল। কিন্তু শেয়ালের তখন মাথার ঠিক নেই; সে পাগলের মতো কেবল ঝাঁপাঝাঁপি-লাফালাফি করতে থাকল আর কেবলি হাঁস তার নাকের সামনে দিয়ে যেতে থাকল—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, দশ, পনেরো, কুড়ি, বাইশ! শেয়াল তাদের একটি পালক পর্যন্ত ছিঁড়ে নিতে পারলে না। শেয়াল এমন নাকাল কখনো হয়নি। চাঁদপুরের শেয়াল সে, কতবার গুলির মুখ থেকে মুরগি হাঁস শিকার করছে তার ঠিক নেই; শেয়ালের রাজা বললেই হয়; কিন্তু এই শীতকালে হাঁস শিকার করতে আজ তার ঘাম ছুটে গেল! সারাদিন ধরে মোটা-সোটা চিকচিকে হাঁস দলে-দলে তার নাকের উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করছে, অথচ একটাকেও সে ধরে খিদে মেটাতে পারছে না! সব চেয়ে তার লজ্জা—মানুষটাও তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে! আর তার দুর্দশার কথা সেই পোষা রাজহাঁসটাও জেনে গেল! দেশে-দেশে নিশ্চয়ই তারা চাঁদপুরের খেঁকশেয়ালের কীর্তি-কাহিনী রাষ্ট্র করে দেবেই-দেবে।

ভোরে এই শেয়ালের গা চিকচিকে, ল্যাজ মোটা, রোঁয়াগুলো কেমন যেন সাটিনের মতো খয়েরি-কালো-শাদা ঝকঝক করছিল; কিন্তু বিকেলে তার পেটের চামড়া ঝুলে পড়েছে, গা ধুলোয়-ঘামে কাদা হয়ে গেছে, চোখ ঝিমিয়ে পড়েছে, জিভ চার-আঙুল বেরিয়ে পড়ে মুখে গোটানাল ভাঙছে। তাকে দেখে কে বলবে সকালের সেই দুরন্ত শেয়াল! সারাদিন ধরে কেবলি উড়ে-উড়ে হাঁসের দল

তাকে এমনি নাকাল করেছে যে, বেচারা শেয়াল একেবারে হয়রান হয়ে পড়েছে ; তার মাথার আর ঠিক নেই ; কেবলি দেখছে যেন চোখের সামনে হাঁস ঘুরছে। সে গাছের তলায় সূর্যের আলো দেখে ভাবছে হাঁস ; প্রজাপতি উড়লে হাঁস বলে লাফিয়ে ধরতে যাচ্ছে ! যতক্ষণ দিনের আলো রইল চকা-নিকোবরের দল কিছু দয়া-মায়া না করে শেয়ালকে হয়রান করেই চলল। শেয়ালের তখন আর নড়বার শক্তি নেই, সে কেবল মাটির উপরে হাঁসের ছায়াগুলো থাবা দিয়ে-দিয়ে আঁচড়াতে থাকল। হাঁসেরা যখন দেখলে শেয়ালটা মড়ার মতো শুকনো পাতার উপরে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লেগেছে, তখন তারা—'কেমন। কেমন। হাঁস ধরবে!' বলতে-বলতে চাঁদপুরের জঙ্গল ছেড়ে নালমুড়ির চরের দিকে চলে গেল।

ঝাউ-গাছের উপর থেকে খোঁড়া হাঁস ঠোঁটে-করে রিদয়কে বাগদী-চরের থেকে একটু দূরে নালমুড়ির চরে নামিয়ে দিয়ে সারাদিন বুনো হাঁসের দলের সঙ্গে শেয়ালকে নিয়ে ঝপ্পটি আর দাঁতকপাটি খেলে বেড়াচ্ছে। ক্রমে সন্ধে হয়ে এল দেখে রিদয় ভাবছে, নিশ্চয়ই হাঁসেরা রাগ করে তাকে ফেলে গেছে, এখন কেমন করে সে বাড়ি যায়? আর কেমন করেই বা ঐ বুড়ো-আংলা চেহারা নিয়ে বাপ-মায়ের সঙ্গে দেখা করে? ঠিক এই সময় মাথার উপর ডাক দিয়ে হাঁসের দল উড়ে এসে নালমুড়িতে ঝুপঝাপ পড়েই জলে নেমে গেল। চরে মেল্লাই কাছিমের ডিম, রিদয় তারি একটা ওবেলা, একটা এবেলা খেয়ে পেট ভরিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। এমনি সে-রাত কাটল। ভোর না হতে হাঁসের দল রিদয়কে নিয়ে আবার চলল। রিদয় দেখলে হাঁসেরা তাকে বাড়ি যাবার কথা বললে না। সেও সে-কথা চেপে গিয়ে চুপচাপ খোঁড়া হাঁসের পিঠে চুপটি করে উঠে বসল।

লুসাই হাঁসের ডানাটা শেয়ালের কামড়ে একটু জখম হয়েছে, কাজেই বুনো হাঁসের দল আজ আর বেশি দূরে উড়ে গেল না। গোবরা-তলির মাটির কেল্লা 'মুড়িয়া ক্যাসেলের' উপরটায় এসে দেখতে লাগল, সেখানে মানুষ আছে কিনা। সেখানে শিকে-গাঁথা ফাটা-চটা কতকগুলো মাটির সঙ, পরী, সেপাই—এমনি সব। বাগানে মালি নেই, মালিকও নেই, কেবল একটা ভাঙা ফটকের মার্বেল-পাথরে কালি-দিয়ে-দাগা সাইন বোর্ডে লেখা রয়েছে।—'পালদিং অফ্ মুড়িয়া' ঠিক তারি নিচে একটা ভাঙা পিপের মধ্যে বসে একটা রোগা, কানা দেশী কুকুর পোড়ো কেল্লায় পাহারা দিচ্ছে।

বুনো হাঁসেরা আকাশ থেকে শুধোলে —'ছপ্পড়টা কার ? ছপ্পড়টা কার ?'

কুকুরটা অমনি আকাশে নাক তুলে চেঁচিয়ে উঠল, ভেউ-ভেউ করে বললে —'ছপ্পড় কী ? দেখছ না এটা নুড়িয়ার কেল্লা—পাথরে গাঁথা ! দেখছ না কেল্লার বুরুজ, তার উপরে ওই গোল-ঘর—সেখানে কামান-বসাবার ঘুলঘুলি, নিশেন ওড়াবার দাণ্ডা। গবাক্ষ, বাতায়ন, দরশন-দরওজা। এ-সব দেখছ না !'

হাঁসেরা কিছুই দেখতে পেলে না —না কামান, না ঘুলঘুলি, না গবাক্ষ, না বাতায়ন। কেবল একটা চিলের ছাদে একটা আকাশ-পিদিম দেবার বাঁশ দেখা গেল, তাতে এক-টুকরো গামছা-ছেঁড়া লটপট করছে ! হাঁসেরা হো-হো করে হেসে বললে —'কই ? কই ?'

কুকুরটা আরো রেগে বললে — 'দেখছ না, কেল্লার ময়দান যেন গড়ের মাঠ ! দেখছ না, কেলিকুঞ্জ —সেখানে রানী থাকেন। দেখ ওই হাম্মাম, সেখানে গোলাপজলের ফোয়ারা। দেখতে পাচ্ছ না বাগ-বাগিচা, আম-খাস, দেওয়ান-খাস ?' হাঁসেরা দেখলে, পানা পুকুর, লাউ-কুমড়োর মাচা —এমনি সব, আর কিছু নেই !

কুকুর আবার চেঁচিয়ে বললে—'ঐ দেখ ওদিকে গাছ-ঘর, মালির ঘর ; আর এই সব সুরকি-পাতা রাস্তার ধারে-ধারে পাথরের পরী, গ্যাসলাইটের থাম, বাঁধা ঘাট, বারো দোয়ারী নাটমন্দির। এসব কী চোখে পড়ছে না যে বলছ ছপ্পড় কার ? ছপ্পড়ে কখনো কেলিকানন, পুষ্পকানন, কামিনীকুঞ্জ থাকে ? না, পাথরের পরী, ঘাটের সিঁড়ি থাকে ? ঐ দেখ রাজার কাচারি, ঐ হাতিশাল, ঘোড়াশাল, তোষাখানা। এসব কি ছপ্পড়ে থাকে ? না ছপ্পড় দেখেছ ? ছপ্পড় কখনো দেখতে হয়তো ওপাড়ার ওই জমিদার-গুলোর বাড়ি দেখে এস। আমার মনিব কি জমিদার ? এরা মূর্ধাভিষিক্ত। লেখাপড়ার ধার দিয়েও যায় না। ঘোড়া-রোগে এদের সবাই মরেছে। সেকালে এরা চীনের রাজা ছিল। এখনো

ফটকে লেখা —'পাল্‌দিং অফ্ নুড়িয়া!' এই ছপ্পড়ের নহবতখানার দেখছ না চুড়ো দশক্রোশ থেকে দেখা যায় —এমনি ছপ্পড় এটা!'

কানা কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে থামলে হাঁসেরা হাসতে-হাসতে বললে —'আরে মুখ্য, আমরা কি তোর রাজার কথা, না রাজ-বাড়ির কথা, না মাটির কেল্লার কথা শুধোচ্ছি? ওই ভাঙা ফটকের ধারে পোড়ো বাগানে ভাঙা মদের পিপেটা কার, তাই বল না!' এমনি রঙ-তামাশা করতে-করতে হাঁসেরা নুড়িয়া ছাড়িয়ে সুরেশ্বরে —যেখানে প্রকাণ্ড ঠাকুর-বাড়ির ধারে সত্যিকার বাগ-বাগিচা, দীঘি-পুষ্করিণী, ঘাট-মাঠ রয়েছে, সেইখানে কুশ-ঘাসেরও গোড়া খেতে নামল। ওদিকে মেঘনা, এদিকে পদ্মা —এই দুই নদী যেখানে মিলেছে, সেই কোণটিতে হল সুরেশ্বর-মঠ। চারদিকে আম-বাগান, জাম-বাগান, ঠাকুর-বাড়ি, অতিথিশালা, ভোগ-মন্দির, দোলমঞ্চ, আনন্দবাজার, রথতলা, নাট-মন্দির, রন্ধনশালা, ফুল-বাগান, গোলাম-গোষ্ঠ, পঞ্চবটী, তুলসীমঞ্চ, রাসমঞ্চ, রামকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, গোলোকধাম, দেবদেবী-স্থান —এমনি একটা পরগনা জুড়ে প্রকাণ্ড ব্যাপার! এরি এক-কোণে বন আর মাঠ। সেইখানে হাঁসদের সঙ্গে রিদয় নেমেছে। কেন যে এত বেলা থাকতে এখানে হাঁসেরা এসে আড্ডা গেড়ে বসল, রিদয় তা বুঝলে না, ভেবেও দেখলে না, নিজের মনে বনে-বনে ঘুরে পাত-বাদাম আর শাক-পাতা কুড়িয়ে ছায়ায়-ছায়ায় খেলে বেড়াতে লাগল।

লুসাই হাঁসের ডানা ভালো হওয়া পর্যন্ত হাঁসেরা সেখানে অপেক্ষা করবার মতলব করেছে। একদিন খোঁড়া হাঁস দুটো শোল-মাছের ছানা এনে রিদয়কে দিয়ে বললে —'খেয়ে ফেল। মাছ না খেলে রোগা হবে।' রিদয় এবারে টপ-করে হাঁসের মতো সে-দুটো গিলে ফেলল। তারপর খোঁড়া হাঁসের পিঠে চড়ে নানা-রকম খেলা চলল। কোনো দিন জলে বুনো হাঁসদের সঙ্গে সাঁতার-খেলা, কোনো দিন দৌড়াদৌড়ি, লুকোচুরি, হাঁসের লড়াই —এমনি সারাদিন ছুটোছুটি চেঁচামেচি। এমন আনন্দে রিদয় জন্মে

কাটায়নি। পড়াশুনো সব বন্ধ, একেবারে কৈলাস পর্যন্ত লম্বা ছুটি আর ছুট! খেলা শেষ হলে দুতিন-ঘণ্টা দুপুর-বেলায় ধলেশ্বরীর ভাঙনের উপরে বসে জিরোনো; বিকালে আবার খেলা; আবার চান; সন্ধ্যাবেলা খেয়ে নিয়েই ঘুম। রিদয়ের খাবার ভাবনা গেছে, শোবারও কষ্ট মোটেই নেই। খোঁড়া হাঁসের ডানায় এখন বেশ ভালো পালকের গদী পেতে সে বিছানা করে নিয়েছে, ঘুম পেলেই সেখানে ঢোক। কেবল রাত হলেই তার ভয় আসে, বুঝি কাল সকালে বাড়ি ফিরতে হয়! কিন্তু হাঁসেরা তার ফেরবার কথাই আর তোলে না। একদিন, দুদিন, তিনদিন হাঁসেরা সুরেশ্বরেই রইল; কোনো দিকে যাবার নামটি করলে না। রিদয়ও মনে ভরসা পেয়ে সুরেশ্বরের মন্দির, মঠ লুকিয়ে দেখে নিতে লাগল — চারদিক ঘুরে। চারদিনের দিন চকা-নিকোবরকে কাছে আসতে দেখেই রিদয় ভাবলে —এইবার যেতে হল ফিরে! চকা গম্ভীর হয়ে তাকে শুধোলে —'এখানে খাওয়া-দাওয়া চলছে কেমন?'

রিদয় একটু হেসে বললে —'চলছে মন্দ নয়। তবে শীতকাল, ফল বড়ো একটা নেই।'

চকা তাকে সঙ্গে নিয়ে এক-ঝাড় কাঁচা বেত দেখিয়ে বললে — 'বেত খেয়ে দেখ দেখি, কেমন মিষ্টি!'

রিদয় বেত অনেকবার খেয়েছিল, আরো খাবার তার মোটেই ইচ্ছে নেই! কিন্তু চকার হুকুমে খেতে হল। খেয়ে দেখে মিষ্টি গুড়! ঠিক যেন আক চিবোচ্ছে!

চকা বললে —'কেমন, ভালো লাগল কি? গুরুমশায় খাওয়ান শুকনো বেত, তাই লাগে বিশ্রী। যাহোক, এখন বলি শোনো। এই বাগানে, বনে যে তুমি আজকাল একলাটি ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছ, এটা ভালো হচ্ছে না।'

রিদয় ভাবলে, এইবার যেতে হল রে!

চকা বলে চলল —'এই বনে তোমার কত শত্রু রয়েছে, তা জানো? প্রথম হচ্ছে শেয়াল, সে তোমার গন্ধে-গন্ধে ফিরছে,

সুবিধে পেলেই ধরবে। তারপর ভোঁদড়, ভাম দুজনে আছে— যেখানে-সেখানে গাছের কোটরে ঢুকতে গেলে বিপদে পড়বে কোনোদিন! জলের ধারে উদ্‌বেড়াল আছে—একলা চান করবার সময় সাবধান! যেখানে-সেখানে জড়ো-করা পাথরের উপরে বসতে যেও না, তার মধ্যে বেজি লুকিয়ে থাকতে পারে। শুকনো-পাতা-বেছানো জায়গা দেখলেই সেখানে শুতে যেয়ো না; পাতাগুলো নেড়ে, তলায় সাপ কি বিছে আছে কিনা, দেখা ভালো। মাঠ দিয়ে যখন চল, তখন আকাশের দিকে কি একবার চেয়ে দেখ— সেখানে বাজ-পাখি, চিল, কাক, শকুনি আছে কিনা? সেটা একবার-একবার দেখে চলা মন্দ নয়। ফস-করে ঝোপে-ঝাড়ে উঠতে যেয়ো না; গেরো-বাজগুলো অনেক সময় সেখানে শিকার ধরতে লুকিয়ে থাকে। সন্ধ্যা হলে কান পেতে শুনবে, কোনোদিকে পেঁচা ডাকল কিনা। পেঁচারা এমন নিঃশব্দে উড়ে আসে যে টের পাবে না কখন ঘাড়ে পড়ল।'

তার এত শত্রু আছে শুনে রিদয় ভাবলে, বাঁচা তো তাহলে শক্ত দেখছি। সে চকাকে বললে—'মরতে ভয় নেই। তবে শেয়াল-কুকুরের কিংবা শকুনের খাবার হতে আমি রাজী নই। এদের হাত থেকে বাঁচবার উপায় কিছু আছে বলতে পার?'

চকা একটু ভেবে বললে—'বনের যত ছোটো পাখি আর জন্তু এদের সঙ্গে ভাব করে ফেলবার চেষ্টা করো; তাহলে কাঠঠোকরা, ইঁদুর, কাঠবেড়ালি, খরগোস, তালচড়াই, বুলবুলি, টুনটুনি, শ্যামা, দোয়েল, এরা তোমায় সময়-মতো সাবধান করে দেবে; লুকোবার জায়গাও দেখিয়ে দেবে। আর দরকার হয় তো এই সব ছোটো জানোয়ারেরা তোমার জন্যে প্রাণও দিতে পারে।'

চকার কথা-মতো সেই দিনই রিদয় এক কাঠবেড়ালির সামনে উপস্থিত—ভাব করতে। যেমন দৌড়ে রিদয় সেদিকে যাওয়া, অমনি কাঠবেড়ালির গিয়ে গাছে ওঠা; আর ল্যাজ-ফুলিয়ে কিচ-কিচ করে গালাগালি শুরু করা—'অত ভাবে আর কাজ নেই।

তোমাকে চিনিনে? তুমি তো সেই আমতলির রিদয়! কত পাখির বাসা ভেঙেচ, কত পাখির ছানা টিপে মেরেছ। ফাঁদ পেতে, ধামা চাপা দিয়ে কত কাঠবেড়ালি ধরে খাঁচায় পুরেছ, মনে নেই? এখন আমরা তোমায় বিপদ থেকে বাঁচাব? এই ঢের যে বন থেকে আমরা এখনো তোমায় তাড়িয়ে মানুষের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছিনে! যাও, আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। সরে পড় বাসার কাছ থেকে।'

অন্য সময় হলে রিদয় কাঠবেড়ালিকে মজা দেখিয়ে দিত! কিন্তু এখন সে ভালোমানুষ হয়ে গেছে; আস্তে-আস্তে হাঁসকে এসে সব খবর জানালে। খোঁড়া হাঁস বললে—'অত দৌড়ে কাঠবেড়ালের কাছে যাওয়াটা ভালো হয়নি। হঠাৎ কিছু-একটা এসে পড়লে সব জানোয়ারই ভয় পায়, রাগ করে। যখন জানোয়ারদের কাছে যাবে—সহজে, আস্তে, ভদ্রভাবে যাবে। হুটোপাটি করে কিংবা চুপিচুপি চোরের মতো গেলেই তাড়া খাবে। তোমার স্বভাব একটু ভালো হয়ে এসেছে; এমনি আর দিনকতক ভালোমানুষটি থাকলেই, ওরা আপনিই তোমার সঙ্গে ভাব করবে। তুমি যদি তাদের উপকার কর, তবে তারাও তোমার সহায় হবে—বনের এই নিয়ম জেনে রাখ।'

রিদয় সারাদিন ভাবছে, কেমন করে সে বনের পশু-পাখিদের কাজে লাগতে পারবে, এমন সময় খবর হল, বেতগাঁয়ের একটা চাষা কাঠবেড়ালের বৌকে ধরে খাঁচায় বন্ধ করেছে; আর সে-বেচারার আটদিনের বাচ্চাগুলি না খেয়ে মরবার দাখিল! খোঁড়া হাঁস রিদয়কে বললে—'দেখ, যদি কাঠবেড়ালির উপকার করতে চাও তো এই ঠিক সময়।' রিদয় অমনি কোমর-বেঁধে সন্ধানে বেরুল।

লক্ষ্মীবার পিঠে-পার্বণের দিন কাঠবেড়ালের বৌ-চুরি হল সুরেশ্বরে, আর শনিবার বাগবাজারে ছাপার কাগজে বার হল সেই খবর। কাগজ-ওয়ালা-ছোঁড়াগুলো গলিতে-গলিতে হেঁকে চলল—

সুরেশ্বরে মজা ভারি—কাঠবেড়ালের বৌ চুরি!

বুড়ো-আংলা মানুষ এল, দুটো বাচ্ছা দিয়ে গেল।
মহন্ত ঠাকুর বড়ো দয়াল!
খাঁচা খুলে, ছেড়ে দিলে বাচ্ছা-সমেত কাঠ-বেড়াল।
মজার খবর এক পয়সা —পড়ে দেখ এক পয়সা!

কাণ্ডটা হয়েছিল এই: কাঠবেড়ালের বৌটি ছিল একেবারে শাদা ধপ-ধপে; তার একটা রোঁয়াও কালো ছিল না! চোখ-দুটি মানিকের মতো লাল টুকটুকে, পাগুলি গোলাপী, এমন কাঠবেড়ালি আলিপুরেও নেই! এ এক নতুনতর ছিষ্টি! গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো, রেল-কোম্পানির সায়েব-সুবো তাকে ধরতে কত ফাঁদই পেতেছে, কিন্তু এ-পর্যন্ত কাঠবেড়ালি ধরা দেয়নি। পোষপার্বণের দিন বাদামতলি দিয়ে আসতে-আসতে এক চাষা এই কাঠবেড়ালিকে টোকা চাপা দিয়ে হঠাৎ কেমন করে পাকড়াও করে ঘরে এনে একটা বিলিতি ইঁদুরের খাঁচায় বন্ধ করলে। পাড়ার লোক —ছেলে-বুড়ো, এই আশ্চর্য কাঠবেড়ালি দেখতে দলে-দলে ছুটে এল। এক ডোম তার জন্যে এক চমৎকার খাঁচা-কল তৈরি করে এনে দিলে। খাঁচার মধ্যে শোবার খাট, দোলবার দোলনা, দুধের বাটি, খাবার খৈ রাখবার ঝাঁপি, বসবার চৌকি —এমনি সব ঘর-কন্নার ছোটো-ছোটো সামিগ্রী দিয়ে সাজানো। সবাই ভাবলে, এমন খাঁচায় কাঠবেড়ালি সুখে থাকবে —খেলে বেড়াবে সারাদিন, দোলনায় দুলবে আর খৈ-দুধ খেয়ে মোটা হবে! কিন্তু কাঠবেড়ালি-বৌ চুপটি করে মুখ লুকিয়ে খাঁচার কোণে বসে রইল আর থেকে-থেকে কিচ-কিচ করে কাঁদতে থাকল। সারাদিন সে কিছু মুখে দিলে না, দোলনাতেও দুললে না, চৌকিতেও বসল না, খাটেও শুল না; কেবলি ছটফট করতে লাগল আর কাঁদতে থাকল!

সুরেশ্বরের পুজো দেবার জন্যে চাষার বৌ সেদিন মালপো ভাজছিল আর সব পাড়ার মেয়েরা পিঠে-পার্বণের পিঠে গড়ছিল। রান্নাঘরে ভারি ধুম লেগে গেছে। উনুন জ্বলেছে; ছেলে-মেয়েরা পিঠে ভাজার ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দ পেয়ে সেদিক দৌড়েছে। চাষার

বৌ ঠাকুরের ভোগ মালপোগুলো কেবলি পুড়ে যাচ্ছে কেন, সেই ভাবনাতেই রয়েছে। ওদিকে উঠোনের বাইরে বেড়ার গায়ে কাঠবেড়ালির খাঁচাটার দিকে কী হচ্ছে, কেউ দেখছে না। চাষার দিদিমা বুড়ি, সে আর নড়তে পারে না, দাওয়ায় মাতুর পেতে বসে সেই কেবল দেখছে—রান্নাঘরের আলো গিয়ে ঠিক কাঠবেড়ালির খাঁচার কাছটিতে পড়েছে, আর সারা-সন্ধ্যে কাঠবেড়ালিটা খাঁচার মধ্যে খুটখাট ছটফট করে বেড়াচ্ছে। এই খাঁচার পাশেই গোয়াল, তার কাছেই সদর দরজা—খোলা। বুড়ি পষ্ট দেখলে বুড়ো-আঙুলের মতো একটি মানুষ উঠোনে ঢুকল। যক দেখলে ধনদৌলত বাড়ে, বুড়ি সেটা জানে, কাজেই বুড়ো-আংলাকে দেখে সে একটুও ভয় পেলে না। বুড়ো-আংলা বাড়িতে ঢুকেই কাঠবেড়ালির খাঁচাটার দিকে ছুটে গেল; কিন্তু খাঁচাটা উঁচুতে ঝুলছে; কাছে একটা পাঁকাটি ছিল, বুড়ো-আংলা সেইটে টেনে খাঁচায় লাগিয়ে সিঁড়ির মতো সোজা কাটি-বেয়ে খাঁচায় চড়ে খাঁচার দরজা ধরে খোলবার চেষ্টা করতে লাগল। বুড়ি জানে খাঁচার তালা বন্ধ, সে কাউকে না ডেকে চুপ করে দেখতে লাগল—কী হয়। কাঠবেড়ালি বুড়ো-আংলার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বললে; তারপর বুড়ো-আংলা কাটি-বেয়ে নিচে নেমে চোঁচা দৌড় দিলে বনের দিকে। বুড়ি ভাবছে যক্ আর আসে কিনা, এমন সময় দেখলে বুড়ো-আংলা ছুটতে-ছুটতে আবার খাঁচার কাছে দৌড়ে গেল—হাতে তার ছুটো কী রয়েছে। বুড়ি তা দেখতে পেলে না, কিন্তু এটুকু সে পষ্ট দেখলে যে বুড়ো-আংলা একটা পোঁটলা মাটিতে রেখে, আর-একটা নিয়ে খাঁচার কাছে উঠল; তারপর এক হাতে খাঁচার কাটি ফাঁক করে জিনিসটা খাঁচার মধ্যে গলিয়ে দিয়ে, মাটি থেকে অন্য জিনিসটা নিয়ে আবার তেমনি করে খাঁচায় দিয়ে, দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

বুড়ি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলে না, সে ভাবলে, যক্ বোধ হয় তার জন্যে সাত-রাজার ধন মানিক-জোড় রেখে পালাল।

খাঁচাটা খুঁজে দেখতে বুড়ি উঠল। বুড়ির কালো-বেড়ালও এতক্ষণ খাঁচার দিকে নজর দিচ্ছিল, সেও উঠে অন্ধকারে গা-ঢাকা হয়ে দাঁড়াল কী হয় দেখতে। বুড়ি পৌষমাসের হিমে উঠোন দিয়ে চলেছে, এমন সময় আবার পায়ের শব্দ, আবার বুড়ো-আংলা হাতে দুটো কী নিয়ে! এবারে বুড়ো-আংলার হাতের জিনিস কিচ-কিচ করে ডেকে উঠল। বুড়ি বুঝলে যক্ কাঠবেড়ালির ছানা-গুলিকে দিতে এসেছে—তাদের মায়ের কাছে। দিদিমা উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখলেন, যক্ আগের মতো খাঁচার কাছে গেল, কিন্তু বেড়ালের চোখ অন্ধকারে জ্বলছে দেখে, সে যেখানকার সেইখানেই দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখতে লাগল—ছানা দুটি বুকে নিয়ে। উঠোনে বুড়িকে দেখে ছুটে এসে তার হাতে একটি ছানা দিয়ে বুড়ো-আংলা আগের মতো কাটি-বেয়ে একটির পর একটি ছানাকে খাঁচায় পুরে দিয়ে বুড়িকে পেন্নাম করে চলে গেল।

বুড়ি ঘরে এসে সবার কাছে এই গল্প করলে, কিন্তু কেউ সেটা বিশ্বাস করতে চাইলে না—দিদিমা স্বপন দেখেছে বলে উড়িয়ে দিলে। কিন্তু বুড়ি বলতে লাগল—'ওরে তোরা দেখে আয় না!'

সকালে সত্যি দেখা গেল চারটে ছানাকে নিয়ে কাঠবেড়ালি দুধ খাওয়াচ্ছে। এমন ঘটনা কেউ দেখেনি! সুরেশ্বরের মোহন্ত পর্যন্ত এই আশ্চর্য ঘটনা দেখতে হাতি চড়ে চাষার বাড়ি উপস্থিত! ওদিকে চাষার বৌ যত পিঠে সিদ্ধ করে, সবই পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সুরেশ্বরের মালপো-ভোগও হয় না, তখন মোহন্ত পরামর্শ দিলেন—'ওই কাঠবেড়ালি নিশ্চয় সুরেশ্বরী, নয় আর-কোনো দেবী, ওকে ছানা-পোনা সুদ্ধ বন্ধ করেছ, হয়তো সুরেশ্বর তাই রাগ করেছেন। না হলে মালপো-ভোগ পিঠে-ভোগ হঠাৎ পুড়েই বা যায় কেন? যাও, এখনি ওঁদের যেখানে বাসা, সেইখানে দিয়ে এস। না হলে আরো বিপদ ঘটতে পারে!'

চাষা তো ভয়ে অস্থির! গ্রামসুদ্ধ কেউ আর খাঁচায় হাত দিতে সাহস পায় না। তখন সবাই মিলে দিদিমাকে সেই খাঁচা নিয়ে

বনে কাঠ-বেড়ালির বাসায় পাঠিয়ে দিলে। বুড়ি যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে, আসবার সময় রাস্তার মাঝে একটা মোহর পেয়ে গেল। 'যতো ধর্ম স্ততো জয়' বলে খবরের কাগজের সম্পাদক খবরটা শেষ করলেন। এই বুড়ো-আংলাটি কিনি—লোকে তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল সুরেশ্বরে, বাগবাজারে, ফরিদপুরে, যশোহরে, ময়মনসিংহে, আগরতলায়, আসামে, কাছাড়ে!

এই ঘটনার দুদিন পরে আর এক কাণ্ড! গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র যেখানে এক হয়েছে, সেইখানে আড়ালিয়ার চর। বুনোহাঁসের সঙ্গে রিদয়কে নিয়ে খোঁড়া হাঁস সেই চরে চরতে নামল। চরটা কেবল বালি, মাঝে-মাঝে ছোটো-ছোটো ঝাউ, আর এখানে-ওখানে শুকনো ঘাস। চরের একদিকে আড়ালিয়া গ্রাম। হাঁসরা চরছে, এমন সময় চরের উপরে কতকগুলো জেলের ছেলে খেলতে এল। মানুষ দেখেই চকা হাঁক দিলে, আর অমনি সব বুনো হাঁস ডানা-মেলে উড়ে পড়ল। কিন্তু খোঁড়া হাঁস ছেলে দেখে একটুও ভয় পেলে না; বরং গলা চড়িয়ে বুনো হাঁসদের বললে—'ছেলে দেখে ভয় কী?'

রিদয় হাঁসের পিঠ থেকে নেমে একটা ঝাউতলায় বসে ঝাউফুল কুড়িয়ে মার্বেল খেলছে, ছেলেগুলো কাছে আসতেই সে একবার শিস দিয়ে খোঁড়াকে সাবধান করে একটা ঘাস-বনে লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু খোঁড়ার আজ কী যে হল, সে যেমন চরছিল তেমনি চরে বেড়াতে লাগল। ছেলে-দুটো একটা বালির ঢিপি ঘুরে একেবারে দুদিক থেকে হাঁসকে তাড়া করলে। কেমন করে যে তারা এত কাছে হঠাৎ এসে পড়ল, ভেবে না পেয়ে খোঁড়া একেবারে হতভম্ব! উড়তে যে জানে তা মনেই এল না। সে ক্রমাগত দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর একটা ডোবার কাছে গিয়ে খোঁড়া ধরা পড়ে গেল।

রিদয়ের প্রথমে মনে এল যে ছুটে গিয়ে ছেলে-দুটোকে থাবড়া মেরে হাঁসটা কেড়ে নেয়, কিন্তু তখনি মনে পড়ল, সে ছোটো হয়ে

গেছে! তখন সে রেগে বসে-বসে কেবলি বালি খুঁড়তে লাগল। এদিকে খোঁড়া ডাকছে—'বুড়ো-আংলা ভাই, এস লক্ষীটি, আমায় বাঁচাও।'

'ধরা পড়ে এখন বাঁচাও!' —বলে রিদয় ছেলে-দুটোর সঙ্গে দৌড়ল। ছেলে-দুটো হাঁস নিয়ে একটা নালা পেরিয়ে চর ছেড়ে গ্রামে ঢুকল।

রিদয় আর তাদের দেখতে পেলে না। নালায় অনেক জল। রিদয় অনেকটা ঘুরে তবে একটা শুকনো-গাছের ডাল বেয়ে ওপারে উঠে, হাঁসকে খুঁজতে মাটির উপর ছেলেদের পায়ের চিহ্ন ধরে এগিয়ে চলল। একটা চৌমাথায় দেখা গেল, ছেলে-দুটো দুদিকে গেছে। কোন পথে যাওয়া যায়, রিদয় ভাবছে, এমন সময় বাঁকের রাস্তায় একটা হাঁসের পালক রয়েছে দেখে রিদয় বুঝলে, হাঁস এই পথে গেছে—পালক ফেলতে-ফেলতে, যাতে সে সন্ধান পায় সেই জন্যে।

রিদয় পালকের চিহ্ন ধরে দুটো মাঠ পেরিয়ে গ্রামের একটা সরু গলি পেলে। গলির মোড়ে একটা মন্দির। হাঁস কোথায় দেখা নেই, মন্দিরের খিলানের উপরে লেখা—'হংসেশ্বরী! আর তারি উপরে মাটির গড়া এক হাঁস। রিদয় রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে সেই দিকে চেয়ে আছে, এদিকে পিছনে প্রায় একশো লোক জমা হয়েছে—নাকে তিলক, কপালে ফোঁটা, নেড়া-মাথা বৈরিগীর দল! রিদয় যেমনি ফিরেছে অমনি সবাই মাটিতে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে বললে—'জয় প্রভু বামনদেব, ঠাকুর, কৃপা করো!'

বামন কে, রিদয় তা জানত না, কিন্তু প্রণামের ঘটা দেখে সে বুঝলে, সবাই তাকে দেবতা ভেবেছে। রিদয় অমনি গম্ভীর হয়ে বললে—'তোমরা আমার হাঁস চুরি করেছ, এখনি এনে দাও। না হলে হংসেশ্বরীর কোপে পড়ে যাবে।'

সবাই মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তখন হংসেশ্বরীর পাণ্ডা গল-বস্তর হয়ে বললে—'ঠাকুর, হাঁস কোথায় আছে বলে দিন, এখনি এনে দিচ্ছি!'

রিদয় রেগে বলে উঠল —'কোথায় জানলে কী তোমাদের আনতে বলি? এই গ্রামের দুটো ছেলে তাকে নিয়ে এসেছে — এই দিকে।'

এই কথা হচ্ছে, এমন সময় মন্দিরের পিছন দিকে হাঁসের ডাক শোনা গেল। বেচারা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। রিদয় দৌড়ে সেদিকে গিয়ে দেখে একটা ঘরের উঠোনে এক বুড়ি খোঁড়া হাঁসকে দুই হাঁটুতে চেপে ধরে ডানা কেটে দেবার উদ্যোগ করছে —দুটো পালক কেটেছে, আর দুটো মুঠিয়ে ধরে কাটবার চেষ্টায় আছে। হঠাৎ বুড়ো-আংলা-রিদয়কে দেখে বুড়ি একেবারে হাঁ হয়ে গেল! সেই সময়ে যত নেড়ানেড়ির দল ছুটে এসে হৈ-হৈ করে বুড়ির হাত থেকে খোঁড়া হাঁস ছাড়িয়ে নিলে। রিদয় হাঁসের উপরে চড়ে বসল আর অমনি রাজহাঁস তাকে নিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

বৈরিগীর দল সেই হাঁসের পালক হংসেশ্বরীর পরমহংস-বাবাজীর কাছে হাজির করে দিলে। তিনি পালক কটি একটি হাঁড়িতে রেখে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন —'অভূতপূর্ব ঘটনা! হংসেশ্বরীর রাজহংস স্বশরীরে বামনকে নিয়ে উপস্থিত হয়ে দুটি পালক রক্ষা করে গেছেন। সে জন্য একটি সোনার কৌটার প্রয়োজন। হিন্দুমাত্রেরই এই বিষয়ে মুক্তহস্ত হওয়া উচিত। চাঁদা আমার কাছে মঃ অঃ করিয়া পাঠাইবেন। ইতি—সুরেশ্বরের পরমহংস বাবাজী।'

মানুষদের মধ্যে যেমন খবরের কাগজ, পাখিদের মধ্যে তেমনি খবর রটাবার জন্য পাখি আছে। কোথাও কিছু নতুন কাণ্ড হলেই সেই জায়গাটার উপরে প্রথমে কাক-চিল জড়ো হয়, তারপর তাদের মুখে এ-পাখি, এ-পাখির মুখে ও-পাখি —এমনি এ-বন, সে-বন, এ-দেশ, সে-দেশে দেখতে-দেখতে খবর রটে যায়।

কাঠবেড়ালির কথা আর খোঁড়া হাঁস উদ্ধারের কথা রিদয় ফিরে আসার পূর্বে হাঁসের দলে, বনে-জঙ্গলে, জলে-স্থলে কোনো

জানোয়ারের আর জানতে বাকি রইল না। গাছে-গাছে তাল-চড়াই, গাং-শালিক —এরা সুরে-তালে রিদয়ের কীর্তি-কথা ঢেঁড়া-পিটিয়ে বলে বেড়াতে লাগল :

শুন এবে অবধান পশুপক্ষিগণ।
বুড়ো-আংলা মহাকাব্য করি বিবরণ॥
কাঠবেড়ালি রামদাস তাহারে উদ্ধরি।
বীরদাপে চলে যথা রাজ হংসেশ্বরী॥
হাঁসের পালক দুটা কেটে নিল বুড়ি।
যাহে লেখা যায় মহাকাব্য ঝুড়ি-ঝুড়ি॥
হাঁসের দুর্দশা দেখি আংলা বুড়ো ধায়।
হংসেশ্বরী ছাড়ি বুড়ি পালাল ঢাকায়॥
মোহন্ত তুলিয়া নিল হংসের কলম।
সোনা চাই বলি তাহে লেখে বিজ্ঞাপন॥
তালচটক তাল ধরে গানশালিকে কয়।
সুবচনী হাঁস নিয়ে চলিল রিদয়॥
খোঁড়া হাঁসেরে লইয়া, খোঁড়া হাঁসেরে লইয়া
রচিলাম মহাকাব্য যতন করিয়া॥
আংলা বিজয় নামে কাব্য চমৎকার।
গোটা দুই শ্লোক তারি দিনু উপহার॥
সকলে শুনহ আর শুনাহ অন্যকে।
ক্ষীর হতে নীর পিয়ে ধন্য হোক লোকে॥
ইতি আংলা বিজয় মহাকাব্যে প্রথম সর্গঃ।

আজ চকা-নিকোবর ভারি খুশি। সে রিদয়কে কুর্নিস করে বললে —'একবার নয়, বার-বার তিনবার তুমি দেখিয়েছ যে পশু-পাখিদের তুমি পরমবন্ধু! প্রথমে শেয়ালের মুখ থেকে বুনো হাঁস 'লুসাইকে' উদ্ধার, তার পরে কাঠবেড়ালির উপকার, সব-শেষে পোষা হাঁসকে বাঁচানো। তোমার ভালোবাসায় আমরা কেনা হয়ে রইলেম। আর তোমায় আমরা ফেরাতে চাইনে। তোমার যদি

মানুষ হতে ইচ্ছে হয় তো বলো আমি নিজে গণেশ-ঠাকুরকে তোমার জন্যে 'রেকমেণ্ডেসন' পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

রিদয়ের আর মোটেই মানুষ হতে ইচ্ছে ছিল না। হাঁসেদের সঙ্গে দেশ-বিদেশ দেখতে-দেখতে বড়ো মজাতেই সে দিন কাটাচ্ছে, তবু মানুষ হবার রেকমেণ্ডেসনখানা না নিলে চকা পাছে কিছু মনে করে, সেই ভয়ে বললে —'মানুষ হবার সময় হলে আমি তোমাকে জানাব। এখন কিছুদিন তোমাদের সঙ্গে থাকতে আমি ইচ্ছে করেছি।'

চকা ঘাড় নেড়ে বললে —'সেই ভালো ; যখন ইচ্ছে হবে বলো, আমি সট্রিফিকিট দিয়ে তোমাকে গণেশের কাছে পাঠাব। এখন হাঁসের দলে হংসপাল হয়ে থাকো।' বলে চকা রিদয়ের মাথাটা ঠোঁট দিয়ে চুলকে দিলে। অমনি চারিদিকে বুনো হাঁস রিদয়ের নতুন উপাধি ফুকরে উঠল —'হংপাল! হংপাল!'

বনের পাখিরা প্রতিধ্বনি করলে —'হি-রি-দ-য় হংসপাল!'

সুরেশ্বর ছেড়ে বৃষ্টি আরম্ভ হল। এতদিন রোদে কাঠ ফাটছিল। সকালে যখন হাঁসের দল যাত্রা করে বার হল তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার কিন্তু ব্রহ্মপুত্র-নদের রাস্তা ধরে যতই তারা উত্তর-মুখে এগিয়ে চলল, ততই মেঘ আর কুয়াশা আর সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টি দেখা দিলে! হাঁসের ডানায় পাহাড়ের হাওয়া লেগেছে, তারা মেঘ কাটিয়ে হু-হু করে চলেছে; মাটির পাখিদের সঙ্গে রংতামাশা করে বকতে-বকতে চলবার আর সময় নেই, তারা কেবলি টানা সুরে ডেকে চলেছে —'কোথায়, হেথায়, কোথায়, হেথায়।'

হাঁসের দলের সাড়া পেয়ে ব্রহ্মপুত্রের দুপারের কুঁকড়ো ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে জানান দিতে শুরু করলে। পুব পারের কুঁকড়ো হাঁকলে —'সাতনল, চন্দনপুর, কোমিল্লা, আগরতলার রাজবাড়ি, টিপারা, হীলটিপারা!' পশ্চিম পারের কুঁকড়ো হাঁকলে —'মীরকদম, নারাণগঞ্জ, ঢাকার নবাববাড়ি, মুড়াপাড়া।' পুবে হাঁকলে —'ভেংচার চর,' পশ্চিমে হাঁকলে —'চর ভিন-দোর।'

হাঁসেরা তেজে চলেছে, এবার ছোটো-ছোটো গ্রাম, নদীর আর নাম শোনা যাচ্ছে না, বড়ো-বড়ো জায়গার কুঁকড়ো হাঁকছে —'পাবনা, রামপুর-বোয়ালিয়া, বোগরা, রাজসাহি, দিনাজপুর, রংপুর, কুচবেহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি!' পুবের কুঁকড়ো অমনি ডেকে বললে —'খাসিয়া-পাহাড়, গারো-পাহাড়, জৈঁতিয়া-পর্বত, কামরূপ।'

বুনো-হাঁসের দল পাহাড়-পর্বত অনেক দেখেছে, শিলিগুড়ি থেকে হিমালয় ডিঙিয়ে মানস-সরোবরে চট করে গিয়ে পড়া গেলেও তারা শিলিগুড়ি থেকে ডাইনে ফিরে, ফুলচারি, হাড়গিলের-চর, ধুবড়ি, শিলং, গৌহাটি, দিব্রুগড়, কামরূপ হয়ে যাবার মতলবই করলে, কেননা, দার্জিলিঙ হয়ে যাওয়া মানে ঝড়-ঝাপটা, বরফের

উপর দিয়ে যাওয়া, আর কামরূপের পথে গেলে ব্রহ্মপুত্র-নদের দুধারে নগরে গ্রামে চরে জিরিয়ে যাওয়া চলে।

রিদয় কিন্তু বেঁকে বসল, এত কাছে এসে দার্জিলিঙ যদি দেখা না হলো তো হলো কী? খোঁড়া হাঁসের যদিও পায়ে বাত তবু রিদয়ের কথাতেই সে সায় দিয়ে বসল! ঠিক সেই সময় শিলিগুড়ি থেকে ছোটো রেল বাঁশি দিয়ে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলে, রিদয় আকাশের উপর থেকে দেখলে, যেন শাদা-কালো একটি গুটিপোকা এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে—হাঁসে চড়া রিদয়ের অভ্যেস, রেল এত ঢিমে চলছে দেখে ভেবেছিল, গুগলির মতো কত বছরই লাগবে ওটার দার্জিলিঙ পৌঁছতে।

রিদয় চকাকে শুধোলে, 'ওটা কতদিনে দার্জিলিঙ পৌঁছবে?'

চকা উত্তর দিলে—'এই সকাল আটটায় ছাড়ল, বেলা তিনটে-চারটেতে পৌঁছে যাবে!'

'আর আমরা কতক্ষণে সেখানে যেতে পারি' রিদয় শুধোলে।

চকা উত্তর করলে—'যদি রাস্তায় কুয়াশা হিম না পাই, তবে বড়ো জোর এক-ঘণ্টায় 'ঘুম-লেকে' গিয়ে নামতে পারি, সেখান থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে সিঞ্চল, কালিম্পং, লিবং, সন্দকফু থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে কার্সিয়ং, টুং-সোনাদা হয়ে আবার ঘুমেতে নেমে একটু জল খেয়ে একচোট ঘুমিয়ে নিয়ে বেলা সাড়ে-এগারটা নাগাদ দার্জিলিঙ-ক্যালকাটা রোডের ধারে আলুবাড়ির গুম্পার কাছটায় তোমায় নামিয়ে দিতে পারি। আমরা তিব্বতের হাঁস তার ওদিকে আর আমাদের যাবার যো নেই—গেলেই গোরারা গুলি চালাবে।'

এত সহজে দার্জিলিঙ দেখা যাবে জেনে খোঁড়া হাঁস পর্যন্ত নেচে উঠল। চকা তখন বললে—'এতবড়ো দল নিয়ে তো পাহাড়ে চলা দায়, ছোটো রেলের মতো আমাদেরও দল ছোটো করে ফেলা যাক। বড়ো-দলটা নিয়ে আণ্ডামানি কামরূপে হাড়গিলে-চরে গিয়ে অপেক্ষা করুক; আর আমি, খোঁড়া, হংপাল, কাটচাল, নানকৌড়ি, চলো দার্জিলিঙ দেখে আসি।' শিলিগুড়ি থেকে হাঁসের দল দুই ভাগ

হয়ে চলল, ঠিক সেই সময় গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি নামল। কাঠ-ফাটা রোদের পরে নতুন বৃষ্টি পেয়ে মাটি ভিজে উঠেছে, পাতা গজিয়ে উঠেছে, বনের পাখিরা আনন্দে উলু-উলু দিয়ে কেবলি বলতে লেগেছে, বৃষ্টির গান :

বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর
বাজছে বাদল গামুর-গুমুর
ডাল-চাল আর মক্কা-মসুর
ফোঁটায়-ফোঁটায় নামে—
আকাশ থেকে নামে—
জলের সাথে নামে—
ঘরে-ঘরে নামে—
টাপুর-টুপুর গামুর-গুমুর
গামুর-গুমুর টাপুর-টুপুর।

'তিষ্টা' নদীর কাছে এসে হাঁসেরা শুনলে, নদীর দুপারে সবাই বলছে :

মেঘ লেগেছে কালা-ধলা
বইছে বাতাস জালা-জলা
বরফ-গলা পাগলা-ঝোরা
শুকনা ধুয়ে আসে
তিষ্টা নদীর পাশে—
ঝাপুর-ঝুপুর ছাপুর-ছুপুর
ছাপুর-ছুপুর ঝাপুর-ঝুপুর।

নতুন জল-বাতাস পেয়ে পৃথিবী জুড়ে সবাই রোল তুলেছে, আকাশের হাঁসেরাই বা চুপ করে থাকে কেমন করে, তারা পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মতো ধাপে-ধাপে আলু, পেঁয়াজ, শাক, সবজি খেত-গুলোর ধার দিয়ে ডাকতে-ডাকতে চলল—'রসা জমি ধ্বসে পড় না, বসে থেক না, ফসল ধরাও, ফল ধরাও নতুন বীচে ফল ধরাও!'

পাগলা-ঝোরার কাছ-বরাবর এসে একখানা প্রকাণ্ড মেঘ হাঁসেদের সঙ্গ নিয়ে উত্তর-মুখে উড়ে চলল। কলকাতার এক বাবু পাহাড়ে রাস্তায় রবারের জুতো রবারের ওয়াটারপ্রুফ পরে বিষ্টির ভয়ে নাকে-কানে গলাবন্ধ জড়িয়ে মোটা এক চুরুট টানতে-টানতে ছাতা খুলে হাঁফাতে হাঁফাতে চড়াই ভেঙে তাড়াতাড়ি বাড়ি-মুখো হয়েছেন দেখে হাঁসেরা রঙ্গ জুড়লে :

জল চাও না, চাও কিন্তু খাসা পাঁউরুটি
হয় না তো সিটি।
জলের ভয়ে তাড়াতাড়ি খুললে কেন ছাতা।
জল না হলে গাছে-গাছে ফলে পেঁপে আতা?
জল না হলে কোথায় পেতে আলু পটোল চা!
হত নাকো রবার-গাছ কিসে ঢাকতে পা?
বিষ্টি নইলে ছিষ্টি নষ্ট, সেটা মনে রেখ—
মেঘ দেখলে নাক তোলো তো উপোস করে থেক।
সকালে পাবে না চা দুপুরেতে ভাত—
বিকেলে পাবে না ফল, রাতে জ্বলবে আঁত
না পাবে নদীতে মাছ খেতেতে ফসল—
ফোঁটা-ফোঁটা ঝরবে তখন তোমার চোখে জল।

বাবু একবার ছাতার মধ্যে থেকে আকাশে চেয়ে দেখলেন, রিদয় টুপ করে তার নাকের উপর একটা শিল ফেলে হাততালি দিতে-দিতে হাঁসের পিঠে উড়ে চলল। মেঘখানা শিল বর্ষাতে-বর্ষাতে হাঁসের দলের পিছনে-পিছনে আসছে, আর হাঁসেরা সারি দিয়ে আগে-আগে যেন মেঘখানাকে টেনে নিয়ে চলেছে—আকাশ দিয়ে পুষ্পকরথের মতো! তিন-দরিয়ার অনেক উপরে দুই পাহাড়ের দেয়াল যেন কেল্লার বুরুজের মতো সোজা আকাশ ঠেলে উঠেছে একেবারে মেঘের কাছে, তারি গায়ে পাগলা-ঝোরা ঝরনা শাদা

পৈতের মতো পাহাড়ের গা বেয়ে গাছ-পালার মধ্যে দিয়ে ঝুলে পড়েছে —এই পাহাড়ের দেওয়াল ডিঙিয়ে হাঁসেরা কার্সিয়ংয়ের মুখে চলল —পাংখাবাড়ি থেকে কারসিয়ং দুধারে ঝরনা আর চা বাগান সবজি-খেত, থাকে-থাকে পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ি বস্তি, সাহেবদের কুঠি, কার্সিয়ং শহরটা যেন আর একটা ঝরনার মতো দেখা যাচ্ছে—পাহাড়ি গোলাপ গেঁদা গাছা-আগাছার কুঁড়ি ধরেছে।

বাঁ-ধারে দূরে কালো-কালো পাহাড়ের শিখরে বরফের পাহাড় যেন দুধের ফেনার মতো উথলে পড়েছে। একদল বাঙালি বৌ ছেলে-পুলে নিয়ে কার্সিয়ংয়ের ইষ্টিশানের উপরের রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছে —গিন্নি সবে অসুখ থেকে উঠেছেন, তিনি ছাতি মাথায় দাণ্ডি চেপে চলেছেন, কর্তা লাঠি ধরে সঙ্গে, পিছনে চার মেয়ে, ছোটো-বড়ো তিন ছেলে, এক বৌ, দুই জামাই, একপাল নাতি-পুতি হাসি-খুশি লুটো-পাটি করে চলেছে! কেউ পাহাড় থেকে ফুল তুলছে, কেউ রাস্তা থেকে নুড়ি কুড়োচ্ছে,একটা ছেলের হাতে প্রজাপতির কুড়োজাল দেখে রিদয় চেঁচিয়ে বললে —'ধর না ধর না, যক্ হবে।'

হাঁসেরা বলে চলল —'ফুল যত চাও তোল, গোলাপ ফুটল বলে, গাঁদা ওই ফুটেছে, চেরি ফুলে রঙ ধরছে, আমরা এনেছি, নাও কলাই-শুটি নাও, ফুলকপি নাও, আপেল নাও, নাসপাতি যত পার খাও নাও দাও থোও, প্রজাপতি ধরা ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!'

দেখতে-দেখতে মেঘে কার্সিয়ং ঢেকে গেল, ছেলে-বুড়ো ঘর-বাড়ি বাজার-ইষ্টিশান মায় ছোটো রেল গিদা পাহাড় ডাউনহিল সব কুয়াশায় চাপা পড়ল, দূরে সিঞ্চল মেঘের উপরে মাথা তুলে দেখা দিল। এইবার রিদয়ের শীত আরম্ভ হল। খোঁড়া হাঁস ডানা ছড়িয়ে উড়ে চলেছে, পালকের মধ্যে ঢোকবার যো নেই, জলে-শীতে থরথর করে বেচারা কাঁপতে লাগল, খোঁড়াও বাঙলা-দেশের মানুষ, পাহাড়ের শীতে তারও ডানার পালকগুলো কাঁটা দিয়ে উঠল, সে ডাক দিলে —'শীত-শীত হংপাল শীতে গেল!'

চকা হাঁকলে —'নেমে পড় কার্সিয়ং !'

হাঁসরা অমনি মেঘের মধ্যে দিয়ে নামতে শুরু করলে। রিদয় দেখলে, মেঘের মধ্যেটায় খোলা আকাশের চেয়ে কম ঠাণ্ডা, যেন পাতলা তুলোর বালাপোষ গায়ে দিয়েছে। হাঁসেরা নামতে-নামতে একটা বাড়ির ছাতে এসে বসল। বাড়ির বাইরে কেউ নেই, কুয়াশার ভয়ে সবাই ঘরে কাঁচ বন্ধ করে বসেছে, বাইরে কেবল গালফুলো একটুখানি একটা পাহাড়ি ছোঁড়া আগুন জ্বেলে কচি ছেলের একজোড়া পশমের মোজা তাতিয়ে নিচ্ছে, আর সেই সঙ্গে নিজের হাত-পাগুলোও একটু সেঁকে নিচ্ছে, এমন সময় ঘর থেকে বাড়ির গিন্নি ডাক দিলেন —'টুকনী !'

ছেলেটা তাড়াতাড়ি হাতের মোজা জোড়া মাটিতে ফেলে দৌড় দিলে, চকা অমনি ছোঁ দিয়ে মোজাটা নিয়ে রিদয়কে দিয়ে বললে— 'পরে ফেল উলের জামা।' রিদয় মোজাটা মাথায় গলিয়ে ছেঁড়া মোজার তিনটে ছেঁদা দিয়ে হাত আর মাথা বার করে ফিট হয়ে যেন সোয়েটার পরে দাঁড়াল।

হাঁসের দল তাকে পিঠে নিয়ে আকাশে উঠল —টুকনী ছোঁড়াটা নিচে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল —'আরে-আরে হাঁস মোজা লেকে ভাগা !'

রিদয় শুনলে গিন্নি চেঁচাচ্ছেন —'হাঁসে কখনো মোজা নেয় ? নিশ্চয় মোজাটা পুড়িয়ে রেখে মিছে কথা বলছে ! ফের ঝুটবাত বোলতা !'

টুকনীর মোজা-পোড়ানোর মামলার শেষ কী হল দেখবার আর সময় হল না ! মেঘ তখন মুষল ধারায় জল ঢালতে আরম্ভ করেছে হাঁসেরা তাড়াতাড়ি মেঘ ছাড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল আর বন-জঙ্গলকে ডেকে বলতে লাগল —'কত জল আর চাই বল, তেষ্টা যে মেটে না দেখি, মেটে না দেখি !' কিন্তু দেখতে-দেখতে আকাশ নীল মেঘে ছেয়ে গেল, সূর্য কোথায় কোনদিকে তার ঠিক নেই, হাঁসেদের ডানার উপরে বিষ্টি ক্রমাগত চাবুকের মতো পড়ছে,

ডানার পালক ভিজে তাদের বুকের পালকে পর্যন্ত জল সেঁধিয়েছে, পাহাড়-পর্বত চড়াই-নাবাই গাছ-পালা ঘন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেছে —দু'হাত আগে নজর চলে না। পাখিদের গান থেমে গেছে। হাঁসেরা চলেছে, ধীরে-ধীরে পথ খুঁজে-খুঁজে; রিদয় কেবলি শীতে কাঁপছে আর ভাবছে, চুরি করার এই শাস্তি।

এই মেঘ আর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে চকা-নিকোবর যখন তাদের কটিকে নিয়ে সিংচল পাহাড়ের সিংএ একটা ঝাউতলায় এসে বসল, তখন যেন রিদয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল! পাহাড়ের চুড়োয় কেবল সোনালি ঘাসের বন আর এক-একটা ছাতের মতো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাথর বরফ পড়ে শাদা হয়ে রয়েছে —কোথাও-কোথাও নালা দিয়ে বরফ-জল বয়ে বয়ে চলেছে, পাতায়-পাতায় টিপটিপ করে বিষ্টি লাগছে কিন্তু শীত হলেও হাওয়া এখানে এমন পরিষ্কার যে রিদয় আনন্দে এদিকে-ওদিকে ছুটে বেড়াতে লাগল। বুনো টেঁপারি সোনালি পাতা রুপোলি পাতা সোনা-ঘাস রুপো-ঘাস তুলে-তুলে রিদয় বোঝা বাঁধছে দেখে চকা হেসে বললে —'এগুলো হবে কী—'

রিদয় অমনি বলে উঠল —'দেশে গিয়ে দেখাব!'

খোঁড়া হাঁস ভয়ে পেয়ে বললে —'ওই মস্ত বোঝা নিয়ে ওড়া আমার কর্ম নয়, তুমি তবে রেলে করে বাড়ি যাও!'

চকা রিদয়কে ডেকে বললে —'খুব-কাজের জিনিস ছাড়া একটি বাজে জিনিস সঙ্গে নেওয়া আমাদের নিয়ম নয়, পেট ভরে টেঁপারি খাও তাতে আপত্তি নেই, ঘাস দু'কানে দুটো গুঁজতে পার তার বেশি নয়।'

রিদয় দু'কানে দুটো ঘাস গুঁজে টেঁপারি খেয়ে বেড়াচ্ছে এমন সময় ভালুকের সঙ্গে দেখা! রিদয় ভালুক নাচ অনেক দেখেছে কিন্তু এত-বড়ো এমন রোঁয়াওয়ালা কালো মিস ভালুক সে কোনোদিন দেখেনি, ভালুক তাকে দেখে দু'পা তুলে থপথপ করে এগিয়ে এসে বললে —'এখানে মানুষ হয়ে কী করতে এসেছ? পালাও, না হলে শীতে মরে যাবে, বড়ো খারাপ জায়গা। গোরাগুলো

পর্যন্ত এখানে টিকতে পারেনি, কত লোক যে এখানে ঠাণ্ডা আর রাতের বেলায় ভূতের ভয়ে কেঁপে মরেছে তার ঠিক নেই। এখানে এককালে গোরা-বারিক ছিল কাণ্ডেল জাঁদরেল সব এখানে থাকত, এখন আর কেউ নেই! কোথায় গেছে তাদের বাগ-বাগিচা বাজার-শহর, কেবল দেখ চারদিকে আগুন-জ্বালাবার চুলোগুলো পড়ে আছে, শীতে সব গোরা ভূত বেরিয়ে এই-সব ভাঙাচুলির ধারে বসে আগুন পোহায় আর মদ খায়, হুক্কা-হুয়া গান গায়।'

ঠিক এই সময় শেয়াল-ডাকের মতো গান শোনা গেল, আর মেম সঙ্গে একটা গোরা বোতল হাতে টলতে-টলতে আসছে দেখা গেল। ভালুককে দূর থেকে দেখেই গোরা যেমন বন্দুক উঁচিয়েছে, অমনি ভালুক চট করে গাছের তলায় অন্ধকারে কালোয়-কালো মিশিয়ে গেছে! রিদয়ের গায়ে টকটকে মোজা—মেম তাকে ভাবলে কার পোষা ছোট বাঁদর, সে অমনি 'মাংকি-মাংকি' বলে রিদয়কে ধরতে ছুটল! রিদয় তাড়াতাড়ি যেমন পালাতে যাবে অমনি পাহাড় থেকে গড়াতে-গড়াতে একেবারে কার্ট রোডে মাল-বোঝাই ছোটো রেলের ছাতে এসে চিৎপাত!

রেলটা ঝরনা থেকে হোঁস-ফোঁস করে খানিক জল ইঞ্জিনে ভরে নিয়ে ঘুম জোড়বাংলার দিকে এগিয়ে চলল ভকভক করে বকতে-বকতে। এদিকে ভালুকের কাছে খবর পেয়ে হাঁসেরা উড়েছে ঠিক রেলের সঙ্গে-সঙ্গে—তারা দেখছে, রিদয় মালগাড়ির উপরটায় যেন একটি লাল নিশেনের মতো লটপট করছে। ঘুম বস্তিতে এসে রেল থামল। হাঁসেরা অমনি হাঁক দিলে—'ঘুম লেক যাও তো নেমে পড়!' কিন্তু তখন গাড়ির ঝাঁকানিতে রিদয়ের ঘুম এসেছে, সে হাত নেড়ে জানাল—'দার্জিলিঙ যাব!' এই সময় গাড়ির মধ্যে থেকে একপাল ছেলে চেঁচিয়ে উঠল—'টু সোনাদা ঘুম!' রিদয় চমকে উঠে দেখলে গাড়ি ছেড়েছে।

ঘুমের পরেই 'বাতাসিয়া' নতুন লাইন খুলছে—এক-একটা পাহাড় কেটে সেগুলো কেল্লার বুরুজের মতো পাথরের টালি দিয়ে

পাহাড়ি মিস্ত্রি সব গেঁথে তুলেছে। রিদয়ের মনে হল, ঠিক যেন কেল্লার মধ্যে ঢুকেছি! ঠিক সেই সময় হাঁসের দল ডাক দিলে — 'বাতাসিয়া বাতাস-জোর, ধরে বস!' কিন্তু গুছিয়ে বসবার আগেই রিদয় বাতাসে লাল ছাতার মতো উড়ে একেবারে পথের মাঝে এসে বসল। সোঁ-সোঁ করে বাঁশি দিয়ে রেল দার্জিলিঙের দিকে বেরিয়ে গেল।

পাহাড়ের মোড়টা সুনসান, লোক নেই, দূর থেকে একটা মোষের গাড়ি আসছে। রিদয় আস্তে-আস্তে সেই মোষের গাড়ি ধরে ঝুলতে-ঝুলতে দার্জিলিঙের বাজারে হাজির। হাঁসেরা মাথার উপরে ডাক দিয়ে গেল —'আলুবাড়ি গুম্ফা মনে রেখ, সেখানে আমরা রইব।' রিদয় আলুবাড়ি-আলুবাড়ি নাম মুখস্থ করতে-করতে বাজার দেখতে চলল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে —অন্ধকারে রিদয় ভিড়ের মধ্যে মিশে চলেছে। বাজারের ওধারে কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়ে বরফের উপর সন্ধ্যার আলো যেন সোনার মতো ঝলক দিয়ে উঠল। তারপর গোলাপী, গোলাপী থেকে বেগুনী হয়ে আবার যে শাদা সেই শাদা বরফ দেখা দিলে। সেই সময় চৌরাস্তায় গোরার বাদ্যি শুরু হল, আর দলে-দলে লোক সেইদিকে ছুটল। রাস্তার দুধারে জুতো, খাবার, বাসন, গহনার দোকান —এখানে-ওখানে ভুটিয়া লামারা মড়ার মাথার খুলি নিয়ে ঘণ্টা-ডমরু বাজিয়ে নন্দি-ভৃঙ্গির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ের রাস্তা কখনো রিদয় ভাঙেনি, দু-এক চড়াই উঠেই বেচারা হাঁপিয়ে পড়ল ; কোথায় বসে জিরোয় ভাবছে, এমন সময় একটা খেলনার দোকানে নজর পড়ল, সেখানে লাল উলের মোজা পরানো ঠিক তারি মতো অনেকগুলো পুতুল সার্শির গায়ে কাগজের বাক্সতে দাঁড় করানো রয়েছে! রিদয় চুপি-চুপি দোকানে ঢুকে একটা খালি বাক্স দেখে তারি মধ্যে শুয়ে রইল।

সার্শিমোড়া দোকানের মধ্যে বেশ গরম, এক খোট্টা বাবু বসে বিড়ি টানছেন আর একটা ভুটিয়া মেয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

দোকানের মধ্যে ফুটবল পোস্টকার্ড নানা পুতুল লজঞ্চুস মার্বেল এমনি সব সাজানো, দরজার উপরটায় একটা বিভীষণের মুখোশ হাঁ করে চোখ পাকিয়ে চেয়ে রয়েছে! রিদয় মুখোশটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে, এমন সময় এক বাবু দোকানে ঢুকেই বলে উঠলেন —'ওহে মার্কণ্ড, ছোটো-খাটো দুটো পুতুল দাও দেখি, টুনু আর সুরূপার জন্যে!'

মার্কণ্ড তাড়াতাড়ি রিদয় যে বাক্সে ছিল সেই বাক্সে আর একটা বিবি পুতুল দিয়ে কাগজে মুড়ে বাবুর হাতে দিলে। বাবু সেটাকে আলখাল্লার পকেটে ফেলে চুরুট ধরিয়ে পাহাড়ে রাস্তায় ঠকঠক লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে বাড়ি-মুখো হলেন। পকেটের মধ্যে গরম পেয়ে রিদয় বিবি পুতুলটির পাশে ঘুমিয়ে পড়ল, আবার যখন চোখ মেলে চাইলে তখন দেখলে বাক্সর ডালাটা খুলে গেছে। একটা কাঁচ-মোড়া বারাণ্ডায় গোটাকতক তুলি, এক বাক্স রঙ, একটা গদী-মোড়া চৌকি, তারি উপরে একটা এতটুকু কালো কুকুর বাক্স থেকে তাকে টানাটানি করে খেলবার চেষ্টা করছে! কুকুরটা যদি কামড়ে দেয় —! রিদয় ভাবছে, এমন সময় ওঘর থেকে ডাক এল 'টমা-টমা-টমাসে।' কুকুরটা দৌড়ে ওঘরে গেল সেই ফাঁকে রিদয় বাক্স থেকে চোঁচা দৌড়।

বাড়ির বাইরে থেকে সার্শিতে মুখ লাগিয়ে দেখলে একটা লাল কম্বল-পাতা খাটে ছেলে মেয়ে একদল বসে তাদের বড়ো ভাইটির কাছে গল্প শুনছে আর একটা ছোটো ছেলে লাল ভুটিয়ার কাপড় পরে যে গল্প বলছে তার গলা জড়িয়ে ডাকছে —'পাখম দাদা, পাখম দাদা!'

শীতের রাতে আগুন জ্বালা ঘরখানি —এই ছেলের দল, এই হাসি খুশি গল্প দেখে রিদয়ের চোখে জল আসতে লাগল। তারও ঘর আছে তারও দাদা আছে, দিদি আছে, অথচ সব থেকেও নেই! কোথায় রইল তাদের আমতলি, কোথায় সেই মাটির দেওয়াল-দেওয়া ঘরগুলি! রিদয়ের প্রাণ চাইছে এই ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে

খেলে, কিন্তু হায়, সে বুড়ো-আংলা যক্ হয়ে গেছে, আর কি মানুষের ঘরে তার স্থান হবে! বুড়ো-আংলা জানালার বাইরে শীতে বসে অঝোরে কাঁদতে লাগল। সেই সময় বাবু ওধারে হুকুম দিলেন — 'এ রবতেন কাল আলুবাড়ি যানে হোগা, ডাণ্ডি রাখ যাও!'

রবতেন ডাণ্ডিখানা জানলার ধারে বারাণ্ডায় রেখে চলে গেল। রিদয় সে রাত ডাণ্ডির ছৈটার মধ্যে কাটিয়ে বাবুর সঙ্গে লুকিয়ে যেমন এসেছিল, তেমনি ডাণ্ডিতে লুকিয়ে রওনা হল। পুতুলের মধ্যে টুনুর পুতুলটাই পাওয়া গেল, সুরূপার পুতুলটা নিশ্চয় টমা মুখে করে কোথায় ফেলেচে বলে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান হল না! সুরূপা টমার পিঠে দুই থাবড়া বসিয়ে পাহাড়ের উপর পা ছড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

আলুবাড়ি থেকে রিদয়কে পিঠে নিয়ে জালা-পাহাড় কাট-পাহাড় পেরিয়ে হাঁসেরা এমন মেঘ আর শিলা-বিষ্টি পেলে যে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকেই এগোতে পারল না, তাড়াতাড়ি ঘুরে ঝুপ-ঝাপ ঘুম-লেকে উপরে গিয়ে পড়ল। ভয়ংকর শিল পড়েছে, লেকের জলের বরফের সর পড়ে গেছে, পাহাড়ের গা বরফে শাদা হয়ে গেছে, খোঁড়া হাঁসের পায়ের বাত কটকট করে উঠল। সে বললে —'কাজ নেই বাপু এখানে থেকে, ফিরে চল, আর একবার আসা যাবে।' কিন্তু চল বললেই চলা যায় না—পাহাড় দেশে মেঘ ভালো হওয়ার গতিক বুঝে তবে চলাচল করতে হয়। কোনো রকমে পাঁপড়া পানকৌড়ি ঘুম-রকে চড়ে আকাশের ভাবটা জেনে আসতে চলল; অমনি রিদয় বললে —'আমি যাব ঘুম-রকে।' খোঁড়া বললে —'আমিও।' অমনি সবাই একসঙ্গে —'আমিও-আমিও' বলতে-বলতে উড়ে গিয়ে রকের উপরে বসল।

মানুষের বাড়িতে যেমন কোনো জায়গা রাঁধবার, কোনোটা বৈঠকখানা, কোনোটা বা শোবার-খাবার জায়গা, হিমালয়েতেও তেমনি এক-একটা জায়গা এক-এক কাজের জন্যে আছে। মানুষের বাড়িতে যেমন দালান থাকে বারাণ্ডা থাকে রক থাকে, হিমালয়েতেও

তাই। ঘুম-রকটা হল ঘুম দেবার স্থান, জলাপাহাড় হল জল খাবার কিংবা জলো হাওয়া খাবার জায়গা, রংটং হল ধোবিখানা, কাপড় রঙাবার জায়গা, টুং হল ঘড়ির ঘর, এমনি সব নানা রক নানা দালান চাতাল গুহা এক-এক কাজের জন্যে রয়েছে।

ঘুম-রকে দিনে বড়ো কেউ আসে না, দু'চার পথিক পাখি কী জানোয়ার কখনো-কখনো জিরোতে বসে, না হলে জায়গাটা সারাদিন ফাঁকা থাকে দেখে বুড়ো রামছাগল মাস্টার এখানে ছানা পড়াবার জন্যে একটা ইস্কুল খুলেছেন। পাখির-ছানা শেয়াল-ছানা শুয়োর-ছানা ভালুক-ছানারা ঘুম-রকে বড়ো-বড়ো পাথরের বেঞ্চিতে কেউ পা ঝুলিয়ে কেউ বা বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে সারাদিন ঝিমোচ্ছে আর রাম-ছাগল শিংয়ের খোঁচায় তাদের জাগিয়ে দিয়ে কেবলি পড়াচ্ছেন, ক, খ, গ, ঐ ব্যে স্যে! একে ঘুম-রক তাতে আজ বড়ো বাদলা, শিংয়ের খোঁচা খেয়েও চুনে-চুনে পড়ছে দেখে রামছাগলও কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমের যোগাড় করছেন এমন সময় রিদয়কে নিয়ে হাঁসেরা উপস্থিত। অচেনা লোক দেখে মাস্টারমশায় তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়ে মস্ত ম্যাপ আঁকা প্রকাণ্ড কালো সেলেটখানায় শিং বুলিয়ে-বুলিয়ে ছেলেদের জিওগ্রাফির লেকচার শুরু করলেন:

জলের জন্তুরা চোখ ফুটেই দেখে জল আকাশ, ডাঙার জীব তারা দেখে বন-জঙ্গল মাঠ, আর পাহাড়ের ছেলেমেয়ে তারা দেখে আকাশের উপরে বরফে ঢাকা ওই হিমালয়ের চুড়ো ক'টা। হিম-আলয় সন্ধি করে হয়েছে হিমালয় অর্থাৎ কিনা হিমালয় মানে হিমের বাড়ি, পাহাড়ি ভাষায় বলে হিমালয়, সমস্কৃততে বলবে হিমাচলম্, ইংরেজ তারা ভালো রকম উচ্চারণ করতেই পারে না, 'র' বলতে 'ল' বলে ফেলে —তারা হিমালয়কে বলে ইমালোইরাস্! হিমালয়ের মতো উঁচু আর বড়ো পর্বত জগতে নেই। সব দেশের সব পর্বত আমাদের এই হিমালয়ের চুড়োর কাছে হার মেনেছে।

ধলা চামড়া জানোয়ারেরা ধরাকে সরা জ্ঞান করে, আমাদের বলে কালো, কিন্তু তাদের সব চেয়ে বড়ো পাহাড় মোটে ষোলো

হাজার ফুট আর আমাদের এই বাড়ির চুড়োগুলো কত উঁচু তা জানো? এর চল্লিশটা শিখর হচ্ছে চব্বিশ হাজার ফিট করে এক-একটি। ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘা যেটা সকালে-সন্ধ্যায় সোনা আর দিনে-রাতে দেখায় রুপো, ওটা হচ্ছে আটাশ হাজার ফুট, ওরও আরো হাজার ফুট উপরে ধবলাগিরির সব উঁচু চুড়ো উনত্রিশ হাজার ফুট। এর পাশে ধলা চামড়াদের জেতো পাহাড় —ফুঃ, রাজহস্তির পাশে খরগোস! মানুষের কথা দূরে থাক পাখিরাও এই হিমালয়ের চুড়োয় চড়তে পারে না, এখানে না ঘাস না গাছ! মেঘ পর্যন্ত ভয় পায় সেখানে উঠতে, শুধু ধপধপ করছে আছোঁয়া শাদা বরফ।

এই হিমালয়ের চুড়ো থেকে বরফ গলে বারোটা মহানদী ছিষ্টি হয়ে পুব-পশ্চিমে দুই মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে, কত দেশ কত বনের মধ্যে দিয়ে তার ঠিক নেই। এ-সব নদীর ধারে কত নগর কত গ্রাম কত মাঠ-ঘাট জমি-জমা রাজ্য পেতে কত রকমের মানুষরা রয়েছে তা গোনা যায় না।

এই হিমের বাড়ির চুড়োটা থেকে ধাপে-ধাপে পৃথিবীর দিকে নেমে গেছে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পর্বত প্রমাণ সিঁড়ি, এক-এক ধাপে রকম-রকম গাছ-পালা পশু-পাখি! এ রকে সে রকে পাথরের কাজাল এমন চওড়া যে সেখানে কতকালের পুরোনো পাথরের মেঝেতে বড়ো-বড়ো গাছের বন হয়ে রয়েছে, ঝরনা দিয়ে বর্ষার জল বরফের জল সব গড়িয়ে চলেছে। কোনো রকমে উপর দিয়ে মানুষেরা রেল চালিয়ে দিয়েছে, বড়ো-বড়ো শহর বসিয়ে বাজার বসিয়ে রাজত্ব করছে।

জীব-জন্তুর অগম্য স্থান ধবলাগিরি, সেখানে কেবলি বরফ। এই সিঁড়ির রক, যাতে আমরা বাস করছি, এরি সব উপরের রকে শুধু বরফ আর শেওলা, একমাত্র চমরী গাই পাহাড়ি ছাগল আর ভেড়া, তার পরের ধাপে মানুষ-সমান ঘাস আর দেবদারু বন, সেখানে শেয়াল ভালুক হেঁড়েল এরাই যেতে পারে. তার পরের রকে নানা ফুল ফলের বাগান, সেখানে প্রজাপতি পাখি খরগোস কুকুর বেড়াল

ভোঁদড় ভাম বাঁদর হনুমান এরাই থাকে, সবশেষের ধাপে বেতবন বাঁশবন অন্ধকার ঘন জঙ্গল, সেখানে হরিণ মোষ বাঘ সাপ ব্যাঙ্, তার পরে চাটালো জমি যার উপর দিয়ে সহস্রধারা নদী সব বয়ে চলেছে, এরি পরে অগাধ সমুদ্র, নীল জল, শেষ দেখা যায় না, এই সমুদ্রের ওপারে যে কী, তা কেউ জানে না।

চকা অমনি বলে উঠল —'আমি জানি। নীল সমুদ্রের মাঝে পাহাড় আছে, টাপু আছে, তার পরে পৃথিবীর শেষ বরফের দেশ, সেখানে বারোমাস বরফ, জমি যেন শাদা চাদরে ঢাকা আর সেখানে ছ'মাস রাত্রি ছ'মাস দিন; সেখানে পেঙ্গু পাখিরা বরফের বাসায় ডিম পাড়ে, ধলা ভালুক আছে, ধলা শেয়াল সিন্ধুঘোটক আছে, সব সেখানে শাদা, কালো কিছু নেই, দিন রাত সমান আলো, ঘুটঘুটে আঁধার মোটেই নেই, আমি সেইখানে পাঁচবার গেছি!'

চকার কথায় রামছাগল শিং বেঁকিয়ে বললে —'এত বুড়ো হলেম এমন আজগুবি কথা তো শুনিনি।'

রিদয় এবার এগিয়ে এসে বললে —'যে হিমালয়ের চুড়ো এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বরফে ঢাকা, ঐ হিমের বাড়ি গড়া নিয়ে কী কাণ্ড হয়ে গেছে এককালে, তার খবর চকা তো জানে না, রামছাগলও জানে না, মানুষেরা ধ্যান করে ওই নিচের তলাকার বনে বসে। ওই ধবলাগিরির উপরের খবর যা শাস্তরে লিখে গেছে —তাই বলছি, শোনো। বড়ো চমৎকার কথা!'

সবাই অমনি রিদয়কে ঘিরে বসল কথা শুনতে, মেঘলা দিন ভিজে স্যাঁতস্যাঁত করছে, ভালুকের গা ঘেঁষে ছাগল, ছাগলের গা ঘেঁষে হাঁস, হাঁসের গা ঘেঁষে শেয়াল।

রিদয় বসে গল্প শুরু করলে:

হিমালয় কেমন, তা শুনলে। হিমালয়ের উপরে কী নিচে কী সমুদ্রের এপারে কী ওপারে কী সবই তো শুনলে, কিন্তু এগুলো তৈরি করলে কে, তার খবর রাখ? প্রথমে সেইটে বলি, শোনো —একদিন বিশ্বকর্মা গোলার মতো একতাল কাদা পাকিয়ে নতুন

পৃথিবী গড়তে বসলেন। চন্দ্র সূর্য গড়া হয়েছে, এইবার সসাগরা আমাদের এই ধরা তিনি গড়তে আরম্ভ করলেন। সেদিনটাও এমনি আঁধার-আঁধার ছিল। বিশ্বকর্মার আর কাজে মনই যাচ্ছে না, তিনি কাদা নিয়ে কেবলি পৃথিবীটার উপরে বুড়ো আঙুলের টিপ দিয়ে এদেশ-সেদেশ গড়ে চললেন, সব দেশ মিলিয়ে দেশ-বিদেশগুলোর চেহারাটা হল ঠিক যেন হাড্ডিসার —এখানে-ওখানে মাটি-ঝরা শিরা-বারকরা বাঁকা-চোরা টোল-খাওয়া দোমড়ানো চোপসানো গরু, ঘাড় ঝুঁকিয়ে সমুদ্রের জল খাচ্ছে আর ঠিক তারি সামনে একটা গরুড় পক্ষীর ছানা সেও যেন গো-ডিম থেকে সবে বার হয়ে মাছ ধরবার জন্যে সমুদ্রের দিকে গলা বাড়িয়েছে!

বিশ্বকর্মার পাশে বিশ্বামিত্র বসেছিলেন; তাঁর বিশ্বাস, বিশ্বকর্মার চেয়ে গড়ন-পিটন করতে তিনি পাকা। বিশ্বকর্মার সঙ্গে বাজি রেখে প্রায়ই বিশ্বামিত্র এটা-ওটা গড়তেন, প্রত্যেক বারে বাজিও হারতেন কিন্তু তবু তাঁর বিশ্বাস গেল না যে বিশ্বকর্মার চেয়ে তিনি পাকা কারিগর। বিশ্বকর্মার ছিষ্টি মিষ্টি আতা খেয়ে বিশ্বামিত্র এক আতা গড়লেন, দেখতে বিশ্বকর্মার আতার চেয়েও ভালো কিন্তু সাগরের জল দিয়ে গড়বার কাদা ছানার দরুন বিশ্বামিত্রের আতা এমনি নোনা হয়ে গেল যে মুখে দেবার যো নেই। ডিম ফুটে পাখি বেরোচ্ছে বিশ্বকর্মা ছিষ্টি করলেন, পাখিদের মা-বাপ — তাদের ডিম, ডিমের মধ্যে বাচ্চা —বিশ্বামিত্র বললেন, 'ও কী হল? এ কী আবার একটা ছিষ্টি। আমি গাছে পাখি ফলাব।' বিশ্বামিত্র অনেক মাথা ঘামিয়ে অনেক আঁক-জোক কষে স্থির করলেন—ডিমে তা দেওয়া চাই কিন্তু পাখি তা দিলে তো চলবে না —তিনি এমন নারকোল গাছ সুপুরি গাছ তাল গাছ ছিষ্টি করলেন যাতে দিন ভোর রোদ পায়, কিন্তু বেশি রোদ পেলে ডিম একেবারে সিদ্ধ হয়ে যাবে, আবার রাতে হিম পেলেও নষ্ট হবে, জল পেলে পচে যাবে! সব ভেবে-চিন্তে বিশ্বামিত্র বড়ো-বড়ো পাখির পালকের মতো পাতা গাছের আগায় বেঁধে দিয়ে সেই পাতার গোড়ায় দশটা বারোটা

কুড়িটা পঁচিশটা করে ছোটো-বড়ো নানা রকম ডিম ঝুলিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন পাখি বার হয়, কিন্তু পাছে কাগে চিলে ঠুকরে ডিমগুলো ভেঙে দেয় সেজন্য বিশ্বামিত্র ডিমের খোলাগুলো এমনি শক্ত করে বানিয়েছেন যে বাচ্চা পাখি সেই পুরু নারকোল মালা নারকোল ছোবড়া তালের খোলা সুপুরির ছাল ভেঙে বার হতেই পারলে না। কোনোটা রোদে পক্ক কোনোটা অর্ধপক্ক কোনোটা অপক্কই রয়ে গেল। ডিম হল, তার শাঁস জল হল, তা দেওয়া হল, সবই হল, কিন্তু তা থেকে পাখি হল না!

এতেও বিশ্বামিত্রের চৈতন্য হল না। বিশ্বকর্মাকে গোরূপা পৃথিবী গড়তে দেখে তাঁরও গড়বার সাধ হল। তখন বিশ্বকর্মা গোরূপা পৃথিবীর বাঁটের মতো এই ভারতবর্ষটি অতি যত্ন করে গড়ছেন, সব তখনো গড়া হয়নি কিন্তু এতেই মনে হচ্ছে এই দেশটি হবে চমৎকার, একেবারে কামধেনুর বাঁটের মতো দেশটি —যা চাই যত চাই এখানে পাওয়া যাবে। বিশ্বামিত্র তাড়াতাড়ি একটু কাদা নিয়ে বসে বললেন, 'দাদা তুমি খানিক এই দেশটার গড়ো, আমিও খানিক গড়ি—দেখা যাক কার ভালো হয়।' বিশ্বকর্মা ভারতবর্ষের আদড়াটা প্রায় শেষ করেছিলেন কাজেই বিশ্বামিত্র খারাপ করে দিলেও দেশটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে না জেনে উপরে বিশ্বামিত্রকে গড়া পেটা করতে দিতে বিশ্বকর্মা আপত্তি করলেন না। তাঁকে সমস্ত উত্তর দিকটা গড়তে ছেড়ে দিয়ে নিজে বাঙলাদেশটা গড়তে বসে গেলেন। বাঙলা দেশটা সুন্দর করে নদী গ্রাম ধানখেত সুন্দর বন আম কাঁঠালের বাগান খড়ের চাল দেওয়া ছোটো-ছোটো কুঁড়ে ঘর দিয়ে চমৎকার করে সাজিয়ে তুলতে বিশ্বকর্মার বেশি দেরি লাগল না, বুড়ো আঙুলের দু'চার টিপ দিয়ে মাঠগুলো আর আঙুলের দাগ দিয়ে নদী-নালা বানিয়ে তিনি কাজ শেষ করে বসে বিশ্বামিত্রের দিকে চাইলেন। বিশ্বামিত্র অমনি বলে উঠলেন —'আমার কাজ অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে, দেখবে এস।'

বিশ্বকর্মার ছিষ্টি বাঙলাদেশ দেখে বিশ্বামিত্র এবারে নিন্দা করতে

পারলেন না, চমৎকার! সুজলা সুফলা—বীজ ছড়ালেই ফসল, কোথাও উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়-পর্বত নেই বললেই হয়, যতদূর চোখ চলে সবুজ খেত আর জল। বিশ্বামিত্র দাড়ি নেড়ে বললেন—'হ্যাঁ, এবারের ছিষ্টিটা হয়েছে মন্দ নয়, কিন্তু আমার দেশটা আরো ভালো হয়েছে দেখতে' বলে বিশ্বামিত্র বিশ্বকর্মাকে উত্তর ভারতবর্ষটা কেমন হয়েছে দেখতে বললেন।

বিশ্বকর্মার আদড়া উল্‌টে পাল্‌টে বিশ্বামিত্র গড়েছেন। পাঞ্জাবে টেনেছেন পাঁচটা নদীর খাত কিন্তু সেখানকার জমিতে সার মাটি না দিয়ে তিনি দিয়েছেন বালি আর কাঁকর, ধানও হবে না, মানুষ গুলো কেবল যেন জল খেয়েই থাকবে। তারপর পাহাড় অঞ্চলে দুজনে উপস্থিত—বিশ্বকর্মা বিশ্বামিত্রের কীর্তি দেখে অবাক! সেখানে যা পেরেছেন পাথর সবগুড়ো জড়ো করে এক হিমালয় পাহাড়ের ছিষ্টি করে বসেছেন বিশ্বামিত্র। তাঁর চিরকাল মাথায় আছে সূর্যের তাপ—গাছপালা মানুষ গরু সব জিনিসের পক্ষে ভালো, কাজেই তাঁর ছিষ্টি-করা পাহাড় দেশ তিনি যতটা পারেন সূর্যের কাছে ঠেলে তুলেছেন আর সেই সব পাথরের গায়ে এখানে-ওখানে দু'চার মুঠো মাটি ছড়িয়ে দু-একটা ঘাসের চাপড়া লাগিয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসেছেন!

বিশ্বামিত্র একগাল হেসে যেমন বলেছেন, 'কেমন দাদা, ভালো হয়নি?' অমনি ঝুপঝুপ করে এক পশলা বিষ্টি নামল আর পাহাড়ের সব মাটি ঘাস ধুয়ে গিয়ে খালি পাথর আর নুড়ি বেরিয়ে পড়ল। এদিকে পাহাড়ের এখানে-ওখানে উপরে নিচেয় এত বিষ্টির জল জমা হল যে তাতে সারা পৃথিবীর নদীতে জল দেওয়া চলে!

বিশ্বকর্মা বলে উঠলেন—'করেছ কী, সব উল্‌টো-পাল্‌টা! যেখানে মাটি চাই, সেখানে দিয়েছ কাঁকর, যেখানে জল দরকার সেখানে দিয়েছ বালি, আর যেখানে জল মোটেই দরকার নেই সেখানে জমা করেছ রাজ্যের জলাশয়, তোমার মৎলব তো কিছু বোঝা গেল না!'

বিশ্বামিত্র দাড়ি মোচড়াতে-মোচড়াতে বললেন —'শীতে যাতে লোক কষ্ট না পায় তাই দেশটা যতটা পারি সূর্যের কাছে দিয়েছি, এতে দোষটা হল কী !'

বিশ্বকর্মা বললেন —'উঁচু জমিতে দিনে যেমন গরম রাতে তেমনি ঠাণ্ডা, এটা তো তোমার মনে রাখা উচিত ছিল, এত উঁচুতে তো কিছু গাছপালা গজানো শক্ত, গরমে জ্বলে যাবে বরফে সব জমে যাবে। এত পরিশ্রম তোমার সব মাটি হল, দেখছি !'

বিশ্বামিত্র মাথা চুলকে বললেন —'আমি সব এখানকার উপযুক্ত মানুষ ছিষ্টি করে দিই। তারা দেখবে এই পাহাড়কে ভূস্বর্গ করে তুলবে !'

বিশ্বকর্মা বললেন —'আর তোমার ছিষ্টি করে কাজ নেই, মানুষ গড়তে শেষে বাঁদর গড়ে বসবে !'

'কোনো ভয় নেই, এবার আমি খুব সাবধানে গড়ছি। দেখ এবারে ঠিক হবে' —বলে বিশ্বামিত্র একরাশ প্রজাপতির ডানা গড়ে রেখে বিশ্বকর্মাকে ডেকে বললেন —'দেখসে মজা !'

বিশ্বকর্মা ভেবেই পান না, এত ডানা নিয়ে বিশ্বমিত্র কী করবেন। তিনি শুধোলেন —'এগুলো কী হবে ভাই ?'

বিশ্বামিত্র খানিক কপালে আঙুল বুলিয়ে চিন্তা করে বললেন —'পাহাড়দের সব ডানা দিয়ে দিতে চাই, তারা যেখানে খুশি — শীতের সময় গরমদেশে, গরমের সময় শীতদেশে, উড়ে-উড়ে বিচরণ করতে পারবে, তা হলে এখানে যারা বাস করবে তাদের আর কোনো অসুবিধে হবে না !'

বিশ্বকর্মা ভয় পেয়ে বলে উঠলেন —'সর্বনাশ, পাহাড় যেখানে-সেখানে উড়ে বসতে আরম্ভ করলে যে-সব দেশে পাহাড়-পর্বত গিয়ে পড়বে, সে-সব দেশের দশা হবে কী ? লোকগুলো-সুদ্ধ সারা-দেশ যে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে !'

বিশ্বকর্মা বলে উঠলেন —'তা কেন ! লোকেরা সব ধন-দৌলত খাবার-দাবার নিয়ে পাহাড়ে চড়ে বসবে, তা হলেই কোনো গোল

নেই!' বিশ্বকর্মা বললেন —'সবাই পাহাড়ে চড়ে ঘুরে বেড়ালে আমার জমিতে হাল দেয় কে, রাজত্বই বা করে কে, ঘর-বাড়িই বা বেঁধে থাকে কে!'

'তা আমি কী জানি' —বলে বিশ্বামিত্র হিমালয়ের ডানা দিতে যান, এমন সময়ে বিশ্বকর্মা তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন —'আগে হিমালয়ের বাচ্ছা এই ছোটো-খাটো মন্দর পর্বতটাকে ডানা দিয়ে দেখো, কী কাণ্ড হয়, পরে বড়োটাকে নিয়ে পরীক্ষা কোরো।'

বিশ্বামিত্র মন্দর পর্বতে ডানা দিয়ে যেমন ছেড়ে দেওয়া, সে অমনি উড়তে-উড়তে বাঙলাদেশের দক্ষিণ ধারে যে-সব দেশ গড়া হয়েছিল সেইখানে উড়ে বসল! যেমন বসা অমনি সারাদেশ রসাতলে তলিয়ে গেল; মাটি যেখানে ছিল সেখানে একটা উপসাগর হয়ে গেছে দেখা গেল। মানুষ যারা ছিল তাদের চিহ্ন রইল না, কেবল মাছগুলো জলে কিল বিল করতে লাগল, আর মন্দর পর্বতটা সমুদ্র তোলপাড় করে এমনি সাঁতার কাটতে আরম্ভ করলে যে, জল-প্লাবনে বিশ্বকর্মার ছিষ্টি মাটি ধুয়ে যাবার যোগাড়!

বিশ্বকর্মা তাড়াতাড়ি সমুদ্রের ধারে-ধারে বালির বাঁধ দিয়ে জল ঠেকিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন— 'আমার হাতের কাজে তোমায় আর হাত দিতে দিচ্ছিনে। এই পৃথিবীর উত্তর শিয়র আর দক্ষিণ শিয়রে কিছু নেই, কিছু সৃষ্টি করতে হয় সেই দু'জায়গায় করোগে। যে ভুলগুলো করেছ সেগুলো আমাকে শুধরে দিতে দাও এখনি।' বিশ্বামিত্রের হাত থেকে বিশ্বকর্মা গড়বার যন্তর-তন্তর কেড়ে নিয়ে পাহাড়ে যত জল জমা হয়েছিল, সমস্ত নালা কেটে ঝরনা দিয়ে সমুদ্রের দিকে বইয়ে দিলেন। বিশ্বকর্মার ছিষ্টিতে কিছু বাজে থাকবার যো নেই, নষ্টও হবার যো নেই—পাহাড়ের জল সমুদ্রে পড়ে, সেখান থেকে সূর্যের তাপে মেঘ হয়ে আকাশ দিয়ে দেশ-বিদেশে বিষ্টি দিয়ে খেতে-খেতে ফসল গজাতে চলল!

বিশ্বকর্মা ইন্দ্রকে বললেন— 'বাজ দিয়ে মন্দর পর্বতের ডানা কেটে দাও!' ডানা কাটা গেল, মন্দর সমুদ্রেই ডুবে রইল আর

তার ডানার কুচিগুলো এখানে-ওখানে সমুদ্রের মাঝে টাপুর মতো ভাসতে লাগল। বিশ্বকর্মা সেগুলোর উপরে মাটি ছড়িয়ে দিলেন, বসতি বসিয়ে দিলেন। তারপর বিশ্বামিত্র যত ডানা গড়ে রেখেছিলেন সেগুলো দিয়ে বিশ্বকর্মা প্রজাপতি ভোমরা মৌমাছি সব গড়ে ছেড়ে দিলেন। তারা দেশ-বিদেশ থেকে ফুলের রেণু ফুলের মধু এনে পাহাড়ে-পাহাড়ে বাগান বসাতে শুরু করে দিলে। দেখতে-দেখতে পাথরের গায়ে সব ফুল গজাল ফল ফলল। সব ঠিক করে বিশ্বকর্মা প্রকাণ্ড দুই ডানা দিয়ে দক্ষ প্রজাপতি ছিষ্টি করে হাত-পা ধুয়ে ভাত খেতে গেলেন, শাস্তরের ছিষ্টিতত্ত্ব তো এই হল, তারপর দক্ষ প্রজাপতির কথা পুরাণে লিখেছে যেমন, বলি, শোনো—

বিধির মানস স্থত দক্ষমুনি মজবুত
প্রসূতি তাহার ধর্ম-জায়া।
তার গর্ভে সতীনাম অশেষ মঙ্গলধাম
জনম লভিল মহামায়া।
নারদ ঘটক হয়ে নানামতে বলে কয়ে
শিবেরে বিবাহ দিল সতী।

নারদ তো ঘটকালি নিয়ে সরে পড়লেন, এদিকে শিব ষাঁড়ে চড়ে ভুটিয়ার দলের সঙ্গে ডমরু বাজিয়ে জটার সাপ জড়িয়ে হাড়-মালা গলায় ঝুলিয়ে নাচতে-নাচতে হাজির।

দক্ষ প্রজাপতি বরের চেহারা দেখেই চটে লাল—

শিবের বিকট সাজ
দেখি দক্ষ ঋষিরাজ
বামদেবে হৈল বাম-মতি।

সেই থেকে জামাই শ্বশুরের মুখ দেখেন না। দক্ষ প্রজাপতিও শিব-নিন্দে না করে জল খান না। এই সময়ে দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ

করলেন ; সব দেবতা নেমন্তন্ন পেলেন। সতীর বোনেরা গয়না-গাঁটি পরে পালকি চড়ে শিবের বাড়ির সামনে দিয়ে ঝমর-ঝমর করতে-করতে বাপের বাড়ি মাছের মুড়ো খেতে চলল দেখে সতীর চোখে জল এল। দুঃখী বলে বাবা তাঁদের নেমন্তন্ন পাঠান নি !

সতী বোনেদের পালকির কাছে গিয়ে দিদির গলা ধরে কেঁদে বললেন :

অশ্বিনীদিদি ! আমারে দুখিনী দেখিয়া পিতে
অবজ্ঞা করিয়া যজ্ঞে আজ্ঞা না করিলেন যেতে,
নিজ বাপ নহে অন্য শুনে হৃদে এই ক্ষুণ্ণ
আমা ভিন্ন নেমন্তন্ন করেছেন এই ত্রিজগতে।

অশ্বিনীদিদি আঁচলে সতীর চোখের জল মুছিয়ে বললেন—'তুই চল না। বাপের বাড়ি যাবি তার আবার নেমন্তন্ন কিসের ? আয় আমার এই পালকিতে।'

সতী ঘাড় নেড়ে বললেন— 'না ভাই— তিনি রাগ করবেন !'

'তবে তুই তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পরে আয়' —বলে সতীর দিদিরা—

চতুর্দোলে সবে চড়ি চলিলেন হরষে
হেথায় শংকরী ধেয়ে করপুটে দাণ্ডাইয়ে
চরণে প্রণতি হয়ে কহিলেন গিরিশে

আমি বাপের বাড়ি যাব।
শিব বললেন—
সতী তুমি যেতে চাচ্ছ বটে,
পাঠাইতে না হয় ইচ্ছা দক্ষের নিকটে।

আমাদের শ্বশুর জামায়ে কেমন ভাব শোনো—

আমাদের ভাব কেমন জামাই শ্বশুরে, যেমন দেবতা আর অসুরে,

যেমন রাবণ আর রামে, যেমন কংস আর শ্যামে,

যেমন স্রোতে আর বাঁধে, যেমন রাহু আর চাঁদে,

যেমন জল আর আগুনে, যেমন তেল আর বেগুনে,

যেমন পক্ষী আর সাতনলা, যেমন আদা আর কাঁচকলা,

যেমন ঋষি আর জপে, যেমন নেউল আর সাপে,

যেমন ব্যাঘ্র আর নরে, যেমন গোমস্তা আর চোরে,

যেমন কাক আর পেচক, যেমন ভীম আর কীচক।

'দক্ষ যখন অমান্য করে বারণ করেছেন নিমন্ত্রণ, কেমন করে সেখানে তোমার যাওয়া হয়!'

সতী কিন্তু শোনেন না শিবের কথা, তিনি সেজেগুজে নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে মহাদেবের ষাঁড়ে চড়ে বাপের বাড়ি চললেন দুঃখিনী বেশে। কুবের দেখে বাক্স-ভরা এ-কালের সে-কালের গহনা এনে বললে,—'মা, এমন বেশে কি যেতে আছে! বাপের বাড়ির লোকে বলবে কি— ওমা, একখানা গয়নাও দেয়নি জামাই!' সতী কুবেরের দেওয়া গহনা পরে সাজলেন, কিন্তু দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতী এমন সুন্দরী যে সোনা হীরে তাঁর সোনার অঙ্গের আলোর কাছে টিম-টিম করতে লাগল। 'দূর ছাই' বলে সতী সেগুলো ফেলে দিয়ে পাহাড়ি ফুলের সাজে সেজে বার হলেন। ত্রিলোক সতীর চমৎকার বেশ দেখে ধন্য-ধন্য করতে-করতে সঙ্গে চলল।

এদিকে ছোটো মেয়ে সতী এল না, কাজের বাড়ি শূন্য ঠেকছে, সতীর মা কেবলি আঁচলে চোখ মুচছেন এমন সময় দাসীরা এসে প্রসূতিকে খবর দিলে— 'ওমা তোর সতী এল ঐ!' এই শুনে—

রানী উন্মাদিনী-প্রায়

কৈ সতী বলিয়া অতি বেগে তথা ধায়।

অম্বিকারে দৃষ্টি করি বাহিরেতে এসে

আয় মা বলে লইয়া কোলে

নয়ন জলে ভাসে !

সতী মায়ের কাছে বসে একটু দুধ সন্দেশ খেয়ে সভা দেখতে চললেন। ইন্দ্র চন্দ্র সব বসেছেন, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ সব বসেছেন দক্ষ প্রজাপতিকে ঘিরে, আর কালোয়াত সব গান-বাজনা করছে—

ধির্ কুট্ কুট্ তানা নানা তাদিম তা, তা দিয়ানা ঝেন্না ঝেন্না
নাদেরে দানি তাদেরে দানি, ওদেরে তানা দেরে তানা
তাদিম তারয়ে তারয়ে দানি।
দেতারে তারে দানি ধেতেনে দেতেনে নারে দানি।

বেশ গান-বাজনা চলেছে —এমন সময় সভাতে সতীকে আসতে দেখেই দক্ষ শিব-নিন্দে শুরু করলেন। দক্ষ প্রজাপতি :

কেবল এ গ্রহ আনি নারুদে ঘটালে,
কনিষ্ঠা কন্যাটা আমি দিলাম জলে ফেলে ;
বস্ত্রবিনা বাঘছাল করে পরিধান,
দেবের মধ্যে দুঃখী নাই শিবের সমান।
ভূত সঙ্গে শ্মশানে-মশানে করে বাস,
মাথার খুলি বাবাজীর জল খাবার গেলাস !
যায় বলদে বসে গলদেশে মালাগুলো সব অস্থি,
সিদ্ধি ঘোঁটার সদাই ঘটা বুদ্ধি সেটার নাস্তি ;
অদ্ভুত সঙ্গেতে ভূত গলায় সাপের পৈতে,
তারে আনিলে ডেকে হাসিবে লোকে—তাই হবে কী সইতে !
পাগলে সম্ভাষা করা কোন প্রয়োজন,
সাগরে ফেলেছি কন্যা বলে বুঝাই মন।

দক্ষের শিব-নিন্দা শুনে সতী আর সইতে পারলেন না।

পতি-নিন্দা শুনি সতী জীবনে নৈরাশ,
ঘন-ঘন চক্ষে ধারা সঘনে নিশ্বাস ;
পিতারে কুপিতা হইয়া অঙ্গ অবসান,
ধরা শয্যা করি 'তারা' ত্যেজিলেন প্রাণ !

সতী শিব-নিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করলেন, চারদিকে হাহাকার উঠল। সতীর সাতাশ বোন আকাশের তারা সব কাঁদতে লাগল, নন্দী কাঁদতে লাগল, ভৃঙ্গী কাঁদতে লাগল দেবতারা কাঁদতে লাগলেন, মানুষেরা কাঁদতে লাগল—

ফিরে চাও মা বাঁচাও পরাণী,
ধূলাতে পতিত কেন পতিত-পাবনী ;
দুটি নয়ন-তারা মুদিয়া তারা—
অধরা কেন ধরাসনে !

নন্দী গিয়ে কৈলাসে মহাদেবকে খবর দিলে—'মা আর নেই।' তখন শিব ক্রোধে হুহুংকার ছাড়লেন, অমনি শিবদাস সব দক্ষযজ্ঞ নাশ করতে আগুয়ান হল। মহাদেব যুদ্ধে চললেন, পৃথিবী কাঁপতে থাকল, মেঘ সব গর্জন করে উঠল, আকাশে বিদ্যুৎ বাজ ছুটোছুটি করতে থাকল কড়মড় করে, শিব ত্রিশূল হাতে সাজলেন—

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে,
ভবম্বম ভবম্বম সিঙ্গা ঘোর বাজে ;
ফণাফণ ফণাফণ ফণী ফন্ন গাজে
মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে ;
ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে,
ববম্বম ববম্বম মহাশব্দ গালে ;
ধিয়াতা ধিয়াতা ধিয়া ভূত নাচে
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে।
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী,

চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে
চলে শাঁখিনী পেতিনী মুক্ত কেশে।

ভূত-প্রেত নিয়ে শিব এসে উপস্থিত। ভয়ে কারু মুখে কথা নেই, মহাদেব হুকুম দিলেন ভূতিয়া ফৌজকে —যজ্ঞনাশ কর।অমনি —

রুদ্রদূত ধায় ভূত নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গিয়া
ঘোরবেশ মুক্ত কেশ যুদ্ধ রঙ্গ রঙ্গিয়া,
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে
যজ্ঞগেহ ভাঙি কেহ হব্যগব্য খাইছে,
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে,
ঘোররোল গণ্ডগোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে ;
ভূত ভাগ পায় লাগ লাথি কিল মারিছে
বিপ্র সর্ব দেখি খর্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁফ ছিণ্ডিল
পুষণের ভূষণে দন্ত পাঁতি পড়িল,
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্ত কেশ ধায় রে,
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে।

নৈবিদ্যির থালা ফেলে বিশ্বামিত্র দৌড় —বশিষ্ঠ চম্পট, সবার দাড়ি গোঁফ ছিঁড়ে কিলিয়ে দাঁত ভেঙে ভূতেরা লম্ফ-ঝম্প করতে লাগল —

মৌনী তুণ্ড হেঁট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে
মৈল দক্ষ, ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।

দক্ষ-নিপাত দেখে সতীর মা কেঁদে শিবকে বললেন —

সতীর জননী আমি, শাশুড়ী তোমার,
তথাপি বিধবা দশা হইল আমার ?

প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইল,
রাজ্যসহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিল।
ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়,
উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের প্রায় —

কন্দ-কাটা দক্ষের দুর্গতি দেখে ভূতেরা সব হাসতে লাগল, তখন শিবের হাতের কাছে ছিল পাহাড়ি একটা রামছাগল দড়ি দিয়ে হাড়-কাঠে বাঁধা। তিনি সেইটে নন্দীকে দেখিয়ে দিলেন। নন্দী তার মুড়োটা কেটে দক্ষের কাঁধে জুড়ে দিয়ে দক্ষ প্রজাপতির ডানা দুটো কেটে নিয়ে চলে গেল, শিব সতীদেহ নিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে কৈলাসে গেলেন! এর পরে আরও কথা আছে, কিন্তু এইখানেই দক্ষযজ্ঞ শেষ — হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় — বলে রিদয় চুপ করল।

রামছাগল ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকালে, খানিক চেয়ে থেকে বললে —'ফুঃ, এমন আজগুবি কথা তো কখনো শুনিনি। বুড়ো হয়ে শিং ক্ষয়ে গেল, এমন কথা তো কোনোদিন শুনলেম না যে প্রজাপতির মাথা হয় রামছাগলের মতো আর পাহাড়গুলোর গজায় ডানা!'

রামছাগল ছেলেদের বললেন :

ওসব বাজে কথায় বিশ্বাস কোরো না, বড়ো হয়ে মধুর সন্ধানে পেটের দায়ে তোমরা জানি দেশ-বিদেশে যাবে, এমন অনেক বাজে গল্পও তোমাদের এই দেশের পাহাড়-পর্বত নদ-নদীর নামে শুনতে পাবে। কেউ বলবে তোমার দেশ মন্দ, কেউ বলবে মন্দ নয়, কিন্তু মনে রেখো, এই হিমালয়ের জলে বাতাসে তোমরা মানুষ, ভগবান তোমাদের জন্যে সব চেয়ে ভালো, সব চেয়ে চমৎকার বাড়ি দিয়েছেন। এই কথাটি সর্বদা মনে রেখো, কোনোদিন ভুলো না যে পৃথিবীর সেরা হচ্ছে এই হিমালয়, আর সেইটে ভগবান দিয়েছেন তাঁর কালো ছেলেদের। এই পাথরের সিঁড়ি এতকালের পুরোনো

যে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আগে এটা, তারপর গাছ-পালা, জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পাখির ছানাগুলো জন্মাবার আগে যেমন তাদের বাসা তৈরি হয়ে থাকে, মানুষদের, জানোয়ারদের জন্মাবার আগে তেমনি জগৎমাতা আর বিশ্বপিতা তাদের জন্যে এই চমৎকার হিমালয় আর সমুদ্র পর্যন্ত গেছে যে পাঁচ ধাপ পাথরের সিঁড়ি, তা প্রস্তুত করিয়েছিলেন। জীব-জন্তুরা জন্মে যাতে আরামে থাকে, কষ্ট না পায় সেই জন্যে চমৎকার করে পাথর দিয়ে দালান রক অমনি সব নানা ঘর নানা বাড়ি তাঁরা সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিলেন!

কিন্তু কত কালের এই বাড়ি, একে পরিষ্কার রাখা, মেরামতে রাখা, যারা জন্মাতে লাগল তাদের তো সাধ্য হল না, এককালের নতুন বাড়ি পাথরের সিঁড়ি সব ভেঙে ফেটে পড়তে লাগল, বর্ষায় এখানে-ওখানে সোঁতা লাগল, শেওলা গজাল, হাওয়াতে ধুলো-মাটি এসে ধাপগুলোতে জমা হতে থাকল, ঝড়ে ভূমিকম্পে বড়ো-বড়ো পাথর খসে-খসে এখানে-ওখানে পড়ল, এখানটা ধ্বসে গেল, সেখানটা বসে গেল, ওটা ভেঙে পড়ল, সেটা বেঁকে রইল, এইভাবে কালে-কালে ধাপগুলোর উপরের তলায় মাটি তাকে ধুয়ে নিচের তলায় নামতে লাগল; আর ধাপে-ধাপে সেখানে যেমন মাটি পেলে নানা জাতের গাছপালা বন-জঙ্গল দেখা দিলে। উপর-তলার মাটি ধুয়ে গেছে সেখানে কাঁকর আর নুড়িই বেশি, তার পরের ধাপে অল্প মাটি আছে সেখানে অল্পসল্প চাষবাস চলেছে দেখো, খুব ছোটো-ছোটো খেত, ছোটো গ্রাম। মাঝের ধাপে অনেকটা মাটি জমা হয়েছে। সেখানে দেখো দার্জিলিঙ শহর বাড়ি-ঘর বাজার চা-বাগান। কোম্পানির বাগান সব বসে গেছে, উপর-তলার মতো অতটা ঠাণ্ডাও নয়, কাজেই সেখানে নানা গাছ ঝাউ বাদাম আখরোট পিচ পদম সব তেজ করেছে। নানা ফুলও সেখানে!

কিন্তু হিমালয়ের সব নিচের ধাপে যত কিছু ভালো মাটি এসে জমা হয়েছে জলে ধুয়ে একেবারে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত, সেখানে ফল-

ফুলের বাগান খেতের আর অন্ত নেই, মাটিতে সেখানে এত তেজ যে, যা দাও ফলবে, আর সেখানে শীতও বেশি নয় বরফও পড়ে না, সেখানে গাছ এক-একটা যেন একখানা গ্রাম জুড়ে রয়েছে, আর চারদিকে আম-কাঁঠালের বন।

পাহাড়ে বরফ পড়লে আমি ইস্কুল বন্ধ করে সেখানে চরতে যাই, নিজের চোখে দেখে এসেছি যা, তাই বলছি। ঋষিদের মতো চোখ বুজে ধ্যান করে গল্প বলবার জন্যে আমি ইস্কুল মাস্টারি করতে আসিনি। ছাত্রগণ! চোখ দিয়ে দেখাই হল আসল দেখা, ঠিক দেখা, আর চোখ বুজে ধ্যান করে দেখবার মানে খেয়াল দেখা বা স্বপন দেখা। খেয়ালীদের বিশ্বাস কোরো না, তা তাঁরা ঋষিই হন, কবিই হন, যা দুই চোখে দেখছি তাই সত্যি, তাছাড়া সব মিছা, সব কল্পনা, গল্পকথা, খেয়াল!

রামছাগল দাড়ি নেড়ে শিং বেঁকিয়ে কটমট করে তাদের দিকে তাকাচ্ছে দেখে সুবচনীর খোঁড়া হাঁস হেলতে-দুলতে এগিয়ে এসে বললে— 'ছাত্রগণ, তোমাদের মাস্টার যা বললেন, ঠিক, চোখে না দেখলে কোনো জিনিসে বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু এই পাহাড় পর্বত কুয়াশায় যখন দেখা যায় না, তখন কি বলতে হবে কুয়াশার মধ্যে কিছু নেই? না বলতে হবে, সূর্য চন্দ্র আকাশ ছেড়ে পালিয়েছেন। ঠিক জিনিস সব সময়ে চোখে পড়ে না, সেইজন্য এই দুই চোখের উপরে নির্ভর করে থাকি বলে আমরা কোনোদিন মানুষের সমান হতে পারব না। মানুষের মধ্যে যাঁরা ঋষি, যাঁরা কবি, তাঁরা শুধু দুই চোখে দেখলেন না, তাঁরা ধ্যানের চোখে যা দেখতে পেয়েছেন সেইগুলো ধ্যান করে কেতাবে লিখেছেন, তা পড়লে তোমরা জানতে পারবে—এই হিমালয় প্রথমে সমুদ্রের তলায় ছিল। হঠাৎ একসময় পৃথিবীর মধ্যেকার তেজ মহাবেগে জল ঠেলে আকাশের দিকে ছুটে বার হল আর তাতেই হল সব পর্বত! যে সময় পাহাড় হয়েছিল সে সময় কেউ দেখেনি কেমন করে কী হল, কিন্তু মানুষ ধ্যান করে অনুসন্ধান করে এই পাহাড়ের জন্ম যেন চোখে দেখে কেতাব লিখেছে।'

'মাস্টার মহাশয়ের কথায় কি কিতাবগুলো অবিশ্বাস করবে!' বলে খোঁড়া একটি সমুদ্রের শাঁখ পাহাড়ের উপর থেকে তুলে নিয়ে রামছাগলকে দেখিয়ে বললে—'হিমালয় তো এককালে সমুদ্রের গর্ভে ছিল, এই শাঁখই তার প্রমাণ!'

রামছাগল ঘাড় নেড়ে বললে —'ওকথা আমি বিশ্বাসই করিনে। নিশ্চয় কোনো পাখিতে এনে ওটাকে ফেলেছে।'

খোঁড়া বললে —'তা হয় না। সমুদ্রের একেবারে নিচেয় থাকে এই শামুক, পাখি সেখানে যেতে পারে না।'

রামছাগল তর্ক তুললে —'তবে মাছে খেয়েছে, সেই মাছ মরে ভেসে এসেছে সমুদ্রের ধারে, সেখানে পাখি তাকে খেয়ে শাঁখটা মুখে নিয়ে হিমালয়ে এনে ফেলেছে!'

খোঁড়া ঘাড় নেড়ে বললে —'তাও হয় না। সমুদ্রে যেখানে এই শাঁখ থাকত, সেখানে মাছ কেন, মানুষ পর্যন্ত যেতে পারা শক্ত!'

রামছাগল অমনি দাড়ি চুমড়ে বললে—'তবে মানুষ জানল কেমন করে এ শাঁক সমুদ্রের তলাকার, পাহাড়ের উপরকার নয়।'

সুবচনী পাছে তর্কে হেরে যায় রিদয় তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল —'জানো না, মানুষ ডুবুরি নামিয়ে মুক্তো তোলবার সময় এই সব শাঁখ কুড়িয়ে এনেছিল ঝুড়ি-ঝুড়ি!'

রামছাগল শিং নেড়ে বললে —'ঝুড়ি থেকে তারি গোটাকতক শাঁখ হয়তো মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।' হঠাৎ সুবচনী বললেন — 'তা নয়' —সুবচনী আরও কী বলতে যাচ্ছে আমনি ছাগল রেগে বললে —'তা যদি নয় তো নিশ্চয় আগে শাঁখের সব ডানা ছিল, উড়ে এসেছে হাঁসেদের মতো এই পাহাড়ে।'

রিদয় অমনি বলে উঠল —'শাঁখের যদি ডানা থাকতে পারে তবে পাহাড়গুলোরও ডানা ছিল একথাই বা কেন বিশ্বাস করবে না?'

সুবচনী অমনি বলে উঠল —'আর প্রজাপতির মাথায় রাম-ছাগলের মুখই বা না হবে কেন, তা বলো!'

ভালুকে-শেয়ালে হাঁসে-ছাগলে তর্ক বেধে গেল, দেশের জানোয়ার সেই তর্কে যোগ দিয়ে চেঁচামেচি হট্টগোল বাধিয়ে দিলে।

শিকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতি
কাহা কুহী লগড় ঝগড় জোড়াথুতি
ঠেটি ভেটি ভাটা হরিতাল গুড়গুড়
নানাজাতি কাক পেঁচা বাবুই বাদুড়।

সবাই মিলে তর্ক লাগিয়েচে—'যাও-যাও হুঁদি খাও!' এমন সময় গণ্ডগোল শুনে পাহাড়ের গুহা থেকে বুড়ো লামা-ছাগল বেরিয়ে এলেন—

অতি দীর্ঘকক্ষ লোম পড়ে উরু পর
নাভি ঢাকে দাড়ি গোঁফে বিশদ চামর।

ববম-বম ববম-বম বলতে-বলতে লামাকে আসতে দেখে সবাই তটস্থ, ভালোমানুষ হয়ে বসল। লামা বললেন—'তোমরা সব কী বৃথা তর্ক করছ? দেখো তর্ক কী ভয়ানক ব্যাপার, কোথায় তোমরা পড়া পড়বে, না, হাতা-হাতি বাধিয়েছ ভায়ে-ভায়ে—'

অভেদ হইল ভেদ এ বড়ো বিরোধ
কী জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ।
ভ্রান্তজীব অন্ত না বুঝিয়ে কর দ্বন্দ্ব,
কারো কিছু ঠিক নাই কেবল কহ মন্দ;
উভয়ের মন তোরে মন্ত্রণা আমি কই,
তর্কে নাহি মেলে কিছু গণ্ডগোল বই;
শুন বাক্য গুরুবাক্য করেছে প্রামাণ্য;
একে পঞ্চ পঞ্চে এক, নাই কিচ্ছু অন্য!

লামা-ছাগল লেকচার শেষ করলেন অমনি বোকা ছাগলের দল জাতীয় সংগীত শুরু করে দিলে—

জটজালিনী ক্ষুরশালিনী,
শিংঅধারিণী গো —
ঘনঘোষিণী ঘাস-খাদিনী,
গৃহ-পোষিণী গো।
চ্যোঁ ভ্যোঁ প্যোঁ পোঁ।

সে সময় ভূমিকম্পে পাহাড় টলমল করে উঠল, অমনি হাঁসেরা রিদয়কে নিয়ে আকাশে উড়ে পড়ল। সব জানোয়ার ভয়ে লেজ গুটিয়ে চুপ হয়ে রইল! লামা-ছাগল মাঝে দাঁড়িয়ে দুলতে থাকলেন আর বলতে থাকলেন, 'একি দোলায় যে, এ্যঁ কী ভয়ানক বিয়াপার!'

রামছাগল লামার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন —'পর্বতটা পার্বতী-পাঠশালা-সমেত উড়বে না কি —এ্যঁঃ!'
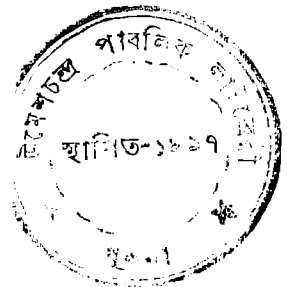
রংপো 'নদীটি খুব বড়ো নদীও নয় ম্যাপেতেও তার নাম ওঠেনি। ঘুম আর বাতাসিয়া দুই পাহাড়ের বাঁকের মধ্যে ছোটো একটি ঝরনা থেকে বেরিয়ে নদীটি পাহাড়ের গা বেয়ে দু-ধারের বনের মাঝ দিয়ে নুড়ি পাথর ঠেলে আস্তে-আস্তে তরাইয়ের জঙ্গলে নেমে গেছে, নদীর দু-পার করঞ্চা টেঁপারি তেলাকুচো বৈচী ডুমুর জাম এমনি সব নানা ফল নানা ফুল গাছে একেবারে হাওয়া করা, মাথার উপরে আকাশ সবুজ পাতার ছাউনিতে ঢাকা, তলায় সরু নদীটি ঝির-ঝির করে বয়ে চলেছে! এই পাখির গানে ভোমরার গুনগুনে ফুল-ফলের গন্ধে জলে কুলকুল শব্দে ভরা অজানা এই নদীর গলিপথ দিয়ে হাঁসেরা নেমে চলেছে আবার শিলিগুড়ির দিকে। উপরে মেঘ করেছে, বনের তলা অন্ধকার। শেওলা জড়ানো একটা গাছের ডাল এক থোকা লাল ফুল নিয়ে একেবারে নদীর জলে ঝুঁকে পড়েছে, তারি উপরে লাল টুপি নীল গলাবন্ধ সবুজ কোর্তা পরে-পরে মাছরাঙা নদীতে মাছ ধরতে বসেছে বাদলার দিনে। নদীর মাঝে একরাশ পাথর ছড়ানো; তারি কাছাকাছি এসে চকা হাঁক দিলে —'জির্‌ওবো, জির্‌ওবো।' অমনি মাছরাঙা সাড়া দিলে —'জিরোও-জিরোও।' আস্তে-আস্তে হাঁসের দল ঝরনার স্রোতে পিছল পাথরগুলোর উপর একে-একে উড়ে বসল। এমনি জায়গায়-জায়গায় জিরিয়ে-জিরিয়ে চলতে-চলতে সন্ধ্যা হয়ে এল, নিচের অন্ধকার পাহাড়ের চুড়োর দিকে আস্তে-আস্তে উঠতে আরম্ভ করলে, মনে হচ্ছে কে যেন বেগুনী কম্বলের ঘেরাটোপ দিয়ে একটার পর একটা পর্বত মুড়ে রাখছে, দেখতে-দেখতে আকাশ কালো হয়ে গেল, তারি মাঝে গোলাপী এক-টুকরো ধোঁয়ার মতো দূরের বরফের চুড়ো রাত্রের রঙের সঙ্গে ক্রমে মিলিয়ে গেল।

পাহাড়ের গলিতে অন্ধকার যে কী ভয়ানক কালো, রিদয় আজ টের পেলে, নিজেকে নিজে দেখা যায় না, কোনদিক উপর কোনদিক নিচে চেনা যায় না, কিন্তু এই অন্ধকারেও ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে রাতের পাখিরা পাহারা দিচ্ছে। এ-পাহাড়ে এক পাখি হাঁকল —'হুহু বাতাস হুহু,' ও-পাহাড়ের পাখি তারি প্রতিধ্বনি দিয়ে বলে উঠল —'ঘুটঘুট আঁধার ঘুটঘুট।' দুই পাখি থামল, আবার খানিক পরে দুই পাখি আরম্ভ করলে —'জল পিট-পিট তারা মিটমিট।' বোঝা গেল এখনো বিষ্টি পড়ছে, দু-একটি তারা কেবল দেখা দিয়েছে। ভালুক-ভালুকী ঝরনার পথে জল খেতে নেমেছে, তাদের চেহারা দেখা যাচ্ছে না, কেবল বলাবলি করছে শোনা যাচ্ছে. —'সেঁৎ-সেঁৎ।' একটা হরিণ কিংবা কী বোঝা গেল না হঠাৎ বলে উঠল —'পিছল।' তারপরেই পাহাড়ের গা দিয়ে একরাশ নুড়ি গড়িয়ে পড়ল।

রাতে যে এত জানোয়ার চারদিকে ঘোরাঘুরি হাঁকাহাঁকি করে বেড়ায়, তা রিদয়ের জ্ঞান ছিল না। আঁধারের মধ্যে কত কী উসখুস করছে, খুসখাস করছে, চলছে, বলছে —কত ঘুরে কত রকম গলায় তার ঠিক নেই। রিদয়ের মনে হল বাতাসটা পর্যন্ত যেন বনের সঙ্গে ফুসফাস করে এক-একবার বলাবলি করে যাচ্ছে। তখন রাত গভীর ঝিঁঝি পোকা বলে চলেছে ঝিম-ঝিম, ঝরনা বলছে ঘুম-ঘুম, রিদয়ের চোখ ঢুলে আসতে লাগল। সেই সময় দূরে শোনা গেল —'ইয়া-হু ইয়া-হু' তারপরে একেবারে রিদয়ের যেন কানের কাছেই ডেকে উঠল বিকট গলায় কী এক জানোয়ার —'তোফা-হুয়া তোফা-হুয়া।'

রিদয় চমকে উঠে শুনলে, কখনো এ-পাহাড়ে কখনো ও-পাহাড়ে দূরে-কাছে আগে-পাছে উপরে-নিচে যেন দলে-দলে কারা চিৎকার লাগিয়েছে —'ইয়াহু-ইয়াহু তোফা-হুয়া তোফা-হুয়া।' ভয়ে রিদয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে চকার গা ঘেঁষে শুধোলে 'এ কী ব্যাপার?'

চকা অমনি বললে—'চুপ-চুপ কথা কয়ো না, ডালকুত্তা শিকারে বেরিয়েছে'—বলতে-বলতে ছায়ার মতো একটা হরিণ ওপার দিয়ে দৌড়ে জলের ধারে এসে থরথর করে কাঁপতে লাগল। ঠিক সেই সময় নদীর দুই পারে শব্দ উঠল—যেন একশো কুত্তা এক সঙ্গে ডাকছে—'হুয়া-হু হুয়া-হু হুয়া-হু!' ঝপাং করে জলে একটা ছায়া লাফিয়ে পড়ল, তারপর পিছল পাথরের উপর খুরের আঁচড় বসিয়ে ভিজে গায়ে হরিণ এসে রিদয়ের পাশে দাঁড়িয়ে জোরে-জোরে শ্বাস টানতে-টানতে কেবলি ঘাড় ফিরিয়ে চারিদিকে চাইতে লাগল। চকা হরিণের ভয় দেখে বললে—'ডালকুত্তা রইল কোন্ পাহাড়ে তুমি এখানে ভয়ে কাঁপছ দেখি!'

রিদয় বললে—'সে কী! এই পাহাড়েই তো এখনি ডাকছিল কুকুরগুলো।'

চকা হেসে বললে—'কুকুরগুলো নয়, একটা কুকুর ডাকছিল, তাও খুব দূরে। ডালকুত্তার ডাকের মজাই এই, একটা ডাকলে মনে হবে যেন দশটা ডাকছে—দূরে কাছে চারদিকে—ভয়ে কোনদিকে যাব ভেবে পাওয়া যায় না, বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। ডালকুত্তার ডাক শুনে ভয় পেয়ে ছুটাছুটি করেছ কী মরেছ। ঠিক পায়ের শব্দ শুনে কুত্তা এসে তোমায় ধরেছে, যেখানে আছ সেইখানে বসে থাক চুপটি করে, তোমার সন্ধানও পাবে না ডালকুত্তা।'

হরিণ চকার কথায় কতকটা সাহস পেলে বটে কিন্তু তখনো ভয়ে তার কান দুটো কেঁপে-কেঁপে উঠছে, এমন সময় পিছনে অন্ধকারে খেঁকশেয়াল খেঁক করে হেসে উঠল, হরিণছানাটা একলাফ দিয়ে একেবারে নদী টপকে উপরের পাহাড়ে দৌড় দিলে। চকা বলে উঠল—'কে ও খেঁকশেয়াল নাকি?'

এই পাহাড়ে যে চাঁদপুরের শেয়াল এসে উপস্থিত হবে তা চকা ভাবেনি, আর খেঁকশেয়ালও মনে করেনি হাঁসেদের দেখা পাবে সে এখানে। শেয়াল আনন্দে চিৎকার আরম্ভ করলে—'হুয়া-হুয়া হুয়া-উয়া বাহোয়া ওয়া-ওয়া!'

চকা শেয়ালকে ধমকে বললে —'চুপ অত গোল করো না, এখনি ডালকুত্তা এসে পড়বে, তখন তুমিও মরবে আমরাও মরব।'

শেয়াল একগাল হেসে বললে —'এবার আমি বাগে পেয়েছি ডালকুত্তা লেলিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব। সেদিন বড়ো যে হাঁসবাজি দেখানো হয়েছিল, এইবার শেয়ালবাজিটা দেখে নাও।' বলেই শেয়াল ডাকতে লাগল —'হুয়া-উহা হুয়া-উহা —তোদের জন্যে আমার আর দেশে মুখ দেখাবার যো নেই!'

চকা নরম হয়ে বললে —'অত চেঁচাও কেন, তুমি আগে আমাদের সঙ্গে লেগেছিলে। আমাদের দলের লুসাই আর বুড়ো-আংলা তুজনকে খেতে চেয়েছিলে, তবে না আমরা তোমায় জব্দ করেছি, আমরা তো মিছিমিছি তোমার সঙ্গে লাগতে যাইনি।'

শেয়াল দাঁত কড়মড় করে বললে —'ওসব আমি বুঝিনে, বিচার আমার কাছে নেই। বুড়ো-আংলাটিকে আমার তু-পাটি দাঁতের মধ্যে যদি হাজির করে দাও তো এবার ছাড়া পাবে, না হলে ডালকুত্তা এল বলে!'

চকা মুখে সাহস দেখিয়ে বললে 'আসুক না কুত্তা, এই ঝরনার মধ্যে পাথরের উপরে আর আসতে হয় না —জলে নেমেছে কী কুটোর মতো কোথায় তলিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। রিদয়কে আমরা কিছুতে ছেড়ে দেব না শেয়ালের মুখে, মরি সেও ভালো।' চকা খুব তেজের সঙ্গে এই কথা বললে বটে কিন্তু রিদয় দেখলে ভয়ে তার লেজের ডগাটি পর্যন্ত কাঁপছে। চকা চুপি-চুপি তাদের সবাইকে বললে —'সাবধান, বড়ো গোল এবারে, যে অন্ধকার, উড়ে পড়বার যো নেই, ডালকুত্তা পাকা সাঁতারু, বিষম জোরালো, ঝরনা মানবে না সাঁৎরে উঠবে। সে জলের কুমির, ডাঙার বাঘ বললেই হয়। সব সাবধান, যে যার সামলে, দেখতে না পায় পাথরের সঙ্গে মিশিয়ে বস!'

হাঁস অমনি ডানায় মুখ ঢেকে গুটিসুটি হয়ে এক-এক পাথরের মতো এখানে-সেখানে চেপে বসল, কালো বুনো হাঁসের ডানার রঙে

পাথরের রঙে এমন এক হয়ে-গেল যে, দু-হাত তফাত থেকে চেনা যায় না, হাঁস কী পাথর। কিন্তু সুবচনীর হাঁস —তার শাদা রঙ অন্ধকারেও ঢাকা গেল না, সে রিদয়কে বুকের কাছে নিয়ে বললে —'দেখ ভাই এবার তোমার হাতে মরণ-বাঁচন।'

রিদয় নিজের টেঁক থেকে নরুনের মতো পাতলা ছুরিটি বার করে বললে —'দেখছ তো আমার অস্তর!'

হাঁস বললে —'অস্তরে ভালো করে শান দিয়ে রাখ ভাই।'

ঠিক সেই সময় উপর থেকে একবার ডাক এল —'ইয়াহু!' তারপরেই ঝপাং করে জলে পড়ে ডালকুত্তা হাঁসের দিকে সাঁৎরে আসছে দেখা গেল। শেয়ালটা ঝোপের আড়াল থেকে চেঁচিয়ে উঠল —'হুয়া-হুয়া হত্যা হুয়া!'

শেয়াল দেখলে, কুত্তা জল থেকে একটা বাঁকা-নখওয়ালা লাল থাবা শাদা হাঁসটির দিকে বাড়িয়ে দিলে। হাঁসটা কখন ক্যোঁক করে ওঠে শেয়াল ভাবছে ঠিক সে সময় ডালকুত্তা 'উঁয়াহুঃ' বলে ডিগবাজি খেয়ে জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে-খেতে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ওপারে উঠল, আর ডানা ঝটপট করে হাঁসের দল অন্ধকার দিয়ে একদিকে উড়ে পালাল।

শেয়ালের ইচ্ছে হাঁসের পিছনে তাড়া করে চলে, কিন্তু ব্যাপারটা হল কী সেটা জানতে তার লোভ হচ্ছে, সে ওপর থেকে ডালকুত্তাকে ডাক দিয়ে শুধোলে 'ক্যায়াহুয়া ক্যোয়া-হুয়া?'

রিদয়ের নরুনের ঘায়ে তখন ডালকুত্তা অস্থির। সে রেগে বললে —'চোপরাও যাও-যাও!'

শেয়াল বললে —'কী দাদা হাত ফসকে গেল নাকি?'

কুত্তা গা ঝাড়া দিয়ে বললে —'শাদা হাঁসটাকে টেনে নিয়েছিলুম আর কী, কী জানি সেই সময় টিকটিকির মতো একটা কী জানোয়ার হাতে এমন দাঁত বসিয়ে দিলে যে, চোখে আমি সরষে-ফুল দেখলুম!' কুত্তা তার থাবা চাটতে বসে গেল।

শেয়াল 'হাঃ-গিয়া হাঃ-গিয়া' বলে কাঁদতে-কাঁদতে হাঁসেদের

সঙ্গে আবার দৌড়ল। হাঁসেরা রিদয়কে নিয়ে ছুই পাহাড়ের গলির মধ্যে দিয়ে কেবল কুলকুল জলের শব্দটি ধরে এঁকে-বেঁকে উড়ে চলেছে অজানা জায়গায়, কোথায় গিয়ে বসে ঠিক পাচ্ছে না, এমন সময় মেঘ কেটে আকাশে চাঁদ উঠল, তখন আর চকাকে পায় কে, ঝকঝকে সরু সাপের মতো নদীর ধারটির উপরে চোখ রেখে চকা হাঁসের দলকে নিয়ে সোজা নিচ মুখে নেমে চলল। সিনিবালি চা-বাগানের উপরটায় এসে নদী একটা বড়ো পাথর ঘুরে ঝরনা দিয়ে একেবারে ছুশো হাত নিচে পড়েছে, চাতালের মতো সেই পাথরে এসে চকা দলবল নিয়ে বাকি রাতটা কাটাতে বসল।

ঝরনার একদিকে ধাপে-ধাপে চা-বাগান পাহাড়ের চুড়ো পর্যন্ত সিঁড়ির মতো উঠে গেছে, আর একদিকে বনের ধারে চা-বাগানের মালিকের ঘর-বাড়ি, সেখান থেকে পাকদণ্ডি নেমেছে ঝরনা পর্যন্ত। হাঁসেরা রাতে এখানে-ওখানে উড়ে হাঁপিয়ে পড়েছিল, সবাই তারা ঘুমিয়ে পড়ল, রিদয় কেবল জেগে পাহারা দিতে লাগল।

খানিক রাতে বনের মধ্যে একটা ঝটপট শব্দ শোনা গেল, তারপরেই রিদয় দেখলে ডালকুত্তার সঙ্গে শেয়াল কী ফুসফাস করতে-করতে পাকদণ্ডি দিয়ে নামছে, অন্ধকারে ছুজনের চোখ আগুনের মতো জ্বলছে। রিদয় তাগ করে একটা পাথরকুচি ছুড়ে শেয়ালটাকে মারতে যাবে ঠিক সেই সময় একটা পাহাড়ি সাপের গায়ে তার হাত পড়ল, ঠাণ্ডা যেন বরফ! রিদয় একেবারে হাঁসের পিঠে লাফিয়ে উঠে বললে—'পালাও-পালাও, শেয়ালটা এবারে আমাদের সাপে খাওয়াবার মৎলব করেছে।'

হাঁসেরা একেবারে ডানা মেলে আকাশে যেমন লাফিয়ে উঠল, ঠিক সেই সময় পাথরের হাতুড়ির মতো পাহাড়ি সাপের মাথাটা সোঁ করে তাদের পায়ের নিচে দিয়ে ছুটে এসে পাথরে ছোবল দিলে। চকা শিয়ালের উপর ভারি চটেছে, নদীর উপর দিয়ে গেলে শেয়ালটা সহজে তার সঙ্গ ছাড়বে না বুঝে চকা এবারে একেবারে উপর দিয়ে উড়ে চলল, সোজা শিলিগুড়ির স্টেশনের টিনের ছাতের দিকে।

দার্জিলিঙ মেল আসতে এখনো তিন ঘণ্টা। স্টেশনে লোকজন নেই, হোটেলগুলোর টিনের ছাত বিষ্টিতে ভিজে চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে। পাহাড়ের অন্ধকার ছেড়ে হঠাৎ ফাঁকায় পড়ে রিদয়ের ধাঁধা লেগে গেল। আকাশ থেকে সে টিনের ছাতগুলোকে দেখছে যেন ছোটো-ছোটো পাহাড়ের চুড়ো শাদা বরফে ঢাকা! হাঁসেরা সেই দিকে নেমে চলল দেখে রিদয় চেঁচিয়ে বললে —'কর কী, ওখানে যে খালি বরফ, বসবার জায়গা কোথা!' কিন্তু হাঁসেরা তার কথায় কান না দিয়ে নেমেই চলল!

রিদয় দেখলে পাহাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আকাশে দুই হাত ছড়িয়ে একটা যেন দৈত্য লাল সবুজ দুটো চোখ নিয়ে কটমট করে তার দিকে চেয়ে রয়েছে! রিদয়ের আরো ভয় হল। সে দুই পা গুটিয়ে হাঁসের পিঠের পালকে লুকোবার চেষ্টা করছে এমন সময় হাঁসেরা ঝুপঝাপ করে স্টেশনের টিনের ছাতে নেমে পড়ল। তখন রিদয়ের ভুল ভাঙল, সে দেখলে রাস্তার আলোগুলোকে ভেবেছিল সব তারা, টিনের ছাদগুলোকে পাহাড়ের চুড়ো —আর লাল সবুজ লণ্ঠন দেওয়া সিগনেল পোস্টটাকে একটা দৈত্য।

রিদয় স্টেশন কখনো দেখেনি, টিনের ছাতে ছুটোছুটি করে এদিক-ওদিক দেখতে আরম্ভ করলে, স্টেশনের সব উঁচু চুড়োয় দুটো কাঁটা উত্তর দক্ষিণ দেখতে আরম্ভ করলে, স্টেশনের সব উঁচু চুড়োয় দুটো কাঁটা উত্তর দক্ষিণ কোনদিকে বাতাস বইছে দেখবার জন্যে কেবলি ঘুরছে, তারি উপরে একটি গোলা, সেই গোলায় এক-পা রেখে আকাশে চিমটের মতো দুই ঠোঁট উঠিয়ে কঙ্ক-পাখি আরামে ঘুম দিচ্ছেন। রিদয়কে টিনের উপর ছুটো-ছুটি করতে শুনে কঙ্ক-পাখি গোলার উপর থেকে ধমকে উঠলেন —'গোল করে কে?'

রিদয়ের দুষ্টুমি গেছে কিন্তু ফষ্টিনষ্টি করবার বাতিক এখনো খুব আছে। সে অমনি বলে' উঠল —'গোল আর করবে কে, গোলের মাঝে বসে আছ তুমি, তোমার এ কাজ!'

'ভালো রে ভালো বলেছিস' বলে কঙ্ক-পাখি চিমটের মতো

ঠোঁটে গিরগিটির মতো রিদয়কে ধরে বার কতক আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিয়ে আদর করে বললে —'দেখো ছোকরা, এত রাত্রে ছাতে খুটখাট করলে এখনি স্টেশন-মিস্ট্রেস মেমের ঘুম ভেঙে যাবে আর স্টেশন-মাস্টার এসে আমাদের উপরে গুলি চালাবে। যদি স্টেশন দেখতে চাও তো ওই জলের পাইপটা ধরে নেমে যাও কিন্তু খবরদার স্টেশনের জল খেও না, তাহলেই ম্যালেরিয়া হয়ে যুধিষ্ঠিরের চার ভাই যেমন একবার মরেছিলেন তেমনি তুমিও মরবে।'

রিদয় বললে —'সে কেমন কথা?'

কঙ্ক বললেন —'শোনো তবে বলি!'

কথার নাম শুনেই চারদিক থেকে হাঁস পাখি যে-যেখানে ঘুমিয়ে ছিল চাঁদের আলোতে টিনের ছাতে বুড়ো কঙ্ক-পাখিকে ঘিরে বসল। চাঁদটাও যেন গল্প শুনতে কঙ্কের ঠিক পিঠের দিকে টিনের ছাদের কার্নিসে এসে বসল।

কঙ্ক গলা খাঁকানি দিয়ে শুরু করলেন :

আমাদের কঙ্ক বংশের শেষ অঙ্কের যে আমি, আমার স্বর্গীয় প্রপিতামহ ছোটো-কঙ্ক, তাঁর প্রস্বর্গীয় মধ্যম প্রপিতামহ মেঝো-কঙ্ক মহাশয়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ধর্মাবতার বড়ো-কঙ্ক —তিনি কাম্য বনে এক রম্য সরোবরে বাস করছেন, এদিকে একদিন হয়েছে কী,না ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের তৃষ্ণা পেয়েছে। বনের মধ্যে তেষ্টা পেয়েছে, খুঁজে-খাঁজে জল খেয়ে নিলেই হত, না হুকুম করলেন —'ওরে ভীম জল নিয়ে আয়।' ভীম চললেন —জল খুঁজে-খুঁজে তাঁরও তেষ্টা পেয়ে গেল। সেই সময় আমাদের ধর্মাবতার বড়ো-কঙ্ক সে পুকুরে পাহারা দিচ্ছিলেন। সেই কতকালের পানা পুকুরটার দিকে ভীমের নজর পড়ল, জল দেখে ভীমের তেষ্টা যুধিষ্ঠিরের চেয়ে দুগুণ বেড়ে গেল। ভীম তাড়াতাড়ি পুকুরে নামলেন, অঞ্জলি ভরে বৃকোদর প্রায় পুকুরের অর্ধেক জল তুলে নিলেন দেখে আমার স্বর্গীয় প্রপিতামহের পিতামহের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বলে উঠলেন

—'অঞ্জলি করিয়া জল না করিহ পান, সমস্যা পুরণ করি করো জল পান —নতুবা তোমার মৃত্যু।'

সমস্যা দিয়ে জল ফিলটার করে খাবার দেরি সইল না, বৃকোদর আমাদের ধর্মাবতারের পানা-পুকুরের পচাজল চকচক করে খেয়ে ফেললেন। যেমন খাওয়া, অমনি কম্পজ্বর সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু। তারপর অর্জুন এলেন, নকুল সহদেব এলেন, দ্রৌপদী এলেন, সবার সেই দশা, কেউ সমস্যা দিয়ে জল শোধন করে নিতে চাইলেন না। শেষে যুধিষ্ঠির এসে ধর্মাবতার কঙ্কের কথামতো চারবার সমস্যা দিয়ে জল শোধন করে তবে বেঁচে গেলেন ; আর সেই শোধন করা শান্তিজল দিয়ে চার ভাই আর দ্রৌপদীকেও বাঁচিয়ে দিলেন।

রিদয় শুধোলে —'বারি শোধন করার সমস্যা কোথায় পাওয়া যায়, তার দাম কত ?'

কঙ্ক হেসে বললেন —'সমস্যা কী জলের কুঁজো যে, বাজারে পাবে ? সমস্কৃততে সমস্যা লেখা হয় মন্তরের মতো, সেইটে পাঠ করে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলে এক নাক টিপে নাকের মধ্যে জল টেনে নিতে হয়, আর বলতে হয়, আদি গঙ্গা সাত সমুদ্র তেরো নদী বান্ধিলাম, দশঘড়ায় বান্ধিলাম, জিহ্বার উপর বান্ধিলাম, সরস্বতী যমুনা বন্ধ, মাতা গঙ্গাভাগীরথী ফুঃ ফুঃ ফুঃ। মন্তর যদি শিখতে চাও তো কামরূপ কামিখ্যেয় আমার হাড়গিলে-দাদার কাছে যাও। সাপের মন্তর বাঘের মন্তর শেয়ালের মন্তর সব মন্তর তিনি জানেন, আর কোনো ভাবনা থাকবে না নির্ভয়ে যেখানে খুশি বেড়িয়ে বেড়াতে পারবে।'

চকা বলে উঠল —'এ পরামর্শ মন্দ নয়। খেঁকশেয়ালটা যে রকম সঙ্গে লেগেছে তাতে একটা শেয়ালের মন্তর রিদয়কে না শিখিয়ে নিলে তো আর চলছে না। সেই কৈলাস পর্যন্ত যেতে হবে, এর মধ্যে কত বিপদ-আপদ আছে —চল কিছুদিন কামরূপে থেকে গোটাকতক মন্তর নিয়ে যাওয়া যাক।'

কঙ্ক বললেন —'চল, দাদার কাছে আমারো গোটাকতক মন্তর

নেবার আছে।' চকাকে কঙ্ক শুধোলেন—'তোমরা কোন পথে কামরূপ যেতে চাও? ব্রহ্মপুত্রের পথে গেলে অনেক ঘুরে যেতে হবে, আর আমার সঙ্গে যদি সিধে রাস্তায় যেতে চাও তো এখান থেকে তরসা নদী একবেলা, সেখান থেকে জলপাইগুড়ি বক্সাও কুচবেহার হয়ে জয়িন্তী আর একবেলা, সেখানে রাত কাটিয়ে মোচু নদীতে জল খেয়ে গোয়ালপাড়া দশটার মধ্যে, সেখানে থেকে বেলা পাঁচটায় মানস নদী, ছটা নাগাদ কামরূপ কামাখ্যার মন্দির—সেখানে ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে হাড়গিলের চরে আমার দাদা থাকেন।'

চকা কঙ্ক-পাখির কথায় সায় দিয়ে তরসার পথেই বাঁয়ে হিমালয় পাহাড় রেখে সোজা পুবমুখো কামরূপে রওনা হল। খানিক উড়েই চকা বুঝলে কঙ্ক-পাখির সঙ্গে বেরিয়ে ভালো করেনি। তার নাম যেমন কঙ্ক চলাও তেমনি বঙ্ক, মোটেই সোজা নয়। সে শিলিগুড়ি ছেড়েই দক্ষিণমুখো চলল, মহানদীর ধার দিয়ে জলপাইগুড়ি স্টেশন হয়ে তিতলিয়া পর্যন্ত, সেখান থেকে উত্তরপুবে বেঁকে কুচবেহার ঘেঁষে বার্ণিশ-ঘাট, তারপর তিস্তানদীর উপর দিয়ে এঁকতে-বেঁকতে উত্তর মুখে রামসাই হাট হয়ে বোগরা কুঠি, একেবারে পাহাড়তলিতে উপস্থিত, এখান থেকে সেখান থেকে পাহাড়ের বাঁকে-বাঁকে পুবে মাদারী পর্যন্ত। সেখান থেকে তরসা নদীর স্রোত ধরে দক্ষিণে এসে একেবারে কুচবেহারের রাজবাড়ির উপরে এসে পড়া, সেখান থেকে আবার উত্তর, আলিপুর বক্সাও জয়িন্তী একেবারে জলপাইগুড়ি পরগণার পুব মোহড়ায় মোচু নদীতে হাজির। এর পরেই গোয়াল-পাড়া আরম্ভ।

এইভাবে এদিক-ওদিক একোণ-ওকোণ এপাড়া-ওপাড়া যেন কী খুঁজতে-খুঁজতে কঙ্ক-পাখি তীরবেগে চলেছে। তার সঙ্গে উড়ে চলা হাঁসদের সম্ভব নয়, কাজেই চকা নিজের পথ দেখে হাঁক দিতে দিতে চলল— 'তরসা— তরসা।' ওদিকে যেমন কুঁকড়ো, এদিকে তেমনি উত্তর থেকে দক্ষিণমুখো যে সব নদী চলেছে, তারি ঘাটে-ঘাটে কাদা-খোঁচা জলপীপী ঘাটিয়াল হাঁক দিচ্ছে— 'তরসা পশ্চিমকূল মাদারি!'

মাদারি হয়ে তরসার উপর দিয়ে হাঁসেরা পাড়ি দিতে লাগল, দূরে ডাইনে কুচবেহারের রাজবাড়ি, তরসার পুবপারে রাজাদের জলকরে পানিকাক হাঁকলে— 'বক্সাও।' আরও দূরে জলপাইগুড়ির সীমানায় তিতিরে হাঁকলে-- 'জয়িন্তি।'

জলপাইগুড়ি ছাড়িয়ে গোয়ালপাড়ার মোচু নদীর কাছ বরাবর এসে হাঁসেরা আকাশ মেঘে অন্ধকার দেখলে, জোর বাতাস তাদের ক্রমেই উত্তরে পাহাড়ের গায়ে ঠেলে নিয়ে চলল। হাঁসেরা এঁকে-বেঁকে কখনো উত্তর ঘেঁষে একেবারে হিমালয়ের দেওয়ালের ধার দিয়ে কখনো দক্ষিণে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে উড়ে চলল, সারাদিন।

গোয়ালপাড়া ছাড়িয়ে কামরূপ মানস নদীর কাছ বরাবার এসেছে, এমন সময় পশ্চিম দিকে বোঁ-বোঁ সোঁ-সোঁ শব্দ উঠল যেন হাজার-হাজার পাখি উড়ে আসছে। পায়ের তলার মানস নদীর জল হঠাৎ কালো ঘোরাল হয়ে উঠল, দমকা হাওয়ার একটা ঝাপটা এসে হাঁসেদের ডানার পালকগুলো উস্কোখুস্কো করে দিলে।

চকা ঝপ করে ডানা বন্ধ করে পলকের মতো চমকে যেন আকাশে স্থির হয়ে দাঁড়াল তারপরে তীরের মতো মানস নদীর দিকে নেমে চলল, ডাক দিতে দিতে— 'সামাল জমি লাও জমি লাও।' কিন্তু জমি নেবার আগে ঝড় একেবারে ধুলো বালি শুকনো পাতা ছোটো-ছোটো পাখিদের ঠেলতে-ঠেলতে তরতর করে এসে পড়ল। বাতাসের জোরে মাঝ-দরিয়ার দিকে চকা নিকোবরের দলকে ঠেলে নিতে লাগল, জমি নেবার উপায় নেই। মানস নদীর পশ্চিম কূলে বিজলী-গাঁয়ের উপর দিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে বাতাস হাঁসের দলকে দেখতে-দেখতে মাঝ-দরিয়ায় নিয়ে আসছে, সামনে মানস নদীর ওপারের ভাঙন-জমি পাহাড়ের মতো উঁচু, সেখানে হাওয়া যদি আছড়ে ফেলে, তবে একটি হাঁসও বাঁচবে না। ঘোরবারও উপায় নেই, ওদিকে মাঝনদীতে তুফান উঠেছে, ঝড়ের মুখে উড়ে গিয়ে সামনের ভাঙনে আছড়ে পড়লে মৃত্যু নিশ্চয়, তার চেয়ে জলে পড়ে বরং সাঁতরে বাঁচবার উপায় আছে স্থির করে সব হাঁস ঝুপঝাপ

নদীতে নেমে পড়ল, শাদা-শাদা ফেনা নিয়ে চারদিকে সাপের ফণার মতো ঢেউ উঠছে-পড়ছে, একটার পিছে তেড়ে আসছে আর একটা, মাথার উপর ঝড় ডাকছে সোঁ-সোঁ, চারদিকে জল ডাকছে গোঁ-গোঁ, নদীতে একখানি নৌকা নেই, একটি ডিঙিও নেই, কেবল মাঝনদীতে ঢেউয়ের উপরে-উপরে স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে মোচার মতো হাঁস কটি।

জলে পড়ে হাঁসদের কোনো কষ্ট নেই। স্রোতে গা ভাসিয়ে একগাছ ছেঁড়া মালার মতো, ঢেউয়ের সঙ্গে উঠে পড়ে চলেছে। কেবল চকার ভয় হচ্ছে পাছে দলটা ছড়িভঙ্গ হয়ে পড়ে। তাই সে থেকে-থেকে ডাক দিচ্ছে—'কোথায়!' অমনি বাকি হাঁসেরা উত্তর দিচ্ছে—'হেথায়-হেথায়।' চকা একবার রিদয়কে ডাক দিচ্ছে—'হংপাল-হংপাল।' রিদয় অমনি উত্তর দিচ্ছে—'ভাসান-ভাসান।' আকাশ দিয়ে স্থলচর পাখিরা ঝড়ে লুটোপুটি হয়ে চলেছে। হাঁসেরা দিব্বি আছে দেখে তারা বলতে-বলতে উড়ে চলল—'সাঁতার-সাঁতার উ-উ-উ গেছি-গেছি-গেছি, মরি-মরি-মরি!' কিন্তু ঢেউয়ের উপর দিয়ে দড়িছেঁড়া নৌকার মতো দুলতে-দুলতে চলাতেও বিপদ আছে। চকা দেখলে হাঁসেরা ডানায় মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়বার যোগাড় করছে, সে অমনি সবাইকে সাবধান করতে লাগল—'ঘুমেসারা দলছাড়া, দলছাড়া, গেছ-মারা, চোখ খোল চোখ মেল।' চকা বলছে বটে চোখ খোল কিন্তু নিজেরও তার চোখ ঢুলে এসেছে, অন্য হাঁসগুলো তো একঘুম ঘুমিয়েই নিচ্ছে।

ঠিক সেই সময় সামনের একটা ঢেউয়ের মাথায় পোড়া কাঠের মতো একটা কী ভেসে উঠল। চকার অমনি চটকা ভেঙে গেল—সে কুমির-কুমির বলেই দুই ডানার ঝাপটা মেরে সোজা আকাশে উড়ে পড়ল, খোঁড়া হাঁস রিদয়কে নিয়ে যেমন জল ছেড়েছে আর কুমির জল থেকে ঝম্প দিয়ে তার খোঁড়াপায়ে একটা দাঁতের আঁচড় বসিয়ে ডুব মারলে। খোঁড়া ইস বলে এক লাফে আর পাঁচ হাত

উপরে উড়ে পড়ল। কুমিরটা আর একবার জল থেকে নাটা-চোখ পাকিয়ে নাকটা তুলে এদিক-ওদিক করে ভুস করে ডুব মারলে।

হাঁসের দল উড়তে-উড়তে খানিক গিয়ে আবার জলে পড়ল, কিন্তু সেখানেও আবার কুমির, আবার ওড়া, আবার গিয়ে জলে পড়া —এই ভাবে সারাদিন কাটল।

কত ছোটো পাখি যে এই ঝড়ে মারা পড়ল, পথ হারিয়ে একদিকে যেতে আর একদিকে গিয়ে পড়ল, না খেয়ে জলে ভিজে নদীতে পড়ে পাহাড়ে আছাড় খেয়ে কত যে পাখি মরে ঝরে গেল তার ঠিকঠিকানা নেই।

চকার দল হাঁফিয়ে পড়েছে, এদিকে অজানা নদী, ওদিকে অচেনা ডাঙা। পাহাড় থেকে জল বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গড়িয়ে চলেছে —ঝড়ে ভাঙা বড়ো-বড়ো গাছের ডাল ভেসে চলেছে, চকা দলবল নিয়ে একবার গাছের ডালে ভর দিয়ে জিরোবার চেষ্টা করলে কিন্তু ভিজে ডাল একেই পিছল তার উপরে আবার স্রোতে গড়িয়ে-গড়িয়ে চলেছে। বাতাস ক্রমাগত তাদের জলে ঠেলে ফেলতে লাগল, ওদিকে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল, জলে থাকা আর চলে না, হাঁসেরা উড়ে পড়ল।

আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই, কেবল কালো মেঘ আর বিদ্যুৎ, আর হুহু বাতাস, থেকে-থেকে পাখিরা ভয়ে চিৎকার করে উঠছে, জলের ধারে ঝুপঝাপ পাড় ভেঙে নদীতে পড়ছে, বজ্রঘাতে বড়ো-বড়ো গাছ মড়মড় করে মুচড়ে পড়ছে, এরি মাঝ দিয়ে চকা তার দল নিয়ে ডাঙায় আশ্রয় নিতে চলেছে। হঠাৎ এক সময় সামনে একটা গুনগুন আওয়াজ শোনা গেল, তারপরেই রিদয় দেখল হাওয়ার মতো একটা পাহাড়ের দেওয়াল নদী থেকে আকাশে উঠেছে আর তারি তলায় নদীর জল তুফান তুলে ঝপাঝপ পড়ছে। চকা সোজা পাহাড়ের দিকে চলেছে! রিদয় ভাবলে —এইবার শেষ, আর রক্ষে নেই, সে বিষ্টিতে কুয়াশায় ঝাপসা পাহাড়ের দিকে চেয়ে রয়েছে এমন সময় চকা ডাক দিলে —'বাঁয়ে ঘেঁসে।' দেখতে-

দেখতে পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড খিলেনের মতো একট গুহা দেখা গেল, চকা হাঁসের দল নিয়ে তারি মধ্যে সোজা ঢুকে পড়ল — সেখানে বিষ্টি নেই, জল নেই, বাতাসও আস্তে-আস্তে আসছে সোঁ-সোঁ করে। ডাঙায় পা দিয়েই চকা দেখতে লাগল সেথো সবাই আছে কিনা। সবাইকে পাওয়া গেল, কেবল কঙ্ক-পাখি, যে তাদের পথ দেখিয়ে আনছিল তার কোনো খোঁজই হল না!

গুহাটার মধ্যে শুকনো বালি কাঁকর আর ঘাস হাঁসেরা তারি উপরে বসে ভিজে পালক ঝেড়ে-ঝুড়ে নিচ্ছে, চকা রিদয়কে নিয়ে গুহাটা তদারক করতে চলল। মস্ত গুহা, মুখের কাছটায় আলো পড়েছে, ভিতর দিকটা অন্ধকার, দু-ধারে দেওয়ালের গায়ে রেলগাড়ির বেঞ্চির মতো থাকে-থাকে পাথর সাজানো—একপাশে একটি ডোবা, তাতে পরিষ্কার বৃষ্টির জল ধরা রয়েছে। রিদয় বলে উঠল —'বাঃ ঠিক যেন ধর্মশালাটি।' অমনি গুহার ওধারে অন্ধকার থেকে কারা বলে উঠল —'ধর্মশালাই বটে!' রিদয় ভয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে গেল।

চকা এদিকে-ওদিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে অন্ধকারে এ-কোণে ও-কোণে জোড়া-জোড়া সবুজ চোখ পিটপিট করছে। 'ওই রে বাঘ!' বলেই চকা রিদয়কে মুখে করে তুলে দৌড়! রিদয় চেঁচাচ্ছে —'বাঘ বাঘ!' সেই সময় অন্ধকার থেকে জবাব হল —'ভ্যো-ভ্যো ভ্যোড়া!'

এবার রিদয়ের সাহস দেখে কে, সে বুক ফুলিয়ে ভেড়াদের সর্দার দুম্বার কাছে গিয়ে শুধোলে —'এখানে যে তোমরা বড়ো এলে? এটা আমাদের ঘর, যাও!'

দুম্বা তার কানের দু-পাশে গুগলি পেঁচ দুই শিং পাথরে ঘষে বললে —'এখানে আমরা ইচ্ছে-সুখে এসে ধরা পড়ে কামিখ্যার ভেড়া বনে গেছি, যাব কোথায়, যাবার স্থান নেই।'

রিদয় অবাক হয়ে বললে —'কী বল এই কামরূপ কামিখ্যার মন্দির? এইখানে মানুষকে তারা ভেড়া ছাগল বানিয়ে রাখে!'

হাঁও বটে নাও বটে, এই ভাবে ঘাড় নেড়ে হুম্বা বললে —'এটা কি গোয়াল না এটা আমাদের বাড়ি —এটা একটা যাদুঘর। এখানে যা দেখছ সব ইন্দ্রজাল, ভৌতিক ব্যাপার। এদিক দিয়ে পাখিরা পর্যন্ত উড়ে চলতে ভয় পায়, তোমরা কার পরামর্শে এখানে এলে শুনি? মহাভারতের ধর্মাবতার কঙ্ক তার কোনো পুরুষের কেউ নয়, সেই বকধর্মিক কঙ্ক-পাখির সঙ্গে তোমাদের পথে দেখা হয়নি তো?'

কঙ্ক-পাখির পাল্লায় পড়েই তারা এদিকে এসেছে শুনে হুম্বা হা-হুতাশ করে বললে —'এমন কাজও করে, বকধার্মিকের কাজই হচ্ছে নানা ছলে লোককে ভুলিয়ে এই কামরূপে এনে মানুষকে ভেড়া, ভেড়াকে ছাগল বানিয়ে দেওয়া, এটা বুঝলে না —কী আপসোস!'

রিদয় ভয় পেয়ে বলে উঠল —'এখন উপায়।'

হুম্বা খানিক ভেবে বললে —'উপায় আর কী, এক উপায় যদি বকধার্মিক এই ঝড়ে রাস্তা ভুলে অন্যদিকে গিয়ে পড়ে থাকে তবেই তোমরা এবারের মতো বেঁচে গেলে।'

চকা শুধোলে —'আর সে যদি এসে পড়ে তো কী হবে?'

হুম্বা উত্তর করলে —'সে এসে ঠোঁট দিয়ে তোমাদের মাথা ফুটো করে যা কিছু বুদ্ধি আছে মগজের সঙ্গে সবটুকু বার করে নেবে; আর তোমরা কেউ বোকা ছাগল, কেউ মেড়া, কেউ ভেড়া হয়ে আ-আ করে তাকেই তোমাদের ভেড়া বানিয়ে দেবার জন্যে বাহবা ধন্যবাদ দিতে থাকবে।'

রিদয় রেগে বলে উঠল —'মাথা ফুটো করতে দিলে তবে তো? যেমন দেখব সে আসছে, অমনি আমরা সরে পড়ব না?'

হুম্বা শিং নেড়ে বললে —'তা হবার যো নেই, সে ধুলোপড়া দিয়ে সবার চোখে ধুলো দিয়ে কখন যে কাজ উদ্ধার করে যাবে তোমরা টেরও পাবে না। মনে হবে, কে তোমাদের মাথা চুলকে দিচ্ছে, তোমরা ঘুমিয়ে পড়বে আরামে। তারপর চোখ খুলে দেখবে ভেড়া হয়ে গেছ।'

চকা এগিয়ে এসে শুধোলে —‘এত বোকা ছাগল বোকা মেড়ায় তার কী দরকার বলতে পার?’ হুম্বা খানিক চোখ বুজে বললে — ‘ঠিক জানিনে, তবে শুনেছি নাকি’ —বলেই হুম্বা হঠাৎ চুপ করে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল।

রিদয় ব্যস্ত হয়ে শুধালে —‘কী শুনেছ বলেই ফেল না।’

হুম্বা আরো ব্যস্ত হয়ে বললে —‘চুপ-চুপ অত চেঁচিও না, কাজ কি বাবু ওসব কথায়, শেষে কি ফ্যাসাদে পড়ব? কে কোন দিকে শুনবে, শেষে আমাকে নিয়ে টানাটানি। যাক ও কথা, কুবরী-কুবরী’ —বলে হুম্বা চোখ বুজল।

রিদয় অনেক পেড়াপীড়ি করেও কুবরী ছাড়া আর একটি কথাও বোকাছাগলের মুখ দিয়ে বার করতে পারলে না। চকা চুপি-চুপি রিদয়কে বললে —‘তুমিও যেমন, বোকামেড়া ও, ওর কথার আবার মূল্য আছে? নিশ্চয় ওটার মাথার গোল আছে, এস এখন খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করা যাক, সকালে উঠে নিজের পথ নিজে দেখা যাবে।’ তারপর হুম্বার দিকে চেয়ে বললে —‘মশায় যদি জানতেন আমরা আজ সারা রাস্তাটা কী কষ্টে কাটিয়ে এখানে এসেছি, তবে এই রাতে আমাদের মিছে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টা না করে বরং কিছু অতিথি সৎকারের বন্দোবস্ত করে দিতেন। আমরা নিতান্ত দায়ে পড়েই এখানটায় আশ্রয় নিয়েছি, এখন উচিত হয় আপনার আর কালবিলম্ব না করে আমাদের জন্য জলযোগ এবং তারপরে সুনিদ্রার ব্যবস্থা করে দেওয়া।’

এবারে হুম্বা অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এসে বললে — ‘আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস করছেন না, আচ্ছা আমি আপনাদের খাবার ব্যবস্থা করছি; দেখুন কী কাণ্ড হয়, তখন কিন্তু আমায় দোষ দিতে পারবেন না।’

চকা এবার সত্যিই ভয় পেলে, কোনদিক থেকে কী বিপদ আসে ভেবে চারদিকে চাইতে লাগল।

হুম্বা ডাকলে —‘আসুন আহার প্রস্তুত কিন্তু দেখবেন চটপট

আহার সেরে উঠবেন, না হলে ব্যাঘাত হতে পারে। আপনারা আসন গ্রহণ করুন আমি এখানে দাঁড়িয়ে আসন-বন্ধন মন্ত্রটি পাঠ করছি।' রিদয় আর হাঁসেরা খেতে বসে গেল। তুম্বা মন্ত্র পাঠ করতে লাগল —

মেষ চর্মের আসন তোরে করিরে পেন্‌নাম
আমার এই কার্যে তুই হ রে সাবধান।
কামিখ্যার বরে তোরে করিলাম বন্ধন
এ কার্যে যেন তুই না হোস লঙ্ঘন ॥

হাঁসেদের অর্ধেক খাওয়া হয়েছে এমন সময় দূরে ফেউ ডাকল। তুম্বা মন্তর জপতে-জপতে বললে —'ওই শুনছেন তো এঁরা আসছেন, এরি মধ্যে খবর হয়ে গেছে। ব্যাঘাত হল চটপট খেয়ে নিন' বলেই তুম্বা তাড়াতাড়ি মন্তর পড়তে লাগল :

লাগ-লাগ ফেরুপালের দন্তের কপাটি
কোনো ভূতে করিতে নারিবে আমার ক্ষতি
শীঘ্রি লাগ শীঘ্রি লাগ।

মন্তরের চোটে কেউ ঘরে ঢুকতে সাহস পেলে না বটে কিন্তু বাইরে চারদিকে ফেরুপাল চিৎকার করে কানে তালা ধরিয়ে দিতে লাগল —'হুয়া-হুয়া, খাওয়া হুয়া, হুয়া খাওয়া, হুয়া খাওয়া।'

রিদয় বললে —'এত গোল করে কে?' রিদয়ের কথা তখন আর কে শোনে? তখন তুম্বা 'ব্যেঘাৎ-ব্যেঘাৎ' বলে চেঁচাচ্ছে আর ঘরের মাঝে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, যেন সর্বনাশ হচ্ছে। রিদয় তুম্বার রকম দেখে চেঁচিয়ে বললে —'আরে মশায় ব্যাপারটা কী খুলে বলুন না, অত বুক চাপড়ে ছুটোছুটি করচেন কেন?'

হুম্বার তখন ভয়ে মাথা ঘুলিয়ে গেছে সে কাঁপতে-কাঁপতে বললে —'সর্বনাশ হল, হায়-হায় কী উপায়, কী উপায়!'

রিদয় আরো চটে বললে —'আরে মশাই হয়েছে কী তাই বলুন না?'

হুম্বা তখন একটু স্থির হয়ে বললে —'ওই খেঁকি-খেঁকি-খেঁকি খেঁকশেয়ালী ওই তিন ফেরুপাল ওঁরা যদি আমাদের দেওয়া মুড়ো কিংবা ভেড়ার মাংস না খেতে চান তো কী হবে এখন!'

রিদয় হেসে বললে —'এই জন্যে এতো ভয়, তা ওঁরা যদি আপনাদের মুড়ো মাংস না খান তো আপনাদেরই তো লাভ, এতে আপনার দুঃখুই বা কী, ভয়ই বা কী?'

হুম্বা শিং নেড়ে বললে —'আহা আপনি বুঝেন না, ওঁদের মুড়ো মাংস খাওয়ানো যে ভেড়াবংশের সনাতন প্রথা, সেটা বন্ধ হলে যে আমাদের জাত যাবে, আমরা একঘরে হয়ে যাব, তার করলেন কী?'

রিদয় গম্ভীর হয়ে বললে —'আগে আপনি কী করতে চান শুনি!'

হুম্বা কেঁদে বললে —'আমি এ প্রাণ আর রাখব না —আমি সমাজদ্রোহী, আমি নরকে যাব স্থির করেছি, আমি অতি হতভাগ্য।'

রিদয় হুম্বার শিংএ হাত বুলিয়ে বললে —'ওদের ঠাণ্ডা করবার কি আর কোনো উপায় নেই!'

হুম্বা ঘাড় নেড়ে বললে —'আর এক উপায় —তুষানলে জ্বলে পুড়ে মরা, কিন্তু তার চেয়ে নরককুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়াই সহজ!'

রিদয় বলে উঠল —'কাজ আরো সহজ হয় ওই তিনটে কুকুরকে নরকে পাঠিয়ে দেওয়া!'

হুম্বা দুই চোখ পাকল্ করে অবাক হয়ে বললে —'একি সম্ভব!'

রিদয় বললে —'দেখি তোমার শিং, খুব সম্ভব এক ঢুঁয়ে তিনটেকে একেবারে নরকে চালান করে দেওয়া যায় যদি তুমি তাল ঠুকে লাগ!'

তুম্বা বলল —'তাল ঠুকে ঢুঁ লাগাতে আমি মজবুত কিন্তু ওদের দেখলেই যে আমাদের বুদ্ধি লোপ পায়, তার কী?'

রিদয় তুম্বার পিঠ চাপড়ে বললে —'তোমার চোখ বুজে থেকো —আমি যেমন বলব 'শিং টিং চট্' অমনি একসঙ্গে সবাই ঢুঁ বসিয়ে দিও, দেখি ওরা কী করে!'

এবারে অন্য-অন্য ভেড়া তুলাডু ঝাঁকাডু তারা এগিয়ে এসে বললে —'আমরা দু-একটা কথা বলতে চাই, আমরা ঢুঁসোতে রাজি কিন্তু তার আগে ভেবে দেখা কর্তব্য যে ফেরুপালদের সরিয়ে দিয়ে কি আমরা চলতে পারব? তাঁরা হলেন আমাদের ধোপা নাপিত এবং চরাবার কর্তা, ধরতে গেলে মেষবংশের মাথা। রাজদ্বারে শ্মশানে চ ওঁরা আমাদের বান্ধব, আত্মীয়, কুটুম্ব বললেই হয়। ওঁরা মাঝে-মাঝে আমাদের চিরুনি দাঁতে টেনে, নখে আঁচড়ে, রোঁয়া ছেঁটে, চাম ছাড়িয়ে, চেটে-পুটে সাফ না করে দিলে —কে মড়মড়ায় কে পড়পড়ায় কে ভাঙে খড়ি? আমাদের গা-শুদ্ধি হবারই যো নেই যদি না পাল-পার্বণে তাঁদের মাঝে-মাঝে মেষ চর্মের আসনে বসিয়ে মেষমাংসে আমরা মুখশুদ্ধি করিয়ে দিতে পারি, এছাড়া আমরা খাঁড়া আর হাড়িকাট সামনে রেখে হাড়িপ-বাবা আর হাঁড়ি-ঝি মাতাজীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি —তুমি খণ্ডা দ্বিখণ্ডা সুমুক্তি বাহার গরল ভাবহং মান্থরিক্ত ঘুমাইয়া আছি স্মটিকের মুণ্ডি। আমাদের এ মাথায় কোনো কাজ করতে গেলেই গুরুর কোপে পড়তে হবে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপে লিপ্ত হয়ে নরকেও যেতে হবে, এর জবাব আপনি কী দেন?'

রিদয়কে আর কোনো জবাব দিতে হল না —খেঁকি খেঁক-খেঁকি খেঁক-খেঁকানি তিনটে হেঁড়েল হঠাৎ এসে তিন মেড়ার লেজ ধরে টেনে নিয়ে চলল, হাঁসেরা ডানা ঝটাপট করে গুহার মধ্যে অন্ধকারে উড়ে বেড়াতে লাগল, রিদয় তাড়াতাড়ি তুম্বার পিঠ চাপড়ে দুই হাত তার ঘাড় বেঁকিয়ে ধরে হুকুম দিলে —'শিং টিং চট্, দে ঢুঁসিয়ে চটপট।' তুম্বা আর ভাবতে সময় পেলে না, অন্ধকারে

সামনে আর ডাইনে-বাঁয়ে তিন ঢুঁ বসিয়ে দিলে। খটাশ-খটাশ করে তিনটে হাঁড়িমুখো হাড়খেগো হেঁড়েলের মাথার খুলি ফেটে চৌচির হয়ে গেল! ঠিক সেই সময় বাইরে দুদ্দাড় করে ঝড়বৃষ্টি নামল —

শিল পড়ে তড়বড় ঝড় বহে ঝড়ঝড়
হড়মড় কড়মড় বাজে —ঘন-ঘন ঘন-ঘন গাজে!
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনি বিত্যুৎ চকচকি
হড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি
ঝড়ঝড়ি ঝড়ের জল ঝরঝরি
তড়তড়ি শিলার জলের তরতরি
ঘুটঘুট আঁধার বজ্রের কড়মড়ি
সাঁই-সাঁই বাতাস শীতের থরথরি।

ভেড়াগুলো কুবরী-কুবরী বলতে-বলতে এ ওর মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে, এমন সময় ঝড়ে একখানা পাথর খসে গুহার মুখটা একেবারে দরজা হয়ে কত বড়ো যে হয়ে গেল তার ঠিক নেই! ঝড় থামলে সেই খোলা পথে সকালের আলো এসে গুহার মধ্যে সবাইকে জাগিয়ে দিলে। চকা সেই আলোতে ডানা মেলে রিদয় আর খোঁড়া আর কাটচাল আর নানকৌড়িকে নিয়ে হাড়গিলের চরে যেখানে আণ্ডামানি লালসেরা হাঁসদের বড়ো দলটা নিয়ে অপেক্ষা করছে, সেই দিকে চলল।

ভেড়ার দল হঠাৎ কতকালের অন্ধকার গুহার মধ্যে দিনের আলো পেয়ে প্রথমটা অনেকক্ষণ ধরে হতভম্বের মতো আকাশের দিকে চেয়ে রইল, তারপর আস্তে-আস্তে পাহাড়ের উপর বুনো ভেড়ার দলে মিশে দিব্বি চরে বেড়াতে লাগল। রাতের কথা, রিদয়ের কথা, হাঁসদের কথা কোনো কথাই তাদের মনে রইল না। তারা যেন চিরকালই বুনো ভেড়া এইভাবে সহজে খোলা আকাশের

নিচে পাহাড়ের চাতালে-চাতালে ঘাস খেয়ে পাতা-লতা খেয়ে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগল! ভেড়াদের মধ্যে হুম্বাই কেবল মনে রাখতে পারলে রিদয় কেমন করে, তাদের নরককুণ্ডের মুখের কাছ থেকে পাহাড়ের উপরকার এই খোলা জায়গায় পৌঁছে দিয়ে গেছে, সেখানে স্বচ্ছন্দে চরে বেড়াতে কোনো বাধা নেই! দলের ভেড়ারা সন্ধ্যেবেলায় অভ্যেস মতো যখন তাদের পুরোনো ঘর গুহাটার দিকে চলল তখন হুম্বা তাদের এক-এক ঢুঁ মেরে বনের দিকে ফিরিয়ে দিলে।

আসামী বুরুঞ্জি

উত্তর থেকে বড়ো নদী যেখানে ব্রহ্মপুত্রের জলে এসে মিলেছে ঠিক সেই বাঁকের মুখেই কতকালের পুরোনো ডিমরুয়ার আসামী রাজা আড়িমাওয়ের নাটবাড়ি। নাটবাড়ির নিচেই নদী মজে গিয়ে মস্ত চর পড়েছে। এত কাল থেকে হাড়গিলে পাখিরা এই চর দখল করে আছে যে, ক্রমে চরটার নামই হয়ে গেছে হাড়গিলার চর। এই চরের ওপারেই দেওয়ানগিরি মস্ত একটা বুড়ো আঙুলের মতো আকাশের দিকে ঠেলে উঠেচে। এই দেওয়ানগিরি হল যত ফরিয়াদি পাখির আড্ডা। একপারে রইল আসামী মাছেদের রাজা আড়িমাওয়ের নাটবাড়ি আর এক পারে দেওয়ানী ফরিয়াদির আড্ডা দেওয়ানগিরি, মাঝখানে বসে রয়েছেন হাড়গিলে। আসামী ফরিয়াদিতে লড়াই মোকদ্দমা প্রায়ই হয়, তাতে দুই দলই মাঝে-মাঝে মারা পড়ে।

হাড়গিলের খাম্বাজং রাজা দুই দলের মধ্যে আরামে বসে দুই দলেরই হাড়-মাস খেয়ে সুখে আছেন, এমন সময় চর মুখে খবর পৌঁছল বুড়ো-আংলা আসছেন। হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং লম্বা-লম্বা পা ফেলে জলের ধারে তাঁর কাশবাগিচায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। ‘চুপিম-পা’ আর ‘চোরম-পা’ দুই সেনাপতি পায়ে-পায়ে হাড়গিলে রাজের কাছে হুকুম নিতে এলেন —রিদয়-হংপালকে এ-পথে আসতে দেওয়া হবে কিনা! খাম্বাজং হাড়গিলে অনেকক্ষণ আকাশের দিকে ঠোঁট উঁচিয়ে ভেবে বললেন —‘আসতে দিতে পার।’ হঠাৎ দেশের মধ্যে মানুষ আসতে দিতে হাড়গিলে-চরের প্রজারা রাজি ছিল না। দুই সেনাপতি একটু ইতস্তত করছে দেখে খাম্বাজং সভাপণ্ডিত চুহুংমুংকে ডেকে বললেন —‘দেখ তো বুরুঞ্জি পুঁথিতে কলির কত হাজার বছরে এখানে মানুষের আগমন লিখছে?’

চুহুংমুং মুখ গম্ভীর করে বুরুঞ্জির পাতা উল্টে-পাল্টে মাটিতে খানিক আঁক-জোঁক কেটে বললেন—'আগামী ভূতচতুর্দশীতে এখানে সিদ্ধিদাতা গণেশের শাপভ্রষ্ট একজন উপস্থিত হবেন, বারো বৎসর এগারো দিন এক-দণ্ড তিনপল উনপঞ্চাশ বিপল বয়সে বুরুঞ্জিতে লেখে—সুন্দরবনস্থ আমতলি গ্রামের কাশ্যপ গোত্রের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এই মহাপুরুষ, তাঁর আগমনে দেশে সুখসৌভাগ্য সঙ্গে-সঙ্গে মূষিক ও মশক বৃদ্ধি, হেঁড়েল বংশ ধ্বংস ও চুয়াদিগের নাটবাড়ি আক্রমণ এবং হাড়গিলা প্রভৃতির প্রচুর ভোগ ঐশ্বর্য এবং সর্ব-সিদ্ধি যোগ। গণেশ-চতুর্থীতে এই কলির বামন অবতার হংসরথে গৃহত্যাগ করবেন এবং ভূতচতুর্দশীতে উনপঞ্চাশ পবনে ভর দিয়ে কল্পাব্দ উনশত উনপঞ্চাশে সূর্যাস্তের দিক হতে উদয় হয়ে ক্রমে সূর্যোদয়ের দিকে অভ্যুত্থান করবেন। শ্যামবর্ণ সুন্দর বপুঃ বুড়োরষ্ঠ বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ' বলে চুহুংমুং বুরুঞ্জি বন্ধ করলেন।

সেইদিন থেকে হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং ভাঙাচোরা পুরোনো নাটবাড়ির চুড়োয় গিয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে ঘাড় তুলে রইলেন—হংপাল কখন আসেন দেখতে, ওদিকে কাকচিরাতে কাকেদের রাজা যোম কাকের কাছে চাঁদপুরী শেয়াল খবর দিয়ে গেল টিকটিকির মতো এক মানুষ এসে ভেড়াদের বিদ্রোহী করে তুলে হেঁড়েল বংশ ধ্বংস করলে, এবারে কাকেদের আর এঁটো-কাঁটা হাড়-গোড় কিছু পাবার উপায় থাকবে না। মাংসখোর সব মারা গেল, কেইবা আর ভেড়া মারবে, ছাগল ধরবে। কাকচিরাতে কাকের ঘোঁট বসে গেল, কী করলে মানুষটাকে সরানো যায় দেশ থেকে, আর ভেড়া গরু ছাগল এদের আরো বেশি করে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায়—যাতে কোনো দিন তারা ফেরুপাল বা সনাতন স্বধর্মের ভুঁড়ো-শেয়ালেদের বিরুদ্ধে শিং চালাতে না পারে।

নদী মাঠ আর জঙ্গল এই তেমাথার মধ্যে রয়েছে কাকচিরার না জঙ্গল, না মাঠ, না পাহাড়, না বালুচর—দূরে থেকে দেখলে

বোধ হবে জমিটাতে ঘাসও যেমন গাছও তেমন, পাহাড়ও রয়েছে, নদীও বইছে, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখ কেবল চোরকাঁটা, শেওড়া আর বড়ো-বড়ো নোড়ানুড়ি, কাঁকর, বালি। তার মধ্যে এখানে-ওখানে কাদাজল নালা নর্দমা!

কোনোকালে ফেনচুগঞ্জের এক নীলকর সাহেব এখানে এক মস্ত কুঠি বানিয়েছিল। সেই বাংলা-ঘরখানা এখনো রয়েছে, কিন্তু মানুষ কেউ নেই। কুঠিবাড়ির বাগানে চোরকাঁটার সঙ্গে গোটা-কতক দোপাটি ফুলের গাছ, ঘরের সমস্ত সার্সি দরজা বন্ধ, জিনিস-পত্র যেখানকার সেখানে গোছানো, অথচ কেউ নেই এখানে। দরজায় চাবি দিয়ে বাড়িওয়ালা যেন দুদিনের মধ্যে আসবে বলে গেল, যেখানে সার্সিটা ভাঙা ছিল সেখানে কাগজ মেরে ঘরগুলি গুছিয়ে রেখে চোরের ভয়ে তালা বন্ধ করে সব ঠিকঠাক রেখে গেল, কিন্তু কোনো দিন এসে আর চাবি খুলে কেউ ঘরে ঢুকল না। বর্ষা এসে সার্সির ফাঁকে আঁটা পুরোনো খবরের কাগজটা গলিয়ে দিলে, কাকচিরার একটা কাক কোনো সময়ে একদিন ঠোঁটে করে সেই কাগজখানা ঠেলে ফেলে ঘরের ভিতরে যাবার আসবার একটা পথ করে রেখে দিলে। তারপর একদিন বোশেখ মাসে ডিম পাড়বার সময় দলে-দলে কাক এসে কাকচিরায় চিরকাল যেমন বাসা বেঁধে আসছে তেমনি ঘরকন্না পেতে জায়গাটা দখল করে বসল। সকাল না হতে দূর-দূর গ্রামে তারা চরতে যায়, এঁটো-কাঁটার সন্ধানে। কিন্তু সন্ধ্যার আগেই দলে-দলে এই আপন রাজত্বে তারা ফিরে আসে, রাঙা আকাশ কালো করে।

আমাদের মধ্যে যেমন ডোম চাঁড়াল তেলি মালি যুগি কায়েত বামুন এমনি নানা জাত, কিন্তু দেখতে চেহারায় মানুষ, তেমনি কাকেদের মধ্যেও দেখতে কাক কিন্তু জাত হরেক রকমের রয়েছে— যেমন ডোমকাক বা যোমকাক, ধাড়িকাক বা দাঁড়কাক, ধোড়াকাক, ঝোড়োকাক, ঢোঁড়াকাক, পাণিকাক, বা পাতিকাক, শ্বেতকাক বা ছিটেকাক, ভুষোকাক বা ভুষুণ্ডেকাক। সব কাকেরই চালচলন

এক ভাবা ভুল, এদের মধ্যে কোনো দল তারা ভদ্দর সভ্য-ভব্য কাক, ছোলাকলা চিংড়িমাছটা আঁসটা আর বামুনের মতো মরা জানোয়ারের শ্রাদ্ধের ফলার খেয়ে দিন কাটায়, আর একদল কাক তারা যা তা খায় বাছবিচার নেই, পাখির ছানা খরগোস ছানা খেয়েই এরা সুখ পায়। কোনো দলের পেশাই হল লুটতরাজ চুরি চামারি খুনখারাবি। এদের জ্বালায় পাখির বাসায় ডিম থাকবার যো নেই, বাইরে কিছু চকচকে জিনিস রাখবার উপায় নেই। আমসত্ত্ব শুকোতে দিলে এরা খেয়ে যায়, কাপড় শুকোতে দিলেও টেনে ছেঁড়ে, ছেলের হাতের মোয়া কেড়ে খায়, বুড়োর পাকা মাথার ঠোকর বসায়, চালের খড় টেনে ফেলে, ভাতের থালায় ছোঁ দেয়, এমনি নানা উৎপাত করে বেড়ানোই এদের কাজ।

কাকেদের ডাকনাম শুনলেই বোঝা যায় কোন দল কেমন — যোমকাকের বংশ তারা হল ডোমকাক, এদের সবাই ভয় করে। মড়া জানোয়ার নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি মারামারি এদের কাজ। তারপর ধাড়িকাক বা দাঁড়কাক —এরা পুরোনো চালের, কাক যখন কোকিলের মতো গাইতে পারত তখন লোকে এদের পুষে দাঁড়ে বসিয়ে-বসিয়ে ছোলা খাওয়াত। সেই থেকে এরা নানা বিদ্যেতে কৌশলে কারিগরিতে মজবুত বলে সব কাকই দায়ে পড়লে এদের পরামর্শ মতো চলে। তারপর, ঝোড়োকাক —এরা এক কালে সব চেয়ে সাহসী বড়োই নামজাদা রাজবংশ ছিল, এখন বিষ হারিয়ে ঢোঁড়াকাক হয়ে পড়েছে কাজেই চুপচাপ থাকে সন্ন্যাসীর মতো। পাতিকাক হল পাণিকাকের বংশ, এরা সব দলেই আছে কিন্তু কোনো দলেই এদের পোঁছে না, পুকুরপাড়ে এরা গুগলি শামুক এঁটো-কাঁটা খেয়েই দিন চালায়। শ্বেতকাক —এরা আসলে দিশি কালো কাকেরই বংশ কিন্তু রঙ বদলে শাদা বিলিতি কাক হতে যাচ্ছে —এদের কারু গলা শাদা, কারু ডানা শাদা, কারু মাথা শাদা, এখনো দোরঙা আছে বলে এদের নাম ছিটেকাক হয়েছে।

পৃথিবীর আদি কাক হল ভুষুণ্ডিকাক, তারি বংশ ভুষুণ্ডে বা ভূষো, দেখতে কালিঝুলি, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই কাকের বংশ চলে আসছে —এদেরই পূর্বপুরুষ রামের সঙ্গে লড়ায়ে একচোখ হারিয়েছিল, সেই থেকে এদের নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়েছে, এমন কী এদের নকল করে অনেক কাক একচোখো সেজে নিজেদের বলাতে চাচ্ছে এদেরই একজন, আসলে হয়তো সে পাতিকাক, কিন্তু লেখবার বেলায় লিখছে পাতি অব্ ভুষুণ্ডি। এই সব নানা ধরনের কাকেদের মধ্যে যখন যে দলপতি হয় তখন কাক সমাজকে সে নিজের মতো ভালোমন্দ নরম-গরম ভাবে চালায়, এই হল কাক সমাজের নিয়ম।

যে কাকটা নীলকর সাহেবের ঘরের সার্সিতে মস্ত ফাঁকটা আবিষ্কার করেছিল, সে বহুকালের পুরোনো রাজবংশী ঢোঁড়াকাক। যতদিন এই ঢোঁড়াকাক দলপতি ছিল ততদিন কাক সমাজ ভদ্ররকম ছিল, কোনো পাখিই তাদের কোনো দোষ কোনো খুঁত ধরতে পারেনি। কিন্তু কাক সমাজে ক্রমে প্রজাবৃদ্ধি হয়ে নানারকম কাক তাতে এসে যখন সেঁধোল তখন চাল-চোলও ক্রমে বদলাতে আরম্ভ করলে। শেষে একদিন সবাই মিলে ঢোঁড়াকাককে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে ডোমকাককে সর্দার করে এমন লুটতরাজ মারামারি আরম্ভ করে দিলে যে, পায়রা, সিকরে, গেরোবাজ এমন কী পেঁচারা পর্যন্ত অস্থির হয়ে কাকচিরে ছেড়ে পালাতে পথ পেলে না।

পুরোনো দলপতি ধোড়াকাক সিংহাসন ছেড়ে মনের দুঃখে ঝোড়োকাকের মতো হয়ে ডানা ঝুলিয়ে চুপচাপ শেওড়াগাছের ডালে দিন কাটায় কেউ তাকে কোনো কথা শুধোয় না, সবাই মিলে বলতে লাগল ওটা বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হয়েছে, বুড়ো হয়ে বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে। নতুন দলপতি ডোমকাক তামাশা করে তার নাম রাখলে ডরা-কাক, দেশের লোক তাকে বললে ঢোঁড়াকাক। একেবারে কাজের বার ভেবে সবাই তাকে তুচ্ছ করছে দেখে ঢোঁড়াকাক মনে-মনে একটুখানি হেসে আপনার কোণটিতে চুপচাপ রইল। নতুন রাজা ডোম জাঁক দেখাবার জন্যে প্রায়ই ঢোঁড়াকে

রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ দিত। কোনো দিন বা নিজের বীরত্ব আর বাহাদুরি দেখাতে শিকারের সময় প্রায়ই সঙ্গে নিত। ঢোঁড়া সব বুঝত কিন্তু বুঝেও বোবা হয়ে থাকত।

ফেনচুগঞ্জের নীলকর সাহেব যদিও অনেককাল হল কুঠিবাড়ি ছেড়ে গেছে, কিন্তু এখনো কোনো কাকের এমন সাহস হয় না যে সে দিকে যায়, কিন্তু ডরাকাক বলে ডোমকাকের দল যাকে তুচ্ছ করছে সেই কাকটি গিয়ে একদিন কুঠি-বাড়ির মধ্যে যাবার একটি রাস্তা করে এল নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে একলা গিয়ে, কিন্তু খবরটা সে কাউকে জানায়নি। একে মানুষ তাতে গোরা, তার ঘরে সুড়ঙ্গ কাটা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসার চেয়েও অসমসাহসের কাজ, কোনো কাক এ পর্যন্ত যা পারেনি ঢোঁড়া সেই কাজটা করেছে —অথচ মুখে তার কথাটি নেই, অন্য কাক হলে চিৎকারের চোটে কাকচিরে মাত করত। নতুন দলপতি ডোমকাকটা দিনের বেলায় এই বুকে পাটকিলে ডোরা টানা ধোড়াকাককে ভয় করে খাতির করে চলত, ধোড়ার বুকের লাল ডোরা দেখে তার মনে হত যেন কতকালের মহাযুদ্ধের রক্তের দাগ রাজটিকের মতো এখনো এর বুকে দাগা রয়েছে। কিন্তু রাতে অন্ধকারে যখন লাল-কালো সব এক হয়ে গেছে তখন ডোমকাক ধোড়াকে জ্বালাতন করতে ছাড়ত না— একদিন প্রায় মেরেই ফেলেছিল। সেইদিন থেকে ধোড়া বা ঢোঁড়াকাক শেওড়া গাছে আর ঘুমোতে যেত না, সেই সার্সি দিয়ে চুপিচুপি ঘরের মধ্যে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে বেলা আড়াইটা বেজে বন্ধ হওয়া একটা ঘড়ির পিছনে বসে রাত কাটাতে আরম্ভ করলে।

রিদয় যে ঝড়ে পড়ে যোগী-গোফার আশ্রয় নিয়েছিল সেই ঝড়ে কাকচিরার বহুকালের পুরোনো শেওড়া গাছটা গোড়া সুদ্ধু উপড়ে রাজ্যের ডোমকাকের বাসা ডিম ছানা-পোনা নিয়ে উল্টে পড়ল ঠিক বেলা আড়াইটাতে। বাসা গেল, ডিম ভাঙল, তাতে কাগেদের বড়ো একটা দুঃখ হল না, কিন্তু গাছের গোড়াটা যেখানে উল্টে পড়ে বড়ো একটা গর্ত দেখা দিয়েছে, সেই গর্তটায় কী আছে না আছে খুঁজে

দেখবার জন্যে দলে-দলে কাক আকাশের দিকে পা করা গাছের মোটা-মোটা শিকড়গুলা নিয়ে টানাটানি চেঁচামেচি বাধিয়ে দিলে।

ডোমকাক, ঢোঁড়াকাক পাতিকাক দুজনকে নিয়ে একেবারে ডোবাটার মধ্যে উড়ে পড়ে এদিক-ওদিক তদারক করে ইঁট পাটকেল উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল। হঠাৎ এত বড়ো গর্তটা কেন এখানে আসে, ঠোকর দিয়ে সন্ধান করতে-করতে গর্তের একদিকে খানিক কাঁকর মাটি ঝরঝর করে খসে পড়ল, আর দেখা গেল ইঁটে-গাঁথা একটা চোর-কুঠুরি, তার মধ্যে তালা দেওয়া ছোটো একটা পেঁটরার সামনে একটা মড়ার মাথা, কতকালের কলঙ্ক-ধরা একটা পিদুম আর গোখরো সাপের একটা খোলস! মড়ার মাথা সাপের খোলস দুটোই সব কাকের দেখা ছিল, পিদুম নিয়েও অনেকবার তারা পালিয়েছে, কিন্তু পেঁটরাটার মধ্যে কী আছে কোনো কাকই তা জানে না, কাজেই এদিকে-ওদিকে ঠোকর দিয়ে তালাটা ধরে নাড়া দিয়ে দেখছে, এমন সময় গর্তের উপর থেকে খেঁকশেয়াল আস্তে-আস্তে বললে —'হচ্ছে কী? টাও নিয়ে নাড়াচাড়া কোরো না, ওতে সাত রাজার ধন আছে, যদি খুলতে চাও তো একজন যক্ ধরে আনো, যকের ধন যক্ না হলে কেউ খুলতে পারবে না।'

সাত রাজার ধন আছে শুনে কাকদের চক্ষু স্থির! চকচকে পয়সা মোহর ভালোবাসতে তাদের মতো দুটো নেই, ডোমকাক পাতিকাক ভুষোকাক ছিটেকাক দাঁড়কাক সব কাক এসে শেয়ালকে ঘিরে —ক্যা-ক্যা-ক্যা কও-কও-কও রব করে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে। ডোমকাক সবাইকে ধমকে চুপ করিয়ে শেয়ালকে শুধোলে —'যক্ এখন কেমন করে পাওয়া যায়?'

শেয়াল ডাঁওর করে মাথা চুলকে নাক রগড়ে যেন কতই ভেবে বললে —'আমি জানি এক যকের সন্ধান, সে ছুঁলেই এই বাক্স খুলে যাবে!'

কাকেরা অমনি চিৎকার করে উঠল —'কই-কই' —বলে

এগিয়ে গর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডোমকাক তাড়াতাড়ি পেঁটরার উপরে চেপে বললে —'রও-রও'।

তারপর শেয়াল এগিয়ে এসে বললে —'আমি সেই যকের সন্ধান তোমাদের দিতে পারি, যদি তোমরা এই সিন্দুক খুলিয়ে নিয়ে যকটিকে আমার পেট ভরাবার জন্যে দিতে রাজি হও।'

কাকেরা শেয়ালের কথায় রাজি হলে শেয়াল তাদের রিদয়ের খবর জানিয়ে দিলে। তিনকুড়ি কাক সঙ্গে ডোমরাজা ঢোঁড়াকাককে সঙ্গে নিয়ে যক্ ধরতে চলল পাহাড়-জঙ্গলের উপর দিয়ে।

হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং যখন চৌষট্টিখানা নাটবাড়ির নহবতখানার চূড়োয় পশ্চিমমুখো হয়ে রিদয়ের আশায় রয়েছেন, আর কাকদের রাজা ডোম রিদয়কে ধরবার জন্যে বনে-জঙ্গলে সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, সেই সময় গণেশের নেংটি ইঁদুরদের সঙ্গে পাহাড়ি চুয়োদের যুদ্ধ বেধে গেল। ব্রহ্মপুত্র আর বড়োনদীর মোহনার পুরোনো নাটবাড়িটা ইঁদুরদের দখলে কতকাল থেকে আছে তার ঠিকানা নেই। দেওয়ানগিরির উপরের কেল্লার মতো আড়িমাও রাজাদের নাটবাড়ি, প্রকাণ্ড কারখানা, এত বড়ো নাটবাড়ি যে সেখানে রাজাদের আমলে যে-সব হাতি-ঘোড়া সেপাই-শান্ত্রী থাকত সেগুলোকে দূর থেকে মনে হতো যেন ছোটো পুতুল চলে বেড়াচ্ছে। দশ-বারো-হাত চাওড়া এক-একখানা পাথরের ইঁটে-গাঁথা বাড়ির দেওয়ালগুলো, এক-একটা থাম যেন এক-একটা তালগাছ! সাততলা বাড়ি কিন্তু তার নিচের পাঁচতলা নিরেট দেওয়ালে ভরাট করা, তার মাঝে পাহাড়ের গহ্বরের মতো অন্ধকার একটি সিংগি দরজা, আশে-পাশে বাক্সর মতো চোরকুঠরি। সেগুলোতে দেওয়ালই সব, থাকবার জায়গা অল্পই, তাও আবার এখানে-ওখানে লোহার গরাদ দিয়ে বন্ধ, কত কালের অস্ত্র-শস্ত্র, রাজাদের আসবাব-পত্র, চাল-ডাল, ঘি-ময়দা, ধন-দৌলত দিয়ে ঠাসা! যেমন সোঁতা তেমনি অন্ধকার, সে-সব ঘরে একবার ঢুকলে রাস্তা হারিয়ে চিরকাল গোলকধাঁধার মতো ঘুরে বেড়াতে হয়, আর বাইরে আসবার

উপায় নেই, এমনি প্যাঁচাও রকমে সে-সব ঘর সাজানো। ছ-তলার উপরে রাজসভা, সেখানে কতকটা আলো-বাতাস আসবার জন্যে সারি-সারি জানলা-বারাণ্ডা, সাততলায় অন্দর মহল, সেখানে জানলা সব খাঁচার মতো পাথরের জাল দিয়ে বন্ধ, পোষা পাখের মতো রানীদের ধরে রাখার জন্যে ছোটো-ছোটো কুলুঙ্গি দেওয়া দরজায় শিকল-আঁটা সব শয়ন-মন্দির।

অন্ধকূপ এই নাটবাড়িতে আড়িমাও রাজাদের বংশ ভালো আলো-বাতাস না পেয়ে গুষ্ঠিসুদ্ধ লোকলস্কর সমেত অল্পদিনের মধ্যেই মরে ভূত হয়ে গেল, রইল কেবল বাড়ির চুড়োয় মস্ত একটা পাথরের আলসের উপরে খড়-কুটো দিয়ে বাসা বানিয়ে একঠেঙে—সে হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং। রানীর শয়ন-ঘরের কুলুঙ্গিগুলোতে গোটাকতক লক্ষ্মী-পেঁচা কালো-পেঁচা ভুতুম-পেঁচা, রাজসভার কার্নিশে কার্নিশে ঝুলে দলে-দলে বাদুড়, রন্ধনশালায় একটা কালো বেড়াল, আর ঘি-ময়দা চাল-ডাল শাল-দোশালা ধন-দৌলতে ঠাসা নিচেকার ভাঁড়ার ঘরগুলো তো গড়বন্দি পালে-পালে গণেশের নেংটি ইঁদুর। হাড়গিলে পেঁচা বেড়াল এরা সবাই ইঁদুরের শত্রু হলেও গণেশের ইঁদুরকে তারা খাতির করে চলত, পৃথিবীর যেখানে যত গণেশ আছে, সবার জন্যে এই নাটবাড়ি থেকে ইঁদুর যায়, এদের কেউ কিছু বলবার যো নেই, কাজেই নেংটি ইঁদুরের দল দেশ জুড়ে নানা উৎপাত আর রাজত্ব করছিল, এই সময় কোথা থেকে তাতারি-চুয়ো এসে হানা দিয়ে, যেখানে-সেখানে গণেশ উল্টে ফেলে নেংটি বংশ ধ্বংস করতে শুরু করে দিলে।

গোলাবাড়ি, ঠাকুরবাড়ি, গোয়ালঘর, রান্নাঘর, কাচারিঘর, হেঁসেলঘর, শোবারঘর, বসারঘর, তোষখানা, বৈঠকখানা, জায়গা দেশের সব থেকে তাড়া খেয়ে নেংটি সরে পড়তে লাগল, লড়ায়ে হারতে থাকল, না খেয়ে মরতে লাগল; শেষে এমন হল যে, এক পুরোনো নাটবাড়ি ছাড়া গণেশের ইঁদুর আর কোথাও রইল না। গণেশের সিংহাসন টলমল করতে থাকল, মানুষে নেংটি ইঁদুর মারত

বটে কিন্তু গণেশ তাতে টলেননি, কেন না এত ইঁদুর বাইরে-বাইরে জন্মাত যে, মানুষ জন্ম-জন্ম মেরেও তাদের বংশ লোপ করতে পারত না। কিন্তু নেংটিরই বড়ো জাত যে চুয়ো, তারা যখন এসে হানা দিয়ে পড়ল, তখন গণেশ ভেবে অস্থির হলেন।

এই চুয়োরা একেবারে চোয়াড়, যা-তা খায়, দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি মোটেই নেই, একেবারে গোঁয়ার-গোবিন্দ, ছুটি-একটি করে যেন ভালোমানুষের মতো প্রথমে নদী নালার ধারে-ধারে নৌকোর খোলে এসে বাসা বাঁধলে, দেবতার মন্দিরে কিংবা মানুষের ভাঙা ঘরের উপরে, গ্রাম-নগরের দিকেই ঘেঁষত না —নেংটি ইঁদুরগুলো যে সব পোড়ো-বাড়ি, পতিত জমি ছেড়ে গেছে সেই জায়গাগুলোয় এসে রইল, নেংটিদের ফেলেদেওয়া যা কিছু কুড়িয়ে খেয়ে বড়ো হতে লাগল। ক্রমে তারা বড়ো হতে-হতে শেষে নেংটিদের মাটির কেল্লাগুলো দখল করে জমিদারী ফাঁদলে, সেখান থেকে এ জমিদারী সে জমিদারী, এ পরগনা সে পরগনা, এদেশ-সেদেশ, করে সারা দেশ তারা দখল করলে। মাটির নিচেটা দখল করে মাটির উপরে চুয়োর দল লড়াই দিতে যখন বার হল, তখন নেংটিরা বুঝলে দাঁড়াবার স্থান গেছে, নিরুপায় হয়ে তারা যে ক'টা পারে তাদের পুরোনো নাটবাড়ির কেল্লায় এসে ঢুকে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। নাটবাড়ির দেওয়াল মোটা, কাজেই নেংটিরা কতকটা নির্ভয়ে রইল, কিন্তু চুয়োরাও ছাড়বার পাত্র নয়; তারা বছরের পর বছর যুদ্ধ চালিয়ে শেষে একদিন নাটবাড়ির উঠোনটা দখল করতে বারোজন তাতারি সওয়ার পাঠিয়ে দিলে! যুদ্ধং দেহি বলে শত্রুদল চারদিক ঘিরে লেজ আপসে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে, চারদিকে সাজ রে সাজ রব পড়ে গেছে —

পায় দল কলবল ভূতল টলমল
সাজল দলবল অটল তাতারি।
দামিনি তক-তক জামকি ধক-ধক

ঝকমক চমকত খরতর বারি।

ধূধূ-ধূধূধূ নৌবত বাজে,

ঘন ভোরঙ্গ ভম্-ভম্, দামামা দদদম্

ঝনন্ন ঝম-ঝম ঝাঁজে —

ধা-ধা গুড়-গুড় বাজে।

নিশান ফরফর নিনাদ ধর-ধর

তাতারি গর-গর গাজে।

ধূধূ ধম-ধম ঝাঁ-ঝাঁ ঝম-ঝম

দামামা দম-দম বাজে।

রণজয় ভেরী বাজে রে ঝাঁগড়-ঝাঁগড় ঝাঁ-ঝাঁ ঝাঁজে রে

মুচড়িয়া গোঁফে চলে লাফে-লাফে

খেলে উড়ো পাকে থাকে-থাকে-থাকে ঝাঁপে রে

বাজে রণভেরী বাজে রে।

ভয় পেয়ে মরে নেংটি হাজার-হাজার

তল গেল মান মত্তা ইঁদুর রাজার

ঘাসের বোঝায় বসি ইন্দুরানী কাঁদে

ইন্দুরায় এতদিনে পড়িয়াছে ফাঁদে

কান্দি কহে ইন্দুরানী গণেশ গোঁসাই

এমন বিপাকে কভু আর ঠেকি নাই।

এই ভাবে ইঁদুর রানী কাঁদছেন, এদিকে একশো বছরের ইঁদুরের রাজা তাতারিদের ভয়ে থরথরি কম্পমান, রানীর আঁচল ধরে মন্ত্র পড়ছেন, খট্ ভৈরবী—দ্রুত ত্রিতালি—আর কেঁদে বলছেন সুর করে:

চল-চল যাই নীলাচলে। (রে অরে যাই).

ঘটালে বিধি ভাগ্যফলে॥

মহাপ্রভু জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ।

দেখিব অক্ষয় বটতলে,

খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত
নাচি বেড়াই কুতূহলে
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হইনু হেন মানি
সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে ॥

নেংটির রাজা যখন কেল্লা ছেড়ে রানীকে নিয়ে পাছ-দুয়োর দিয়ে গঙ্গাসাগরের দিকে পলায়নের মতলব করছেন—লড়াই না দিয়ে, সেই সময় হাঁসের দল রিদয়কে নিয়ে দেওয়ানগিরির তলায় এসে উড়ে বসল। একদিকে নাটবাড়ির পাথরের পাঁচিল, আর একদিকে হাড়গিলের চর, এরি মাঝে জলের ধারে শুশনি কলমি শাক খেয়ে হাঁসের দল চরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় আণ্ডামানি হাঁসের সঙ্গে দেখা, ছোটো দল বড়ো দল দুই দলে অমনি কথাবার্তা চলল, সাঁতার খেলা আরম্ভ হল।

যোগীগোফাতে ভেড়াদের নিয়ে যে কাণ্ড হয়েছে শুনে আণ্ডামানি বললে—'তা হলে শেয়াল লোভ সহজে ছাড়বে না, নিশ্চয়ই আমাদের পিছু নেবে, আর এখন দুদিন উড়ে কাজ নেই, এইখানেই থাকা যাক, আর ব্রহ্মপুত্রের বাঁক ধরে মানস সাগরেও গিয়ে কাজ নেই। এইখান থেকে বাঁহাতি মোড় নিয়ে একেবারে পাহাড়ের পাশ দিয়ে সোজা উত্তরে চলাই ভালো।'

চকা বললে—'অজানা রাস্তা কেমন করে যাব।'

আণ্ডামানি অমনি জবাব দিলে—'অজানা নয়, উত্তর সমুদ্রের ধারে রুশ দেশে যে সব পাখিরা থাকে তারা পাহাড়ের এই গলি পথটা দিয়ে সোজা হিমালয়ের ওপারে চলে যায়। আজ ক'দিন ধরে দলে-দলে সারস বক কাদাখোঁচা জলপীপী এরা দেখি এই পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করছে।'

বুড়ো চকা ঘাড় নেড়ে বললে—'ওহে রাস্তা তো আছে জেনেছ, রাস্তার কোথায়, কেমন দানাপানির ব্যবস্থা তার খবর নিয়েছ কি?'

আণ্ডামানি লালসেরা মাথানেড়ে বললে—'সে খবরও নিতে বাকি

রাখিনি। এই দেওয়ানগিরি থেকে বড়োনদীর রাস্তা বেয়ে সোজা উত্তরে গেলে তাস্‌গং, তাউয়াং, ছুটো বড়ো-বড়ো বস্তি, তার পরই চুখাংএর জলা। সেখানে এক রাত্তির কাটিয়ে তার পরদিন সন্ধ্যায় চোনা হ্রদ পাওয়া যাবে, তারপর একদিনে নারায়ুম হ্রদ, সেখান থেকে একবেলার পথ, 'তিগুৎসো'। সেখান থেকে পশ্চিমে গেলে পেমো চাং, বাসাং সো, চোলু, খাম্বাজং গোঁসাইথান হয়ে ধবলাগিরি, আর উত্তর-পুবে গেলে যামদক্ষা নগরের ধারে প্রকাণ্ড পালতি হ্রদ, তার পরে 'তামলং কঙ্কজং' হয়ে আবার ব্রহ্মপুত্রের রাস্তায় পড়া যেতে পারে, অনেক পাখিই এই রাস্তা দিয়ে চলেছে, সেথোর অভাব হবে না। তাছাড়া কঙ্কজং-এর রাজা কঙ্ক-পাখির সঙ্গে যখন তোমাদের পরিচয় আগেই হয়ে গেছে, তখন সেখানেও কিছুদিন জিরিয়ে যাওয়া যেতে পারে।'

চকা ঘাড় নেড়ে বললে —'সে সব ভালো, কিন্তু ওদিকের আকাশটা যেন কেমন ঘোলাটে ঠেকছে, দেওয়ানগিরির উত্তর গা-টাতে মেঘের ছাওয়াটাও দেখতে পাচ্ছি; হঠাৎ ওদিকে যাওয়া নয়, দু-একদিন দেখা যাক।'

হাঁসদের মধ্যে এই সব পরামর্শ চলেছে এদিকে রিদয় একটা ডোবায় পা ডুবিয়ে আড়িমাও রাজার পুরোনো নাটবাড়িটার পাঁচিলের দিকে চেয়ে রয়েছে, এমন সময় দেখলে সন্ধ্যের অন্ধকারে পাঁচিলের ধারে রাশ-রাশ নুড়িগুলো যেন নড়তে-চড়তে আরম্ভ করলে, তারপর সার বেঁধে সব নুড়িগুলো কেল্লার দিকে এগোতে লাগল! রিদয় চেঁচিয়ে উঠল —'দেখো-দেখো!' অমনি সব হাঁস সেদিকে চেয়ে দেখলে দলে-দলে চুয়া রাস্তা ঢেকে চলেছে।

রিদয় যখন বড়ো ছিল তখন একবার ইঁদুরের কামড় কেমন টের পেয়েছে, এখন এই বুড়ো-আংলা অবস্থায় ইঁদুরের পাল্লায় পড়লে যে কী হবে তাই ভেবে সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল! হাঁসেরাও রিদয়ের মতো ইঁদুরের গন্ধ মোটেই সইতে পারত না, যতক্ষণ সেদিক দিয়ে ইঁদুরগুলো গেল ততক্ষণ সবাই চুপচাপ মুখ বন্ধ করে রইল।

তারপর 'ছি-ছি' বলে যেন কেবলি ডানা ঝাড়া দিতে শুরু করে দিলে।

চুয়োর দল ছোটো-বড়ো নুড়ির ঝরনার মতো গড়াতে-গড়াতে পাথরের পাঁচিলের গোড়া বেয়ে নাটবাড়ির সিংগি দরজার দিকে চলে গেল, ঠিক সেই সময় আকাশে দুই পা লটপট করতে করতে হাড়গিলে-রাজ খাম্বাজং ঝুপ করে হাঁসদের মধ্যে এসে পড়লেন। রিদয় এমনতরো পাখি কোনোদিন দেখেনি, এঁর মাথা, গলা আর পিঠ শাদা রাজহাঁসের মতো, ডানা দুখানা কালো দাঁড়কাকের মতো, তেলে পাকানো গেঁটে-বাঁশের ছড়ির মতো লাল দুখানা সরু ঠ্যাং, আর বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির মতো এতটুকু মাথায় এত বড়ো এক লম্বা ঠোঁট —এক আঙুল কলমের যেন দশ আঙুল নিব, তার ভারে মাথাটা ঝুঁকেই আছে, মুখের দুপাশে বোয়াল মাছের মতো দুটো চোখ বসানো। রিদয়ের বোধ হল, পাখি মাছ কাঁকুড় কলম বাঁশ সব মিলিয়ে যেন এই পক্ষীরাজ সৃষ্টি হয়েছে!

হাড়গিলেকে দেখে চকা তাড়াতাড়ি ডানার পালক ঝেড়েঝুড়ে সামনে এগিয়ে এসে দণ্ডবৎ হয়ে দু-তিন বার প্রণাম করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল হঠাৎ খাম্বাজং কী কাজে এলেন। নাটবাড়ির চুড়োয় হাড়গিলের বাসা চকা জানে আর ফাল্গুন মাসের গোড়াতেই হাড়গিলেদের আনবার পূর্বে খাম্বাজং বাসাটা একবার তদারক করতে প্রতি বছরে এখানে এসে থাকেন সেটাও জানা কথা। কিন্তু হাড়গিলেরা তো হাঁসদের সঙ্গে প্রায়ই আলাপ-সালাপ রাখে না, হঠাৎ আজ হাঁসের দলে রাজার আগমন হল কেন, এটা চকা ভেবে না পেয়ে একবার ঘাড় চুলকে বললে—'জং বাহাদুরের বাসার খবর ভালো তো, গেল ঝড় বৃষ্টিতে কোনো লোকসান হয়নি তো?'

হাড়গিলেরা সবাই তোতলা, সহজে কথা কওয়া তাদের মুশকিল, খাম্বাজং অনেকক্ষণ ঠোঁট কাঁপিয়ে এ-চোখ বুজে ও-চোখ খুলে ভাঙা গলায় কাঁদুনি শুরু করলেন 'বুড়োবয়সে বাসাটা ঝড়ে পড়ে গেছে, একে উঁচু নাটবাড়ি, তায় আবার চুড়ো, গিন্নী দেখে-দেখে সেখানেই

বাসা বাঁধলেন, টিকবে কেন! এই বুড়োবয়সে জল-ঝড়ের মধ্যে ঐ গোটা কতক ভাঙা কাঠির বাসায় তো আমার টেকা দায় হয়েছে। এদিকে আবার মানুষগুলো সমস্ত জলা আর খাল-বিল ভরাট করে তার উপর দিয়ে রেলগাড়ি চালাবার বন্দোবস্ত করচে, দু-একটা সাপ ব্যাঙ যে ধরে খাব তারও রাস্তা বন্ধ। শুনেছি না কী আবার এই নাটবাড়িটাতে ইষ্টিশান বসাবে, তাহলে তো আমাকে এদেশ ছাড়তে হয় দেখি!'

চকা খুব দুঃখ জানিয়ে বললে —'আপনি তো তবু এতকাল এই নাটবাড়িতেই কাটালেন, ইচ্ছে করলে পরেও আপনি ইষ্টিশানের চুড়োটায় বাসা বাঁধতে পারেন। মানুষে কোনোদিন আপনার উপরে গুলিও চালাবে না। আর বাসা থেকে আপনার আণ্ডাবাচ্ছা চুরি করে ভেজেও খাবে না, আপনার তো কোনো পরোয়া নেই। বড়ো জোর এখন চুড়োয় আছেন, না হয় চরে নেমে বসবেন; কিন্তু আমাদের দশা দেখুন দেখি —

ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে
মরণং গোমতী তীরে অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি।

এই ভাবেই সারা জীবন কাটাতে হবে। আপনার তো যাহোক একটা দাঁড়াবার স্থান আছে, আমাদের দশাটা ভাবুন তো। ভবঘুরের মতো —

যেখানে-সেখানে শোও আর খাও
পৃথিবীটা ঘিরে চক্কর দাও
শেষ একদিন অকস্মাৎ!
বিনি মেঘে বজ্রাঘাত!

'তাগে পেলেই মানুষ গুলি চালাচ্ছে আমাদের দিকে!'

হাড়গিলে গলার পালকের দাড়ি দুলিয়ে বললেন —'কথাটি তো বলেছ ঠিক, কিন্তু নাটবাড়ি হয়ে পর্যন্ত ঐ চুড়োটায় বাস করে আসছি সাতপুরুষ ধরে, আজ হঠাৎ চুড়ো থেকে চরে নেমে বসা কি কম কষ্টের কথা, আর ঐ হাড়গিলের চরটাও শুনেছি মানুষেরা চেঁচে ফেলে ওখান দিয়ে বড়ো-বড়ো মালের জাহাজ চালাবে!'

চকা এবারে আমতা-আমতা করে বললে —'তা হলে তো মুশকিল দেখছি, মানুষের সঙ্গে তো আমরা পেরে উঠব না, এ বিষয়ে আপনি —'

এবারে হাড়গিলে ঠোঁট বাজিয়ে বলে উঠলেন —'আঃ, সে মানুষের কথা, যখন তারা আসবে তখন ভাবা যাবে। এখন একটা কথা শুধোই, এদিক দিয়ে চুয়োদের পল্টন যেতে দেখেছ কি?' হাজার-হাজার চুয়ো এই মাত্র এইদিক দিয়ে গেছে শুনে হাড়গিলে আকাশে চোখ তুলে বললে —'এতদিনে বুঝি গণেশের ইঁদুরের দফা রফা, আজ রাতের মধ্যেই চুয়োরা নাটবাড়ি দখল করবে।'

চকা ভয় পেয়ে বললে —'কী বলেন লড়াই বাধবে নাকি?'

হাড়গিলে বলে উঠলেন —'বাধাবে আর কী, বিনা যুদ্ধে চুয়োরা আজ কেল্লা মেরে নেবে, রাজা গঙ্গাসাগরের দিকে রানীকে নিয়ে দৌড় দিয়েছেন। বামুন গেল ঘর তো লাঙুল তুলে ধর, কেল্লায় যারা ছিল তারা মানস সরোবরের ধারে আসছে পূর্ণিমায় পক্ষিরদলের বারোয়ারীর নাচ দেখতে ছুটেছে, ঠিক ঝোপ বুঝেই চুয়োর দল কোপ দিতে চলেছে। কেল্লায় গোটাকতক অকর্মণ্য বুড়ো নেংটি ছাড়া আর তো কেউ নেই, এতকাল নেংটিদের সঙ্গে এই নাটবাড়িতে কাটালেম, এখন বুড়ো বয়সে আর শিং ভেঙে বাছুরের দলে যাওয়ার মতো চুয়োর দলে ভিড়তে আমার ইচ্ছে যায় না, তাই ভাবচি থাকি কি যাই।'

হাড়গিলে যে ইঁদুরদের বিপদের খবরটা না দিয়ে হাঁসের দলে এসে কাঁদুনি শুরু করেছে এটা চকার মোটে ভালো লাগল না। সে একটু এগিয়ে গিয়ে হাড়গিলেকে বললে —'গণেশের ইঁদুরদের আপনি ও-খবরটা পাঠাননি এখনো?'

হাড়গিলে গলার থলি ঢুলিয়ে বললে—'খবর দিয়ে লাভ? তারা আসবার আগেই সে কেল্লা দখল হয়ে যাবে।'

চকা এবারে চটে বললে—'হয়ে যাবে বললেই হয়ে গেল, এমন অঘটন হতে দেব না আমি বলছি!'

যে চকার ঠোঁট একেবারে ভোঁতা, নেই বললেই হয় আর যার পায়ের নখও ততোধিক ধারাল, সন্ধ্যে না হলেই যার ঘুম আসে, তিনি লড়তে চান চিরুনিদাঁত চুয়োদের সঙ্গে! হাড়গিলে হেসেই অস্থির। ঘাড় নেড়ে চকাকে বললেন—'বুরুঞ্জিতে লেখা আছে এই ঘটবে, কারো সাধ্য নেই তা রদ করা, আমি পণ্ডিতদের দিয়ে গণিয়ে দেখেছি কোনো উপায় নেই, না হলে আমি চুপ করে বসে আছি!'

চকা হাড়গিলের কথায় কান না দিয়ে ডাক দিলে—'পাঁপড়া নান্‌কৌড়ি, নেড়োল কাটচাল, লালসেরা আণ্ডামানি, চোখ-ধলা ডানকানি, পাটাবুকো হামস্ত্রি, মারাগুই চাপড়া, তীরগুলী আকায়ব, তোমরা যাও মানস সরোবরের পথে যত নেংটি দেখবে সবাইকে খবর দাও লড়াই বাধবে।' অমনি সাতটা বুনো হাঁস অন্ধকারে ডানা ছড়িয়ে উড়ে পড়ল। চকা আবার বাঙলাদেশের হাঁসদের ডাক দিলে—'সনদ্বীপের বাঙ্গাল, ধনমাণিকের কাওয়াজী, রায়-মঙ্গলার ঘেংরাবল, চব্বিশ পরগনার সরাল!' অমনি তেল চুকচুকে মোটাপেট পাঁচজন উপস্থিত হল হেলতে-দুলতে, চকা তাদের বললে—'চট করে যাও গঙ্গাসাগরের দিকে, নেংটিদের রাজা পলাতক ইন্দুরায় আর ইন্দুরানীকে ফিরিয়ে আনো!' কিন্তু এবারের দল অত চটপট উড়ে পড়ল না, বাঙাল মাথা চুলকে বললে—'এ কাজটা কি সমীচীন হবে, ইঁদুরের যুদ্ধে হাঁসেদের যোগ দেওয়া কি সংগত, তা ছাড়া এই অন্ধকার রাত্রে আপনাকে একলা এই শত্রুদের মাঝে—'

চকা ধমকে উঠল: 'বড়ো দেরি করছ তোমরা!' বাঙলার হাঁসরা পটাস-পটাস করে ডানা ঝাপটে দক্ষিণ মুখে আস্তে-আস্তে উড়ে চলল।

চকা তাদের দিকে খানিক কটমট করে চেয়ে থেকে সুবচনীর হাঁসকে বললে —'তুমি গিয়ে হাড়গিলে চরে চুপচাপ বসে থাকো, আমি কেবল হংপাল বুড়ো-আংলাকে নিয়ে নাটবাড়িতে যাব, যদি কেউ চুয়োদের তাড়াতে পারে তো এই ছোকরা।' বলে চকা হাড়গিলের সঙ্গে রিদয়ের আলাপ করে দিলে।

টিকটিকির মতো বুড়ো-আংলাকে দেখে হাড়গিলে একবার গলার থলি ফুলিয়ে খানিক হেলে-দুলে হেসে নিলেন। তারপরে ঝপ করে ঠোঁটে করে রিদয়কে আকাশে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে লোফালুফি শুরু করে দিলেন, রিদয় ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। চকা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললে 'জং বাহাদুর করেন কী! ওটা মানুষ —ব্যাঙ নয়, ওকে ছাড়ুন, গেল যে!'

'মানুষ!' বলেই হাড়গিলে মাটিতে রিদয়কে নামিয়ে দিয়ে দু-চারবার ডানা আপসে নৃত্য করে বললেন —'বুরুঞ্জিতে ঠিক তো লিখেছে, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এই মহাপুরুষ এসেছেন ঠিক ভূতচতুর্দশীতেই, আর ভয় নেই, আমি এখনি গিয়ে নাটবাড়ির সকলকে এ-খবর দিচ্ছি। জয় গণেশের জয়' —বলে হাড়গিলে নাটবাড়ির দিকে উড়ে গেল।

হাড়গিলের ব্যবহারে রিদয় ভারি চটে ছিল, সে গোঁ হয়ে চকার পিঠে উঠে বসল। নাটবাড়ির চুড়োয় একখানা যাঁতার মতো পাথর, তার মাঝ-খানটায় রাজাদের ধ্বজি গাড়বার একটা গর্ত, সেই গর্তে খান দুই পুরোনো হোগলা পাতার মাদুর বিছানো, তার উপরে কাঠকুটো আর পালকের তোশক, একপাশে কোন কালের রানীদের ছেঁড়া কাপড়ের এক টুকরো জরির আঁচল মাদুর-ছেঁড়ার মধ্যে ঝিকমিক করছে, কতকালের মরচে-ধরা একটা খিল-ভাঙা তালা, একটা কলঙ্ক-পড়া রুপোর চুষিকাঠি, ভোঁতা একটা শরের কলম, ছেঁড়া একপাটি জরির লপেটা জুতো, আধখানা পরকলা লাগানো শিংএর চশমা একটা, গেল বছরের ফাটা চিনের পেয়ালার মতো গোটাকতক ডিমের খোলা, পেটটা ফুটো-করা একটা আধমরা

ব্যাঙ, অমনি সব নানা সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে বাসাটা ভর্তি। কতকালের সে বাসা তার ঠিক নেই, তার গায়ে ছোটো-বড়ো ঘাস-গজিয়ে গেছে, এমন কী গোটাবারো লতাওয়ালা একটা বটগাছ পর্যন্ত, তাতে আবার ফল ধরেছে।

চকার সঙ্গে রিদয় এসে দেখলে নাটবাড়ির সবাই এসে আজ বাসায় হাড়গিলেকে ঘিরে কী সব পরামর্শ করছে, এই বুড়ো ভুতুম-পেঁচা একদিকে বসে গোল দুই চোখ বার করে কেবলি হুঁ-হুঁ সায় দিচ্ছে, কালো বেরালটা লেজ নাড়ছে আর মিউমিউ করে কী যে বকছে তার ঠিক নেই, হাড়গিলে মাঝে বসে কেবলি গলার থলি ঝাড়ছেন আর পাঁচ গণ্ডা বুড়ো নেংটি ইঁদুর শুকনো মুখে একধারে চুপটি করে বসে এদিক-ওদিক কান ঘোরাচ্ছে।

ইঁদুর বেরাল পেঁচা হাড়গিলে একখানে জমা হয়েছে দেখেই রিদয় বুঝলে নাটবাড়িতে আজ বিষম গণ্ডগোল। চকা আর রিদয়ের দিকে কেউ আজ চেয়েও দেখলে না, সবাই চেয়ে রয়েছে হাঁ করে যেদিক দিয়ে দলে-দলে চুয়ো সার বেঁধে মাঠের উপর দিয়ে আসছে।

ভুতুম পেঁচা খানিক ভূতের মতো নাকিস্মুরে চুয়োদের বিষম উৎপাতের কথা বর্ণনা করে চলল। বেরাল মিউমিউ করে খানিক কাঁদুনি গাইলে —'এই বুড়ো বয়সে শেষে কি চুয়োর পেটে যেতে হবে নাকি, আণ্ডাবাচ্চা কাউকেই তারা রেহাই দেবে না!'

হাড়গিলে ইঁদুরদের ধমকে বললেন —'এই দুঃসময়ে তোমাদের চাঁইদের বারোয়ারিতে যেতে দিয়ে যত মুখ্যুমি করেছ, লড়াই দেবার জন্যে একটা লোক পর্যন্ত রইল না কেল্লায়! আমি কি এই বুড়ো বয়সে চুয়া মেরে ঠোঁটে গন্ধ করতে পারি, ছি-ছি! এমন করে কেল্লা ফাঁক রেখে সব নেংটির চলে যাওয়াটা ভারি অন্যায় হয়েছে!"

ইঁদুরগুলো কেবল হতভম্ব হয়ে বেরালের দিকে চাইতে লাগল। বেরাল ফোগলা দাঁত খিঁচিয়ে বললে —'আমার দিকে দেখছ কী? তোমরা নিজেদের ঘর সামলাতে না পার নিজেরাই মরবে। আবার

কী' আমি ষষ্ঠীর দুয়োরে গিয়ে ধন্না দেব। সেখানে পেসাদের কিছু না পাই দুধ তো আছে।'

ইঁদুরেরা হাড়গিলের দিকে চাইতে তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন —'আমি আর কী করতে পারি বল? এই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ টিকটিকির মতো মানুষটিকে তোমাদের এনে দিলেম, এঁর সঙ্গে পরামর্শ করে যা ভালো হয় করো। আমার যথাসাধ্য তো তোমাদের জন্যে করলেম, এখন যা করেন গণেশ ঠাকুর। আঃ, আর পারিনে!' বলে হাড়গিলে পা মোড়া দিয়ে আকাশের দিকে ঠোঁট তুলে চোখ বুজলেন।

ইঁদুর বেরাল পেঁচা একবার রিদয়ের মুখের দিকে চাইলে তারপর আস্তে-আস্তে সভা ছেড়ে যে যার বাসায় যাবার উদ্যোগ করলে। এদের রকম দেখে চকার এমনি রাগ হচ্ছিল যে সব কটাকে ঠেলে সে চুয়োদের মুখে ফেলে দেয়, বিশেষ করে ওই একঠেঙে হাড়গিলেটাকে এক ধাক্কায় নাটবাড়ির চুড়ো থেকে একেবারে নিচে ফেলে দেবার জন্যে চকা নিসপিস করতে লাগল।

রিদয় তাকে চোখ টিপে বললে —'চুয়োদের জব্দ করা শক্ত নয়, যদি নাটবাড়ির ঠাকুরঘরের লক্ষ্মীপেঁচা আমাকে এখনি একবার ঠাকুরঘরে যে দুয়োরের উপরে কুলুঙ্গীতে গণেশ বসে আছেন তাঁর কাছে নিয়ে যান!'

ভূতুম অমনি তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীপেঁচাকে ডেকে আনলে। রিদয় লক্ষ্মীপেঁচাকে গণেশের কথা শুধোতে সে বললে —'ঠাকুর তো এখন শয়ন করেছেন, ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ!'

রিদয় চকার সঙ্গে চুপিচুপি দু-একটা কথা বলাবলি করে পেঁচাকে বললে —'পুরোনো দরজা খুলে নিতে কতক্ষণ? চলো, পথ দেখাও!'

লক্ষ্মীপেঁচা আগে পথ দেখিয়ে চলল, সঙ্গে রিদয়।

চকা বললে —'এই ভূতচর্তুর্দশীতে রাত্রে পোড়ো বাড়িতে একা এই অঙ্গুলিপ্রমাণ মানুষটি এসে নাটবাড়িতে মূষিকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে হাড়গিলে বংশের সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি করবেন। তুমি

গেলে শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হয়ে যায়। এই নাও শনিবার অমাবস্যাতে তোলা এই মানকচুর শিকড় সঙ্গে রাখ, ভূত পালাবে।' বলে রিদয়ের হাতে হাড়গিলে তাঁর বাসার ছেঁড়া মাদুর একটু ভেঙে দিয়ে তার কানে মন্তর দিলেন।

রিদয় ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে কচুর শিকড় গুঁজে চিলে ছাতের গোল সিঁড়ি বেয়ে পেঁচার সঙ্গে নেমে চলল, মনে-মনে ভূতের মন্তর আওড়াতে-আওড়াতে —হং সং বং লং হাঃ ফুঃ! ভূতচতুর্দশীর রাত্রি এমন অন্ধকার যে, ভূতকে পর্যন্ত দেখা যায় না। রিদয় সেই অন্ধকারে পেঁচার সঙ্গে চিলের ছাতের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ক্রমাগত নেমে চলেছে। দুদিকে পিছল পাথরের দেওয়াল, তার মাঝে-মাঝে এক-একটা ঘুলঘুলি, সেইখান দিয়ে একটু যা আলো আর বাতাস আসতে পায়! রিদয় দেওয়ালের গা ঘেঁসে টিকটিকির মতো পায়ে-পায়ে নামছে, অন্ধকারে পেঁচা যে কোনদিকে চলেছে সেই জানে, কেবল সে এক-একবার হাঁকছে —'উঁচা-নিচা!' আর সেই ডাক শুনে রিদয় চলেছে, ইস্ক্রুপের প্যাঁচের মতো পাক-দেওয়া সিঁড়ি পার হয়ে অন্ধকারে!

একটা কিসের গায়ে হাত পড়তেই সেটা কেঁ্য বলে ঝটপট করে উঠল, এক জায়গায় জল পড়ে ডোবা মতো হয়েছে হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে পা রেখেই রিদয় থমকে দাঁড়াল, পেঁচা অমনি বলে উঠল —'বাঁয়ে ঘেষে।' কখনো বাঁয়ে কখনো ডাইনে কখনো উঁচায় কখনো নিচায় এইভাবে রিদয় চলেছে! চোখে কিছু দেখছে না, কানে শুনছে খালি যেন এখানে কী একটা ঝটপট করে উঠল, ওখানে মাথার উপর থেকে কী ঠিক-ঠিক করে ডাক দিলে, কখনো শুনলে পাথরের গায়ে কে নখ আঁচড়াচ্ছে, ওদিকে কারা যেন দুদ্দাড় করে পালিয়ে গেল, পায়ের কাছে কী একটা পাশমোড়া দিলে, হঠাৎ গালে যেন কে একটা চিমটি কেটে গেল, কানের কাছে চট করে একটা কে 'টু' দিয়ে পালাল! এর উপরে রিদয় নানা বিভীষিকা দেখছে — হঠাৎ এক জায়গায় গোটাকতক চোখ আলেয়ার মতো জ্বলেই

আবার নিভে গেল। যেন ইলিশ মাছের জাল নাকের সামনে কে একবার ঝেড়ে দিয়েই সরে পড়ল, হঠাৎ একটা গরম হাওয়া মুখে লাগল, তার পরেই বরফের মতো বাতাস এসে কাঁপিয়ে দিলে!

রিদয়ের মনে হচ্ছে এইবার সিঁড়ি শেষ হল কিন্তু খানিক গিয়ে আবার সিঁড়ি, আবার চাতাল, আবার ধাপ, আবার দেওয়াল, এমনি ক্রমাগত ওঠা-নামা করতে-করতে চলা — এর যেন আর শেষ নেই। আঁধি ধাদি ভূত পেত্নি ব্রহ্মদৈত্যি ঝাম ঝামড়ি কন্ধকাটা শাঁকচুন্নি ডাকিনী যোগিনী ভ্যাল ভেল্লকি, পেটকামড়ি সবই আজ ভূতচতুর্দশীতে জটলা করতে বেরিয়েছে, আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে রিদয়কে দেখে কেউ ঝমঝম করে নাচতে লাগল, কেউ ফিকফিক করে হাসতে লাগল। খুস-খাস খিট-খাট আওয়াজ করে ভূতেরা কেউ খড়ম পায়ে, কেউ হাড় মড়-মড় করে, কেউ বা ঘণ্টা বাজিয়ে, কেউবা চটি চটপট করে তার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। ভয়ে রিদয়ের হাত-পা অবশ হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় সরু গলির শেষে মস্ত একটা চাতালের উপরে এসে পেঁচা 'ঠাকুরবাড়ি' বলেই অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল!

অনেকক্ষণ ধরে কারুর সাড়াশব্দ নেই, রিদয় অন্ধকারে হাতড়ে দেখলে চারদিকে দেওয়াল, দরজাও নেই, কিছুই নেই! রিদয় ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটা কে তার পায়ে এসে সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে আস্তে-আস্তে দেওয়ালের কাছে টেনে নিয়ে গেল, তারপর কিচ করে যেন চাবি খোলার শব্দ হল! একটা মস্ত দরজা হড়মড় করে গড়িয়ে আপনি যেন খুলে যাচ্ছে, পায়ের নিচে পাথরের মেঝেটা তারি ভারে কাঁপছে!

ঠিক সেই সময় বিকট শব্দে মাথার উপরে ঘটং-ঘং ঘটং-ঘং করে রাত বারোটার ঘড়ি পড়ল। অমনি দপ-দপ করে চারদিকে আলোয়-আলো এসে দেওয়ালীর পিদুম জ্বলিয়ে দিলে, আর ঘণ্টা নাড়তে-নাড়তে ভয়ংকর এক কাপালিক ব্রহ্মদৈত্য মড়ার মাথার খুলিতে ঘিয়ের সলতে জ্বালিয়ে উপস্থিত —

গলে দোলে ভীষণ রুদ্রাক্ষ মালা

পিঙ্গল নয়নে যেন মহেশের কোপানল জ্বালা।

রিদয় দেখলে ঘরের মধ্যে কালো পাহাড়ের প্রকাণ্ড এক মূর্তি, তাতে কতকালের রক্তচন্দনের ছিটে, ভৈরবটির জিব লকলক করছে আর গায়ে সোনা-রুপো হীরে-জহরৎ আর মুণ্ডুমালা ঝুলছে। ব্রহ্মদৈত্য আরতি আরম্ভ করলেন :

রম্-ঝম্ রম্-ঝম্ শব্দ উঠে

ভূত প্রেত পিশাচ দাঁড়ায় সবে জোড় করপুটে।

তাধিয়া-তাধিয়া বাজায় তাল

তাতা থেই-থেই বলে বেতাল

ববম-ববম বাজায়ে গাল

ডিমি-ডিমি বাজে ডমরু ভাল

ভবম-ভবম বাজায়ে শিঙা

মৃদঙ্গ বাজায় তাধিঙা-ধিঙা

ধেই-ধেই নাচে পিশাচ দানা।

রিদয় হাঁ করে ভূতের কাণ্ড দেখছে এমন সময় পেঁচা কানের কাছে ফিসফিস করে বললে, 'এখানে নয়, পাশের কুঠরিতে গণেশ ঠাকুরের সভা।' হোমের ধোঁয়ায় আলোগুলো ক্রমে ঘোলাটে হয়ে এল ; সেই সময় রিদয় পেঁচার সঙ্গে আস্তে-আস্তে পাশ কাটিয়ে গণেশ মহালের গলিতে সেঁধোল। দেউড়িতে একটা মোটাপেট হিন্দুস্থানী দরোয়ান সিদ্ধি খেয়ে খালি গায়ে ভোঁ হয়ে ঢোলক পিটছে, অন্ধকারে রিদয় তাকেই গণেশ ভেবে টিপ করে একটা পেন্নাম দিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

দরোয়ানজী ভারি গলায় বললে, 'কৌন হোঃ ?'

রিদয় কিছুই বুঝলে না, তবু ঘাড় নেড়ে বললে —'আজ্ঞে আমি রিদয়, নেংটি ইঁদুরেরা বড় বিপদে পড়েছে তাই —'

'ক্যা বক্‌-বক্‌ লাগায়া' —বলে দরোয়ান আবার ঢোল পিটতে লাগল।

রিদয় ভাবলে গণেশ বকের কথা শুধোচ্ছেন; সে তাড়াতাড়ি বললে —'আজ্ঞে বকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, কিন্তু আজ আমি ইঁদুরদের হয়ে লড়াই করতে চাই, সেইজন্যে আপনার ঐ জয়ঢাকটি আমি চাই।' বলে রিদয় যেমন ঢোলকে হাত দিয়েছে, অমনি গণেশের দরোয়ান ধমকে উঠল —'ধেৎ তেরি!'

রিদয় ভয়ে দশহাত পিছিয়ে পড়ল —সেই সময় পেঁচা এসে তার কানে-কানে বললেন —'করছ কী? উনি গণেশ নন, ভিতরে চলো!' তারপর দরোয়ানের সঙ্গে পেঁচা গিয়ে কী খানিক বকাবকি করলে, তখন দরোয়ান দুয়োর ছেড়ে দিয়ে বললে —'আইয়ে বাবু!'

মহলের মধ্যে গণেশের পরিচয় চৌষট্টি ভাগ কলাবৌ, কেউ রঙ-তুলি নিয়ে আলপনা দিচ্ছিল, কেউ সেতার বাজিয়ে গান বাজনা করছিল, কেউ মালা গাঁথছিল, কাঁথা বুনছিল, এমনি চৌষট্টি খাম্বা ঘরের মধ্যে সবাই এক-এক কাজে, হঠাৎ রিদয়কে দেখে সবাই মাথায় ঘোমটা টেনে জুজুবুড়িটি হয়ে বসল।

পেঁচা সেখান থেকে রিদয়কে নিয়ে আর একটা হাতিশুঁড়ো গজদন্তের খিলানের মধ্যে দিয়ে গণপতি গণেশের বৈঠকখানায় এনে হাজির করে দিলে। রিদয় দেখলে ঘরের উত্তর গায়ে মস্ত একটা তক্তাপোশে গের্দা হেলান দিয়ে থান ধুতি পরে মেরজাই পরে এক ভদ্রলোক বসে আছেন, তাঁর গজদাঁতও নেই শুঁড়ও নেই, মোটা পেটও নয়, দিব্যি দেবতার মতো চেহারা!

পেঁচা রিদয়ের কানে-কানে বললে —'ইনিই রাজা গণেশ, এঁকে যা দরবার করতে হয় করো।'

রিদয়ের মুখে কথা নেই, ইনিই গণেশ! ভয়ে-ভয়ে সে এগিয়ে বললে —'মশায়ের নাম?'

উত্তর হল —'আমি গণপতি, কী চাই?'

রিদয় খুব নরম হয়ে বললে —'যে ইঁতুরগুলিতে চড়ে মশায় বেড়িয়ে বেড়ান সেগুলির বড়ো বিপদ উপস্থিত!'

গণেশ ভুরু কুঁচকে বললেন —'ইঁতুর! আমি তো কোনো দিন ইঁতুরে চড়িনে!'

রিদয় বললে —'আজ্ঞে, ভুলে যাচ্ছেন আপনি, হস্তী-বেশ ধরে যখন হাওয়া খেতে বেরোন, সেই সময় যে ইঁতুর আপনার গাড়ি —'

গণেশ হোঃ-হোঃ করে হেসে বললেন —'তুমি পাগল নাকি আমাকে সুদ্ধ গাড়ি টেনে চলতে পারে যে ইঁতুর তাকে তুমি কোথায় দেখলে? ছেলেবেলায় আমি তু-একটা ইঁতুর পুষেছিলেম কিন্তু সবগুলোর বাচ্চা হয়ে আমার ঘরে এমনি উৎপাত লাগালে যে, সব ক'টাকে আমি ইঁতুর-কলে ধরে বিদায় করেছি। তুমি ভুল খবর শুনেছ, ইঁতুরে আমি চড়িনে, হস্তীবেশেও সঙ সেজে আমি হাওয়া খেতে যাইনে, নিশ্চয়ই কেউ তোমায় ঠকিয়েছে!'

রিদয় অবাক হয়ে বলে —'সে কী মশায়, ঘরে-ঘরে ইঁতুরে-চড়া আপনার ছবি, তাছাড়া আমি নিজের চোখে দেখেছি আপনি ঢোল বাজিয়ে ইঁতুর নাচ করছেন আমাকে শাপ পর্যন্ত দিয়ে এলেন, এখন বলছেন উল্টো, আমাকে ছলনা করছেন!'

গণেশ গম্ভীর হয়ে বললেন —'বাপু আমি যাই করি, এটুকু জেনো আমি ছলনাও করিনি শাপও দিইনি! ইঁতুরেও চড়িনি কোনোদিন, ঢোলও পিটিনি। ওই আমার দরোয়ানগুলো মাঝে-মাঝে হোলিতে দেওয়ালিতে ঢোল পিটিয়ে আমার কান ঝালাপালা করে, ওদের গিয়ে শুধোও। যদি আর কোনো গণেশ থাকেন তো বলতে পারিনে।'

রিদয় চোখ মুছে বললে —'মশায় যে আমাকে শাপ দিলেন, এখন শাপান্ত না করে দিলে তো আমি মারা যাই!'

গণপতি চোখ পাকিয়ে বললেন, —'কোনো সাপের ওঝাকে শুধোওগে বলে দেবে, কে তোমায় শাপ দিয়েছে আর কেমন করে শাপান্ত হবে —যাও, আমাকে বিরক্ত কোরো না!'

রিদয় মুখ কাঁচুমাচু করে বললে —'মশায়, আমি গরীব !'

গণেশ বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরালেন।

রিদয় জানত স্তুতি করলেই দেবতারা খুশি হন তাই সে একেবারে গলায় বস্তর দিয়ে গণেশের রূপ বর্ণনা করে গণেশবন্দনা শুরু করে দিলে :

খর্বস্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর
বিঘ্ন নাশ করো বিঘ্নরাজ,
পূজা হোম যোগে যাগে তোমার অর্চনা আগে
তব নামে সিদ্ধ সর্ব কাজ।
শুণ্ডে তুলি খৈ মোয়া দন্তে খাও চিবাইয়া
ইঁদুর বাহন গণপতি,
আপনি আসরে উর রিদয়ের আশা পুর
নিবেদিনু করিয়া প্রণতি।

গণেশ কানে হাত দিয়ে বললেন —'আরে রাম রাম কী বাজে বকছ, তুমি তো ভালো বিপদে ফেললে দেখি, রোসো আমি একবার বাড়ির মধ্যে থেকে আসছি, বিশেষ কাজ আছে।' বলে গণেশ উঠে গেলেন।

এতক্ষণ গণেশের চৌষট্টি কলাবৌ ঘরে কী হচ্ছে দরজার পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছিলেন, কর্তা উঠে যেতেই গণেশ-দাসীকে দিয়ে রিদয়কে ডেকে তারা শুধোলেন —'হ্যাঁগা তুমি কর্তার কাছে কী নালিশ করছিলে ?' রিদয়ের মুখে ইঁদুরের খবর শুনে তাঁরা বলে উঠলেন —'ওমা, এই দরবার করতে এসেছ তা বলতে হয়, ওই আমাদের কুমোর-বৌ কর্তার যে মূর্তিগুলো গড়ে-গড়ে ভটচায্যি মশায়ের হাতে দিয়ে লোকের ঘরে-ঘরে বিক্রি করতে পাঠায়, সেই গণেশের তুমি বুঝি সন্ধান করছ ? ওই দারোয়ানজীকে বলো সে তোমাকে সেই গণেশের দোকান দেখিয়ে দেবে।'

রিদয় কলাবৌদের পেন্নাম করে আবার দেউড়িতে এসে

দারোয়ানজীর সঙ্গে আর একটা ঘুপসি ঘরে গিয়ে দেখলে, দোকান-ঘরের এক-এক কুলুঙ্গীতে এক-এক রকম গণেশ। গোবর-গণেশ তিনি কলম হাতে পুঁথি লিখছেন, সিদ্ধিদাতা-গণেশ তিনি এক ধামা দিল্লীর লাড্ডু নিয়ে বসেছেন, মাড়োয়ারি-পটির টঙ্ক-গণেশ বসে বসে খালি আকাশে আঁকশি দিচ্ছেন, হেড়ম্ব-গণেশ তিনি খুব আড়ম্বর করে ঢোল পিটছেন।

রিদয় টিপ করে তাঁকে নমস্কার করে বললে—'গণেশদাদা চিনতে পারেন?' হেড়ম্ব রিদয়ের কথার জবার দিলেন সমস্কৃত দেবভাষায় 'বুং।' রিদয় ভাবলে এ তো মুশকিল, যদি বা কত কষ্টে এসে ধরলেম, এখন কথা না বুঝলে উপায়? সে একবার ইঁদুরের দিকে, একবার ঢোলকের দিকে, একবার নিজের দিকে আঙুল নেড়ে ইশারায় বোঝালে ঢোলকটা চাই। গণেশ ঢোলকটা রিদয়কে দিয়ে এদিক-ওদিক শুঁড় নেড়ে কী বললেন বোঝা গেল না। রিদয় শুধু শুনলে—'বুং চটাপট্ ত্বং কং করং বাদনং পুনস্তম্ ব্যস্তম্ নাদম্ কুণ্ডমকুলম্ পোউন্‌ড্রবর্ধনম্ গণ্ডস্থলম্ আগচ্ছতু।'

রিদয় গণেশের মুখ দেখে বুঝলে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। সে অমনি আচার্যি পুরুতকে দুর্গোপুজোয় শ্রাদ্ধে শান্তিতে যেমন করে সব মন্তর আওড়াতে শুনেছিল ঠিক তারি নকলে বললে—'হুঁং ভূত স্বাহা, কুরু-কুরু কুণ্ডলিনী নমোঃ আসিতো দেবল গৃহ্যং কুরু তুভ্যং হং যং ছট ফট ব্রহ্মবিদ্যা হবিষে স্বাহা অহঃ চিটপটাং শান্তি ভূশান্তিং ভ্যূতরশান্তি অযুধেঃশান্তি ছিহরি ছিহরি ছিহরি হরিবোল হরিবোল হরিবোল সুর্য প্রণাম।' গণেশ খুশি হয়ে দুবার ঘাড় নেড়ে 'তথাস্তু' বলে চোখ বুজলেন।

রিদয় আস্তে-আস্তে ঢোলক নিয়ে বেরিয়ে এল। দারোয়ান ঘরের দুয়োয়েরই দাঁড়িয়ে ছিল, সে অমনি বখশিশের জন্যে হাত পাতল, রিদয় এদিক-ওদিক দেখে আস্তে-আস্তে মানকচুর শিকড়টি বার করে বললে—'দারোয়ানজী আর তো সঙ্গে কিছু নেই, এইটে নাও।'

দারোয়ান 'হাৎ-তেরি,' বলে হাত ঝাড়া দিলে।

শিকড় যেমন মাটিতে পড়া অমনি পেঁচা রিদয়কে ছোঁ দিয়ে একেবারে ঘুরোনো সিঁড়ি বেয়ে ছাতে এসে উপস্থিত। সঙ্গে-সঙ্গে পেঁচো এসে রিদয়কে পেয়ে বসল —রিদয় অজ্ঞান হয়ে পড়ল আর বহুরূপীর চামড়ার মতো তার গায়ের রঙ লাল, নীল, হলদে, রকম-রকম বদলাতে আরম্ভ করলে। হাড়গিলে অমনি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মন্তর পড়ে পেঁচো ঝাড়তে বসে গেলেন :

স্কন্ধাপসার শকুনী
অন্ধ পুতনা শীত পুতনা মুখমণ্ডিকা
নৈগমেষ প্রসীদতু
ক্লীং চর্চ্চ হুং হুং ঝংশা
ওঁলং শ্রীং কপালিকং জং জং
তিষ্টতি মূষিকং চং চং চর্ব্বশং হংসঃ
হুং ফট্ স্বাহা।

মন্তরের চোটে রিদয় হাঁ করলে, যেন খেতে এল, অমনি চট করে হাড়গিলে ধুনোপড়া বেড়ি পেঁচোর মুখবন্ধন করে দিলেন :

ধুল-ধুল স্বর্গের ধুল
মর্তের মাটি
লাগ-লাগ পেঁচোর দন্ত-কপাটি
হাঁ করে নাড়িস তুণ্ড খা পেঁচির মুণ্ড
যাঃ ফুঃ
কার আজ্ঞে হাড়িপ বাবার আজ্ঞে
হাঁড় নড়-মড় হাড়গিলের আজ্ঞে
শিগ্‌রি যাঃ শিগ্‌রি যাঃ।

পেঁচো রিদয়কে ছেড়ে পালাতেই রিদয় ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। চকা রিদয়ের কানে-কানে শুধোলে—'গণেশ কী বললেন?'

রিদয় বললে— 'তা তো সবটা বুঝলুম না, কেবল আসবার সময় তিনি বললেন — তথাস্তু।'

চখা হেসে বললে—'তবে আর কী, কেল্লা মার দিয়া! আর তোমার ভয় নেই। একদিন সকালে উঠে দেখবে, যে রিদয় সেই রিদয় হয়ে গেছ। চল এখন যুদ্ধং দেহি করা যাক গে।'

এদিকে কেল্লা খালি পেয়ে চুয়োর দল এ-ওর পিঠে চড়ে একটা ঘুলঘুলি দিয়ে কেল্লার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটার পর একটা নেংটি ইঁদুরের গড়ভাণ্ডার সব দখল করে লুঠের চেষ্টায় দলে-দলে পিলপিল করে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় চৌতলায় পাঁচতলায় উঠে ছতলায় রাজসভায় ঠাকুরবাড়িতে, এমন কী অন্দরমহলে পর্যন্ত ঢোকবার যোগাড়, দু-একটা চুয়ো ছাতেও উঠে হাড়গিলের বাসাটা পর্যন্ত প্রায় এগিয়েছে। এমন সময় উত্তর দক্ষিণ থেকে নেংটি ইঁদুরের দলকে খবর দিয়ে চকার বাকি হাঁসেরা ফিরে এল। ঠিক সেই সময় গণেশের ঢোলকে রিদয় চাঁটি বসালে— ধিক-ধিক-ধিক ধাঁকুড়-ধাঁকুড়।

ঢোলের শব্দে চুয়োর দল লেজ উঁচু করে শিউরে উঠে যে যেখানে ছিল থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর তালে-তালে লেজ দোলাতে-দোলাতে দলে-দলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলে। চুয়োতে-চুয়োতে কেল্লার প্রকাণ্ড ছাত ভরে গেল, রিদয় চুড়োয় বসে ঢোল বাজাচ্ছে—

চুয়ো, হাততালি দুয়ো
নেংটি ধিং নিগিরি টিং
ধাতিং তিং নাতিং থিং
চুয়ো, হাততালি দুয়ো।

আর সব চুয়ো লেজে-লেজে জড়াজড়ি করে নৃত্য করছে, পেঁচা পালক ফাঁপিয়ে, বেরাল লেজ ফুলিয়ে, হাড়গিলে গলার থলি দুলিয়ে

সঙ্গে-সঙ্গে তাল দিচ্ছে! সব চুয়ো যখন ছাতে এসে জড়ো হল, তখন রিদয় চাকার পিঠে চড়ে ঢোল বাজাতে-বাজাতে আকাশে উড়তে আরম্ভ করলে, চুয়োগুলো নাচতে-নাচতে লাফাতে থাকল। আনন্দে তারা মনে করলে যেন সবার ডানা গজিয়েছে, তারা প্রথমে ছাতের পাঁচিল, তারপর ছাতের আলসে, শেষে একেবারে আকাশে ঝম্প দিয়ে ডিগবাজী খেতে-খেতে মাটিতে এসে পড়ে জোড়া-জোড়া হাঁ করে আকাশের পানে চার পা তুলে চেয়ে রইল।

চুয়োগুলো নাটবাড়ির লীলাখেলা সাঙ্গ করে সরে পড়েছে অনেকক্ষণ। হাড়গিলে, বেরাল, পেঁচা পর্যন্ত ঢোলের আওয়াজে এমনি মশগুল হয়ে গেছে যে পায়ে-পায়ে কখন সবাই একেবারে ছাতের প্রায় কিনারায় এসে পড়েছে টেরই পায়নি, হঠাৎ রাত একটার ঘণ্টা পড়ল অমনি রিদয় ঢোল বন্ধ করলে, সবাই চটকা ভেঙে দেখলে কেল্লা খালি, আকাশে অমাবস্যার চাঁদ দেখা দিয়েছে, চুয়ো আর একটাও নেই। রিদয়কে নিয়ে চকা উড়ে চলেছে। হাড়গিলে, পেঁচা চটকা ভেঙেই দেখলে বেরাল আলসে থেকে আকাশে একটা পা বাড়িয়ে চুয়োদের মতো ঝাঁপ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে আর কী! হাড়গিলে তার লেজ ধরে এক টান দিয়ে বললে— 'করো কী, পড়ে মরবে যে!'

বেরাল ফ্যাল-ফ্যাল করে খানিক চেয়ে থেকে —'ইকি' —বলেই ফ্যাঁচ করে হেঁচে আস্তে-আস্তে পেছিয়ে এল।

ওদিকে নেংটির দল আস্তে-আস্তে কেল্লায় এসে যে যার ঘরে ঢুকে ধান ভানতে বসে গেল। চুয়ো তাড়াবার জন্যে হেড়ম্ব-গণেশের ঢোলককে ছাড়া আর কাউকে যে ধন্যবাদ দেওয়া দরকার সেটা তাদের মনেই এল না!

রাতের মধ্যে পেঁচার দল প্রায় বারোআনা মরা চুয়ো খেয়ে সাফ করে দিলে, বাকি যা রইল সেগুলোর উপরে সকালবেলায় কাক চিল এসে পড়ল। বেলা আটটার মধ্যে সব সাঙ্গ হয়ে গেল।

আজ অমাবস্যা তিথি, রাত্তিরটা হিমালয়ের এপারটায় কাটিয়ে

কাল থেকে হাঁসেরা পাহাড়ের ওপারে নিজের-নিজের দেশের দিকে রওনা হবে, দেশের কথা ছাড়া আজ আর কারু মুখে অন্য কথা নেই। আকাশে মেঘ করেছে, বিষ্টি নেই, কেবল ঠাণ্ডা হাওয়া আর শীতালু বাতাস। মাথার উপর দিয়ে দলে-দলে পাখি হু হু করে উত্তরমুখো চলেছে —সবাই দেশে যেতে ব্যস্ত, তার ওপর এ-বছর পাখিদের বারোয়ারি পড়েছে। কুঁচেবক কুঁচিবক তারা বারোয়ারির নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছে, যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে চেঁচিয়ে জানাচ্ছে পুন্নিমার দিনে বারোয়ারিতে যেতে হবে, ভারি জলসা।

চকা নিমন্ত্রণ পেয়ে ভারি খুশি, রিদয়কে বললে —'তোমাদের হুজনের কপাল ভালো, বারো বছর অন্তর কৈলাস-পর্বতের ধারে মানস-সরোবরে এই বারোয়ারির মজলিস হয়, সেখানে সারসের নাচ, হরিণ-দৌড়, আগিন-পাখির কনসার্ট, গাঙ-শালিকের গীত, ছুঁচোর কেত্তন, শেয়ালের যুক্তি, মেড়ার লড়াই, ভালুক-নাচ, সাপ-বাজি, মাছের চান, এমনি আরো কত কী হবে তার ঠিকানা নেই! ব্রহ্মার হাঁস কর্মকর্তা, স্বয়ং পশুপতি হবেন সভাপতি, পৃথিবীর পশুপক্ষী সেখানে হাজির হবে। মানুষের কপালে এমন আশ্চর্য কারখানা দেখা এ-পর্যন্ত ঘটেনি, কোথায় লাগে তোমাদের হরিদ্বারের কুম্ভমেলা! আর পাহাড়ের ওধারে আমাদের দেশটা কী চমৎকার তোমায় কী বলব, পালতি জলা —যেটা ব্রহ্মার হাঁস আর পৃথিবীর জলচর পাখি, কী পোষা কী বুনো সবাইকার আড্ডা, সেটা যে কত বড়ো তা কেউ জানে না, উত্তরের সমস্ত নদী সমস্ত পাহাড় এসে সেইখানেই শেষ হয়ে আবার সব নতুন-নতুন নাম নিয়ে দক্ষিণ দিকে নেমে এসেছে। এই পালতির উত্তর গায়ে ঢোলা পর্বত, সেই ঢোলা পর্বতের ওপারে পাঁচিলে ঘেরা চীন মুল্লুক, তারো ওধারে বরফের দেশের ধারে 'তন্দ্রা' বলে একটা দেশ। বছরে প্রায় দশ মাস সেখানে বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে ফুল পাতা নদ নদী সবাই ঘুমিয়ে থাকে, কেবল বসন্তের মাস দুই সেখানে সূর্য দেখা দেন, আর অমনি সারা দেশ ফুলে-ফলে পাতায়-ঘাসে দেখতে-দেখতে সবুজ হয়ে ওঠে,

আর আমরা সব পাখিরা মিলে সেখানে গিয়ে বাসা বেঁধে ডিমে তা দিয়ে বাচ্ছা ফুটিয়ে চলে আসি। বসন্তের শেষে পালতি জলায় বাচ্ছারা বড়ো হবার জন্যে আপনারাই উড়ে আসে, আমরা সারা বছর দেশে-বিদেশে ঘুরে আবার বছরের এই সময়টিতে গিয়ে দেখি আমাদের ছেলে-পিলেরা কেউ বড়ো হয়েছে, কেউ বড়ো হয়ে নিজের পথ দেখে নিতে বিদেশে চলেছে, কোনো-কোনো বাচ্ছা বা মরে গেছে, কেউ-কেউ বা এরি মধ্যে বিয়ে-থাওয়া করে ঘরকন্না পাতবার চেষ্টায় আছে, কোনো বাচ্ছা বা সন্ন্যাসী হয়ে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, কাউকে ধরে মানুষে খেয়ে ফেলেছে, কাউকে মানুষে গুলি করে মেরে ফেলেছে আর কাউকে বা তারা জেলখানার মতো খাঁচায় ভরেছে, আর কাউকে বা ডানা কেটে পোষ মানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। বছরের এই সময়টিতে আমরা একবার করে নিজেদের জন্মস্থানে আর পুরোনো বাসায় ফিরে আসতে পাই, নিজের ছেলেমেয়ের দেখা পাই, সুখ-দুঃখের দুটো কথা কয়ে নিই, তারপর আবার চলি এ-দেশ সে-দেশ করে।

রিদয় বলে উঠল —'আমারো তো দেশ আছে কিন্তু আমার তো সেখানে ফিরতে একটুও ইচ্ছে হয় না।'

চকা বললে —'সে কী! তোমার বাপ-মা কেউ নেই নাকি? যখন বড়ো হবে, বৌ হবে সংসার হবে, ছেলে-পুলে নাতি-পুতি হবে তখন বুঝবে সারা বছরের পরে দেশে ফিরতে কী আনন্দ। তখন দেশের ডাক যখন এসে পোঁছবে তখন দেখবে মন অমনি উধাও হয়ে ছুটেছে আর কিছুতে মন বসছে না, প্রাণ নীল আকাশে প্রজাপতির মতো সোনার পাখনা মেলে দিয়ে উড়ে পড়তে চাচ্ছে, তখন দেশের কথাই কইতে থাকবে। এর সঙ্গে তার সঙ্গে, দিন নেই রাত নেই, কী সকাল কী সন্ধ্যে কেবল বঁধুর মুখ মধুর হাসিই মনে জাগবে তখন।'

চকার কথা শুনতে শুনতে রিদয় কেমন আনমনা হয়ে গেল। সারাদিন ধরে আজ তার কেবলি মনে পড়তে লাগল —আমতলির

সেই ঘর ক'খানি, সেই তেঁতুলতলার ঘাট, তেপান্তর মাঠ, হাঁসপুকুরের কাদা জল, তাতে শালুক ফুল, বাড়ির ধারে ঝুমকো-লতার মাচা, তার উপরে ডুগ্‌গা টুনটুনি পাখিটি, উঠোনের কোণে তুলসীমঞ্চটি, কালো মাটি-লেপা ঘরের দেওয়াল তার উপরে মায়ের হাতে লেখা লক্ষ্মীপুজোর আলপনা, দড়ির আলনায় বাপের কোঁচানো চাদর, পুরোনো শোবার তক্তা তার উপরে শীতলপাটি আর লাল ঝালর দেওয়া তালপাতার পাখাখানি। সব আজ পরিষ্কার যেন রিদয় চোখে দেখতে লাগল, আর থেকে-থেকে মন তার ঘরে যেতে আকুলি-বিকুলি করতে থাকল —সকাল কেটে দুপুর হয়েছে, তখনো রিদয় আকাশের দিকে চেয়ে ঘরের কথা ভাবছে —দলে-দলে কত পাখির ঝাঁক দেশমুখে চলে গেল —'চল-চল চলরে চল' বলতে-বলতে। নাটবাড়ির জলায় যত পাখি —

কাদাখোঁচা জলপিপি কামি কোড়া কঙ্ক
পালতির কুঁচেবক আর মৎস্য বঙ্ক।
ডাহুকা ডাহুকি আর খঞ্জনী খঞ্জন
সারস সারসী যত বক বকীগণ।
তিত্তিরী তিত্তরা পানিকাক পানিকাকী
কুরবী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী।

সবাই দলে-দলে দেশমুখে উড়ে পড়ছে! রিদয় দেখলে মাথার উপর দিয়ে কত পাখির ঝাঁক দেশ-বিদেশ থেকে, কেউ বন ছেড়ে, কেউ খাঁচা ভেঙে হু-হু করে দেশে চলেছে —

ময়না শালিকা টিয়া তোতা কাকাতুয়া
চাতক চকোর নুরী তুরী রাঙ্গাচুয়া।
ময়ুর ময়ূরী সারিশুক আদি খগ,
কোকিল কোকিলা আদি মরাল বিহগ।
সীকরী বহরী বাসা বাজ তুরমুতি

কাহা-কুহি লগড় ঝগড় জোড়া ধুতি।
শকুনী গৃধিনী হাড়গিলা মেটেচিল
শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ শ্বেত রক্ত নীল।
ঠেটি ভেটি ভাটা হরিতাল গুড়-গুড় —
বাকচা হারিত পারাবৎ পাকরাল
হাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল।

চড়ুই মুনিয়া পাবছুয়া টুনটুনি বুলবুল ফুলঝুটি ভিংরাজ রঙে-রঙে সবুজে-লালে সোনালিতে-রুপোলিতে আকাশ রাঙিয়ে চলেছে যে যার দেশে বাতাসে ডানা ছড়িয়ে। রিদয় কেবলি বসে-বসে দেখতে লাগল আর মনে-মনে বলতে লাগল— 'যদি ডানা পেতুম!'

পাখিদের দেখাদেখি ভীমরুল ডাঁশ মশা দলে-দলে উড়তে আরম্ভ করেছে, চকার দলের হাঁসেরা আর থির থাকতে পারছে না, এখনো সারারাত এখানে কাটাতে হবে ভেবে তারা কেবলি উস্‌খুস্‌ করছে আর ডানা ঝাড়া দিচ্ছে।

চকা একবার রিদয়ের কানের কাছে বলে গেল, যা কিছু নেবার আছে সঙ্গে, এইবেলা বেঁধে-ছেঁদে রাখ, কাল ভোরেই রওনা হতে হবে। রিদয়ের দেশের জন্যে মনটা আনচান করছে কিন্তু বেড়াবার শখ এখনো মেটেনি। সে পথের মাঝে নিজের আর খোঁড়ার জন্যে গোটাকতক গুগলি টোপাপানা এটা-ওটা সেটা নিয়ে উলুখড়ের একটি গেঁজে বুনতে বসে গেল।

থলেটা তৈরি হতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এল। হাঁসেরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে চোখ বুজে রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দেবার যোগাড় করছে এমন সময় চকা এসে রিদয়কে শুধাল —'খোঁড়াকে দেখেছ কি?. তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

রিদয় তাড়াতাড়ি থলে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললে —'সে কী, গেল কোথায়, শেয়ালে নিলে না তো?'

চকা শুকনো মুখে বললে —'এই তো এখানে একটু আগেই ছিল, হঠাৎ গেল কোথা!'

রিদয় বিষম ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। একে সন্ধ্যা হয়ে গেল, যেখানে পাখির ডাক শোনে সেইদিকেই রিদয় ছুটে যায়, ঝোপ-ঝাড় নেড়ে দেখে, নাম ধরে ডাক দেয়, এমনি সারারাত রিদয় ছুটোছুটি করতে লাগল অন্ধকারে জল কাদা ভেঙে! নাটবাড়ির উঠোনটা পর্যন্ত রিদয় খুঁজে এল, কিন্তু সুবচনীর খোঁড়া হাঁস কোথাও নেই!

এদিকে সকাল হয়ে এল, চকা বললে —'সে নিশ্চয়ই অন্য দলে মিশে এগিয়ে গেছে, আর মিছে খোঁজা, চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি, সময় উৎরে যাচ্ছে।'

রিদয় ঘাড় নেড়ে বললে —'তাকে না নিয়ে আমি এখান থেকে নড়ছিনে, তোমরা যেতে চাও যাও।'

চকা মুশকিলে পড়ল! রিদয় নড়তে চায় না, এদিকে সব হাঁসেরই দেশে যাবার টান রয়েছে, তবু খোঁড়ার জন্যে চকা আরো এক ঘণ্টা দেরি করলে, তাতেও যখন খোঁড়ার সন্ধান পাওয়া গেল না তখন তারা রিদয়কে একলা রেখে চট করে দেশ থেকে ঘুরে আসবার জন্য উত্তরমুখে উড়ে পড়ল —আসি-আসি বলতে-বলতে।

চকার দল চলে যেতে রিদয়ের চারদিকে যেন শূন্য বোধ হতে লাগল! সে আস্তে-আস্তে নাটবাড়ির ভাঙা পাঁচিলটা আর একবার সন্ধান করতে চলেছে, এমন সময় দূর থেকে দেখলে খোঁড়া কিরাশ-কলমীর ডাঁটা মুখে নিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে পাঁচিলের গায়ে একরাশ ভাঙাচোরা পাথরের মধ্যে গিয়ে সেঁধোলে। এমনি খোঁড়াকে শেওলাগুলি নিয়ে সেখানটায় আনাগোনা করতে দেখে রিদয় লুকিয়ে-লুকিয়ে পাঁচিলে উঠে দেখলে —জড়োকরা পাথরের মধ্যে চমৎকার ছাই রঙের একটি বালিহাঁস শুয়ে আছে, খোঁড়া তার মুখে খাবার তুলে-তুলে দিচ্ছে আর দুজনে কথা হচ্ছে —'আজ কেমন আছ? তেমনিই? ডানার ব্যথাটা যায়নি?'

'না, এখনো নাড়তে গেলে বুকটায় বেদনা করে।'

'মানুষগুলো কী নিষ্ঠুর! ভাগ্যি গুলিটা বুকে লাগেনি।'

'লাগলে আর কী হত, না হয় মরে যেতুম!'

'ছি-ছি অমন কথা বোলো না, আমার ভারি দুঃখ হয়।'

'আমি তোমার কে যে আমার জন্যে দুঃখু হবে; আজ এই দেখা শোনা এত ভাব এত যত্ন, কাল হয়তো তুমি চলে যাবে, দুদিন পরে মনেও থাকবে না, কে বালি কোথাকার বালি!'

খোঁড়া ঘাড় নেড়ে বললে—'অমন কথা বোলো না, যতদিন বাঁচব তোমায় ভুলব না, জলার মধ্যে এই দিনটি মনে থাকবে!'

বালিহাঁস একটু ঘাড় হেলিয়ে খোঁড়ার গা ঘেঁষে বললে—'আমি দল ছাড়া হয়ে পড়লুম, কতদিনে সারব তার ঠিক নেই।'

খোঁড়া বুক ফুলিয়ে বললে—'ভয় কী তোমার কাছে রইলুম, এখন একটু ঘুমোও আমি একবার ঘুরে আসি।'

খোঁড়া চলে গেলে রিদয় আস্তে-আস্তে গর্তর মধ্যে ঢুকে দেখলে এমন সুন্দরী হাঁস সে কোনোদিন দেখেনি, এতটুকু তার মুখটি, পালকগুলি নরম যেন তুলো, সাটিনের মতো ঝকঝক করছে, চোখদুটিও কাজলটানা যেন ঢলঢল করছে! রিদয়কে হঠাৎ দেখে বালিহাঁস ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু বেচারার ডানায় বেদনা, উড়তে পারে না, বালি চওঁা করে কাঁদতে লাগল।

রিদয় তাড়াতাড়ি বললে—'আমি হংপাল হাঁসেদের বন্ধু, খোঁড়া হাঁসের সেঙাত, আমায় দেখে ভয় কী?'

বালিহাঁস রিদয়ের কথায় সাহস পেয়ে ঘাড়টি একটু নিচু করে বললে—'তাঁর মুখে আপনার নাম শুনেছি, আপনি অতি মহাশয় লোক।' এমনি ভাবে এই কথাগুলি বালি বললে যে, রিদয়ের মনে হল কোনো রাজকন্যে যেন তার সঙ্গে আলাপ করছেন!

রিদয় বললে—'দেখি, আপনার কোথায় হাড়টা ভেঙেছে সোজা করে দিই।' আস্তে-আস্তে বালিহাঁসের ডানার তলায় হাত দিয়ে রিদয় মচকানো হাড়টা ধরে খুট্ করে যেমন সরিয়ে দেওয়া, অমনি বালিহাঁসটি 'মাগো!' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

রিদয় কখনো ডাক্তারি করেনি, পাখিটি মরে গেল ভেবে সে

তাড়াতাড়ি পাছে খোঁড়া এসে দেখে সেই ভয়ে লম্ফ দিয়ে চোঁচা চম্পট। খোঁড়া বেশি দূর যায়নি, দু-ঢোক জল খেয়েই ফিরে আসছে, পথের মধ্যে রিদয়ের সঙ্গে দেখা! রিদয় তাড়াতাড়ি খোঁড়াকে বললে —'কোথায় ছিলে সবাই যে চলে গেল, সারারাত তোমাকে খোঁজাখুঁজি করেছি, চলো আর দেরি নয়, এই বেলা গিয়ে তাদের ধরি, বেশি দূরে এখনো যায়নি !'

খোঁড়া আমতা-আমতা করে বললে —'রোসো, এখনি যেতে হবে ? এত শিগ্‌রি কি না গেলেই নয় ?'

রিদয়ের ভয় হল পাছে খোঁড়া গিয়ে দেখে বালিহাঁস মরে গেছে। সে তাড়াতাড়ি খোঁড়ার পিঠে চেপে তাকে ওড়াবার চেষ্টা করতে লাগল !

খোঁড়া ঘাড় নেড়ে বললে —'দেখ ভাই আমার এক বন্ধু বড়ো বিপদে পড়েছে, তাকে একলা ছেড়ে যাওয়া তো হতে পারে না, বেচারার ডানাটি জখম হয়েছে নড়তে পারে না, আমি গেলে তাকে কেবা খাওয়ায় আর কেই বা যত্ন করে !'

রিদয়ের ইচ্ছে হাঁস সেদিকে না যায়, সে কেবলি তাকে ফেরাতে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু খোঁড়ার মন পড়ে আছে সেই রূপকথার রাজকন্যের মতো সুন্দরী বালিহাঁসের দিকে, সে রিদয়কে নিয়ে একবার উত্তরমুখে উড়ল, কিন্তু খানিক পথ গিয়েই বললে —'ভাই, বড়ো মন কেমন করছে, মানস সরোবরের এই নাটবাড়ির চালায় দু-চারদিন কাটিয়ে চল বাড়িমুখো হওয়া যাক, দেশে যাবার জন্যে মন টেনেছে আর ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগছে না।'

রিদয়েরও মনটা সকাল থেকে দেশের দিকেই টানছিল, সে কোনো কথা কইলে না। খোঁড়া হাঁস আস্তে-আস্তে উড়ে এসে আবার নাটবাড়ির ধারে নামল ঠিক বেছে-বেছে সেইখানটিতে, যেখানে তার বালিহাঁস রয়েছে। খোঁড়া রিদয়কে পিঠ থেকে নামিয়ে গলা উঁচু করে দুবার ডাক দিলে —'বালি ও বালি !' কোনো উত্তর এল না, তারপর ছুটে গিয়ে দেখলে পাথরের মধ্যে

শুকনো ঘাস পাতা বিছানো তাদের দুদিনের বাসাটি খালি হা-হা করছে, কেউ কোথাও নেই। রিদয় চুপ করে রইল, ভাঙা গলায় খোঁড়া হাঁস আবার ডাক দিলে —'বালি, কোথায় বালি!'

রিদয় ভাবছে নিশ্চয় শেয়াল এসে মরা হাঁসটা টেনে নিয়ে গেছে, ঠিক সেই সময় জলার ধারে বেনা-বনের সবুজ পাতাগুলো নড়ে উঠল, তার পরেই মিঠে সুরে —'এই যে আমি, একটু গা ধুয়ে নিচ্ছি' বলে বালি আস্তে-আস্তে জলা থেকে উঠে এল। তার ঝকঝকে পালকে শিশিরের মতো জলের ফোঁটাগুলি আলো পেয়ে হীরের মতো ঝকঝক করছে, রিদয়ের মনে হল যেন জলদেবী জল থেকে উঠে এলেন।

খোঁড়া হেলতে-দুলতে বালির কাছে গিয়ে আস্তে-আস্তে তার গলা চুলকে দিয়ে বললে —'বেদনা আছে কি?' বালি ঘাড় নেড়ে বললে —'একটুও না, তোমার বন্ধুর কৃপায় আর তোমার যত্নে আমি ভালো হয়ে গেছি।' তারপর দুজনে জলে গিয়ে সাঁতার আরম্ভ করলে, রিদয় জলের ধারে বসে একটা বেনার শিষ চিবোতে থাকল।

বালিহাঁসকে সঙ্গে নিয়ে খোঁড়া এর মধ্যে একদিন চুপিচুপি পদ্মবনে পদ্ম-ফুলের সোনালি রেণু এ-ওর গায়ে ছাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই নিজেদের গায়ে হলুদ মেখে, মাছরাঙা পাখিদের বৌ-ভাতে মাছ খাইয়ে, বিয়ে-থাওয়া খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে জলার ধারে বাসা বাঁধবার যোগাড়ে আছে, দেশে ফেরার কিংবা বিদেশে উড়ে চলার আর নামটি করে না।' রিদয় শুধোলে বলে —'আমরা দুটিতে যেখানে থাকি সেইখানেই আমাদের দেশ।'

রিদয় বলে —'আমার তো দেশ আছে, আমাকে তো সেখানে যেতে হবে বিয়ে-থাওয়াও করতে হবে। এই জলার মধ্যে না পাওয়া যায় ভালো খাবার, না আছে ভালো শোবার জায়গা, এখানে বাসা বাঁধলে তো আমার চলবে না।'

বালিহাঁস বললে —'তা বেশ তো, এই জলার ওপারেই একটা

গয়লাপাড়া আছে, চলুন আপনাকে তাদের গোয়ালে রেখে আসি। একটি বুড়ি গাই তাদের আছে এক ছটাক করে দুধ দেয়, দুধ ভাত সবই সেখানে পাবেন।'

রিদয় শুধোলে —'আর তোমরা ?'

বালিহাঁস লজ্জায় মুখটি নিচু করে রইল। খোঁড়া চুপি-চুপি রিদয়ের কানে-কানে বললে —'ভাই, ওর ডিম পাড়বার সময় হয়েছে, দুটো মাস অপেক্ষা করো, তারপর সবাই এক সঙ্গে বাড়ি ফেরা যাবে, এই কটা দিন তুমি কোনো রকমে গৌহাটিতে কাটাও।'

হাঁসের বাচ্ছা হবে শুনে রিদয় ভারি খুশি, সে একখানা শালপাতার নৌকোতে ভর দিয়ে গয়লাপাড়ার ঘাটে গিয়ে উঠল। গয়লাপাড়া নামেই পাড়া, একঘর বই গয়লা নেই, তাও আবার গয়লা-বুড়ো অনেককাল হল মরেছে, আছে কেবল এক বুড়ি গাই আর এক বুড়ি গয়লানী!

গয়লাবাড়ির উঠোনে ঢুকে রিদয় এদিক-ওদিক চাইতে লাগল, ঘুটঘুটে আঁধার রাতটা, বাড়ির কোথাও একটি আলো নেই, কোনদিকে গোয়াল কোনদিকে ঢেঁকিশাল কোথায় বা হেঁসেল কিছুই দেখবার যো নেই, একটা কেবল বেল গাছ ভূতের মতো এঁকে-বেঁকে টেরা-বাঁকা মোচড়ানো-দোমড়ানো শুকনো ডাল নিয়ে উঠানের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার উপরে বসে একটা কালো পেঁচা কেবলি চেঁচাচ্ছে —'যো-মেঁ-র বাড়ি-যাঃ, মাথা খাঃ!'

ঝড় উঠল, তার সঙ্গে টিপটিপ বিষ্টি নামল, আরো দুটি পথিক নেউল আর খটাস তাড়াতাড়ি উঠোনে ঢুকে এদিক-ওদিক চাইতে-চাইতে রিদয়কে দেখে শুধোলে —'এটা কি গৌহাটির চটি, রাতে থাকবার ঘর পাওয়া যাবে কি এখানে ?'

রিদয় বললে —'আমি তো গয়লাবাড়ি বলে এখানে ঢুকেছি কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখছিনে। এটা গোয়াল কি চটি কি ধর্মশালা বা পাঠশালা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কারু সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে, কেবল একটা পেঁচা ডাকছিল একটু আগেই শুনেছি।'

খটাস বললে —'তবে নিশ্চয় এটা গঙ্গাযাত্রীর ঘর !'

নেউল বলে উঠল 'মাঠের মধ্যে কখনো মড়া পোড়াবার ঘাট হয় ? বাড়িই বটে, তবে এটা কলুর বাড়ি কি গয়লাবাড়ি কিংবা পুলিশের খাদাবাড়ি তা বোঝা যাচ্ছে না !'

খটাস বললে —'সেটা বোঝবার সহজ উপায় আছে।'

রিদয় শুধোলে —'কোনো বাড়ি সহজে চেনবার উপায়টা কী প্রকাশ করো !'

খটাস খানিক ভেবে বললে —'মানুষেরা নানা কাজের জন্যে নানারকম বাড়ি-ঘর বাঁধে তা তো জানো —উত্তরমুখো, দক্ষিণমুখো, পুবমুখো, পশ্চিমমুখো। গয়লা বাঁধবে একরকম, তেলি বাঁধবে অন্যরকম, মালি বাঁধবে একরকম, কুমোর বাঁধবে একরকম। আর্ট বোঝো না ? কে কী রকম বাঁধবে তার হিসাবটা জানলেই কোনটা কী বাড়ি রোঝা যাবে।'

নেউল বললে —'হিসেবটা কেমন শুনি ?'

'শোনো তবে, প্রথমে মালির বাড়ি কেমন তা বলি শোনো,' বলে খটাস খনার বচন আরম্ভ করলে :

চৌদিকে প্রাচীরে উচা কাছে নাই গলি কুচা
পুষ্প বনে ঢাকে রবি শশি
নানাজাতি ফোটে ফুল উড়ি বৈসে অলি কুল
কোকিল কুহুরে দিবা নিশি।
মন্দ-মন্দ সমীরণ বহে সেথা অনুক্ষণ
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল !

রিদয় বলে উঠল —'এখানে তো ফুলের গন্ধ মোটেই পাচ্ছিনে ! তবে এটা মালির ঘর নয়।'

'আচ্ছা, গন্ধে-গন্ধে বোঝো এটা তেলির বাড়ি কিনা,' বলেই খটাস আবার শুরু করলে :

সরষে ঝাঁঝে তেলি হাঁচে ফেঁচ-ফেঁচ
বলদেতে ঘানি টানে ঘেঁচ-ঘোঁচ ভেঁচ।

নেউল বাতাসে নাক উঁচিয়ে বললে —'কই হাঁচি তো পাচ্ছে না। তবে এটা তেলির বাড়ি নয়, মালির বাড়িও নয়।'

'কুমোর বাড়ি কিনা দেখো তো,' বলে খটাস শোলক আওড়ালে :

হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর ঠাকুর কলসীর কাঁধা
পাতখোলার সোঁদা গন্ধ কুমোর বাড়ি বাঁধা।

রিদয় এদিক-ওদিক নাক ঘুরিয়ে বললে —'নাঃ, কোনো গন্ধই পাচ্ছিনে।'

'আচ্ছা দেখো দেখি গয়লাবাড়ি কিনা'

গোয়াল ঘরে দিচ্ছে হামা নেহাল বাছুর
ঘোল মউনি বলছে ঘরে গাবুর গুবুর
ভাল দুধ টোকো দই দিচ্ছে সেথা বাস
মোষ দিচ্ছে নাক ঝাড়া গরু চিবায় ঘাস।

রিদয় পুবদিকে নাক তুলে বললে —'এসব কিছুই নেই এখানে!'

নেউল পশ্চিম দিকে শুঁকে-শুঁকে বললে—'যেন ভিজে ঘাসের গন্ধ পাচ্ছি।'

খটাস উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারদিকে কান পেতে নাক ঘুরিয়ে বললে—'এটা গয়লাবাড়ি বটে, কিন্তু তেমন গোঁড়া গয়লা নয়। শব্দ আর গন্ধগুলো কেমন ফিকে-ফিকে ঠেকছে, বিচিলি আছে, ঘাসও কিছু আছে, গরুও একটা যেন আছে বোধ হচ্ছে।'

ঠিক সেই সময় বুদিগাই 'ওমঃ' বলে একবার ডাক দিলে! তিন পথিক তাড়াতাড়ি সেই দিকে গিয়ে দেখলে —কত কালের পুরোনো চালাখানা তার ঠিক নেই, বিষ্টির জলে মাটির দেওয়াল গলে

গিয়ে বুড়ো মানুষের পাঁজরের হাড়গুলোর মতো ভিতরের চাঁচ আর খোঁটাখুঁটি বেরিয়ে পড়েছে, দরজার একটা ঝাঁপ খুলে মাটিতে শুয়ে পড়েছে, আর একটা পচা দড়ি ধরে পড়ো-পড়ো হয়ে এখনো ঝুলে রয়েছে! চালের খড় এখানে-ওখানে উড়ে গিয়ে ভিতর থেকে ঘুণ-ধরা বাঁশের আড়া দু-চারটে ফোগলা দাঁতের মতো দেখা যাচ্ছে!

তিন পথিকের পায়ের শব্দ পেয়ে গোয়ালের মধ্যে থেকে বুদি ভাবলে গয়লাবুড়ি তার জাব নিয়ে এল—সে দরজা থেকে মুখটা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে বললে—'মাগোঃ মাঃ, রাত হল আজ কি খেতে দিবিনে।'

খটাস, রিদয় আর নেউল বুদির কথার উত্তর দিলে—'তিন পথিক মোরা, রাতের মতো জায়গা মিলবে কি?'

বুদি মাথা হেলিয়ে কেবলি শুধাতে লাগল—'কেগাঃ কে?'

রিদয় বললে—'আমি আমতলির তাঁতির পুত্তর শাপভ্রষ্ট বুড়ো-আংলা দেশভ্রমণে বেরিয়েছি।'

বুদি নেউলের দিকে শিং হেলিয়ে বললে—'ইনি?'

'নেউলপুত্তর ইনিও বেরিয়েছেন মৃগয়া করতে।'

খটাসের :দিকে চোখ ফিরিয়ে বুদি রিদয়কে শুধালে—'আর ইনি কে?'

'ইনি হচ্ছেন খটাসের পুত্তর, দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন।'

বুদি গোয়ালের দুয়োর ছেড়ে একপাশ হল, তিন বন্ধুতে বাদলার রাতে গোয়ালে আশ্রয় নিয়ে রাত কাটাবার যোগাড় করতে চলেছেন, বুদিগাই লেজ নেড়ে বললে—'আর জন্মে কত তপিস্যি করেছি, তাই কাঙালিনীর ঘরে রাজপুত্তুর, পাত্তরের পুত্তর আর কোটালের পুত্তরের পা পড়ল!' রিদয় খুশি হয়ে বুদির ঘাড়টা একটু চুলকে দিলে, তারপর খড়ের গাদায় শুয়ে তিন বন্ধুতে চোখ বুজলে।

এদিকে বুদিগাই সারাদিন জাব পায়নি, সে পেটের জ্বালায় কেবলি উসখুস করছে—'ওমঃ মাগোঃ, কোথায় গেলে আজ কি

আর খাব না? ও ভাই রাজপুত্তুর মাচানের উপর থেকে এক বোঝা খড় নামিয়ে দিতে পার, বড় খিদে লেগেছে!'

রিদয় দেখলে চালের বাতায় মস্ত এক বোঝা খড় চাপানো রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা টেনে নামানো রিদয়ের সাধ্যি নয়, একটা আঁটি কোনো রকমে টেনে রিদয় বুদির মুখের কাছে ধরে দিলে। গাই খড়গুলো মুখে নিয়ে জাবর কাটতে লাগল।

রিদয়ের একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় বুদি আবার বলে উঠল —'ওমা গো, ভাই পাত্তরের পুত্তুর একটুখানি জল এনে দিতে পার?'

নেউল ঘুমের ঘোরে বললে —'এত রাতে জল পাই কোথা!'

বুদি বিনয় করে বললে—'বাইরেই বিষ্টির জল জমা হয়েছে, উঃ বড়ো তেষ্টা, আমার গলার দড়িটা যদি খুলে দাও তো ওখানে গিয়ে একটু জল খেয়ে বাঁচি!'

নেউল বুদির গলার দড়িটা দাঁতে কেটে দিয়ে বললে —'যাও তবে!'

বুদি দু-পা গিয়ে বললে —'ইস ভারি অন্ধকার, ভাই কোটালের পুত্তুর!'

খটাস আধবোজা চোখ মেলে বললে —'কী?'

বুদি একে রাতকানা তাতে আবার কানে কালা হয়েছে, খটাস কী বললে—শুনতেই পেলে না। আবার ডাকলে —'ও ভাই কোটালের পুত্তুর, আমি রাতকানা, যদি গলার দড়িটি ধরে একটুখানি এগিয়ে দিয়ে এস তো ভালো হয়!'

'ভালো বিপদেই পড়া গেল,' বলে খটাস দড়িটা ধরে বুদিগাইকে উঠানের মাঝে টেনে নিয়ে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে সরে পড়ল!

রাত তখন বারোটা, খড়ের গাদায় তিন বন্ধুতে আরামে নিদ্রা যাচ্ছে, এমন সময় বুদিগাই এসে সবার কানে-কানে বললে —'বড়ো বিপদ, বুড়িটা মরে গেছে!'

রিদয় তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল —'সেকী! মরল কেমন করে?'

বুদি নিশ্বেস ফেলে বললে—'দুঃখের কথা কইব কী, এই সন্ধ্যেবেলা সে আমার গলাটি ধরে বলে গেল—'বুদি শুনেছিস এই নাটবাড়ির জলায় রাজা এবার ধান বোনবার হুকুম দিয়েছেন, এতকালে জমি সব আবাদ হবে; আমাদেরও দুঃখু ঘুচবে।' আমি বললেম—'মা, তোমার আর দুঃখু ঘুচবে কী, তোমার ছেলেপুলে ক'টাই বিদেশে গিয়ে সংসার ফেঁদে কাজ-কারবার করতে বসে গেল, বুড়ি মাকে তো তারা একটিবার মনেও করলে না!' মা বললে—'বুদি লো বুদি, তাদের দুখিসনে, ঘরের ভাত পেলে কি তারা আমাকে একলা ফেলে বিদেশ যায়, না পরের চাকরি করে? এইবার তাদের চিঠি দেব দেখিস কেমন না তারা আসে। আমার মরবার সময় সব ছেলেরা এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াবে আমি ডঙ্কা মেরে স্বর্গে চলে যাব এই সাধটি আমার কি পূর্ণ হবে বুদি!' এই বলে মা ঘরের মধ্যে চিঠি লিখতে গেল, গোয়াল-ঘরে আর জাবও দিতে এল না, পিদুমও জ্বাললে না! সন্ধ্যেবেলা মাকে যেন কেমন-কেমন দেখনু, তাই বলি একবার যাই দেখে আসি। ওমা, ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি যেখানকার যেটি সব তেমনি গোছানো রয়েছে—পিদুমটি জ্বলছে বিছানা পাতা রয়েছে কিন্তু মা আমার চিঠিটুকু হাতে নিয়ে আলুথালু হয়ে দরজার ধারে পড়ে রয়েছেন, ছেলেরা আসবে ছেলেরা আসবে করেই বুড়ি মলো গো!

'আহা! এই গয়লা বোয়ের দশা কি এমন ছিল। এই বাড়িতে দেখছি ছেলে-মেয়ে চাকর-বাকর গিসগিস করছে—ঐ নাটবাড়ির সমস্ত জলাটা ওদের জমিতে পড়েছে, আজ এখনো কত জমি যে বেখবর পড়ে আছে তার ঠিক নেই। কর্তা যতদিন ছিলেন যেমন বোলবোলা তেমনি লক্ষির ছিরি। আহা, ওই গয়লা-বৌ তখন দুবেলা সেজেগুজে পাঁচজন গয়লানী সঙ্গে গাই দোহাতে আসত, নূপুরের শব্দ শুনলে গাই-গরু সব চারদিক থেকে হাম্বা দিয়ে ছুটে আসত গো। এমন লক্ষ্মী বৌ কচি-কাচা নিয়ে বিধবা হল গো! তখন এক-একদিন সে আমার গলা ধরে কানত আর বলত—'বুদি,

আর পারিনে যন্ত্রণা সইতে।' আমি বলি, 'মা এই শরীর তোমার, একা সবদিক দেখা কি তোমার কর্ম, দু-চারটে দাস-দাসী নায়েব-গোমস্তা বেশি রাখলে হয় না?' কিন্তু সে বড়ো কর্মিষ্ঠি, নিজের হাতে ছেলে-মানুষ ধান-বোনা রান্না-করা গাই-দোয়া সব করবে। আমি বলি —'মা, শরীর যে ক্ষেয় হলো!' কিন্তু বৌ কেবলি বলে —'ভালো দিন আসছে বুদি আসছে!' আর ভালো দিন! ছেলেগুলো বড়ো হয়ে চাকরির চেষ্টায় বিভূঁয়ে বিদেশে টো-টো করে ঘুরতে লাগল, কেউ বিদেশ গিয়ে সংসার পাতলে, ছেলেপুলে হল কিন্তু বুড়িকে আর কেউ দেখলে না। জমি-জমা গহনা-গাঁটি বেচে ছেলে-মেয়ে নাতি-পুতি এমনি তিনপুরুষ ধরে সবাইকে বিয়ে দিয়ে চাকরি নিয়ে বিদেশে পাঠাতে-পাঠাতে বুড়ি ক্রমে সর্বস্বান্ত হয়ে না খেয়ে মরবার দাখিল হল। ছেলে-মেয়ে কত যে জন্মাল, মানুষ হল, বড়ো হয়ে বুড়িকে একলা রেখে চলে গেল. এই গয়লাবাড়িতে ক'পুরুষ ধরে কত কারখানাই দেখলুম যে, তা কী বলি।

'এদানি বুড়ি আর দুঃখু করত না, ছেলেদের কথা হলে বলত —'বুদি এখানে এলে তাদের তো কষ্ট বই আরাম হবে না, তবে কেন আর তাদের ডেকে পাঠাই; এই তো ভাঙাবাড়ি, এখানে জায়গা কোথায় তাদের বসবার শোবার খাবার! ওই বাপ-মা-হারা আমার শিবরাত্রির সলতে ওই ছোটো নাতিটি বেঁচে থাক, মরবার সময় তবু মুখে জল দেবার একজন তো রইল —কী বলিস!' কিন্তু এ নাতিও বড়ো হয়ে যেদিন কুলির সর্দারি করতে বিদেশে গেল সেদিন থেকে বুড়ির আর চোখের জল থামল না। সে দিন-দিন কুঁজো হয়ে পড়ল, হাল-গরু জোতজমা সমস্ত পাঁচ ভূতে লুঠে পালাল, বুড়ি দেখেও দেখলে না —শেষে এখানে আর কেউ রইল না —এই বুদি আর ওই বুড়ি ছাড়া। বুড়ি খেতে পায় না দেখে আমি একদিন বললুম —'মাগো, কসায়ের কাছে আমাকে বেচলে তো পয়সা পাও, তা কর না কেন!' বুড়ি আমার গলা ধরে বললে —'বুদি সব ছেলে-মেয়ে

তোর দুধ খেয়ে মানুষ হল তোকে আমি কি ছাড়তে পারি।' আহা সেই আমার সেওাতনী মনিবনী, গিন্নি মা-জননী আজ নিজেই চলে গেল গো:, ওমা' —বলে সে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

রিদয় অনেকক্ষণ চুপ করে থেকেই বললে —'আহা বুদি, আমতলিতে মাকে আমি এমনি করে ফেলে এসেছি যে!'

বুদি বলে উঠল —'যাও কালই ফিরে যাও, না হলে হয়তো এই বুড়ির মতো ছেলে-ছেলে করে শেষে সেও মরবে। তোমার তো এখনো গিয়ে মাকে দেখবার সময় আছে কিন্তু এই বুড়ির ছেলেরা কী পোড়াকপাল নিয়েই জন্মেছিল, কখনো দেশে এল না, মা মরে গেল তাকেও দেখতে পেলে না!'

সকাল বেলায় মিউনিসিপালের মুর্দোফরাসগুলো এসে বুড়িকে পোড়াতে নিয়ে গেল, খটাস চলে গেল দিগ্বিজয়ে, নেউল চলে গেল মৃগয়াতে, রিদয় বুড়ির ঘর থেকে তার ছেলেদের নামের চিঠিখানি ডাকে ফেলে দিয়ে বুদিকে মাঠে রেখে খোঁড়ার কাছে ফিরে চলল। পাতি-জলার কাছ বরাবর এসে রিদয় দেখলে খোঁড়া হাঁস সকালে উঠে জলের মাঝে একটা মাটির ঢিপিতে দাঁড়িয়ে ডানা ঝাড়ছে, বালি হাঁস তখনো ঝোপের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। রিদয় সারারাত কিছু খায়নি, হাঁসের কাছে না গিয়ে সে বরাবর বুদিগাইটার পিছনে-পিছনে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। দু-একটা-পাত বাদামের চেষ্টায় রিদয় একটা শিরীষ গাছের উঁচুডালে কাঠবেড়ালিদের ঘরে ভিখ্‌খে করতে চলেছে। মস্ত শিরীষ গাছ, তার সব উপরের ডালে কাঠবেড়ালিদের খোপ বসতি, ঝোপ বসতি। এমনি এপাড়া-ওপাড়ায় রিদয় 'জয়রাম' বলে গান গেয়ে দাঁড়াচ্ছে আর কেউ এসে তাকে দুটো শুকনো ছোলা, কেউ একটা বাদাম, এমনি টুকি-টাকি ভিখ্‌খে দিচ্ছে। রামের দোহাই দিলে কাঠবেড়ালিদের ভিখ্‌খে দিতেই হয়, কিন্তু এক-এক কাঠবেড়ালি গিন্নী ভারি কিপটে, রিদয়কে দূর থেকে দেখেই বলছে —'ওগো ঘরে কিছু নেই, কর্তা

হাটে গেছেন, ওবেলা এস —এখন কিছু হবে না।' রিদয় পাকা ভিখিরী, সহজে ছাড়বে কেন, গান শুরু করলে :

বাসনা করায় মন পাই কুবেরের ধন
সদা করি বিতরণ তুমি যত আশ না
আস তাই আরো চাই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য পাই
ক্ষুধা মাত্র সুধা খাই মরি-মরি ফাঁস না
ফাঁসনা কেবল রৈল বাসনা পূরণ নৈল
লাভে হতে লাভ হৈল লোকে মিথ্যা ভাসনা।

কাঠবেড়ালি গিন্নী এতেও সাড়া দেয় না, রিদয় এবারে হিন্দী গান ধরলে ঃ

ধুম বড়া ধুম কিয়া খানে জোনে নাহি দিয়া
চহুঁয়ার ঘেরলিয়া ফোজ কি গিতাপয়া।
আরে চহুঁয়ার, আরে চহুঁয়ার।

এক থোকা শিরীষ-ফুলের তলায় দাঁড়িয়ে বুড়ো-আংলা পেট বাজিয়ে গাইছে, এমন সময় মনে হল তার কোমরের কাপড় ধরে কে টান দিচ্ছে, রিদয় ফিরে দেখতেই একটা কাক 'খাও' বলে তার ঠোঁট আর ডান হাতটা চেপে ধরলে, অমনি আর একটা কাক, তারপর আর একটা আর একটা এসে রিদয়কে ছোঁ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলল। ডোম-কাকের দল রিদয়কে চোখে-মুখে কিছু দেখতে দিচ্ছে না —'যকা-যকা' বলে এর মুখ থেকে ও, তার মুখ থেকে সে, এমনি রিদয়কে ফুটবলের মতো ছুঁড়ে দিতে-দিতে দল বেঁধে গোলমাল করতে-করতে চলছে' দেখে বুদি গাই 'ওমা-ওমা' করে চেঁচাতে-চেঁচাতে লেজ তুলে ছুটোছুটি করতে লাগল। ইচ্ছেটা কাকগুলোকে শিং দিয়ে গোঁতায়, কিন্তু তারা আকাশে সে বেচারা

মাটিতে —বুদি কেবল ধুলো উড়িয়ে মাঠে ছুটোছুটি করতে লাগল।

খোঁড়া হাঁসও আকাশে কাক দেখে —'ক্যা-ক্যা' বলে একবার ডাক দিলে, কিন্তু দেখতে-দেখতে কাকের দল অদৃশ্য হয়ে গেল।

রিদয় চটকা ভেঙে যখন চেয়ে দেখলে, তখন কাকেরা পাতি-জলা পেরিয়ে নাটবাড়ি ছাড়িয়ে কাকচিরের দিকে চলেছে। হাঁসের পিঠে আরামে উড়ে চলা এক, আর কাকের ঠোঁটে ঝুলতে-ঝুলতে চলা অন্য একরকম। রিদয় দেখলে জলা-জমি যেন একখানা ফাটা-ফুটো গালচের উল্টো পিঠের মতো পায়ের তলায় বিছানো রয়েছে, সবুজ লাল কালা কত রকমের যেন সুঁয়ো-ওঠা পশমে বোনা, বাঙলা-দেশের পরিষ্কার ছক-কাটা জমির মতো মোটেই নয়, জলগুলো দেখাচ্ছে যেন মাঝে-মাঝে ছোটো বড়ো আয়না ভাঙা।

দেখতে-দেখতে সূর্যি উঠল, আলো পেয়ে মাটি যেন সোনা রুপো আর নানা রঙের উলে-বোনা কাশ্মীরী শালের মতো দেখাতে লাগল। তারপরে জলা পার হয়ে বন-জঙ্গল মাঠ-ঘাটের উপর দিয়ে কাকেরা রিদয়কে নিয়ে উড়ে চলল! কাকেরা তাকে ধরে নিয়ে কোথায় চলেছে, কোথা রইল খোঁড়া হাঁস, কোথায় বা চকার দল, কোথা বুদি, কোথা বালি!

রিদয় ভয় পেয়ে চারদিক চাইছে এমন সময় ডোমকাক ডাক দিলে —'খবরদার!' অমনি সব কাক রিদয়কে নিয়ে জঙ্গলের তলায় নেমে পড়ল! চোরকাঁটার বনে রিদয়কে ঠেলে ফেলে গোটা পঞ্চাশেক কাক সঙিনের মতো ঠোঁট উঠিয়ে তার চারদিকে পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে গেল।

রিদয় গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে —'তোরা যে আমাকে বড়ো ধরে আনলি!'

ডোমরাজা দৌড়ে এসে বললে —'চুপ, কথা কবি তো চোখ ঠুকরে নেব!'

রিদয় বুঝলে এবার সহজে ছাড়ান নেই, এরা সব ডাকাতে-পাখি!

গোলযোগ করলে হয়তো মাথাটাই ফাটিয়ে দেবে। সে কী করে, শুকনো মুখে কাকগুলোর দিকে চেয়ে রইল। কাকগুলোও তাকে ঘিরে ধারাল ঠোঁট বাড়িয়ে একচোখে তাগ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

দূর থেকে দেখে রিদয় ভাবত কাকগুলো বেশ কালো চিকচিকে, যেন কালো আলপাকার চায়না-কোট পরা নতুন উকিল কোঁছিলের মতো, চালাক চতুর চটপটে। কিন্তু কাছ থেকে কাকগুলোকে রিদয় দেখলে কদাকার কালো কুচ্ছিত যতদূর হতে হয়, পালকগুলো রুখো মড়মড়ে যেন কালিতে ছুপোনো তালপাতা, পাগুলো গেঁটে-গেঁটে কাদামাখা খরখরে, ঠোঁটের কোণে এঁটো ঝোলঝাল মাখানো; একটা চোখ যেন ছানি পড়া আর একটা যেন ময়লা পয়সার মতো তামাটে কালো! কোথায় শাদা ধপধপে সুবচনীর হাঁস আর কোথায় এই কালো কুচ্ছিত কাগের ছা সব!

রিদয় এই কথা ভাবছে এমন সময় মাথার উপরে অনেক দূর থেকে হাঁসের ডাক এল—'কোথায়—কোথায়—' রিদয় গলা শুনে বুঝলে খোঁড়া তার সন্ধানে চলেছে, সেই সঙ্গে-সঙ্গে বালি হাঁসও ডাক দিয়ে গেল 'সেঙাত-সেঙাত!' বনের ওধারটায় বুদিও একবার হাঁক দিলে—'ওগোঃ ওগোঃ!' রিদয় বুঝলে তিনজনেই এসেছে, সে অমনি হাত নেড়ে হেথায় বলে চেঁচাতে যাবে আর ডোমরাজা ছুটে এসে ধমকে বললে—'কিও! আয় দিই চোখ দুটো খুবলে!' রিদয় অমনি মুখ বুজে গোঁ হয়ে বসল।

হাঁসেরা চলে গেল, বুদি গাইও ডেকে-ডেকে থামল, তখন ডোমকাক হুকুম দিলে—'উঠাও!' দুটো কাক তাকে আবার ঠোঁটে ঝুলিয়ে নিয়ে ওড়বার চেষ্টায় আছে দেখে রিদয় বললে—'বাপু তোমাদের মধ্যে কেউ পালোয়ান কাক থাকে তো আমাকে পিঠে করে নিয়ে চলো, অমন ঝোলাঝুলি' করলে আমার হাত পায়ের জোড় সব খুলে যাবে যে!'

ডোমকাক ধমকে বললে—'চলো-চলো, অত বাবুগিরিতে কাজ

নেই। কাগে চড়বেন এত সুখ তোর কপালে—আমরা কি ঘোড়া যে তোকে পিঠে নেব!'

এবারে ঝোড়োকাগ এগিয়ে এসে বললে—'মহারাজ, মানুষটাকে হাড়গোড় ভেঙে দ করে নিয়ে গেলে তো ওটা আমাদের কোনো কাজে আসবে না, আমি বরং ওকে পিঠে নিই, কী বলেন?'

ডোমকাক মুখ সিঁটকে বললে—'তোমার ইচ্ছে হয় তো ওর পালকি বেহারার কাজ করতে পার, কিন্তু দেখো পালায় না যেন?'

রিদয় দেখলে ঢোঁড়াকাগটা ওর মধ্যে দেখতে-শুনতে ভদ্দর রকম, সে আস্তে-আস্তে তার পিঠে চড়ে বসল।

কাকের দল ক্রমাগত দক্ষিণ মুখেই উড়ে চলেছে। পরিষ্কার দিনটি খটখট করছে, চারদিকে যেন বাতাস আর আলো ছড়িয়ে পড়েছে, বনের শিয়র দিয়ে রিদয়কে নিয়ে কাকরা উড়ে চলল।

রিদয় দেখলে বৌ-কথা-কও পাখি বকুল গাছের আগডালে বসে বৌকে শুনিয়ে কেবলি গাইছে—'কথা কও বৌ কথা কও, মাথা খাও বৌ কথা কও!' রিদয় অমনি বলে উঠল—'কথা কইবে কী ছলে, কথা শুনলে গা জ্বলে!'

'কে রে?' বলে হলদী পাখি আকাশের দিকে ঘাড় তুলতেই, রিদয় তাকে শুনিয়ে বললে—'কাকে-ধরা যক্! কাকে-ধরা যক্!'

ডোমকাক অমনি ধমকে উঠল—'আবার কথা!'

আরো দক্ষিণ-মুখো গিয়ে রিদয় দেখলে আমবাগানের মাথায় ঘুঘু বসে তার বৌকে গান গেয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছে আর গলা ফুলিয়ে আদর করে ডাকছে—'বুবু ওঠো দেখি মুমু।'

রিদয় অমনি বলে উঠল—'আদর দেখ উহুঃ।'

ঘুঘু গলা তুলে বললে—'কে রে কে রে?'

রিদয় তাকেও শুনিয়ে দিলে—'কাকে-ধরা যক্!'

এবার ডোমকাক রেগে রিদয়কে ডানার থাপ্পড় দিয়ে বললে—'ফের বকচিস, চুপ!'

ঢোঁড়াকাক বলে উঠল —'বকুক না যত পারে, পাখিগুলো ভাবচে আমরাও ঠাট্টা-তামাশা শিখেছি।'

ডোমকাক আর উচ্চবাচ্য করলে না। রিদয় ঘাঁটিতে-ঘাটিতে সব পাখিকে জানিয়ে দিতে-দিতে চলল—তাকে কাকে ধরেছে!

এমনি বন ছাড়িয়ে তারা একটা নগরের উপরে এসে পড়ল। নদীর ধারে মস্ত শিব-মন্দির, তারি চুড়োয় ত্রিশূলের ডগায় বসে শালিক তার বৌকে শুনিয়ে রাগরাগিণীতে গলা সাধছে; বৌ তার পঞ্চবটির বাসায় ডিমে তা দিচ্ছে আর কর্তার গান শুনছে —'সা রে গা মা পা —চারটে ডিমে তা, ধা নি সা —তুই জোড়া ছা।'

রিদয় অমনি আকাশ থেকে বলে উঠল —'কাগে খাবে গা।' শালিক 'কেও?' বলে মুখ ফেরাতেই রিদয় শুনিয়ে দিলে —'কাকে-ধরা যক্।'

যতই দক্ষিণ দিকে এরা এগোতে থাকল ততই বড়ো-বড়ো নদী খাল-বিল ক্ষেত মাঠ-ঘাট গ্রাম-নগর দেখা দিতে থাকল। একটা মস্ত বিলের ধারে একটা হাঁস আর একটা হাঁসের সামনে দাঁড়িয়ে কেবলি ঘাড় নাড়ছে আর বলছে, 'চেয়ে দেখ্ আমি তোরি চিরদিন আমি তোরি।'

রিদয়ের মনে হল যেন খোঁড়া আর বালি দুজনে কথা কইছে; সে অমনি তাদের শুনিয়ে বলে উঠল —'এসা দিন রহে থোড়ি রহে থোড়ি!'

'কেও —কেও?' বলে হাঁস মুখ ফেরাতেই রিদয় শুনিয়ে দিলে — 'কাকে-ধরা যক্!' অমনি যাকে দেখে, তাকেই নিজের খবর শুনিয়ে দিতে-দিতে রিদয় চলেছে!

বেলা দুপুর, কাকের ঝাঁক এক মঠের জমিতে নেবে সড়া পেসাদ খেতে আরম্ভ করলে। রিদয় খেলে কিনা সে দিকে কারু লক্ষ্য নেই। ডোমকাক রিদয়কে আগলে বসে আছে, এমন সময় ঢোঁড়াকাক একটা ডালিম এনে ডোমকাককে বললে —'মহারাজ দুটো ফল খেতে আজ্ঞে হোক্!' ডালিম ভাঙা কাকের কর্ম নয়, তা ঢোঁড়াকাক

জানত —ডোম-রাজা নাক তুলে বললে —'ওই শুকনো ফল আমি খাব, থুঃ!' ঢোঁড়া অমনি সেটা রিদয়ের পায়ের কাছে ফেলে তাড়াতাড়ি রাজার জন্যে যেন ভালো ফল আনতেই যাচ্ছে এইভাবে ছুটে পালাল। রিদয় বুঝলে ঢোঁড়া তার জন্যেই ডালিমটা এনেছে; সে অমনি সেটা দাঁতে চিবিয়ে ছালসুদ্ধ খেয়ে ফেললে।

ভাত খেয়ে ডোমরাজ মঠের চুড়োর উপরেতে গেলেন, অন্য সব কাক খেয়ে-দেয়ে পেট ভরিয়ে রিদয়কে ঘিরে গান গল্প শুরু করলে। পাতিকাক দাঁড়কাককে শুধোলেন —'দাদা চুপচাপ ভাবছ কী শুনি!'

দাঁড়কাক গলা খাঁকনি দিয়ে বললে —'ভাবছিলেম এই তল্লাটে এক মিয়া সাহেব একটি মুরগি পুষেছিল, মুরগি ঐ মোছলমানের বিবিকে এতো ভালোবাসত যে তাকে খাওয়াবার জন্যে লুকিয়ে বিবির পানের ডাবরে গিয়ে চারটে করে ডিম পেড়ে আসত। মিয়া ডিম খুঁজে-খুঁজে হয়রান, তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে কে একটা চালাক কাক সেই লুকানো ডিম খুঁজে বার করেছিল, না? তার নামটা কী মনে পড়ছে না। সে কি তুমি না আমি, না ওই ডোম না এই ঝোড়োকাক?'

পাতিকাক বলে উঠল —'ওঃ! বুঝেছি, আচ্ছা শোনো দেখি বলি, বোষ্টম-বাড়ির সেই কালো বেড়ালটাকে মনে আছে তো? সেই যেটা বোষ্টম বোয়ের হেঁসেলের মাছ রোজ নিয়ে পালাত, কোথায় সে লুকিয়ে মাছটা রাখত তা বোষ্টম না বোষ্টমী না কালো কেউ টের পেত না, সেই মাছের সন্ধান কে-কে পেয়েছিল দাদা, তুমি না আমি, রাজা না মন্ত্রী?'

সব কাক অমনি এগিয়ে এসে নিজের-নিজের বড়াই করতে আরম্ভ করলে। কেউ বললে —'মাছ চুরি আবার একটা কাজের মধ্যে, আমি একবার একটা খরগোসের লেজ ঠুকরে দিয়েছিলাম; আর একটু হলেই সেটাকে নিয়ে চিলের মতো ছোঁ দিয়ে উড়েছি আর কী, এমন সময় সেটা তার গর্তে সেঁধিয়ে গেল!'

আর এক কাক বলে উঠল —'আরে বাবা খরগোসছানা

বেড়ালছানা এদের নিয়ে খেলা করছ—মানুষের কাছে কখনো এগিয়েছ? আমি একবার ফিরিঙ্গির বাড়িতে গিয়ে তাদের টেবেলের রুপোর কাঁটা চামচে চুরি করে সাফ বেরিয়ে এসেছি, একটি পালকে পর্যন্ত আঁচড় লাগেনি!'

রিদয় থেকে-থেকে বলে উঠল—'এই বিদ্যের আবার এত বড়াই, এই বেলা ওসব চুরিচামারি ছাড়ো, না হলে মানুষ বিরক্ত হয়ে একদিন এমন গুলি চালাতে আরম্ভ করবে যে কাকবংশ ধ্বংস করে তবে ছাড়বে!'

'কী বলিস?' বলে সব কাক রিদয়কে তেড়ে এল, মনে হল এখনি তাকে ছিঁড়ে খাবে।

ঢোঁড়াকাক তাড়াতাড়ি সবাইকে ঠাণ্ডা করে বললে—'ছেলেমানুষ কী বলতে কী বলেছে। থামো হে ওকে মেরো না, রাজা তাহলে ভারি দুঃখিত হবেন! মনে নেই সেই যকের ধনটা বার করা চাই। ছোঁড়াটা না হলে সে কাজটা করে কে? তাছাড়া এটা মানুষ, একে মারলে পুলিস হাঙ্গামা হতে পারে।'

কাকেরা রিদয়কে আর কিছু না বলে ঢোঁড়াকেই ধমকাতে লাগল—'হাঃ মানুষ, ভারি তো উনি বড়োলোক যে ভয় করতে হবে, ঢের-ঢের অমন মানুষ দেখেছি—'

এই সময় ডোমকাক উপর থেকে হাঁক দিলে—'চালাও!' এবারে কাকের দল রিদয়কেনিয়ে কাকচিরার পতিত জমির দিকে চলেছে—গ্রাম নগর আর দেখা যাচ্ছে না, কেবল ধূ-ধূ বালি আর কাঁটাগাছ। মানুষ নেই গরু নেই—কেবল আগুনের মতো রাঙা সূর্যটা পশ্চিম দিকে ডুবছে—সমস্ত আকাশে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়ে।

ভর সন্ধ্যেবেলা ডোমকাক রিদয়কে ধরে নিয়ে কাকচিরার জঙ্গলে এসে নামল। ডোমকাক দূত হয়ে আগে গিয়ে সবার বাসায় খবর দিলে রাজা এলেন, অমনি সব কাকনী 'বা-বা-বা তোবা-তোবা' বলে বাসা ছেড়ে তামাশা দেখতে ছুটল।

শেয়ালের দল আহ্লাদে লেজ ফুলিয়ে হাঁক দিলে —'হুয়া —কয়েদ হুয়া, তোফা হুয়া!' চারদিকে হৈ-চৈ-ক্কা-ক্কা-হুয়া শব্দ উঠেছে, তারি মধ্যে ঢোঁড়া রিদয়ের কানে-কানে বললে —'আমি তোমার দিকে আছি, দেখো খবরদার ওদের কথা শুনে কোনো কাজ কোরো না। কাজ করিয়ে নিয়েই তোমায় মেরে ফেলবে, সাবধান।'

ডোমকাক এসে রিদয়কে টানতে-টানতে সেওড়াগাছের গোড়ায় গর্তটার মধ্যে নামিয়ে দিলে, রিদয় যেন জেরবার হয়ে পড়েছে এমনিভাবে আধমরার মতো গর্তের মধ্যে শুয়ে পড়ল। ডোম রাজা ডাকলে —'ওঠো, যা বলি তা করো।' রিদয় যেন শুনতেই পেলে না, চোখ বুজে রইল। ডোম তাকে ধরে যকের পেঁটরার কাছে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বললে —'খোল্ এটা।'

রিদয় ধাক্কা দিয়ে ডোমকে সরিয়ে বললে —'খিদেয় পেট জ্বলছে এখন আমি কাজ করব? আজ রাত্তিরটা না ঘুমিয়ে নিলে আমি কিছু কাজ পারব না, গা-হাত-পা টাটিয়ে গেছে।'

'খোলো আভি!' বলে ডোম রিদয়কে ঝাপটা মেরে পেঁটরার গায়ে ঠেলে দিলে; রিদয় গোঁ হয়ে পেঁটরা ধরে নেড়ে বললে — 'বাবা, যে মরচে-ধরা তালা, এ তো খোলা সহজ নয়, আজ খেয়ে-দেয়ে গায়ে জোর হোক, কাল তখন দেখা যাবে!'

ডোম রেগে রিদয়ের গায়ে এক ঠোকর বসিয়ে বললে —'খোল্ বলছি!'

রিদয় এবারে আর রাগ সামলাতে পারলে না, ডোমকে এক থাপ্পড় কষিয়ে কোমর থেকে ছুরি বার করে বললে —'ফের বজ্জাতি, পাজি কোথাকার!'

ডোমকাক রাগে আর চোখে দেখতে পাচ্ছে না —'তবে রে' বলে সে রিদয়ের উপরে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ল, অমনি রিদয় ছুরিটা তার চোখে বসিয়ে দিলে। ডোমকাক দু'বার ডানা ঝটপট করেই অক্কা পেলে।

'হত্যা হুয়া, হত্যা হুয়া,' বলে শেয়াল চেঁচাতে লাগল, 'ক্যা-ক্যা'

বলে কাকরা গোলমাল করে তেড়ে এল। ঢোঁড়া বোকা সেজে কেবলি রিদয়কে আড়াল করে-করে ডানা ঝাপটাতে লাগল, যেন কতই রেগেছে এইভাবে। রিদয় বিপদ গুণে পেঁটরাটা জোরে টেনে খুলে তার মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগল। পেঁটরাটা কিন্তু টাকায় পয়সায় ঠাসা, তার মধ্যে জায়গা নেই দেখে দু-চার মুঠো পয়সা বাইরে ছড়িয়ে ফেললে।

এতক্ষণ কাকরা হট্টগোল করছিল যেন কাঙালী বিদেয়ের ভিড় লাগিয়েছে। পয়সা পড়তে সবাই ছোঁ দিয়ে এক-একটা তুলে বাসার দিকে দৌড় —চকচকে পয়সা পেয়ে তারা রাজা, রাজহত্যা সব কথাই ভুলে গেল।

সব কাক যে-যার ঘরে গেছে, তখন ঢোঁড়াকাক এসে রিদয়কে বললে —'তুমি জানো না আমার কী উপকার করছে। এস আমার পিঠে চড়ো আমি তোমাকে এমন জায়গায় রেখে আসব যেখানে শেয়ালের বাবাও আর ধরতে পারবে না।'

এত ছুটোপাটির পর রিদয়ের ঘুম পাচ্ছিল, সে কাকের পিঠে চড়ে ঢুলে-ঢুলে পড়তে লাগল! ঘুমের ঘোরে তার যেন মনে হল অন্ধকারে কাকের চেহারাটা গণেশের ইঁদুরের মতো হয়ে যাচ্ছে — কাক বগ হাঁস শেয়াল সব এক সঙ্গে তার মাথার ভিতরে ঘুরছে। এমন সময় আকাশ থেকে যেন বোধ হল চকার দল হাঁকলে —'কোথায় ?'

'হেথায়' বলে যেমন রিদয় চেয়েচে অমনি দেখলে কোঁ করে দরজা খুলে গণেশের মতো মোটা পেট নিয়ে তার বাপ ঘরে ঢুকে বললেন —'কিছু ভাঙিসনি তো ?'

রিদয় ভয়ে-ভয়ে একবার কুলুঙ্গিটার দিকে চেয়ে দেখলে যেখানকার গণেশ সেইখানেই রয়েছে —দুবার মাথা চুলকে রিদয় এক দৌড়ে বাড়ির উঠোনে এসে দেখলে খোঁড়াহাঁস পুকুরপাড়ে একটা বুনো হাঁসের সঙ্গে ভাব করছে —আর একটা ঝোড়োকাক চালে বসে 'কা-কা' করে ডাকছে— গোয়ালঘর থেকে কপ্‌লে গাই

ডাক দিলে 'ওমঃ', ঠিক সেই সময় একটা গুগলি পুকুর ঘাট বেয়ে আস্তে-আস্তে জলে নেমে গেল।

রিদয় পুকুর পাড়ে হাঁ করে কী ভাবছে দেখে রিদয়ের মা কাছে এসে বললে '—কী হল তোর?'

রিদয় মাথা চুলকে বললে—'মা, আমি কি সত্যিই বড়ো হয়ে গেছি?' বলে আপনার মাথায় হাত বুলোতে লাগল!

সেই সময় ডালিমগাছে টুনটুনি পাখি বলে উঠল—'ওকী রিদয় হল কী!'

'মাথা আর মুণ্ডু হল!' বলে রিদয় পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতার আরম্ভ করলে।

রিদয়ের মা চেঁচিয়ে বললে—'এত বড়টি হলি তবু তোর ছেলেমানষি গেল না। উঠে আয়, পাঠশালায় যাঃ।'

হানাবাড়ির কারখানা

৹

অ. ৩য়—২৩

ভূমিকা

আষাঢ়ান্ত বেলায় রোদ পড়ো-পড়ো। বেড়াল-বৌ হুঁকোর নলের জন্য আমতলায় পাতা খুঁজে বেড়াচ্ছে, সোনাতন টিকে ধরাচ্ছে, এমন সময় 'তারৎ বহ্মাস্বনাতন দ্দীননাথ দ্দীনবন্দো' বলে হাঁক দিতেই সোনাতন খাতাঞ্চি মশার ঘরে ঢুকে বললে —'কর্তা ডাকছেন' ?

'আরে তোরে ডাকব কেন ? হঠাৎ শ্বশুর বাড়ির স্বপন দেখে ডরিয়ে উঠেছি!'

সোনাতন বললে —'কর্তা, তবে যে শুনতে পাই, লোকে বলে থাকে— অহ্বারে খেলো হুংহারে ছার শ্বশুর মন্দির। তার নামে কর্তা কেন হয়েছেন অস্থির —এ তো বুঝলাম না।'

'তুমি বুঝবে না সোনাতন, তুমি বুঝবে না। আমার শ্বশুরবাড়ি তো নয় —একটা হানাবাড়ি। তুপুলিয়ার সে রাজবাড়িটার কাণ্ড-কারখানা শুনতে চাও তো যাও জীবন গোঁসাই, জগদ্রাম মুনশি, ঢোলারাম চণ্ডুকে খবর দাও। আর খুদিরামকে বলো একটু বেশী করে রামপাখির মালসা-ভোগ চড়িয়ে দেন। সবাই মিলে কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ আহার করে হানাবাড়ির কারখানার আলোচনা করা যাবে।'

দু-জোড়া রামপাখির বাচ্চা, একগণ্ডা রাজ-হাঁসের ডিম, খানকয়েক লেঁড়ু বিস্কুটের গুঁড়ো, কিছু চিঁড়ে দৈ জিরে-ভাজার সঙ্গে মিলিয়ে ঠিক রাত আটটায় মালসা-ভোগ নামালেন খুদিরাম। খাতাঞ্চি তিন বন্ধুর মাঝে বসে কেবলি ঘড়ি দেখছিলেন, হাই তুলছিলেন আর ঘন ঘন তুড়ি দিচ্ছিলেন। মালসা-ভোগ আসতে চার বন্ধুতে সাবাড় করে হাত মুখ ধুয়ে বৈঠক জমিয়ে বসলেন।

মালসা ফেলিয়ে সোনাতন, খুদিরাম আর থামের আড়ালে বেড়াল-বৌ হানাবাড়ির কারখানা শুনতে বসে গেল।

শ্রুতির খুদিরাম কতক মনে রাখলেন, কতক সাঁটে খাতায় টুকে রাখলেন। একটা কারখানা বলেন খাতাঞ্চি, আর একটা বলেন গোঁসাইজী, একটা বলেন জগমুনশি, একটা বলেন চণ্ডু মশাই। এমনি ভাবে হপ্তায় নয়টা করে মালসা পোড়াতে-পোড়াতে দিন ছোটো, রাত বড়ো হয়ে উঠল। তখন মালসার সঙ্গে রামপাখিরও দর এত চড়ে গেল যে আর তখন বৈঠক বসানো অসম্ভব হয়ে পড়ল। তখন খতম হলো হানাবাড়ির কারখানা। চাপা যন্ত্রে চাপা গেল তারপরে পুরা গ্রন্থ ব-কলম।

উনপঞ্চাশ মহল নিয়ে দুপুলিয়ার সাবেকি আমলের রাজবাড়ি— এখন হয়েছে সেটা হানা-বাড়ি।

এই দুপুলিয়ার রাজবাড়ির দুমুখে ছিল দুটো পুল।

তার এক পুল দিয়ে ঢুকত বিয়ের বরাত, আর এক পুল দিয়ে বার হত মড়ার-খাট —এই ছিল দস্তুর।

পাটরানী থেকে ফুলবউ, এর মাঝে অগুন্তি বাঁদী, এক-এক রাজার বিয়েতে যৌতুক করা —উনপঞ্চাশ মহলা বাড়িতে কৌতুকে থাকত ধরা। কোন্ রানী মলে কে নেবে তার স্থান, এই নিয়ে চলত তাদের মধ্যে আড়াআড়ি।

জলটুঙি, হামাম, কাচমহল, খাসমহল, রানীমহল এ তো ছিলই, তার উপরে কোঠার পর কোঠা, কুঠরির পরে কুঠরি, ঘরের পরে ঘর—সব ঘরের খবর নির্ণয় করতে হারি, এত বড়ো সে দুপুলিয়া রাজবাড়ি।

সে সংসারে যে একবার ঢুকল সেই বুঝল যন্ত্রণা নেই বেঁচে থাকার তুল্য। জানের মূল্য নিয়ে তাই কেউ করত না বাড়াবাড়ি।

কুল-কিনারা পাওয়া যেত না এত বড়ো ফুল বাগান, তারি মধ্যে শ্বেত পাথরের বাঁধানো ফুলটুঙি ঘর—তিন দিকে তার ফুলের কেয়ারি, একদিকে সান্ নদী—একবেলা লাগে দিতে পাড়ি।

উড়ো ভাষায় শোনা যায় — এই ফুলটুঙির বাগিচায় এল একদিন রানীর সাজে কোন্ এক ফুলমালির মেয়ে ; দোল-পূর্ণিমায়, এক হাতে রাজার হাত, আর এক হাতে পিচকারি। মধুরাত পূর্ণিমার, ঘড়ি পড়ল একটার —হয়ে গেল সুন্ সান্ রাজবাড়ি বাগান। সকালে দেখা গেল ফুলমালির মেয়ে কোথা ভেসে গেছে সান্ নদী বেয়ে, ফুলটুঙি ঘরে ফুলের বাসর রেখে খালি!

হুকুম হল রাজার—ফুলটুঙি মহল ধোলাই করবার—ধারা দিয়ে পড়ল নালি বহে আবীর কুমকুম্ কেশরের লালি।

শ্বেত পাথরের টালি যেমন শাদা ছিল তেমনি হল, শুধু লেগে রইল পাথরের তক্তে যেন লোহার কষের মতো, শক্ত চাপ রক্তের মতো রাঙা দাগ একটা দাঁড়ি।

ওঠানো গেল না ঘষে সেটা জল বালি।

মস্ত রাজবাড়ির মস্ত কারখানা, তার মধ্যে কে করে ঠিকানা —দাগটা রেখে গেল কিনা যাবার কালে ফুলওয়ালী।

বাদ এক বছর। ছুপুলিয়াতে দেয়ালি রাতে আকাশ পাঠাল ঝড় জলের ঝাপটা: দশটা কি এগারোটা কে করে ঠিক: হাওয়া কাঁদছে, যেন প্যাঁচার খপ্পরে চেঁচাচ্ছে শালিক!

হয়ে ত্রস্ত, রাজারে খবর দিল নফর—অন্দরের দোরে কড়া নাড়ছেন এক কাপালিক—হাতে একখানা কাস্তে মস্ত!

হুকুম হলো ফুলটুঙি ঘরে কাপালিককে বাসা দিতে। বসবে ভৈরবী চক্কর—বুঝে নিল নফর রাজার একটু ইঙ্গিতে।

সেদিন ফুলটুঙি ঘরে রাত দুই প্রহরে বাঘাসনও পড়ল রাজাসনও পড়ল দুই জনার। হুকুম নাই চাকর নফর কারো ঢোকবার, কি চৌকিদার কি চোপদার।

বাহিরে ঝড় ঝাপটার মাতন ফুলবাগান দলে ফুলটুঙিতে।
ভিতরে ফিরছে ঘন ঘন কারণ মরা মানুষের মাথার খুলিতে।
ঝড়ের গর্জনে মিলছে থেকে-থেকে অট্টহাস।
ঝন্‌ঝন্ দুলছে ঝাড়, পর্দা উড়ছে এপাশ-ওপাশ।
শব্দ হচ্ছে, যেন নৃত্য করছে দুটো পিশাচ।

রাজার খাস কামরার আলো জ্বলছে নিভছে, দেখা যায় ঘুলঘুলিতে।

ক্রমে দেয়ালির রাত হল অবসান—ভোরের আলোতে অস্পষ্ট প্রতীয়মান ফুলটুঙির ভাঙা ফুলবাগান। ফুলটুঙি ঘরে জাগাতে গিয়ে রাজারে, দেখে গিয়া ভোর বেলাতে নফরে—না কাপালিক,

না রাজা কেউ বর্তমান! ঘরটার ভর্তি পোড়া মাংস আর তাজা রঙের ঝাঁজা গন্ধ। সে পায়ে-পায়ে পিছিয়ে দোর করে দিলে বন্ধ। মহল ধোলাই করিয়ে ভৈরব দেয়ান নীরব থাকতে হুকুম দিলেন বাগেয়ানকে শপথ দিয়ে শক্ত।

হাত ফেরাল ফুলবৌয়ের যাবার পর হুপুলিয়ার রাজতক্ত। কেউ বললে, রাজাটা ছিল মহাপাপী, কেউ বললে ছিল মহা ভক্ত।

কাচমহল, খাসমহল, বিবিমহল, মালাঘর, তারপরে গড়বন্দী আঁধার কোটা খাজনা ঘর। মোহরার সেখানে বসে দুপুর রাতে দুপুলিয়ার খাস তহবিলের হিসেব রাখে ঘড়া উলটে ঢেলে মোহর —এক হাতে দাঁড়িপাল্লা, আর এক হাতে মাল্লাদের জল-সেঁচা ডোঙার মতো চৌকোনা গাম্ভার কাঠের পাত্তর।

এমন মোটা দেয়াল, ভারি দরোজা খাজনা-খানার যে ঝন্‌ঝন্ টাকা ঢাললে শব্দ পৌঁছায় না বাহিরে তার। সেখানে সাবধানে ওজন করছেন রাজার প্রয়োজনের নিজ খরচি খাস-মোহরার যেন একটা বুড়ো যক্ষি পিদুমের আলো পড়েছে টাক মাথার উপর ; ভিতর হতে দুয়োর বন্ধ, কোমরে ঝুলছে চাবি শিকলি তার — বাহিরের কারো উপায় নাই হঠাৎ প্রবেশ করবার। কী করে সেখানে সিঁদ-কাঠি, কী করে শাবল !

খাজনা ঘরের পারে গন্না-কাটার মাঠ। তার একধারে খাড়া সামনা-সামনি দুটো ফাঁসিকাঠ —তাতে ঝুলছে একটা মড়া —কে জানে কোন্ কালে ফাঁসিতে চড়া —শুকিয়ে ফেলেছে সেটারে কত দিনের হিম-জল-রোদ। দুলছে সেটা আজ —করছে যেন বোধ — প্রাণ পেয়ে গেছে অকস্মাৎ। তারি শিয়রে রাত দুপুরের ঝড়ে পড়ছে নজরে গ্রহণে খাওয়া খানিকটা চাঁদ।

এত ঝড়ে বার হয় না কুকুর শেয়াল —ফাঁসি-কাঠের তলে জুটেছে বেঘোরে কালো মূর্তি চার। এ ওরে বলছে —কে আছ রে জোয়ান —ভেঙে আনো দেখি কবজি সইতে মরা মানুষের হাতের মুটখান ! আঁধার ঘুট-ঘুট, কে উঠবি উঠ, ফাঁসি-কাষ্ঠে কে আছিস শেয়ান। ধর গন্না-কাটা নাপিতের দাড়ি-কামান আস্তরি —কেটে

আন মড়ার মাথার পাঁচ গাছা চুলি। দেখে না যেন ভূতের দেয়ান। পালোয়ান —কে…কে আছিস্ ধর না চেপে মড়াটার উলটো পা দু-খান।'

'হয়েছে ; হয়েছে, যা চাই হাত হয়েছে।'

'আরে মড়ার বেম্মতালুটা কোন্ দিকে রয়েছে!'

'ওরে টিকি থাকে যেদিকে।'

'নে চট্‌পট্ ঘুরে দে টান। রাত হচ্ছে ফিকে, চোরের মায়ের ঘরের দিকে কাজ সেরে দে পিট্টান।'

চোরের মা থাকে সান্ নদীর বাঁকে, বুড়ির বয়েসের গাছ-পাথরের হিসাব ধরে কে! তবক্ষুর মতো কোটর-গত চক্ষু দুটো তার, নাকটা যেন সাতকেলে কাল পেঁচার। উনুন-মুখী উকুন বাছতে আছে একটা রামছাগলার —কোলের পরে রেখে। তারে দেখে মনে হয় ছাগলীর মা বুড়ি —ছাগলের শিং-এ মারে সে ঘামাচি ফুসকুড়ি। কেউ তারে বলে ডাইনি বুড়ি, যক্ষি বুড়ি, খায় শেয়ালের নাড়ি-ভুঁড়ি। কাল পেঁচি আর দাঁড়-কাগের জুড়িদার সে, বসে আছে কম্বল মুড়ি। চোখের তারা তার কালো বেড়ালটা, দিষ্টি দিয়ে রাতে জ্বলে। সে খায় ইঁদুর ভাজা ধরে খাঁচা-কলে। চোরেরা সবাই তারে উলটো-মা বলে। সে যদি পড়ে দেয় উলটো মন্তর ভিতরের আগড়ে —কী করে আপনি খুলে যায় রাজ-ভাণ্ডারের দোর — অক্লেশে সেঁধিয়ে যায় চোর!

পালটা মন্তর ঝাড়ে যদি বুড়ি —বাহির থেকে কপাট পড়ে যায়, অঘোর নিদ্রায় সবাই পড়ে ঢুলি —চোর পালিয়ে যায় বহে চোরাই মালের ঝুড়ি —ভয়ানক বুড়ি সে থুথুড়ি।

চার চোর তারে দাঁড়াল ঘিরে, বুড়ি পাকাল সলতে মড়ার চুল চিরে। মড়ার মুঠাতে ধরিয়ে দিলে সেটা -- ফু ক-মন্তর একটা পড়ল বুড়ি ধীরে ধীরে —

'খোল খোল আগল কুলুপ কুঞ্জি
খোল নিঃসাড়ায়, এই দুই তিন গুন্‌তি।
জ্বলছে পিদুম মড়ার হাতে
আলো পড়ুক ধনের ঘড়াতে
তিন দুই এক গুনতি।
কাক পেঁচা থামাক চেঁচামেচি, ঘড়ি থেমে যাক।
উলটাক পালটাক চার কড়া কড়ি ঘেঁচি
চোর পালাক তো বুদ্ধি বাড়াক।
কুবের ভাণ্ডারে বেঙ্গী এদিক ওদিক ফিরে
বসে থাক দুই তিন এক, এক দুই ফাঁক গুনতি।'

মন্তর পড়া মড়ার মুঠার চাপে দুপুর রাতে মড়ার মতো ঘুমিয়ে আছে দুপুলিয়ার লোক। বাঘের ঘরে ঘুমায় বাঘ — দুপুরিয়া ডাকাত দুপুলিয়ায় ঢোকে —বাঘের ঘরে যেমন ঘোগ্!

মড়ার হাতে চেরাগ প্রদীপ, পগার পারে করল ঝিক্‌মিক — যেন আঁধার কোটার বাহিরে একটা জ্বলছে নিভছে জোনাক পোক্।

মড়ার হাতের উলটো মন্তরে অবাধে চোর যায় চলে —শব্দ হয় না, পা পিছলায় না, দোর আলগায় না আগড় কুলুপ, অন্ধকারে প্রকাশ পায় সুন্‌সান্ রাজবাড়িটায় যা আছে যেথায় —চোর জেনে যায় অলিগলির সন্ধান সুলুক।

নিঃশব্দে খোলে খিড়কি দরজা —যেন তেল-পালিশে সাফ মির্চি-ধরা কল-কবজা। অলি-গলি চোর যায় চলি —মড়ার মুঠায় চুলের সলি—আলো ফেলায় সবজা! পড়ে চার চোরের পা উলটো মন্তরে —তিন দুই এক, দুই এক তিন করে, যায় ধাপে ধাপে সিঁড়ি চড়ে। কারো দেখা নাই, ঘুমায় অঘোরে শান্ত্রি-সেফাই — সং যেন রেখেছে কেউ মাটিতে গড়ে। শ্বেত পাথরের কাটা, জালি দিয়ে ঘেরা ঘুমায় আসান্ পাষাণ। সান্-নদী পারে দুপুলিয়ার জানানা মহলটা—

কাচমহল, নাচমহল, খাসমহল — মহলের পর মহল, কোথাও নাই পাহারা টহল—ঘড়িয়াল ঘুমায় পড়ি, রাত কত ঘড়ি খোঁজ নাই সেটা।

বুড়ি দিয়েছে উলটো মন্তর পড়ি দু-কুড়ি নয় বার। সময় পায়নি কুলুপ লাগাতে খাজনা খানার খাস মোহরার—ঘুমের তাড়াতে বাসাতে শুয়ে আছে বেহুঁশিয়ার!

জীবন্ত যা-কিছু দেখে ঘুমেতে কাতর, চার চোরে পাতল চক্কর, খাজনা ঘরের কাছ-বরাবর।

গ্রহণের চাঁদ—ধরেছে যেন সোনার ডাবরের ছাঁদ, আঁধার কোটার আলিসার পর।

'খোল খোল আগল কুলুপ কুঞ্জি,
খোল যা আছে বন্ধ—
পেয়ে মড়ার হাতার চুল-পোড়া গন্ধ।
পোহাতে না পোহাতে রাত
খোল খাজনা খানার বন্ধ কপাট
ফাঁসিতে লট্‌কা মরা-মানষের হাত।
চল্ ছুরি ছোরা, শাবল, হাতুড়ি, সিন্ধুক
তোড়া,
ধনের ঘড়া, টাকার তোড়া হাতাক চোর রাত
ঘোরা!
তার পরে ওঠে তো উঠুক চন্দ্র—
তার আগে যদি কেউ ওঠে—
মড়ার হাতের মুঠায় থাক খাঁড়ার
চোটে হয়ে কবন্ধ।'

বন্ধ দোর সহজে খুলল, চার চোর ঢুকল পায়ে-পায়ে চলি। জ্বলে উঠল মড়ার মুঠাতে মন্তর পড়া মড়ার চুলের সলি!

সোনা রুপার ঝলক,—চার চোরের চোখে লাগাল চমক। চৌকাঠ মাড়াতে চোরে সাক্ষাতে খুলে গেল খাজনার সিন্দুক — শব্দ দিলে ক্রুম বন্দুক। কোথা ছিল কলের মুরুগ ব্যাঙ্গ দিল —চোর পড়া হু রে বরকন্দাজ আচানক্!

কলের মন্তরে খাজনা ঘরে দোর পড়ে গেল —উলটা-পালটা মন্তরে হাতুড়ি শাবলে কল-ঘরের কল-কবজা পথ দিলে না চোর পালাতে আজ।

কলের মোরগের চিৎকারে ভৈরব দেয়ান জাগল যখন যা হল তখন বলে আর কী কাজ।

গোবিন্দ ঘোষের আদরের নাতনী, ডুপুলিয়ার খাস খামারের গোয়ালিনীর তিনি, মেজাজ কিছু শৌখিনী। তিনি লোকটি ছিল ভালো, সইতে পারত কথা তিক্ত, অতিরিক্ত মেজাজ খোস্ ঐ ছিল তাঁর দোষ। গোয়ালিনী করলে রোষ, ডুপুলিয়ার দেলখোস-বাগের হাওয়ায় দিয়ে দোষ খালাস হতেন গোয়ালিনীর তিনি।

চাকরান বড়ো ছামের শেষে, গোয়াল-পাড়া ঘেঁষে, গোবিন্দ গোয়ালার বহুকালের পাকা-ভিটে, তারি অধিকারিণী গোয়ালিনী — সব ভালো তার, মেজাজ শুধু খিটখিটে। বিয়ের আগে ধরা পড়েনি এইটুকু জেনে ম্রিয়মাণ হন যখনি গোয়ালিনীর তিনি —ভালো পান ভালো বিড়ি, শেষে ভালো তাড়ি হতে তাড়াতাড়ি মারামারি হট্টগোলের দলে ভিড়ে খোস মেজাজে অনেক রাতে বাড়ি-মুখো হন কোনমতে পথ চিনি, এমন ঘটে প্রায় প্রতিদিনই।

গোয়ালিনী বলে, ঘড়ি দেখো, বেজেছে কয়টা।

গোয়ালিনীর তিনি বলেন, দাদাশ্বশুরের আমলের পুরোনো ঘড়ি, ওর কি চোখ আছে না কান আছে? বাজাতে দে কানের কাছে — বাজাতে চায় যে কয়টা। খিদে লেগেছে, দে লুচি ভেজে, মেখে ঘি ময়দা।

কথায় কথায় লাগে বচসা ছু-জনাতে। রাতে-রাতে বচসাতে রাত প্রায়ই হয় ফরসা। ভঁয়সা বাথানে শব্দ দেয় মহিষ কয়টা। ঘড়িও বাজায় ভোর ছয়টা।

গোয়ালিনী বলে, যাই, ছুধ পৌঁছাই রাজবাড়ি।

গোয়ালিনীর তিনি বলে, তা যাও, কিন্তু আসতে চাও তাড়াতাড়ি —জোলাপাড়ায় ওরা বুনেছে যা খাসা শাড়ি, এক জোড়া গুলবাহারি —হাতছাড়া হয়ে না যায়। গোটা কয় টাকা বার করো বায়না দিয়ে আসি তাড়াতাড়ি।

গোয়ালিনী বলে, গুলবাহারি আনতে বলি না। আপনারি দেহটাকে রাত নয়টাতে ফিরে আনতে চাও বাড়ি, না হলে আজ আমারি একদিন কি তোমারি।

—ওগো দেখো, দেখো রইবে রইবে কথা, তোমারে বোঝাতে হারি।

তিন দিন ঠিক কথা রইল, দাদাশ্বশুরের ঘড়ি কাঁটায়-কাঁটায় নটাই কইল। তারপরে শনিবারে সকাল নয়টাতে ঘড়িয়াল দম ফেরাতে এল সাবেক কালের দাঁড়ানো ঘড়িটার গোয়ালপাড়ার।

সেই দিন থেকে শুরু হল কথার ফের-ফার। গোয়ালিনীর ঠাকুরদাদার ঘড়ি আর থেমে থাকে না কাঁটায়-কাঁটায় রাত নয়টাতে।

ফিরে ফিরে রোজ সেই বুলি—চেয়ে দেখোতো, চোখ খুলি ঘড়িতে কত রাত ? জ্ঞান আছে তো কোন্‌টা কোন্ হাত ?

গোবিন্দ ঘোষের নাতজামাই দেখে বড়ো কাঁটাটা বারোটাকে ছাড়ায় নাই ; ছোটো কাঁটাটা বেঁকে চুরে তিনটের ঘরে ভুল করে ঢুকেছে। নাতজামাই বলে, ও গোবিন্দের নাতনী, ঘড়িটার ভীমরতি ধরেছে, নিশ্চয় ছোটো কাঁটাটাকে পেত্নীতে পেয়েছে। কালই ওঝা ডেকে ঘড়িটাকে ঝাড়ানো চাই। তাতেও না সারলে ওটাকে কালকে উচিত বউ-বাজারে বেচে ফেলাই—ঘড়িটা ঘোড়া হয়ে গেছে দেখতে পাই।

কী! এত বড়ো কথা! গোবিন্দ ঘোষের ঘড়ি ঘোড়া হয়ে গেছে— তারপরে পেত্নী চেপে আছে! দেখবে কারে বলে ওঝার ঝাঁটা। তোল তো আর একবার বেচবার কথা দেখবে ছোটো কাঁটা ধরে কোন্ গাছে!

—আরে তুলতেই হয় যদি, ঘাড়ে তুলে চুলোর জ্বালে পুড়ায়ে আসব ঘর-কুঁতুলে ঘড়ির ঘাড় ভেঙে। হনুমান থাম ভেঙে হয়েছিল মৃত্যুবাণ—এর আর কী কথা আছে।

—আমারে দেখালি মৃত্যুবাণ—ভালো, কাল থেকে দেখি কে সাজে তোর পান। কে ভাজে গরম লুচি।

গুম্ হয়ে রইল গোয়ালিনীর তিনি মুখ বুজি। শুয়ে পড়ল ঘড়ির কাছটাতে গোয়ালিনী মুখ গুঁজি।

সত্যিই সেদিন ছুটল মৃত্যুবাণ—আর উঠল না রাজার গোয়ালিনী, নিত্য দুধের দিতে যোগান, সাজতে তেনার মিটে পান।

আজকাল সে মানুষ আর নেই, গোবিন্দ গোয়ালার নাতজামাই। হয়ে গেছে ঠিক—বেঠিক ছিল মাথা যেটুক। ঘড়ি ঠিক সময়ে করে টিক্‌টিক্, ভোর পাঁচটায় তাড়া লাগায় নিয়মিত—রাজবাড়িতে পৌঁছে দাও গা খাঁটি দুধ। নয়তো দেউড়ির দেয়ালে লোহার গজালে আছে ভৈরব দেয়ানের শংকর মাছের চাবুক। হয় না যেন সময়ের এদিক্ ওদিক্। রাত নয়টার ভয়টা গিয়ে ঠেকেছে ভোর পাঁচটায়। আচমকা চমকান ঘোষের পো—ভাবেন, হায়, হায়, কোথায় রইল আমার প্রীতিপদের চাঁদ, ছ্রাবন মাসটায় হল অস্তমিত। ঘোষের পো এখন চলেছে ঘড়ির বশে—ওঠ বললে ওঠে, বোস বললে বসে, খা বললে খাওয়া চোকায়, শো বললে শোয়া হয় খাটিয়াতে আলসে।

ঘোষের পো-তে ঘোষালের পো-তে মাঝে মাঝে ঘড়িটা নিয়ে কথা হয়। ঘোষালের পো বলে, ঘড়িটাতে তাহলে তোমার ভূতপূর্বার আত্মাপুরুষ ঢুকেছে নিশ্চয়—ওটারে আর ঘরে রাখা নয়। ঘোষের পো বলে, ইস্তির পুরুষ আত্মা, এটা কি কথা একটা—থাক ঘড়ি বেচার কথাবার্তা। ও সেই থাক ঘড়ির ভিতর—বিক্রয়ের নামও ওর সামনে আর করা নয়।

তাঁতির পো, হাজরা পাড়ায় তার বাড়ি, বুনে আনলে শাড়ি গুলবাহারি, শুনলে এসে অশুভ খবর—শাড়ি যে পড়বে সে-ই নাই। বললে, তবে ফিরে যাই।

ঘোষের পো বললে, তা কি হয় ভাই? বায়নার শাড়ি নেওয়াই চাই, রেখে যাও ঐ ঘড়িটার পর।

তাঁতির মুখে শুনলে ঘোষজা, এ শাড়ির যোগ্য আছে একটি

কন্যা, রূপেগুণে ধন্যা, হাজরা পাড়ার দিলু পাচ্ছে না তার যোগ্য বর —সেই মেয়ে এলে পূর্ণ হয় গোবিন্দ গোয়ালার শূন্য ঘর, বংশটাও থাকে বজায়।

ঘোষজা বললে, সে আমার অজানা নেই।

তাঁতি বললে, মেয়েটা নয় ফেলনা, বলে গেলাম যা, ভেবে দেখো, সুখে করবে ঘর-কন্না। হাটে এমো-কাঠের জানলা কিনতে এখন আমি যাই।

তাঁতি গেল জানলা কিনতে, তখন ঘড়ি বললে, বেলা তিনটে ; ঘোষজা বসে করে চিন্তে —গাই কিনতে গো-হাটে যাই, না দিনটা দেখে হাজরা পাড়ার মাঠ-বাগে আগাই।

ডাকের মন্তর, কাক চরিত্তর দেখে ঘোষের পোর যাত্রা করতে স্থির, বড়ো কাঁটা দাদাশ্বশুরের ঘড়ির ঘুরল আড়াই পাক, ছোটো কাঁটাকে দু-ঘর ঠেলে দিয়ে টিক্‌টিক করল যেন হয়ে অস্থির।

সে দিকে দৃষ্টি না দিয়েই, লাল সুতো হাতে বেঁধে একখেই, খস্‌খসের আতর বেশ করে মেখে, ফস্ করে চাবি দিয়ে দোরে, দিলু হাজরার জামাই হতে মানস করে, পা চালিয়ে সজোরে ঘোষজা হল বাহির। সামলাতে পারলে না —তাড়ির দোকানে খোঁজ করতে বসে গেল একখানা গরুর গাড়ির।

দলে ভিড়ে গান ধরলে —

'গরু গাড়ি চাকায় চলে
গাছের আগায় তাল ধরে
সে গাছে আছে তাড়ি।
টাল মাটাল করবি কত
কাল রে মন ভারি
না হলে চলো না শ্বশুর-বাড়ি।
সূয্যি ডুবল ; চন্দর ডুবল,
শেয়ালে তুলল রোল।

বোল হরিবোল ; ভাঁড়ের তলা শুকনো খালি।
ওরে গরু বুদ্ধি সরু তোর
নিত্যি কাট জাবোর
আমি চলি ঝট্ শ্বশুর-বাড়ি, আছে পা-গাড়ি।'

আকাশে তখন দোয়াদশীর চাঁদ আলো দিচ্ছে চন্‌চন্ —পাঁচ-কোশি মাঠ ভেঙে ঘোষের পো চলেছে বেগে, হাজরা-পাড়া, তেগে ষাঁড় ছুটেছে যেন হনহন্।

থেকে থেকে দেখছে ঘাড় তুলি —এই লাগছে গো-ধূলি —ঠিক আর একটা পাকা দেখার দিনের মতন। কাছেই দেখছে যেন হাজরা-পাড়ার সাঁজের পিদ্দিম, তুলসী তলার মাথার উপর চাঁদটা যখন।

নিশুত রাত, মাঠের শেষ না পাই, ভূত পেরেতের ভয় নাই, চলেছে তো চলেছে একলাই গোবিন্দ ঘোষের আধা-বয়সী নাত-জামাই। ভাবেতে তন্মন —ভাবছে ঠিক চলেছে পথ চিনি একাই। এমন সময় টিং টিং টিং—ওকী শুনতে পাই—যেন দাদাশ্বশুরের ঘড়ি বাজল টং টং!

ঘোষের পোর মুখ বিবর্ণ, ঘাড়ের সাথে ফিরল কর্ণ, গো-ধূলির গোলাপি বর্ণ, কোথাও তার চিহ্নও আর নাই। গা-হাত-পা ঝিন্ ঝিন্, মন বলল, এটা রাত না দিন? পিছনে শব্দ পায় টুপ্-টাপ ঘুট্-ঘাট —যেন কাঠের খড়ম পায়ে হাঁটছে কেউ ভেঙে মাঠ ; নিয়ে তারি পাছ। আর কোথা আছে। ঘোষের পোর ঘামে ভিজল আতর-মাথা মেরজাই ফিন্‌ফিন্।

—কে-রে! বলে দৌড় তো দৌড়, দড়া-ছেঁড়া গরুর দৌড়! টুক্-টাক্ ঘুট্-ঘাট্ ছুটছে যেন গরুর পাছে গামলাটায় দিতে জাব। তেপান্তর মাঠ জুড়ে শব্দ! ভূতের চক্করে ঘুরে ঘোষজার শৌখিন প্রাণ হয়রান হল —যা এমন হয়নি কোনোদিন। তাতারস ছিল ঘোষের পোর ধাতে যথেষ্ট জমা। তাই ছুট দিতে সে ডাইনে-বাঁয়ে

হেল্‌ল বটে, এল্‌ল না। লাফিয়ে হল পগার পার, মাড়িয়ে চলল ঝোপ-ঝাড়। পিছন বাগে তার খড়ম পায়ের খট্‌-খট্‌ চলার শব্দের তথাপি নেই ক্ষমা।

কোথা থেকে আসে শব্দটা, মাটি থেকে, না আকাশ থেকে, না আশপাশ থেকে কে বা দিচ্ছে, কিসের বা শব্দ ওটা! না গাড়ি চলার, না গরু চলার, না ঘোড়া ছোটার, ভাঁটা গড়াবার, নামও নাই থামবার। শব্দটার কিনারা করে কে মাঠের মধ্যে, এ রাতেতে সাধ্য আছে কার?

ভূতের তাড়ায় বহুদূর ছুটে জেরবার, চকিতে ফিরে দেখল একবার! পা চলল না আর—ঘোষের পো দাঁড়িয়ে গেল থ'। মুখে নাই রা—এ যে পা পেয়ে দৌড়েছে দাদাশ্বশুরের দাঁড়া-ঘড়িটা বিদ্‌ঘুটে।

সেই সময় চাঁদের আলো বারাল মেঘ ফুটে। দাদাশ্বশুরের ঘড়ি দেখালে গোলাকার মুখটার ডৌল। চাঁদমুখটি যেন তার খিটখিটে বৌ-র। গুলবাহারি শাড়ির ঘোমটা — দুটো কালো চোখ পুট্‌-পুটে!

বস্‌ আর দেখা নয়—ঘোষের তনয় দে দৌড় যারে কয় নিজ বাড়ির মুখে। ঘরে ঢুকে কি শুনছে টিং-টিং টিং-টিং-টিং—দাদাশ্বশুরের ঘড়ি বলছে—হয় হয় দিন—বাজছে পাঁচটা, চেয়ে দেখ দেখিন— গোলে যাও ছুটে—টিং-টিং-টিং। ভৈরব দেয়ান খায় প্রতিদিন হিঞ্চের রস এক কাঁচ্চা কাঁচা দুধে, জানতো সকালে উঠে!!

পুঁটেরানীর মঠ

হুপুলিয়ার পুঁটেরানী দাহ হলেন যে আঘাটায়, সেখানে উঠল কালীবাড়ি। পূজারী হলেন ঘোর শাক্ত ঘাট-বামন শ্যামাচরণ নাম। ইস্টেটের বরাদ্দ মাসিক পাঁচ টাকা—শ্যামাচরণ সংসারে একা, তাতেই ইষ্টদেবতার ভোগরাগাদি সামলে চালান।

সেদিন ভৈরব দেয়ান শ্যামাচরণকে ডেকে সমঝান—মায়ের সেবা তো যথাসাধ্য করছ, মঠ-বাড়ির সৈষ্ঠব বাড়ছে কই? শুনি তো কেবল বসে-বসে পড়ছ তন্ত্রের বই, মঠবাড়ি যে শূণ্‌শান্‌, অথচ বাড়াতে বলছ মাসিক বারদ্দ।

শ্যামাচরণ বলেন, আজ্ঞে আমি তো আছি চিরবাধ্য। দেব-সেবার ত্রুটি হয় না, অতিথি জমা হয়—যদি রয় মদ্য-মাংস, নবান্ন, উত্তম ঘৃত, মিষ্ঠান্নাদি সুখাদ্য।

বলেন ভৈরব দেয়ান, অতি সেয়ান—ও কথা দাও ছাড়ান, আমি ভাবছি এক, তুমি আর এক ভাবছ। আমি চাচ্ছি মঠবাড়ির সৈষ্ঠব, তুমি চাচ্ছো কাগ-চিল অতিথ সব ইস্টেটের অন্নধ্বংস করুগ গবাগব। তোমার মত বেকুব দেখি নাই এমন, তোমারে বোঝায় কার সাধ্যি।

শ্যামাচরণ বলেন, উপদেশ কন, পালন করতে প্রস্তুত এ দাস চিরবাধ্য।

উপদেশ হল, এই আদ্যনাথকে কর তোমার চেলা। তুমি তো কবে আছ কবে নেই। তোমার অবর্তমানে যাতে সকল কাজের ধরতে পারে খেই, বর্তমানে পুজো-আস্রাদির কাজে বালকটাকে পাকা-পোক্ত করে তোল এই বেলা। যাও, বারে বারে দরখাস্ত করে ব্রক্ত কর না আমায়।

বিনা বাক্যব্যয়ে উপদেশ লয়ে বিদায় হয়ে গেলেন শ্যামাচরণ চিরবাধ্য।

মঠের কাজে ভর্তি করলেন আত্মনাথে দেয়ান, তার মা ছিল তাঁর ধেয়ান। আত্মনাথের মাছের মতো নিপলক গোল দুটো চক্ষু, বালকটা যেন একটা তরক্ষু, বুদ্ধি সুক্ষ্ম, অথচ দেখে মনে হয় একেবারেই নয় সেয়ান। শ্যামাচরণের সাথে ঘটি গামছা হাতে কোমরে জড়িয়ে পৈতা খান। অটব্য অরণ্য এঁদো-পুকুর, ভাঙা ঘাট, তিনি ফুকুরে দালানে মুক্ত-কেশী দেবীর পাট, তারি উত্তরে সাধন কুটিরে স্থান পেলেন শ্যামাচরণের চেলা বাবা আত্মনাথ!

গুরুর কাছে নিয়ে দীক্ষামন্ত্র, শিক্ষা করেন চেলা নানা তন্ত্র পুজাপাঠ। কারণ করা তান্ত্রিক মতে, পাঁঠার মুড়োটা আসটা করে চাট। পরিপক্ক হতে দেরী করলে না মঠাধ্যক্ষের কাজে ভটচায্ শ্যামাচরণের চেলা আত্মনাথ।

ইতিমধ্যে এক রাতে, মঠের সৈষ্ঠব হয় যাতে, চেলার সাথে যুক্তি করেন চিরবাধ্য শ্যামাচরণ।

—করে দেখলে হয় না কুবরী মন্ত্রে কুবের সাধন? আত্মনাথ গুরুরে কন।

গুরু বললেন, কথাটা ঠিক, কিন্তু নকুল কুলার্ণবে লিখছে শক্তি বিনা এ সাধনের ফল অনিশ্চিত।

আত্মনাথ বললেন, বুদ্ধি শক্তি তো আছে—অন্য শক্তির কিং প্রয়োজন।

তিন আঙুলে নকুলেশ্বর মুদ্রা দেখিয়ে জানিয়ে দিলেন চেলাকে শ্যামাচরণ—ক্লীং মন্তর জপের কালে সোনার একটি সজীব প্রমাণ নেউলের আছে প্রয়োজন—সেটা মেলাই শক্ত বাপধন!

আত্মনাথের নিপলক ভাটা চোখে জেগে-জেগে পড়লো যতি সেই প্রথম সেই দিন রাত তিনটাতে। বেজির আওয়াজে ঘুম ভেঙে দেখে পুকুর ঘাটে পড়ে আছেন সর্ব অঙ্গ হিম, তিন আঙুলে নকুল মুদ্রা—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র চিরবাধ্য মুক্তকেশীর মঠাধ্যক্ষ শ্যামাচরণ।

বেয়ানের মুখে ভৈরব দেয়ান শুনলেন শ্যামাচরণের হয়েছে তিরোভাব! গোঁপ মুচড়ে দেয়ান বললেন, যাক চুকল

উৎপাত। এখন যা করেন আত্মনাথ —বলেই দেয়ান নস্য নিলেন একটিপ।

তদারকে গেলেন পেশকার —দেবতার সম্পত্তি যেখানকার যা রেখে গেছেন কিনা ভূতপূর্ব শ্যামাচরণ। পেশকার দেখে এলেন সব আছে কেবল নাই পূজারীর সেরাচীন বাঘাসন। কুন্তি বুড়ি নিযুক্ত হল সেই দিন থেকে মঠ-বাড়ির খোন্তা খুন্তি ইত্যাদি করতে মার্জন।

আশ্বিন গেল, পড়তে কার্তিক, ঝাঁজ শেওলা সিঁদুর গোলা যেন দেখাচ্ছে ঠিক। ঘাটে বসে কুন্তি বুড়ি পিতলের খুন্তি হাতা কসে মাজছে, ঘসে ঝামা ইঁট। হেন কালে ঘাটের রাণা হতে কুড়ি হাত অন্তরে পড়ল বুড়ির নজরে, ভুস্ করে উঠল, ঝুপ করে ডুবল, মা বলে দিয়ে ডাক, ড্যাব-ড্যাবে চোখ বোয়াল মাছ। এমনি একবার নয় তিনবার! *ঠেলে শেওলা ঝাঁজ,* মা গো মা, বলে দিয়ে আবাজ মাছ উঠল আর ডুবল আকাশে তুলে লেজের দিক।

পুকুর ঘাটের খবর যেমন হয়ে থাকে বরাবর, হাওয়াতে পৌঁছল বাজারে হাটে। পাটরানী শুনলেন কুন্তির মার কাছে। রাজা শুনলেন রানীর মারফতে—পুঁটেরানীর পুকুরে পুঁটিমাছ মা মা বলে শ্যামা বিষয় গাইচে বসে ঘাটে।

পেশকার বললেন, দেওয়ানজী, শুনেছেন কী ব্যাপার? রানীর পুকুরে জলহস্তী একটা শ্যামা সঙ্গীত শোনাতে আদেশ পেয়ে গেছে শ্যামা-মার।

হুম, বলে গোঁফ মোচড়ালেন ভৈরব দেয়ান দু-চারবার, জবাব দিলেন না কোনোপ্রকার।

পাটরানীর হুকুম হল যখন ভাঙাঘাট সারিয়ে শ্বেত পাথর লাগাতে, দেয়ান বুঝলেন আত্মনাথ মঠবাড়ির সৈষ্টবের কাজ নিয়েছেন হাতে।

কুন্তির মা শুধায় আত্মনাথকে, হ্যাঁ বাবা, কুন্তি তো কানে কালা, কেমন করে শুনলে, মা বলছে মাছে?

আগুনাথ বলেন, কী না হয় মায়ের কৃপাতে, মাছে কয় কথা, শুনতে পায় কালাতে। যা হোক ঐ সব দৈব বলতে মানা যার-তার কাছে, বুঝেছ কুন্তির মা।

কুন্তির মা বলে, কুন্তি আমার অত শত বোঝে না।

আগুনাথ বলেন, তা বললে কী চলে ? শ্রীমন্তের বাপের মশান হয়েছিল সিংহলে কমলে-কামিনী দেখার কথা বলে — সেটা জানা আছে।

কুন্তি যে কালা সে কালাই রইল। কুন্তির মার কাছে হিমী, বামী শৈল শুনলে কমলে-কামিনী পুকুরের মাঝে উঠছে আর গিলছে জলহস্তী। রাষ্ট্র হল কথাটা বাজার-বস্তি লোকের আনাগোনায় হাঁটাপথ মঠের দিকে অল্পদিনে প্রস্তুত হল তিন বিতস্তি। ইতিমধ্যে খুন্তির মেলা বসাতে দেয়ানের বাসাতে পাঁজী হাতে আগুনাথের উদয়।

দেয়ান কইলেন, আর দেরী নয়, আগামী ভূত-চর্তুদশী উপযুক্ত সময়।

তেল পিতুম ইত্যাদির খরচা সৈষ্টবের কারণ ছেংছন করলেন স্বয়ং ভৈরব দেয়ান মহাশয়।

দেয়ানের চটি

ভেড়ির চরে হুপুলিয়ার পুরোনো গড়ে ভেঙে-পড়া খোয়াব-গা সেখানে বাস করে রাজার মুচি, সেলাই করে বিবিরানীর কিংখাবের পা-পুস আর সোনার তারের ফোঁড় দিয়ে হরিণের চামে রাজার লপেটা। এ মাসটায় দেওয়ানজীর হয়েছে ফরমাশ খটাশের চামে খালাষি-চটি —সেটি হলেই বেড়ে যায় ভাতা।

মুচির শ্বশুর চামার, তারে শুধাতে দর চামড়ার, চামার-গুষ্টি রুখে উঠল করে মার-মার। বলে, দূর দূর কোথাকার মুচি তুই, চামারে করে না ও চামের কারবার ; জামাই বলে পেয়ে গেলি পার। শাশুড়ী বললে, বাছা, খট্টাঙ্গ রাজার ঘোড়া —নাম করো না চাম ছাড়াবার, মেয়ে মরে যাবে আমার।

মুচির ঘেসেড়া-পিসি ঘোড়ার ঘাস কাটে ভেড়ি-চরার মাঠে, তাকে শুধালে খটাশের কথা মুচি। সে বললে, শুনেছি যা চলে খটাস্ খটাস্ তাকেই বলে খটাশ। চামার শ্বশুরের কাছে ঘোড়ার চাম কেনো গো দরদাম বুঝি।

সব ঘোড়াই খট্টাঙ্গ রাজার বুঝে শ্বশুরবাড়ির নামে ভড়কালো মুচির পো। খাটুলিতে শুয়ে ভাবছে খালাষি-চটির কথা ; নিশুত হল খোয়াব-গা, মেঘেতে মিলাল চাঁদের ছটা।

রাত নিশুতি, শুনলে মুচি শব্দ খটাখট্ সুস্পষ্ট। বুকের মধ্যে করলে অনুভব নিঃশ্বাসের কষ্ট। তারপরেই চোখ চেয়ে খাটের খুরোর মত অষ্ট আশি বছরের দেড়ে এক বুড়োকে আঙুল নেড়ে ডাকতে দেখলে পষ্ট। গায়ে তার পাতলা চাদর —যেন এই ছেড়ে উঠেছে পাতাল হতে ঠেলে মাটি আর কাঁকর। মাথা-ভর ধুলো মাখা জটা। মেঘ কেটে তখন প্রকাশ পেয়েছে চাঁদের ঘটা।

বন্ধ ঘর ছেড়ে বার হল মুচি, বুড়োর ইঙ্গিত বুঝি, চামকাটা

বাটালিখান কোমরে গুঁজি। লণ্ঠনটা নেবার পেল না সময়, ঘাম দিচ্ছে গা-ময়। বুড়ো উঠে চলল খোয়াব-গা'র চাল-চুলো ওড়া পাঁচতালা চিলে কোঠার দিকে, 'চলে এসো' জানায়ে ইঙ্গিতে। মুচি চলল, কলের পুতুল যেন উঠি, পড়ল কিনা পড়ল তার পা-ধাপ ধ্বসা টালি ভাঙা ঘুরোনো সিঁড়িতে —চাঁদনীতে তখন মিট-মিট পিদুমের অধিক আলো নয়।

পেঁচা না করে চেঁচামেচি ঘেঁচি-কড়ির মতো একটা চোখ মটকালে বসে পাঁচতলার দাঁত পড়া ফাটা দেয়ালে। মুচির মনে হল, আনলে হত ভালো একটা লন্ঠন্, সিঁড়ি ভেঙে কোমরটাও করছে টন্টন্, বুড়া ঠিক চলেছে তখনো এগিয়ে হন্হন্।

পেরিয়ে ছাতের পর ছাত, ওঠাল নামাল সিঁড়ির ধাপ, অলিগলি, ভাঙা দোর ঘুলঘুলি, ঢুকেই একটা গোল ঘরে হাওয়ার পরে ধুমার মতো পাক খেয়ে ফিরে দাঁড়াল বুড়ো। মুচি দেখলে সামনে পড়ে খটাশে চাম ঘরখান জুড়ে যেন সতরঞ্চ একখানা। ইঙ্গিতে বুড়ো জানান দিলে, কাটো চাম রাতারাতি। বাটালি চালাতে বসে গেল মুচি কসে মুঠিয়ে ধরে কাঠের ডাঁটি। চামের পরে চোপ বসাতেই, ওপ্ বলে যেন তোপে উড়ে গেল বুড়ো ঝুলের মতো। যেন মাকড়সার জালে আটকানো রইল তার কাপড়-চোপড়গুলো।

ঠিক সেই কালে কানাচের আড়ালে খুন্-খুন্ বলছে, কানে শুনল মুচি —চক্ষু বুজি লেপ মুড়ি দিয়ে শুল।

সকালে পোষা নুলো বেড়াল মেঁও মেঁও শব্দে তারে জাগালে। মুচি উঠে দেখে নিজের যন্তর-পাতি রাখা চামের বড়ো থলিটাকে বাটালি চালিয়ে খালাষি-জুতোর আকারে কেটে রেখেছে খটাশের চামড়ার খোয়াবে খেয়ালে।

ভাবে তখন রাজার মুচি খালাষি-চটির গোড়ালি বাঁধাবো কী গাধার নালে।

ছিটওয়ালা কাক

ছিটওয়ালা রাজার পোষা দাঁড়কাক খানা-কামরার ঘুলঘুলিতে থাকে। রাজার গোয়ালা রোজ এক গোলা মাখম, দু'গুলি পনির খাওয়ায় পরের চেকনাই বাড়ে যাতে।

গুরুমশাই পড়ান রোজই তাকে ক'য়ে আকার কা খ'য়ে আকার খা। সে পড়ে ক কা কাক্ বক্, বসে খানা-কামরার বারান্দায়। এর বেশী পড়ায় পারলে না আগাতে।

কিন্তু স্বভাব-চতুর কাক, পড়ে বা কোনোদিন, এমনি দেখায় ভাব সভার সাক্ষাতে। রাজার চিহ্নিত কাক ঠোকর বসালে টাকে, সভা-পণ্ডিত হেসে কিঞ্চিৎ —একচক্ষুর্ণকাকোয়ং —বলে উদ্ভট একটা কাক-প্রশস্তি চট্ শুনায়ে দেন রাজাকে।

রাজা হন তুষ্ট, কাকও হন হৃষ্টপুষ্ট। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট — জেনে নিল সুচতুর পণ্ডিত দুপুর বেলা কৃষ্টনাম পড়াতে দুপুলিয়ার কাকে।

কাক তো নয়, দুপুরিয়া ডাকাত—একথা বললে রানীর চাকরানী। পণ্ডিতানী বলেন —ও কথা বলতে নেই। আমাদের তিনি বলেছেন, ও কাক নয়, এক-এক খগোমানী।

মেথরানী যদি বলে —এক চোখোরে ঝাড়ু মার, ঝাড়ুদার বলে, কাকের ঠোকরে হলি বলে কানী। ওকথা তুলিসনে আর।

ভৈরব দেয়ান একদিন বলেন, ওহে পেশকার, কাক চরিত্র অতি বিচিত্র —একখানা দেখো তো পাও কিনা খুঁজে রাজার পুস্তকাগারে।

পেশকার বলেন, কাল থেকে চশমাখানা খুঁজে পাচ্ছি না আমার।

এমনি প্রতিদিন কারো না কারো কিছু না কিছু হারায়।

কুটোটি এদিক ওদিক হত না যে তুপুলিয়ায় সেখানে রোজই হারায় এটা-ওটা। গালা-মোহর করতে মুহুরী পায় না বাতির টোটা! বলে, এই ছিল মশায়, এই নেই! দপ্তরী দেখে, খুরি-সুদ্ধ উধাও সেই। দেয়ানজীর ধমকের চোটে চাকর-নফর কারো মনে সুখ নেই। বাটি-চালা ডাকে, ঘটি-চালা ডাকে, পয়সা চলে, কড়ি চলে ধরতে চোরটাকে। চাল-পড়া খেয়ে শুধু নিজেদেরই গলা শুকোয়, জিভ হয় মোটা।

সেই সময় কাছারি বাড়ি ফাটালে চীৎকারে রামতুলুলী—চানের বেলায় চুরি গেছে তার হাঁপানির মাতুলি!

দপ্তরীর তুর্বুদ্ধি হল, বললে—কেন চেঁচাস, শিষের মাতুলি গেছে যাক—গলায় বেঁধে রাখ একটা কালী-ছোপা চুনের পুঁটুলি।

এই না, হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়িয়ে আঙিনাতে শাপ-শাপন্তি সুরু করলে রামতুলুলী—

'মরুক মরুক কেকো মরুক
মাথার কেশ উকুনে কুরুক
ঘুমিয়ে জেগে ঘুরুক মাথা
বুকে ঠেলা দিক আগুনি ভাঁটা
বল্ কে খেলি জনায়ের মাতুলি
বার কর হেঁচে-হেঁচে হিক্কে তুলি।
নয়তো মর্ হেসে হেসে, খেতে খেতে
শুতে শুতে, বসতে, হাঁটতে, দাঁড়াতে উঠে।
মরুক না মরুক হাঁপ তো ধরুক!
আমার মাতুলি বন্দুকের গুলি
গুলগুলি হয়ে গলায় ফুটুক—'

কারকুন বলে, রামতুলুলী হও শান্ত। রাজবাড়ির মধ্যে শাপ-শাপন্তি কর কেন?

—আর কেন? লাঠি ঠুকে উঠল যেন নেচে ডাইনী বুড়ি রামতুলুলী—চলল ছড়া কেটে—

'জনায়ের গোঁসায়ের মন্তর
কই কাটাক দেখি পারে কোন্ চোর।
চোর বলে চোর, মাদুলি চোর ;
মাদুলি বলে মাদুলি —
হাঁপের মাদুলি —মন্তর মন্তর।
খুলল খুলল বলে যমের দোর
লাগল লাগল বলে দোক্তার ঘোর
তুলল তুলল বলে অষুধ
এল এল বলে যমের দূত !'

হেনকালে ঘটল কাণ্ড অবাক —যমদূত না এল, এল একটা ঝড়ো ডোম কাক ! কে বলবে সেটারে দেখে ছিটওয়ালা দুপুলিয়ার রাজার পোষ্য ! সে কাশলে, কেশোরুগী যেন নিয়েছে নস্য —খাক্ খাক্ খাৎ ! গলা চিরে তামার মাদুলিটা মাটিতে পড়লো খটাৎ।

রাজার বড়ো খানসামা বলে উঠল —আপদের শান্তি যাক। কাকটা করেছে কুখাদ্য হজম অনেকগুলি। শোধন করে করগা ধারণ মাদুলি, বুঝলে তো রামদুলুলী।

গুমগুমি

বাজার হুপুলিয়ায় গুমগুমি এয়েছে—উঠল রব! ঘরে বাজারে ডরে মরে লোক; বলে, কে এলরে বাবা, বাঘের ঘরে ঘোগ —সেটা গোটা ধরে আর থলিতে ভরে, কপালে টেনে নিয়ে চুনের তেলোক। বাড়ি নিয়ে খেয়ে ফেল্লায় গব্-গব্।

শখের দলের অধিকারী, —বেশ একটু ওজনে ভারী। সে দেনার দায়ে সরে পড়ল—গুমগুমিতে পেয়েছে বাজারে রটল। প্রবোধ সুবোধ ভালো দুটো ছেলে, বিয়ে হত আজ কী কাল গেলে—হঠাৎ নিলে সন্ন্যাস। বাজারে রটল, গুমিতে ধরেছে, আর কী ব্যাস্। বিন্দাবনে গেল হুপুলিয়ার কীর্তনিয়া, পাষাণ গলত যার মাথুর শুনিয়া—বাজারে রটল গুমিতে তারে গেল নিয়া। ফজলু সহিসের দুম্বাটা বকরিদের আগেই পালাল—গুমিতে নিয়েছে বাজারে রটল। গো-বদ্যি সে বদ্যিনাথে গেল সুদখোরের তাড়ায়—গুমিতে নিয়েছে সত্যি সত্যি রটল পাড়ায়।

গুমির ভয়ে রাত না হতে, বন্ধ হয় দোকান-পাট, খোলা রয় না দোর-জানলা-কপাট—সুন্ সান্ হাট বাট, কার কারবার, লোক চলাচল সব বন্ধ।

দেয়ান বলেন, পেশকার, ব্যাপার কী বুঝছো?

পেশকার বলেন, বুঝছি পরিষ্কার? ব্যাপারটা নয় তুচ্ছ।

দেয়ান বলেন, রটনার মধ্যে আছে সত্য মিথ্যা কতকটা উহু?

সেদিন পহর রাতে, লোকজন নাই হাটে, ভৈরব দেয়ান একা যান গুমগুমির তল্লাসে গুপ্তি হাতে। টাকের পরে কল্কাদার চামড়ার কাপু, কোমরবন্ধে কলম-কাটা চাকু, সর্বাঙ্গ ঢাকা কলন্দরি আলখাল্লাতে।

হুপুলিয়ার কেল্লার বাইরে শ্মশান ঘাট, মাঠের মাঝে খাড়া আছে একটা মুড়ো খেজুর গাছ। শকুনি কটা চুনের পোঁচড়া টেনেছে তাতে, জন মানবের নাই যাতায়াত সে তল্লাটে!

দেয়ান প্রথমে যান বাজার ঘুরে হেঁকে —মুশকিল আসান! সাড়া শব্দ নাই কারো, চক্র বাজার সুন সান্। পহরা কী প্রহরি। কারো দেখা নেই ও হরি গেরস্তো পাড়া, আছে নিঃসাড়া —গুমির ভয়ে বেরোবার নেই নাম। একাই আগান দোকান পাট পারিয়ে মাঠের দিকে ভৈরব দেয়ান। আকাশে তখন নাই চাঁদ, খেজুর তলে এক মূর্তি দেখা দিল হঠাৎ —কালো মুস্কো —চটের থলির পাশে বসে আছে চুলগুলো উস্কো-খুস্কো যেন যমদূত সাক্ষাৎ।

কে রে! বলে দেয়ান ছাড়লেন এক কোতোয়ালী হাঁক।

মূর্তিটা যেন কালো দত্যি, উঠে দাঁড়াল রাতের আলোয় —যেন দেখাল দুপুরিয়া ডাকাত, বুক চটাল।

ভৈরবদেয়ান, তিনি নন্ কম শক্তিমান —কচি ছেলে নন্ একরত্তি —মুঠিয়ে ধরেন গুপ্তি ; ভাবেন, দেখা যাক গুমি কিনা সত্যি!

মূর্তিটা চটের থলিটা তুলে ঘাড়ে, আগাতে চায় মাঠের পারে।

কে রে যাস! দেয়ান বল্লেন তারে।

লোকটা যেন শুনেও শোনে না, চেহারাটা একেবারে অচেনা।

দেয়ান বল্লেন, দেখছো বাপু কলন্দর আমি, মাথায় কাপু —একা পড়েছি মাঠে, একটু দাঁড়াও, যাই একসাথে।

মূর্তি বলে দাঁড়াবার সময় নেই। সূর্যোদয়ের আগে ভূতের বোঝা নামাতে হবেই। রোদের ভয়ে চলাচলি করি রাতে ; দামী মাল আছে আমার বোঝাতে। সোজা কইবোই, বই ভূতের বোঝা। উটের পিটে যেন কুঁজের বোঝা। কথাটা কইতে সোজা, বোঝাটা বইতে সোজা নয়।

এই বলে আর মূর্তি অগ্রসর হয়। দেয়ান ভাবেন, এই সেই গুমি নিশ্চয় গেছে বোঝা।

আগে চলে চট থলি ঘাড়ে কালো মূর্তি। দেয়ান চলেন হট্হট্ চালে হাতে ধরে গুপ্তি।

খোয়াব্রের বাঁকে স্থানটা অন্ধকার, দেয়ান সেই ফাঁকে থলিতে বসান চাকু আপনার।

মাটিতে পলো থলি —ছিঁড়ে শির যেন গোটা পাঁচ ছয়।

দেয়ান বলেন, এ কীরে ?

লোকটা বললে, কী করলে মশায় ? বৈতাল কুমড়ো কটা হল নয়-ছয়। এ সব বস্তু রাজা-রাজোড়ার রাজভোগ, যোগাড় করতে ভুগতে হয় ভোগ। গুমি বলে কত লোক মার দিয়েছে মশায়। আগাগোড়া বরবাদ করলে এখন কী হয় ?

দেয়ান বলেন, বোঝা গেছে, যা গেছে তা গেছে, আমার কাছে যাতুবিদ্যা খাটবার নয়। দেখা যাবে সকালে কাল বৈতাল কুমড়ো কোন্ গাছে ফলায়। সরে পড়ো ভালো চাও তো —আমি ভৈরব দেয়ান সেটা জান তো ? ও কথা আর উচ্চবাচ্য নয়। তুপুলিয়ার রাজা হিঁতুর চুড়ো, বৈতাল কুমড়ো খাবার পাত্র নয়। বিদায় হও, নিয়ে টাকা পাঁচ ছয়। মুশকিল বাধবে সকালে কালকে কুষ্মাণ্ড যদি নরমুণ্ড হয়। ভূতের বোঝা বহে এলে এবার প্রাণ-সংশয় !

ঘাল হয়েছে গুমগুমি —সকালে পেটান তুমতুমি তুপুলিয়াতে দেয়ানজী মশায়।

বাদশাহী গল্প

এক

বাদোশাবাবু বললেন—দাদামশা, ভূতপত্রীর দেশ দেখা শেষ করে কোথায় গেলে ?

—গেলেম একটা জায়গায়।

—কিসে গেলে ? পালকিতে ?

—না।

—রেলগাড়িতে ?

—না।

—পায়ে হেঁটে ?

—না।

—ইষ্টিমারে ? মটোরে ? উড়োজাহাজে ?

—না।

—তবে ?

—শোন বলি—

জলপথ স্থলপথ আকাশপথ এই তো তিনটা
জলেতে চলি সাঁতার কাটি, থলেতে চলি ধরে লাঠি
আকাশ পথে স্বপ্নে হাঁটি
তবু ছাড়ে না বিপদ আপদ
সঙ্গে লেগে আছেই কোথাও একটা যাবার চিন্তা।
কোথা যাই, কিসে যাই এই ভাবচি সারা দিনটা।

—একটা কাঠের ঘোড়া কিনে বেরিয়ে পড়লে না কেন দাদামশা, কিম্বা মশার পিঠে চড়ে ?

—গিয়েছিলেম মশার পিঠে চাপতে, সেটা বললে—

তোমার এই গজগিরি দেহ গুরুভার
সাধ্য নেই বহা ক্ষুদ্র মশার

কিম্বা যুদ্ধ ঘোড়ার
জল পী পী কাঠের ঘোড়া তো কোন ছার !

গেলেম আলিপুরের চিড়িয়াখানায় —সেখানে উঠপাখিকে বললেম, আমাকে একবার ঘুরিয়ে আনতে পার ? সে বললে—রোজ তিন মন করে লোহার পিরেক যদি খাওয়াতে পার তো রাজি আছি। সোনার সঙ্গে সমান দরে বিকোচ্ছে বাজারে লোহা জেনে উটপাখির আশা ছাড়লেম। উট বললে—যদি আলুকাবলি খাওয়াতে পার সাড়ে বত্রিশ সের করে দু-বেলা তো এস, নয়তো যাও। বলে, ডাঙ্গার জাহাজ সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। বন-মানুষটা নিচের ঠোঁট উলটিয়ে আমায় ভেংচে দিল। হাতী গজ-দাঁত বার করে হেলে দুলে হাসতে থাকল—নীরব হাসি।

জানোয়ারদের খোসামোদ করতে ঘেন্না ধরল ; তখন মনের দুঃখে ঘরে এসে নিজের চৌকিতে একটু জিরোতে বসলেম ছারপোকার ভয়ে পুরোনো আসনখানা পেতে।

—এইবার বুঝেছি, দাদামশা ছারপোকার পিঠে চড়ে চললে।

—ঠিক বলেছ বাদোশাবাবু, এতক্ষণে ঠিক ধরেছ। বার হলেম ছারপোকার পিঠে, —'আসুন, বসুন' লেখা আসন পেতে।

—তখন কী হল ?

এই মনে হচ্ছে ভাসছি জলে, এই বোধ হচ্ছে যাচ্ছি থলে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ! পরেই মনে হচ্ছে, গরু গাধা ছাগল ভেড়া হাঁস মুর্গি তাদের সঙ্গে চরছি আবার উড়ছি এক স্তরে—বন হতে বনান্তরে, দিক হতে দিগন্তরে ! পথের পন্থি এমনি বোধ করছি যেন, হয়ে গেছি পক্ষী। মাছ-রাঙা হয়ে মাছ গিলছি —হঠাৎ কাঁটা বেধেছে। অমনি 'অবাক' বলে আসন ফেলে দিয়েছি এক লাফ।

—এ রে, দাদামশায়কে ছারপোকা কামড়িয়েছে।

—আরে না ভাই না, হাসি না। শোনো না বলি। জেগে দেখি অন্ধকারে ভুবনেশ্বরের মাঠে চকাচোঁও লেগে দাঁড়িয়ে গেছি !

চেয়ে দেখছি—

আঁধার পরে চাঁদের কলা,
কতক কালো কতক ধলা
উত্তরে উঁচা দক্ষিণে কাত
মেঘ একখানা বিরাট
কোন দেশ হতে আসছে, কোথায় যাচ্ছে
কিছু যায় না বলা!
গুণ্ডি ঘর একটা তারি তলায়
তেল কালি পড়া পুরানো বেজায়
সেটার চূড়ায় পেটা লোহার ভুশুণ্ডি কাক।
দু-মুখো তার দুটো গলা।

—গুণ্ডি ঘর কারে বলে দাদামশায়?
—কে জানে ভাই, দেখে মনে হল সেটা গুণ্ডিঘর।

কে জানে ভুৎখানা কি গুণ্ডিঘর
ধাঁচাখানা খাঁচাপানা
কোন লুপ্ত যুগের গুপ্ত কৃষ্টির দিচ্ছে খবর
বারান্দা দিচ্ছে গান্ধার শিল্পের গন্ধ
মৌর্য শিল্পের শৌর্য্য বোঝাচ্ছে
সারি সারি দরজা জানালা আঁট সাঁট বন্ধ
অলিন্দে বারেন্দ্র শিল্পের খাড়া কটা কবন্ধ
মাথার জন্যে অপেক্ষা করছে একটানা
সদর দোরে পাল রাজাদের পালকি
আছে পড়ে একখানা।
কোথা এলেম কিছু ঠিক নাই
মনে ভাবছি আগাই না পিছাই

এমন সময় নাক-কাটা দুই মূর্ত্তি হাজির। খোনা খোনা নাকি

সুরে বললে —এই যে অবুবাবু নমস্কার। কেমন আছেন? বলেই দুজনে গীত ধরলেন—

ভাল আছেন ত, ভাল আছেন ত?
দেখছি কাহিল নিতান্ত
মন প্রাণ ত আছে শান্ত?
চিনতে পারছেন ত?
উপদেব উপাধ্যায়, প্রভূত সামন্ত
ভূতখানার কিউরেটার ও তাঁর অশিষ্টান্ত!

দেখি একটা কিছু জবাব না দিলে অশিষ্টতা হয়, বললেম—ভাল আর কী, যেতে যেতে রয়ে গেছি। প্রায় হয়েছে প্রাণান্ত; কই মশায়দের স্মরণ হয় না তো!

কী আশ্চর্য! কত্তকালের ফ্রেনশিপ। একদম মেমারি স্লিপ। আমরা কিন্তু ধরেচি ঠিক আপনি অবুনিবাবু না হয়ে যান না। শিল্পী-প্রাণ শিল্পীপ্রোদান শিল্পাচার্য আমরা আপনার—বলেই দুই প্রভুতে আমার দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল।

আমি ভাবচি —যাচ্ছি কী যাচ্ছিনা। তারা বলছে —চলেন চলেন, দেখবেন চলেন আমাদের ভূতখানার অদ্ভুত কলেকশানটা!

প্রভূত বললেন—ভূতখানাটি ভুলেশ্বর পরগণার—ভূভারতের অধুনালুপ্ত কৃষ্টির রত্ন সমষ্টির—বললেও চলে —একটি বিশেষ রত্নভাণ্ডার।

উপদেব বললেন —এখান থেকে দেখেন খাঁচা খানা বাড়িটার—সত্যি বলেন, কেমন লাগচে আপনার?

আমি আর কী বলি, মুখে এল —ভূতগত-ব্যাপার, সামনে বললেম—চমৎকার!

চৌকোস যেন লখিন্দরের মাঞ্জাসটা লোহার

গম্বুজটি যেন মাহেঞ্জোদাঁড়োর তিজেল হাঁড়ি
তোরণ মকরটি যেন পোড়া মৎসটি নল রাজার।

—বলেন তো পরিকল্পনাটি কার সারা বাড়িখানার। দেখি ভাস্কর্য সম্বন্ধে ভূয়োদর্শন কতদূর এগিয়েছে আপনার? আমি তখন ভূয়োদর্শন করব কি, চক্ষে অন্ধকার দেখছি। একবার মনে হল বলে ফেলি—ধীমান বীটপালং-এর। কিন্তু কী জানি কপাল ঠুকে বললেম—শ্যাম মিস্তিরির—কাম্বোডিয়ার।

উপদেব একটুখানি হেসে বললেন, নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে —আমার।

প্রভূত বলে চললেন—ভিতরটা দেখেন একবার।

খট্ করে একটা তালা খোলার শব্দ হল —কালচিটে নিবিড়ান্ধকার ভেদ করে ভিতরে ঢুকে দেখি ফিকে ফিকে তিমির সঞ্চার। ডাইনে বাঁয়ে ভূতখানার দুই মহাপ্রভুতে লিষ্টি ধরে দেখিয়ে চললেন, আমিও দেখে চললেম।

—শেষু নাগবংশীদের সিন্ ভারলাগ ওষ্টাইরিণ হতে সংগ্রহ করা।

—কালিদাসের ঘোঁটনকালির এক টুকরা।

আমি বললেম—

বর্ণচ্ছটায় কোককে হারায়, কোথায় পেলেন এটি?

—নিউকাস্‌ল পাঁচ নম্বর জেটি

কয়লার দরে পাওয়া গেছে এ রত্নটি।

—দেখেন সগরাশ্বমেধের ঘোড়ার আক্কেল দাঁত

সিলোনে পাওয়া মাটির তলায় পাঁচ হাত!

আমি বললেম—এই কী যেন গুলোপোড়া শিতলপাটি?

—আজ্ঞে না, নটি বেহুলার মেখুলাসাটি।

—ওটা কী শাঁখ ভাঙা নাকি?

—লখিন্দরের মালাই চাকি।

—কী একটা গজালের মতন?

—লোহদন্ত মুনির দাঁতন।

—এটা বুঝি কাগজের পালক ?

—আজ্ঞে না, আলেকজাণ্ডারের বিউকিফেলার ঘোড়ার চক্ষের পালক।

—এটি কাঁচ পোকার ডানা না ?

—আহা দেখে পায় কান্না—লক্ষণ সেনের সানকী ভাঙা।

—এটা যে দেখি ভাঙা বোতল।

—আরে না মশায় ? সম্রাট অশোকের গড়গড়ার মুখনল।

—ও যে পড়ল একটা কাগজের চিরকুট।

—আহাঃ উপগুপ্তের প্রেমপত্রের কোনো একটুক করকোষ্ঠী ভাষায় লেখা। শুঙে দেখলে লোধ্ররেণু গন্ধ পাবেন অত্যল্প খুব।

—দেখেন অজন্টা গুহার দোরের ছিটকিন।
যেন আজকালের একটি চেপ্টিনিন।
পাহাড়পুরের কাঁচা ইট একখান।
মাহেঞ্জোদাড়োর বেঞ্জোর কান

—এটা বুঝি নারদ মুনির পিয়ানোর তার ?

—অদ্ভুত শিল্প-দৃষ্টি আপনার।
লম্বা আঙ্গুল দেখেই বুঝেছি।

—বাইরে পড়ে ওটা কী ?

—মৈপাল রাজার সুখপাল পালকি।

—তাহলে আমি ওটাতেই উঠি আরকি—নমস্কার।

—বড়োই চললেন তাড়াতাড়ি।
দেখা হলনা চাঁদসাগরের হেঁতাল বাড়ি।
নেতা ধোপানীর পাট, বড়ু চণ্ডিদাসের দোয়াদ
বাংলার কৃষ্টি সব গেল বাদ—
দেখলে হত কাজ ভারি।
আমি বললেম —পরে আসব যদি সময় করতে পারি।

—যেরূপ দিনকাল পড়েছে মশয়—

দেখেন বল্লাল সেনের ব্রাহ্মণ ভোজনের
খুরি গেলাস মেটে হাঁড়ি।

—তাহলে যাই এখন, সুখপালে হই কাত?

—প্রণিপাত, দণ্ডবৎ – একটা দিয়ে যান অটোগ্রাফ।

পকেট খুঁজতে গিয়ে দেখি পকেটও নেই, সোয়ান কলমও নেই, কামিজটাও লোপাট।

জেগে দেখি হয়ে গেছি ঠাকুর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ।

'তারপর ?'

—'কিসের পর বাদোশাবাবু ?'

—'সেই যে তুমি ভূতখানা থেকে ফিরে এসে দেখলে, কামিজও নেই, কলমও নেই, পকেটও নেই, জেগে দেখলে ঠাকুর হয়ে গেছ —তারপর ?'

—'তারপর ভাই, জেগে জেগে দেখি উল্টো শ্রী—ছিলেম 'শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর' হয়ে গেছি 'ঠাকুর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ'—নামটা কুরকুর করে খাচ্ছে কলাই ভাজি নেংটি ইঁদুর তিনটা ধারাল দাঁত।'

—'তোমার কী হল তাই বলনা !'

—'হবে আর কী ! তিন-তিনটি 'মিকি মাউস্' হয়ে নামটা কলাই খেয়ে আমার পায়ে গোঁফ মুছতে আমি পা তুলতে যাব —পা ওঠেনা; হাত ছুড়তে যাই—হাত নড়েনা, শরীর যেন পাষাণ ; সুড়সুড়ি লাগছে —রোমাঞ্চ হচ্ছেনা, মন অস্থির, গা শির শির, চক্ষুস্থির, আকাট বসে আছি রাত আর কাটেনা। ভাবছি ঠাকুর হয়ে তো বিপদে ঠেকলেম —সকালে চা টোষ্ট খাওয়া হবে না তো আর ঠাকুর ঘরের বাল্যভোগ পুজুরিতে বাদোশাবাবুতে খাবে, যা কিছু বাকী থাকবে ছোলা-কলা-কলাই-মটর তা কতক খাবে টিয়াপাখি কতক খাবে চড়াই, কতক ইঁদুর খাবে ; আমি চাইতেও পারব না, কেড়ে খেতেও পারব না। বেলাতে ভোগ চড়বে, খিচুড়ি ভোগের গন্ধ নাকে পাব, পিত্তি জ্বলবে, খেতে পাব না। ঘণ্টা বাজবে ভোগের—ভিখিরি বুড়ি লাঠি হাতে গুড়ি গুড়ি এসে পাতা পেতে বসবে—ব্রাহ্মণেরা বসে যাবে কুশাসনে, সপাসপ্ খাবে খিচুড়ি, সবাই দক্ষিণে পাবে দু-দুআনা। আমাকে তালাবন্ধ ঠাকুর ঘরে শয়নে থাকতে হবে কয়েদীর মতো, আর শুনতে হবে কোশাকুশি বাসনমাজার শব্দ। বৈকালে বৈকালিকি ফুলবাতাসা

বাদোশা বেলের সরবতের সঙ্গে হজম করবে। আমি বসে ভাবব, এই বুঝি আনে রাধু চিজ্ টোষ্ট, অম্‌লেট চা—কে কোথা!

হবে সন্ধিপূজা সমাপন,
গোধুলিতে গোষ্ঠে যাবে কৃষ্ণের গোধন,
ঠাকুরের ঘরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে দাস গোবর্দ্ধন।
বাদশা ছাড়বেন গ্রামোফোন,
রাধু কাট্‌লেট্ ভাজছে যখন,
খট্ করে পড়বে ঠাকুর ঘরের তালা,
এসে পড়বে পেলেট্ ধোয়ার পালা
হবে খানার টেবিলে ডিনারের আয়োজন,
আমার কী হবে তখন ?

বাদোশাবাবু বলে উঠলেন —'তুমি—খাব, খাব পুডিং খাব বলে চ্যাঁচাবে, আমি গিয়ে তালা খুলে দেব !'

—'পারবে না বাদোশাবাবু। ঠাকুর ঘরে ভুত ঢুকেছে বলে তুমি লেপ মুড়ি দেবে ; দাসী চাকরবাকর উচ্ছেলালকে ডাকতে ছুটবে, সে লণ্ঠন হাতে লাঠি ঠক্‌ঠকাতে এদিক ওদিক ঘুরে—'কোই নেহি হায়' —বলে দেউড়িতে গিয়ে খাটিয়া নেবে সে রাতের মত ; সাত ডাকে আর সাড়াও দেবে না।

—'তখন কী করবে তুমি ?'

—'করব কি সেই তো কথা বাদোশাবাবু !

—'রোসো ভাবি, আমিও ভাবি তুমিও ভাব !'

'কেন হনুমানকে স্মরণ করবে !'

—'সে তো আসবে না, আমার নাম যদি রাম হ'ত তবে আসত!'

—'কলা দেখালেই আসবে !'

—'মুষ্টিবদ্ধ হাত, কলা দেখাই কেমন করে ? আঙ্গুল নড়বে না যে !'

—'কেন নৈবিদ্যির কলা ? না, না সেতো পাবে না ; আমি যে খেয়ে ফেলেছি তখন।'

—'তবে কী হবে—বাদোশাবাবু ?'

—'ও ঠাকুর নাই হলে, আরো তো অনেক রকম ঠাকুর আছে।'

—'বলে যাও আরো কী ঠাকুর হতে পারা যায় !'

—'কেন গোঁসাই ঠাকুর তো বেশ। চেলীর জোড় পরে, জরীর ছাতি মাথায় চামর বাতাস খেতে খেতে নগরকীর্তনে বেরোবে শিঙে ফুঁকে—আমরা দেখব বারান্দায় দাঁড়িয়ে।'

—'আরে খড়ম পায়ে দুহাত তুলে নাচতে রাস্তায় পপাত হব দশা পেয়ে, তখন তুমি গিয়ে ভারি দেহটা কী ধরে তুলবে ?'

—'হাঁ তুলব।'

—'বাঃ তুমি মুর্গি খাও, আমি পরম বৈষ্ণব গুরু গোঁসাই—পবিত্র দেহ যাকে তাকে ছুঁতে দেবনা। পরম ভাগবৎ শিষ্য না জোটালে গোঁসাই ঠাকুর হয়ে লাভ নেই। শুধু দশা পাও আর কাদা মাখ।'

—'তা হলে ও চলবে না। আচ্ছা রাঁধুনী ঠাকুর হলে কেমন ?'

—'ছেঁক্ ছেঁক্ ছেঁক্ রাঁধুনী ঠাকুর
আননা ছোকা ধোঁকা কচুর
ডাল কি ডালনা বোঝা যাবেনা, লঙ্কার ঝালে ভরপুর
ভাতে ঝুল, চুল আর কয়লাচুর
রোচে যদিবা মুখে বাদোশা বাবুর
রুচ্‌বে না বেড়াল ছানার রাধুর
রোজ ফুটো হাঁড়ির জরিমানা দিতে, মাইনে নিতে গিয়ে
দেখব হয়ে গেছি ফতুর।'

—'কেন আমাদের সব আলুমিনামের হাঁড়ি।'

—'আরে হাঁড়ি হলে কী হয়,-শুখা বেহারা যে—

আনবে সাতকেলে শুকনো মাছ তরকারি
তখন যে ওপড়াবে রাঁধুনি ঠাকুরের পাকাদাড়ি

তার চেয়ে ভালো আমার ঠাকুরবাড়ি
ওকাজ নারি, বাদোশাবাবু রাঁধুনি ঠাকুর হতে নারি
আর কী হওয়া যায় ভাবনা ভাব তারি।

—'রোসো ভাবি—ঘুম পাচ্ছে ভারি—ঠাকুর—দাদাঠাকুর—ঠাকুর দাদা!'

'বস্ হয়েছে, ঢুকে গেছে বাধা—ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরদাদা!'

'কার ঠাকুরদাদা?'

'কেন তোমার, তোমার শুধু-দাদার—এরপর কথা নেই আর। আন নুন মাখিয়ে পুড়িয়ে আদা!

—'কে পোড়াবে?'

—'কেন তুমি!'

—'হাত পুড়বে না?'

—'তবে রাঁধুনী ঠাকুর পোড়াবে।'

—'তুমি খাবে? এই নাও, মুখ খোল দেখি। মুখ যে খোলেনা, রোসো মন্তর পড়ি—হুন্—

মন্তর মন্তর দাঁতি ছাড়া মন্তর চোল ধরা মন্তর
আদায় নুনের ছিটে, চুণে গুড়ে, চিট্‌চিটে—
খুলে যায় খিল দন্তর
কার আজ্ঞে? লোহদন্ত মুনির আজ্ঞে; অনুজ্ঞে কার?
করাতি দাঁতার;
প্রতিজ্ঞে কার? হাতে যার জাঁতি যন্তর।'

—'যাঃ ফুঃ।'

—'দাঁতি ছেড়েছে, বাদোশাবাবু, বাতাসা খাবু!'

—'বাতাসা নেই, আদাপোড়া!'

—'নড়ল না চোয়াল জোড়া!'

—'চক্‌লেট চকচকে রাংতা মোড়া ?'

—'এই খুলল কুমীড়ে হাঁ, চোখ খুলছেনা —ফেল দেখি চক্‌লেট দু'জোড়া ! হাঁ আঁ, আরে ছ্যাঃ এ যে খালি কাগজ !'

'মুখ খুলে গেছে এখন গল্প বেরক ফসাফস্।'

শোন শোন গল্প বলি ঠাকুরদাদার
গ্রাণ্ডফাদারেরও গ্রাণ্ডফাদার পেকে হয়নি ঝুনো
তত পুরনো একটা গলি, তারই মোড়ে আর এক গলি
আর এক মোড় আর এক গলি
ছিষ্টি করেছে অলি গলি গোলক-ধাঁধার
তার মধ্যে দিয়ে ঠাকুরদাদা চললেন ঠানদিদি আনতে
বাদোশাদাদার
বাজিয়ে গড়ের বাদ্যি, জ্বালিয়ে ফাসকেলাস্
খস্‌গেলস্ দেদার।
সঙ্গে চলল বরযাত্রি ভোলানাথ পুরুত
ছিরাম ঘটক মুখে চুরুট —নেড়ে টিকি।
তখন খাননা তামাকটি ঠাকুর দাদা
ঠোঁটের পরে সরু টানটি গোঁফের রেখার
টাক ঢাকা কোঁকড়া চুলে টেরির বাহার
চাপ্‌কান্ কিংখাবের
পায়ে মখমলের জুতো পঞ্জাবের
মাথায় কার্ত্তিকের পাগড়ি, কপালে চন্দন, গলায় মুক্তাহার
ফেটিং গাড়ি চারঘোড়ার—
খেপে বুঝি এই ভয় হচ্ছে ঠাকুরদাদার।
সে ভারি মজার ভিড় বরযাত্রার
সঙ্গে তখন রাধু নেই—আছেন কুণ্ডু রামলাল
গলায় সোনার হার।
পুরুত বলেছিল খালিপেটে যেতে

রামলাল লুকিয়ে দিয়েছিল খেতে—
লুচি ষোলোখান রামপাখির কাট্‌লেট খানচার।

—'ঠাকুরদাদা লুচি খেয়ে গেলে কয় গণ্ডা ?'

—'আরে ভাই চার গণ্ডা !'
—'কতদূর যেতে হল তোমার ?'
—'বেশী দূর নয় এই গলির মোড়েই শিব মন্দির
তারপরেই এক গলির মোড়ে দোকান দোয়ারি ময়রার
তার পরেই থালা ঘটি বাটি বেচে হরিচরণ কর্মকার
তার পরেই শ্বশুর মন্দির।'
'যেতে কতক্ষণ লাগল ?'
—'তা অনেকক্ষণ, অনেক লোক লস্কর, পথে কন্ধকাটা, গন্নাকাটা পায়ে পায়ে সবাই আগ বাড়াল, সঙ্গে ছিল কাবুলিওয়ালা পাহারাওয়ালা —পৌঁছতে বেশ একটু খিদে চাগ্‌ল !'
—'তারপর ?'
—'তারপর ভাই রঙ্গ বাধল —'

নাপিত বললে—'চোগা-চাপ্‌কান পেণ্টুলান ছাড়াও রামলাল !
খুলে নিয়ে গয়নাগাটি, জুতোপাটি সাজ গোজ চমৎকার
দিলে পরিয়ে একখানা চাদর, দশহাত ধুতি—
পাড়টা তার লাল।

ফতুর বেশে ঠাকুরদাদাকে শেষে
টেনে নিয়ে গেল—কে জানে কে সে ?
ভোলানাথ বললেন—'হাঁটুর কাপড় তুলে উবু হয়ে বস
হেসে একগাল'।

ভোলানাথ তো ভোলানাথ,
ভুলে গেছে আমার হাঁটুতে বাত
উবু হয়ে বসতে ছাড় ছাড় ধাত্‌
পিঁড়া পরে কাৎ হয়ে পপাৎ

শব্দ দিলে মটাং—পিঁড়ির কাঠ।

'দেহটা ভারি' বলে ভোলানাথ

মন্তর পড়িয়ে চললনে—খুলে পুঁথির পাত্।

—'কি মন্তর?'

'অড়র্ বড়র্—অসিত দেবল। কাশ্যপ শাণ্ডিল্য'—

'তুমি মন্তর বললে?'

—'সমস্কৃত বুঝলে তো বলব! আমি কেবল দে দে বলে হাত পাতলেম।'

—'কী করলে পুরুৎ?'

'সে এক কাণ্ড অদ্ভুত; আমার বাঁ হাতে একটা সোনার আংটি পরিয়ে ডান হাতে গোটাকতক পান সুপুরি দিয়ে আর একটা পিড়ের উপরে আর একটা লাল চেলীর পুটুলি থেকে একখানা মোমের মত নরম গয়নাপরা হাত টেনে বার করে আমার হাতে লাল-সুতো দিয়ে বেঁধে ফেললে।'

—'তারপর?'

—'তারপর বল্লে 'উঠে পড়, যাও বাটির মধ্যে!' বাটির মধ্যে ঢুকব কী—আমি উঠলেম, সঙ্গে সঙ্গে সামনের চেলীর পোঁটলাটিও উঠল—দুখানা রাঙা টুকটুকে আলতায় জোবড়ান পা ঝমর ঝমর শব্দ করছে।'

—'তারপর?'

—'বাটির মধ্যে ঢুকি কেমন করে ভেবে খিদে বেড়ে গেল। যা কপালে আছে বলে চললেম চক্ষু বুজে।'

—'তারপর কী হল?'

—'হবে আবার কী! কলকাতায় ঠাকুরদাদায় ঠানদিদিতে শুভদিষ্টি—লাল কাপড় ঢাকা দিয়ে!'

—'সে আবার কী? শুভদিষ্টি?'

—'আরে সে যার হয়েছে সেই জানে। তোমার যখন হবে তুমিও জানবে। সে কথা বলতে বারণ আছে।'

—'চুপি-চুপি বলনা কানে কানে—আমি কাউকে বলব না। লাল কাপড় ঢাকা দিয়ে বাটির মধ্যে কী?'

—'বলবার জো নেই। সে যে কী তা আমিই জানি তোমার ঠানদিদিও জানেন—কিন্তু বলবে না!'

—'বলবে না কেন?'

—'মন্তর ফাশ হয়েছে কি ঠাকুরদাদাতে ঠানদিদিতে চটাচটি হয়ে যাবে—শুধিয়ে দেখ!'

—'বলবে না?'

—'কিছুতে না!'

—'শুভ-দিষ্টির ইন্‌জিরি কী?'

—'Holy Look'

—'এখনি দেখছি ডিকসেনারি!'

—'যাও, খুঁজে বার করতে করতে দেখবে তার আগেই হয়ে গেছে তোমার শুভদিষ্টি!'

—'তারপর কী?'

তারপর ভাই পেটে ধরেছে খিদের জ্বালা
সামনে ভাত বেড়ে দিয়েছে একথালা
খিদে বলে আর কোথা যান
গরাস তুলে মেলাতে মুখখান
চেপে ধরল একহাত শালা
বলে 'খড়কি আগায় লও ঘ্রাণ'
পিছন থেকে কে মলে দিলে কান
ফিরে দেখলাম তোমার ঠানদিদির ঠানদিদি
নিয়ে পালালেন ভাতের থালা
আমার কানে ধরিয়ে জ্বালা
তার উপরে হাসি টিটকিরিতে কাণ ঝালাপালা।

—'তার পরে ?'

—'তারপরে এল গরম লুচির পালা।'

—'তার পরে ?'

তারপরে সবাই বলে 'আর খান দুচ্‌চার লুচি খাও!'
আমি মুখে বলিনে মনে মনে বলি 'যতপার কানমলা দাও'
সবাই বলে 'আর দুটো সন্দেশ খাও'।
আমি মুখে বলিনে মনে মনে বলি বলি 'আর চলবেনা একটাও'
হয়ে গেল সব গলাধঃকরণ
বাদোশা বাবু ঘুম পেল যে করিগা শয়ন
আর কথা নয় লাঠি গাছ দাও।

—'কাল চাই ভালো গল্প!'

—'বেশ এখন নিন্‌ গিয়ে তল্প, খেয়ে ডাল ভাত বিশ্রী—

অবনীন্দ্রনাথ।

তিন

—দাদামশায় ডালমুটের গল্প বল।

—ও কাগজের ঠোঙায় কী ?

—এক পয়সার মুড়ি।

—দাও ছুটো মুখে পুরি
শোন এইবার গল্প জুড়ি—

ডাল-হারা-পটির ডালমুটে ! আমডালের মতো মোটা মোটা কালো শক্ত তার পা। সে সোনামুগের ডাল মোটা মোটা গুণ-চটের থলিতে ভরে অলিতে গলিতে এ পাড়ায় সে পাড়ায় বিলি করতে করতে যখন একটা থলি বাকি থাকে, আমাদের ফটকের গোড়ায় এসে জিরোতে বসে ছুপুর বেলায় ঘামতে ঘামতে। সোনা মুগের ডালে ঠাসা চটের থলিটাকে সে একটা লাঠির ঠেকো দিয়ে বসিয়ে নিজে মাটিতে বসে ঝিমোয় ছুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে —যেন তেল চিক্‌চিক্ কন্‌ধকাটা দৈত্য কালো আবলুস কাঠ কুঁদে কাটা, ভয়ে কাছে যেতে পারিনে—একটুখানি খড়খড়ির ফাঁকে চোখ রেখে তাকে দেখি। ইস্কুলের তখন ছুটি। গরমের দিনের দমকা হাওয়া রাস্তার ধুলোয় কখন শুকন বাদাম পাতা কখনো ছেঁড়া খাতার টুকরো কাগজের ঘুর্ণি ঘুরিয়ে খেলে—ডালমুটে মুখ তুলেও চায় না—আমি দেখি !

ছিরে মেথরের পোষা ডালকুত্তো মাটি স্তুঁকে স্তুঁকে পায়ে পায়ে এসে ডালমুটেকে ডাক দেয় —এউ ! ডালমুটে জেগে উঠে বলে —হজুর ! তারপর নিজের ট্যাঁক থেকে সেকেলে তামার ঢিব্‌লে পয়সা ডালকুত্তোর সামনে ফেলে দেয়। কুত্তো সেটা মুখে নিয়ে খানিক এদাঁতে ওদাঁতে সুপুরীর মতো চিবিয়ে মাটিতে ফেলে লেজ

নাড়তে নাড়তে একদিকে চলে গেল। ডালমুটে টিব্লেটা তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে উঠে দাঁড়াল গা ঝাড়া দিয়ে। লাঠির ঠেকো সরিয়ে ডালের থলিটাকে মোটা সোটা একটা ছেলের মতো পিঠে নিয়ে হন্হন্ বেরিয়ে যায়।

—কোথায় যায় ?

—তা কী জানি ? রোজই দেখি এই ব্যাপার। ঠিক দুপুরবেলায় ডালমুটেতে ডালকুত্তোতে দেখা হয়। এ ডাকে এউ একটিবার ? সে ফেলে দেয় একটি পয়সা।

একদিন ডালমুটের হাতে সাহস করে একটি পয়সা দিয়ে বললাম —ডালমুটে, আমায় এক পয়সার ডাল দাও না।

সে বললে—পেট দুখবে। অমিত্ত দাসী বকবে বাবু।

—অমিত্ত দাসীকে তুমি চেন ?

—হ্যাঁ রান্নাঘরে যাঁতা ঘুরায় ঘর্ঘর ; ডাল ভাঙে, আটা পিষে।

—আচ্ছা ডালমুটে, ডালকুত্তোকে তুমি রোজ রোজ পয়সা দাও কেন ?

—ধরমরাজ খাপ্পা হবে তো কী হবে ? এই বলে সে চলতে চায় দেখে আমি বললেম—ডাল দিলে না তো ? পয়সা ফিরে দাও। সে আমার হাতে পয়সাটি ফিরে দিয়ে চলে গেল। আমারও ইস্কুলের ছুটি ফুরিয়ে গেল।

জানলার ধারে বসে দেখছি তারপরদিন ডালমুটে তখনও আসেনি, ভাবছি পয়সা ফিরে নিতে ডালমুটে রেগেছে বুঝিবা আর এল না। নিমগাছে একটা কাক কাটিকুটি কুড়িয়ে বাসা বাঁধছে— একটা কাটি সে কিছুতে ঠিক মত গছাতে পারছে না বাসায়। আমি বসে সেই কাণ্ডই দেখছি, এমন সময় কুত্তো ডাকল—এউ ! চেয়ে দেখি ডালমুটে গাঁটের গেরো খুলছে। যেমন টিব্লে ফেলা —লেও ধরমরাজ—বলে অমনি—

—অমনি কী বল দাদামশা ? চুপ করলে কেন ? বলে ফেল।

—রোসো মনে করি। দাও তো আর দুটো মুড়ি গালে ফেলি।

—আর নেই দেখ খালি ঠোঙা। অমনি কী হলো বল না।

—যেমন পয়সাটি ফেলা ডালমুটে, অমনি কোথা ছিল কাক, টপ করে পয়সাটি তুলে নিল। ডালকুত্তো —ওউ বউ —ডেকে, দুটো লাফ দিয়ে ডিগবাজী খেয়ে মাটিতে পড়েই উঠে দৌড় !

ডালমুটে তখন কাকের দিকে চেয়ে বললে—এ ক্যা কিয়া যমরাজ ধরমরাজ তো খপ্ত হোগা !

কাক, ক্যা, বলে পয়সাটা গাছের তলায় ফেলে দিলে। ডালমুটে খুঁটে থেকে একচিমটি চাল গাছের তলায় ছড়িয়ে দিয়ে পয়সাটি মাথায় ঠেকিয়ে কোমরে গুজে চলে গেল ডালকুত্তো যেদিকে গেছে —যমরাজ ক্যা কিয়া ধরমরাজ খপ্ত হোগা বলতে বলতে। ডালের থলি যেখানকার সেখানে লাঠি হাতে পাঁচিলে বসে রইল।

আমার কী মনে হল, থলিটাকে পাঁচিল থেকে উল্টে ফেলে দিই। যেমন মনে হওয়া অমনি কাজ। লাঠি সুদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়ল চটের থলি দুপ্‌ করে খানিক ধুলো উড়িয়ে, খানিক ডাল ছড়িয়ে মুখ গুঁজড়ে। কাকটা বাসা বাঁধছিল, ক্যা ক্যা বলে উড়ে পালাল। সেই সময় পাঁচিলের ওপারে শুনলেম, ডালমুটে বলছে—আর এ ক্যা ! শুনে আমি চোঁ চাঁ চম্পট খড়খড়ির ঘরে দোতালায়। খড়খড়ি খোলবার সাহস নেই, কান পেতে শুনছি ডালমুটে বলছে—এ যমরাজ এ ক্যা কিয়া, ধরমরাজ খাপ্পা হুয়া, বহুত মাল নোকসান। ক্যা জানে আওর ক্যা হোনেকা হ্যায়, বলে সে চলে গেল কি পুলিশ ডাকতে গেল জানিনে। যমরাজের ঘাড়ে দোষ পড়েছে শুনে আমি ভয় থেকে রেয়াৎ পেয়ে সেই যে সরলুম, ডালমুটের দিকে আর মাড়াইনে খড়খড়িও খুলিনে পুলিশের ভয়ে !

—ডালের থলিটা ফেলতে গেলে কেন দাদামশায় ?

—আরে কী জানি ভাই, থলিটা বসে আছে উঁচুতে, তাকে যে বয়ে বেড়ায় সে বসে আছে নীচুতে দেখে সেটাকে ঠেলে ফেলে দিতে আমার হাত নিস্‌পিস্‌ করত।

—তুমি তখন কত বড়ো ছিলে ?

—এই তোমারই মত বয়েস।

—তবে পাঁচিলে হাত পেলে কী রকম করে? এইবার তোমার বাজে কথা ধরা পড়েছে।

বাজে কথা কেন হবে? তুমি পাঁচিলে উঠে বিয়ে বাড়ির বাজনা-বাদ্যি দেখ কেমন করে?

—তুমি গাছে চড়তে পার?

—না, কিন্তু গাছে চড়ে পট্‌কান খেয়েছিলে সেদিন আমি দেখেছি।

—কখন না। পট্‌কান খেতে আমি ভালই বাসিনে, আমি ঘুড়ি পাড়তে উঠেছিলেম গাছে। আজ আর গল্প থাক দাদামশায়।

—আর একটুখানি আছে।

—না আমার ঘুম পাচ্ছে, থাক আজ।

—আরে না না, বাকিটুকু না শুনলে খাপ্পা হবে ধরমরাজ। শোন বলি।

—না আমি শুনব না। যমরাজ ধরমরাজ আমার ভাল লাগে না—আমি কানে আঙুল দিলুম।

—বেশ, আমিও আর এ গল্প বলচিনে—নাক মললুম।

চার

—'পট্‌কান্ ফলে কোন্ গাছে বাদোশামশায় ?'

—'কেন, লট্‌কান্ গাছে। তুমি বলত দাদামশায় চিৎপটাং ফলে কোন্ গাছে ?'

—'কেন, তৃপ্‌পতাং গাছে, ফলটি খেয়েছ কি তৃপ্ত হয়ে গেছ, আর খাবার ইচ্ছে হবে না। তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে ভুঁড়িতে হাত বোলাও আর শুয়ে থাক বিছানায়।'

—'খাবার ইচ্ছে হবে না ?'

—'না।'

—'চিঁড়ে ভাজা সামনে ধরে দিলেও না ?'

—'না।'

—'চিনে বাদাম ? গোলাপী রেউড়ি ? গরম ফুলুরি ? চকলেট ? বিস্কুট ? লজনজুষ—ইত্যাদি ?'

—'কিছুনা।'

—'মিশির বোধহয় আজ সেই ফল খেয়েছে দাদামশায়, আমি দেখেছি খাটিয়ায় পড়ে ভুঁড়িতে হাত বোলাচ্ছে—মটর চলবে না বলে পাঠিয়েছে—আমার ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ।'

—'আরে সে ফল পেলে তো খাবে ! পৃথিবীতে জন্মায় না সে ফল—দেবলোকের গাছে স্বর্গের বাগানে ফলে। মিশির কাল মটর ভাজা খেয়েছে বেশী করে তাই পেট ফুলে ঢোল হয়েছে, উঠতে পারছে না, কাল ঠিক উঠবে।'

—'কাল রবিবার, ইস্কুলের ছুটি, উঠলেও আমি যাচ্ছিনে। সোমবারের আগে সেই গাছ একটা আনাতে পার না দাদামশায় ?'

—'আমাদের যুধিষ্ঠির যদি বেঁচে থাকত আনতে পারত।'

—'যুধিষ্ঠির কে ?'

—'জান না ?'

—'না, হাঁ মনে পড়েছে, ভীমের দাদা স্বর্গে হেঁটে গিয়েছিল !'

—'আরে সে যুধিষ্ঠির কেন হবে। এ হল পরীক্ষিৎ মালীর ছেলে যুধিষ্ঠির। ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নয়।'

—'সে কী করত ?'

—'উড়ে রামায়ণ পড়ত সন্ধে বেলা, দিনের বেলায় সবজী বাগানে মাটি খুঁড়ত। সূর্যিকে বলত সে 'মহাপড়ভু', আমাকে বলত সে 'ড়বনীবাবু, অবধাড় নমসকাড়' ; 'অ' বলতে সে বলত 'ড়', 'র' বলতেও সে বলত 'ড়'। অড়হর ডালকে সে বলত 'ড়ড়র ডাল', রামায়ণকে বলত 'ড়ামায়ণ', 'অ' গুলো সে যোগ করে দিত কথার শেষে। কানন্ বলতে বলত 'কানন্অ' ; শ্রাবণ বলতে বলত 'সড়াবন্অ'।'

' 'আ' বলতে পারত ?'

'এক একবার পারত, এক একবার পারত না। আম গাছকে কখন বলত 'অমগছ্অ' 'কখন বলত 'আমব্গাছ্অ'।'

—'তার পড়াশুন খুব বেশী ছিল না বুঝি ?'

—'খুব ছিল, রামায়ণ মহাভারত গড় গড় করে পড়ে যেত কিন্তু নিজের নাম যুধিষ্ঠির বলতে তার চক্ষুস্থির হয়ে যেত।'

—'কি বলত সে নিজের নাম ?'

—'আরে সেই নিয়েই তো কথা, শোন না বলি—

ছিরে মেথর ছিল ইংরাজি বলতে পাকা। মদ না খেলে সে সাধু বাংলায় কথা কইত। মদ খেয়েছে কি বেরিয়েছে কুইক ইংলিশ ফর্ ফর্—ড্যাম্ ইউ রাস্কেল, গো টু হেল, ব্লখেড্—এক্স নম্বর ওয়ান ব্লডি ফুল।

আমি তখন ভালো ইংরিজি শিখিনি। বিদ্যে ফলাতে গেলাম তার কাছে, শুধোলেম ইংরেজিতে —'ছিরে মেথর, হোয়াট নেম ইউ ?'

সে খাঁটি ইংরিজিতে জবাব দিলে—'মাই নেম্ ইজ শ্রীরাম—নট্ ছিরে মেথর'।

আমি বললেম—'মেথর নয় তো হোয়াট্ ইউ।'

সে হেসে বললে—'গো এণ্ড রীড—ফার্ষ্ট বুক, প্যারিচাঁদ সরকার—আপন্ গড্ আই এম নট্ মেথর, হাইকাষ্ট স্কেভেঞ্জার। দীন দরিদ্রকে উপহাস করিয়া লজ্জিত করিবেন না—আমি অতি অজ্ঞ।'

—'তুমি কী করলে দাদামশায় ?'

—'আরে ভাই কী ইংরিজি কী বাংলাতে হার মেনে আমি বোকা বনে গেলাম—কান লাল হয়ে উঠল লজ্জায়।'

'তারপর ?'

—'তারপর বলি শোন। ইস্কুলে আমার পাশে যে বসত, সে ডবল প্রমোশান পেয়ে ক্লাসে উঠে গেল—আমি ইংরেজি বাংলা ছুয়ে ফেল হয়ে হেডমাষ্টারের হাতে পায়ে ধরাধরি করে ক্লাসের সেকেণ্ড বেঞ্চিতে বসবার হুকুম আদায় করে পুজোর ছুটিতে বাড়ি এলেম যখন, তখন হাফ হলিডের প্লেজুরটুকু আছে বাকিটা বাদ।'

—'মার খেলে না বাড়িতে এসে দাদামশায় ?'

—'ক্ষিদে ছিল না ভাই, ছুটো কুচো গজা খেলাম, রামলাল বললে 'হয়েছে তো প্রমোশন ?' আমি বললেম—'হয়েছে, ছুধ খাব না, নিয়ে যাও।' প্রমোশন নিয়ে আর কিছু গোলমাল হল না।'

—'কেন ?'

—'আবার কেন ? ছুধের বাটি চাপা পড়ে গেল।'

—'তারপর ?'

—'কত আর ছুধের বাটি চাপা দিই। মাষ্টার গেল টের পেয়ে—সেকেণ্ড বেঞ্চির উপরে আর উঠতে প্রমোশান হয়নি। 'দী র‍্যাম' একশোবার—তার মানে একশো বার লেখার হুকুম দিয়ে পুজোর ছুটিতে বাড়ি গেল। ইস্কুল-ঘোড়া পুজোর ছুটি পেলে, আক্কেল সহিস সেও পেল—কেবল আমিই পেলেম না ইস্কুলের পড়া থেকে ছুটি। রামলাল চাকর খাতা বেঁধে আনলে রুল টেনে।

—'কী মুস্কিল, দাদামশায় কী করলে ?'

—'কী আর করব! রুল টানা খাতার পাতা তো নয়, যেন ইঁদুর কলের শিক পরান দরজা!'

প্রথম পাতায় 'দী র‍্যাম' ভর্তি করতে, আর 'দী র‍্যাম' কটা পড়ল খাঁচাকলে গুনতে ষষ্ঠির সকাল কাটল। দ্বিতীয় পাতা লিখব, গেছি ভুলে 'দী র‍্যাম' মানে। দী র‍্যাম মানে আর কিছুতে মনে পড়ে না —'দী র‍্যাম মানে কী লিখি! মানের পাতা খালি রেখে 'যাই' বলে এক হাঁক দিয়ে মরিয়া হয়ে দৌড় —বই সেলেট খাতা ফেলে। এমনি রোজই হয়, 'দী র‍্যাম' পর্যন্ত এগিয়ে মানেতে গিয়ে ঠেকি। হাই তুলছ যে বাদোশাবাবু, ভালো লাগছে না গল্প?'

—'লা-গ-চে বলে যাও।'

—'ঐ খাতা লিখতে লিখতে কোনো দিন ঘুম পায়, কোনো দিন মানে ভেবে ঘুম হয় না রাতে। পাছে হঠাৎ ছুটি ফুরিয়ে যায় মাষ্টার এসে পড়ে —এই ভাবনায় ছুটোছুটি করতে পারিনে ভালো করে, ক্ষিদেও হয়না দুধের বাটি ভর্তিই থাকে পড়ে রাতের বেলায়। এই অবস্থায় একদিন ছিরে মেথরের শরণ নিলুম।

—'দী র‍্যামের' মানে বাংলায় বলত দেখি, কেমন পার?'

—'কেন ছাগলীর মায়ের ভর্তা।'

—বস্ আর পায় কে! পাতাজোড়া গোটা গোটা 'দী র‍্যাম' আর ছাগলীর মায়ের ভর্তাতে খাঁচা কল ভর্তি করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন ভাই তোমার দাদামশায়।'

—'তারপর?'

—'দিন দিন মোটাতে থাকলেম, দুধের ক্ষিধে বেড়ে গেল। রামলাল থেকে থেকে ভয় দেখায়— 'খাতা লিখছ না বলে দেব।'

—'দিও বলে, আমি খাতা লিখে শেষ করে দিয়েছি—দেখে নাও।'

'এক পাতায় একশোটা করে লেখা দরকার, এ যে একটাতেই পাতা ভর্ত্তি করে রেখেছ। এ খাতা চলবেনা, আমি আবার খাতা আনব।'

—'বারে আমি ত্বার করে খাতা লিখব নাকি ?'

—'চল খাতাঞ্চিখানায়, যোগেশ দাদা এর বিচার করবেন।'

—'চল, চলনা তুমি আগে চল, আমি যাচ্ছি সঙ্গে।'

—'গেলে না সরলে মাঝপথ থেকে দাদামশায় ?'

—'আরে ভাই সে রামলাল তাতে কদিন ত্বধ না পেয়ে চটেছে—গ্রেপ্তার করে হাজির করলে খাতাঞ্চিখানায় বিচারকের সামনে। কদম ছাঁটা পাকা চুল বুড়ো বাঘের মত পাকা গোঁফ গলায় শাদা শাপের মত পৈতে, বড়ো বড়ো চোখ, সামনে খাতা বাক্‌স পাশে রূপো বাঁধা হুঁকো —ফরাসে বসে উঁচু বৈঠকের পরে।

—'কি রামলাল, ছোটো বাবাকে ধরেছ কোন্ অপরাধে ?'

—'আজ্ঞে খাতা লেখায় ফাঁকি দিচ্ছেন।'

—'খাতা দাও, এক কল্‌কি তামাক সাজো দেখি। বস ছোটো-বাবা তক্তায় উঠে বস।'

আমি উঠে বসতে বললেন—'গোবর্দ্ধন দাও তো তোমার চশমাটা, ভালো করে বিচার করে দেখি খাতা।'

আমি বললেম—'চশমা যে তোমার নাকেই রয়েছে যোগেশ দা।'

—'ছোটো বাবা হাসালে। সূক্ষ্ম বিচার করতে হলে ডবল চশমার দরকার।'

—আমি বললেম—'আমার দোষ নেই, ত্বধের বাটি দিইনি বলে রামলাল রেগেছে।'

—'আচ্ছা সে বিচার পরে, দেখি খাতা, কী লিখতে দিয়েছিল মাষ্টার ?'

—'দী র‍্যাম আর তার বাংলা মানে।'

—'বেশ, দী র‍্যাম—এতো দিব্বি হয়েছে, পাতা জোড়া খাতা, দেখিতো মানেটা—'ছাগলীর মায়ের ভর্তা' বলেই বাক্‌সতে এক চাপড়। রামলাল হুঁকো হাতে হাজির ঠিক সময়ে। যোগেশদা তেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন — হুঁকো হাতে পেয়ে ঠাণ্ডা।'

—'রামলাল ছোটো বাবার ত্বধ কতটা বরাদ্দ ?'

—'আজ্ঞে দেড় সের দুবেলা।'

—'গোবর্দ্ধন দেখত খাতা।'

গোবর্দ্ধন খাতা ধরে দিলে কিছু না বলে।

—'যাও ছোটোবাবা তুমি খালাস—লেখা খুব ভালো হয়েছে।'

আমি দৌড়।

—'তারপর দাদামশায়, রামলালের কী হল?'

—'তা দেখবার ইচ্ছেও হলনা, সময়ও হলনা। বৈকেলে দেখি দুধের বাটিতে পুরু সর—'ও রামলাল আমি সর খাইনে যে।'

—'হুকুম হয়েছে ঘন দুধ খাওয়াতে যোগেশ মজুমদারের।'

—'সর তুলে নাও।'

—'এক দিক ভেঙে চুমুক দাওনা—দুধ আছে তলায়।'

'চুমুক দিই' দুধের গন্ধ পাই দুধ পাইনে।

—'এ কী হল? দুধ কোথা গেল?'

—'দুধ ঘন করতে করতে মরে গেছে—সরটা খেয়ে ফেল।'

—'না কাল থেকে বল্‌কা দুধই দিও।'

—'তাই হবে কিন্তু মজুমদার মশায় আর না টের পায়, আমার তা হলে তোমার চাকরি করা চলবেনা।'

—'কোথায় যাবে রামলাল?'

—'জবাব হলে আর কোথায় যাব?—বর্দ্ধমানে দেশে চলে যাব।'

—'তা হলে সীতে ভোগ এনে দেবে কে?'

—'তবে আর নালিশ করনা দুধের।'

—'করি তো আমার নাম নয়—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ।

পাঁচ

—'অবাক জলপান খেয়েছ কখন দাদামশায় ?'

—'না খাইনি, গল্প শুনতে বসলেই তোমার খাবারের কথা মনে পড়ে কেন বলত বাদোশাবাবু ?'

—'মনে পড়লেই বা দোষ কি ?'

—'ওতে করে গল্প শোনার ক্ষিদে মরে যায়।'

—'গল্প বলবার ক্ষিদে ?'

—'আর বেড়ে যায় ; কই দেখি একটু অবাক-জলপান দাওতো চাখি।'

—'সে এখানে পাওয়া যায়না !'

—'তবে ?'

—'তোমাকে লোভ দেখালুম !'

—'আরে কী মুস্কিল, কোথায় পাওয়া যায় বলনা, আনাই কাউকে দিয়ে !'

—'সে কেউ আনতে পারবেনা, এদিকে আসেনা সে !'

—'তবে কোন্ দিকে ?'

—'সে অনেক দূরে—মামাবাড়ির দিকে !'

—'যাওয়া যায়না সেখানে ?'

—'যাবেনা কেন ? মটোরে গেলে দু'টাকার তেল পুড়বে, ট্রামে গেলে দু'আনা, বাসে গেলেও তাই অথচ —জিনিষটার দাম এক পয়সাও নয় !'

—'কেমন করে জানলে ?'

—'আমিতো অমনি খেয়ে এলেম মামার বাড়িতে, পকেটেও নিয়ে এলেম একথাবা—দাম তো চাইলে না কেউ !'

—'দেখি তো পকেট !'

—'অ্যাঁ, না কী কর দাদামশায়, পকেট ছিঁড়ে যাবে, ছেড়ে দাও!'

—'আরে পকেট নিচ্চিনে!'

—'তবে দেখ যাঃ ফোক্‌কা—উড়ে গেছে—কেমন ঠকেছ?'

'ভারি তো তোমার অবাক-জলপান, আমি ওর চেয়ে ভালো জিনিস বিনি পয়সায় খেয়েছি।'

—'কী বলনা?'

—'শুনে কেবল দুঃখু বাড়বে, খেতে তো পাবে না।'

—'নিশ্চয় তোমার পকেটে আছে, দেখি!'

—'দেখ, এ পকেটে রুমাল, ও পকেটে চশমার খাপ্, বুকের পকেটে কলম, খড়কি কাঠি, অ্যাঁ, ওটা নিও না—ও আমার নোট!'

'খুলে দেখি?'

—'দেখ আপত্তি নেই!'

—'এ কী লেখা আছে?'

—'পড়ে দেখ না!'

—'চেপ্‌টা মাথা চট্ জলদী!!'

'কী বাদোশাবাবু কথা নেই যে? অবাক-জলপানের চেয়ে খাসা জিনিস কিনা বল?—ও কী কাগজটা খেয়ে ফেললে যে!'

—'হ্যাক্ থুঃ তেতো!'

—'লেখা কাগজে তেতো হবেনা. জীভে কালী লেগেছে। যাও মুখ ধুয়ে এস —চেপ্‌টা-মাথা চট-জল্‌দীর গল্প হবে।'

—'কামিজে মুছে ফেলেছি আর তেতো নেই।'

—'আচ্ছা তা'হলে মুখটি বুজে কানটি খুলে রাখ, গল্পের মাঝে মুখ খুলেছ কী চট্-জলদী পালিয়েছে। শোন বলি—

যুধিষ্ঠির মালী—ঘাড় নাড় যে বাদশা? শোন না বলি—হাত নাড় যে? যুধিষ্ঠির মালী—এ কী উঠে যাও যে? আচ্ছা বুঝেছি, যুধিষ্ঠিরের গল্প চলবে না। বস, বলি শোন—

যখন যে তরকারিটি মাছটি নতুন উঠবে বাজারে, সেটি এনে

উপস্থিত করা চাই আমাদের বাড়িতে সহরের আর কেউ খাবার আগে —দামের জন্যে ভাবনা নেই। মানুষটি কে? তুমি দেখনি, দেখতেও পাবে না, নামধাম পরিচয় দিলেও বুঝবেনা। —আঙ্গুল নড়ে যে? ছবি এঁকে দেখাতে বলছ? আচ্ছা কথায় ছবি আঁকা যাক্—

ভাব এক বুড়ো টাক মাথা,
ঘাড়ের কাছে পাকাচুল বাবড়ি-কাটা,
বাম পাটা-ফোলা যেন হালি সহরের বৈতাল কুমড়ো
বাকী দেহটা-কালিদাসের 'ব্যুঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ' কবিতা
পাঞ্জাবি কেতায়-পাকা দাড়ি গোঁফ্
গায়ের রং—খয়েরে সিঁদুরে মিলেছে সুরকীর গুঁড়ো
সর্বদা হাতে মুর্শিদাবাদের গেঁটে বাঁশের মোটা দাণ্ডা,
লাল ছিটের রুমাল গলেতে বাঁধা,
কামিজের চুনোট্ হাতা,
কাঁধে চাদরখানি —
ধুতি পরার কেতা হিন্দুস্থানি,
দুপায়ে দুই মাপের জুতা,— বাম পায়েরটা চেপ্টা গুড়মুড়ো।
ভোরে উঠে ডন ফেলে, লর্ড্স্ প্রেয়ার পড়ে
দাঁতন করেন,
বেড়াল দেখেছে কী উঠিয়েছে হুড়ো।

বেড়ালের উপর জাতক্রোধ এমন আর দেখিনি। কেন তা জানিনে। রাতে চারখানা কাঠের চৌকির হাতায় মশারি বেঁধে বৈঠকখানার মাঝের ঘরে মাদুরের উপর তোষক পেতে দিত ফরাশ, তার মধ্যে তিনি নিদ্রা দিতেন— বেড়াল সেখানে এগতে সাহস করে কি?

আমি একদিন শুধিয়েছিলেম— 'বেড়াল দেখলেই তেড়ে ওঠ কেন?'

কে জানে ভাই, ব্যাটাদের দেখলেই কেমন রাগ হয়ে যায় ; শোন তবে বলি—

আজ প্রায় ৬০।৬৫ বছর হল, এই লাঠি যখন প্রথম কিনি, তখন যার নামে ঐ পাঁচিধোবানীর গলিটা হয়েছে সেটা বেঁচে আছে। ইয়া ল্যাজ মোটা তার এক পোষা বেড়াল। ভোরে নতুন লাঠিটা হাতে তোমাদের এখান থেকে যাচ্ছি, দেখি বেড়ালটা অকাতরে ঘুমোচ্ছে দাওয়ায় পড়ে। নতুন কিনেছি লাঠিটা— মজবুদি তো পরখ্ করা চাই। দিলেম বসিয়ে বেড়ালটার ঘাড়ে। টুঁ শব্দটি করতে হল না। আমিও চট্ সরলেম নতুন বাজারের দিকে— তখন ঘোর ঘোর আছে।

বাসায় গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে, বাজার থেকে নতুন এক তরকারী — যা কেউ খায়নি —কিনে রুমালে বেঁধে আসছি, গলির মোড় থেকে শুনি পাঁচি বাড়িওয়ালীর গলা— 'কে কল্লে এমন ? তার সর্বনাশ হোক— গোল্লায় যাক্' যত গালাগাল তত কান্না।

আমি বুঝলেম ভাই ব্যাপারটা যা হয়েছে। অতি ভাল মানুষ হয়ে বললেম— 'বলি ও গিন্নি, হল কী ? কান্নাকাটি কেন ?'

—'দেখনা বাবু কেন'—বলেই যা একটানা লম্বা গালাগাল, শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়।

আমি কী আর বলি, বেড়ালটাকে একটা লাঠির খোঁচা দিতে সেটা দাঁত খিঁচিয়ে, পেট উঁচিয়ে কাৎ হয়ে পড়ল খানায়।

আর কোথা আছে—বাড়িওয়ালীর কান্না ! মাথা কুটে মরতে যায়। আমি সাধু হয়ে তার কাটা ঘায়ে তত নুনের ছিটে দিই— 'তাই তো, এই বাজারে যেতে দেখে গেলেম, বেড়ালটি মোটা ল্যাজ ফাঁপিয়ে দেয়ালে গা ঘসছে —আহা কে এমন নিষ্ঠুর এর মধ্যে এর দফা রফা করলে ? বড়ো ভালো ছিল বেড়ালটি ! সকালে ওর মুখখানি দেখলে দিনটি ভালো যেত ! কোলে পিঠে করে মানুষ করলে —ওর প্রমাই ফুরিয়েছিল ; তবু ভাল্ বলতে হবে যে তোমার ষষ্ঠির দাস ঠিক ষষ্ঠির দিনেই গেছে —'এই বলেই আমি চট্ চম্পট।

তারপর থেকে বেড়াল দেখছি কী, সেদিনের গালাগাল মনে পড়ে যায় আর রাগ সামলাতে পারি না—ব্যাটা বেড়াল অপঘাতে মরেছিল তাই উদ্ধার হয়নি এখন ঘুরছে।

আমি বললেম—'কখন সে বেড়াল আর দেখা দিয়েছিল?'

—'দিয়েছিল, সেদিন সন্ধেবেলা এতকাল পরে ঠিক ষষ্ঠি পুজোর সময় নিজের চৌকিতে বসে আছি—বিশ্বেশ্বর তামাক দিয়ে গেল, টানছি তো টানছি, টিকে আর ধরতে চায় না, বৈঠকে হুঁকো রেখে ভাবছি সেই কত বছর আগেকার তোমাদের বাড়ির ষষ্ঠি পুজোর ধূমধাম, এমন সময় পিছন দিকে ডাক! লাঠি ঠুকব—দেখি লাঠি সরে গেছে।

—'বেদ্‌ড়া কোথাকার' বলে উঠতে যাই পারিনে। 'বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বর' হাঁক দিতে কে যেন চেপ্‌টা-মাথা চট্‌ জলদী পালিয়ে গেল।'

—'তারপর?'

—'এঃ বাদোশাবাবু মুখ খুলেছে—আর গল্প চলবে না।'

—'তুমি যে বললে চট্‌ জলদি খাবার জিনিস?'

—'নিশ্চয় আমি কি মিছে কথা বলেছি!'

ছয়

দাদাভাই !

—আরে কে ও ? কাবুলিদিদি যে ! ষষ্টির দিনে হঠাৎ, মা কই বাবা কই, দুলালী কই !

— তারা পুজোবাড়িতে, তুমি তো গাড়ি পাঠালেনা তাই মিশিরের গাড়িতে আমি চলে এলেম, আকাল আগমনী ! দাদাভাই —বাবা মা নেই, রাধাকান্তকে এইবেলা খেল্‌না আনতে বলে দাও !

—রাস্তায় আসতে কিছু দেখলে ভাল খেলনা কাবুলিদিদি ?

—একটি দেখেছি, চমৎকার মাটির পুতুল ঃ

—বল কেমন শুনি ?

—ষষ্টিবুড়ি যষ্টি হাতে গুড়ি গুড়ি যায়।

—ওই শোন দিদি যষ্টি ঠক্‌ ঠক্‌ সিঁড়িতে উঠছে পুতুল !

—না দাদাভাই আমায় ভয় করছে, আমি ও পুতুল নেব না !

—দামটা লোকসান যাবে যে !

—ও তুমি নিয়ো ! আমি কী পুতুল খেলি ?

—না খেল তাকে তুলে রাখবে ঘর সাজিয়ে ! আচ্ছা রাধাকান্তকে বলে এস নতুন পুতুল জোগাড় করুক ! —দাম !—সে ভাবনা নেই, বল আমার ঐ যে হাতঘড়িটা আছে সেইটের মধ্যে পয়সা আছে— চুপি চুপি বার করে নিয়ে, বুঝলে ? হাঁ কাউকে বোলনা।

—ও দাদাভাই এযে দাদু এল লাঠি হাতে, ষষ্টিবুড়ো ত নয় !

—আমাকে দিয়ে দিয়েছ আর ফিরে পাবে না !

—ইস্‌ আমার দাদু !

—তোমার দাদু হতে পারে কি, দাম তো দিয়েছি আমি।

—কত হলে ছেড়ে দিতে পার ?

—দাম কেন, তুমি নাও না অমনি।

—দিয়ে নিলে যে কালিঘাটের কুকুর হয়

—আচ্ছা কানাকড়ি একটা

—আমি জানি সে ভয়ানক শক্ত পাওয়া !

—আচ্ছা, কাবুলীওয়ালার সেই নাচগানটা একবার দেখিয়ে দাও।

—ঝুলি লাঠি তো আনিনি।

—এই নাও তাকিয়া এই নাও লাঠি, লাগাও নাচগান কাবুলীদিদি ঃ—

(ছড়া) পেশুঔর সে আতাহুঁ অয়েস চায়ন মেরা কাম,

অব রাহিগীর হেন্দকা হুঁ

লেও লেও বাবু আঙ্গুর পেস্ত বদক্সান কা

খিসমিস বাদাম সস্তা বদস্তা হুঁ

সালুন্ মিছরী সালাম সালাম

(গীত) আঙ্গুর খরবুজ আহালু বখরা কাবুল কশমীর

মশ্কট হালবা

খিসমিস খিসমিস অখরোট পিস্তা !

গুর্জিন্ পুস্তিন্ জাফেরাণ হোর হিং থোড়ি

খড়ি খড়ি বিচ্তা

খাজুর খাজুর মিঙ্কই কাফুর কাবুলী ধুস্সা উনি কম্বল

বুনবন বোস্তা সিস্তান সহরা সস্তা জোড় !

—এইবার দাদাভাই ধর লাঠি, তোমার সেই ভিখিরি বুড়োর গান গাও।

—কোন্ ভিখিরি ভাই—

—সেই যে তোমার ছেলেবেলায় আগমনীর দিনে গান গেয়ে গেয়ে দোরে দোরে কেঁদে বেড়াত পয়সার জন্যে ?

—অমন কথা বল না, পয়সার জন্যে কাঁদত না সে।

—তবে ?

সে তার মায়ের জন্যে কাঁদত—মায়ের জন্য কেঁদে কেঁদে তার দুটি চোখই কাণা হয়ে গিয়েছিল, সে লাঠি নিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করে আসত, ধূলায় বসে গাইত—

মা ওমা জগতের মা সবার মা হয়ে কি আমার মায়া ভুলেচ

—এই টুকখানি মনে আছে আর মনে নেই।

—তারপর! দাদাভাই আমার চোখে কী একটা পড়ল!

—কচলিওনা লাল হয়ে যাবে। —মন্তর মন্তর চোখ জ্বলার মন্তর জল পড়ার মন্তর যাঃ ফুঃ উড়ে যা, দেখ দেখি আর চোখ জ্বলছে ?

—না, মা আসচে না কেন দাদাভাই ?

—এই আসেন আরকি, আচ্ছা সেই যে ভিখারিটা বসে গাইলে তার নামটি কী ছিল বলত দিদি ?

—কেন জগত্!

—তুমি ত দেখনি তাকে কেমন করে জানলে তার নাম ?

—গানের মধ্যে রয়েছে যে জগতের মা। পুজো বাড়িতে খেয়ে মা বাবা দুলালী বসে রইলেন আসবার নামটি নেই। নিশ্চয় মা গল্প জুড়ে দিয়েছেন, বুঝেছ দাদু ?

—গেছে তো খানিক বসে গল্প করবে না, থাক না আসবে যখন খুসি।

—শুনলে কাবুলীভাই তোমার দাদুর কথাটা শুনলে ?

—যখন খুসী আসবেন আমরা না খেয়ে বসে থাকি, বাদশা-দাদাও নেই।

—সে তার মামার বাড়ি যাবে না ;

আমি তাই বুঝি বলছি, দাদু কী বলেন তার ঠিক নেই দাদাভাই তুমি এর বিচার কর—

—আচ্ছা তুমি কী বলছো শুনি কাবুলীদিদি —তবে এর বিচার।

—আমি বলছি এতক্ষণ ধরে গাড়ি বসিয়ে রেখেছেন কত তেল পুড়ছে বল।

—তা পুড়ছে বইকি।

—তবে? যদি আসবার সময় তেল ফুরিয়ে যায়?

—ফুরিয়ে যায় যাবে তোর তাতে কিলা?

—আঃ থামনা দাদু, আমি এক বলছি দাদু আর এক বলছেন। আমাকে বলতে দাও—

—দাদু কী বুঝবে তুমি চুপি চুপি বল তোমার মনের কথা

—শোন, বুঝলে তো—

—ঠিক বুঝেছি।

—দাদুকে বুঝিয়ে দাও—

—বুঝলে তো বোঝাব—পুজোর দিন টেক্‌সি পাওয়া শক্ত, মিশিরের গাড়িও চলবে না —বাবা মা দুলালী রিস্‌ক ডেকে সোজা বাড়ি যাবে; এইতো তোমার ভাবনা কাবুলীদিদি?

—তিনজনের বেশী চাপলে রিস্‌ক ভেঙে পড়বে কী দাদাভাই?

—রিস্‌ক ভাঙতে না পারে রিস্‌কাওয়ালার কোমর ভেঙে যাবে, এতো মিশির ড্রাইভার নয়?

—যায় যাবে, তুই এইখানে থেকে যাবি লুচি খেয়ে।

—আরে না না, এই দেখ আবার কী চোখে পড়ল —যাঃ ফুঃ সেরে যাঃ গেছে তো?

—গেছে একটু একটু আছে।

কোথায় গেছেন পুজো দেখতে বাবা মা —বলে ফেল ও কাবুলীদিদি, জেনে রাখি।

—বাবা মায়ের মামার বাড়ি।

—তাহলে ভয় নেই তেলকলঘাট কাছেই।

—ভাবিস কেন আজ ষষ্ঠি, আসতেই হবে তোর মাকে বাপের বাড়ি।

—এইবার পাকা কথা বলেছেন তোমার দাতু,— চন্দর, সুয্যি উল্‌টে যেতে পারে কিন্তু পাঁজীতে যা লিখেছে কেউ উল্‌টাতে পারবে না,—আসতেই হবে।

—এল বলে দেখ্‌না লা।

—ঘর্ঘর করে কিসের শব্দ হচ্ছে ?

—ও ইসক্রীম কল ঘোরাচ্ছে রাধু।

—তাহলে এখন রাত হয়নি —তুমি ছড়া বল দাদাভাই, আমি শিখে নিই—

—সব ছড়া মনে নেই।

—একটু একটু বলনা আমি জুড়ে জাড়ে নেব বাড়ি গিয়ে—

—ছড়া কই তবে :

গোরচাঁদের মেলায় যাব মেলায় গেলে হেলায় পাব ;
দয়াল নিতাই দয়া করে খেতে দেবে পেট ভরে
মোণ্ডা মিঠাই যা চাই পাব
গোরা বাজারের বুড়া কর্ত্তা খায় এককুড়ি বেগুন ভর্ত্তা
গিন্নিটি তার পেঁচা চিন্নি পাঁঠা চাই তার হপ্তা হপ্তা
খেয়েছে শতাধিক পাঁঠার মুড়ো একটি ফেলেনি হাড়ের গুঁড়ো,
সেখানে কেনো যাব !
পাতড়া চাটতে অক্কা পাব ! গোরাচাঁদের মেলায় যাব
বলে ঠোঁটকাটা মুটে সকালে উঠে—খেংরাপটির নোংরা
গলিতে আর কী রব

—দাদাভাই আমাদের পাড়ায় গোরাচাঁদের মেলা হয়, কোনোদিন তো ঠোটকাটা মুটেকে দেখিনি।

—রোসো সে আগে তার খেংরাপটির বাসাভাড়া চুকোক, রাধুকে আজও সকালে ধরেছিল —আমি যদি তার বাসাভাড়াটা দিয়ে দিই।

—তুমি দিয়েছ নাকি দাদাভাই ?

—দিয়েছি তো !

—তবেই হয়েছে, সে ঠোঁটকাটা এখন কর্ত্তাগিন্নির মত তোমার নামে ছড়া বেঁধে ফেলেছে।

—আমি রাধুকে বলে দিয়েছি ঝাঁকাভরে মাটির পুতুল মুর্গিহাটা থেকে পৌঁছে দেবে তবে পাবে পয়সা।

—না হলে থাকো খেংরাপটীতে। বেশ বুদ্ধি করেছ দাদাভাই!

—একী আমার বুদ্ধি, বাদোশাবাবুর বুদ্ধি।

—তুমি হলে হয়ত বলতে আহা গরীব দিয়ে দে ক'টা পয়সা।

—তাহলে কী হত?

—পয়সা নিয়েই সরে পড়ত মুটে, পুতুলও আসত না মুটেও আসত না।

—এখন তো এল না কে জানে রাধাকান্ত কী করে বসে আছেন দেখত—

—আবার অন্ধকারে যায় মেয়েটা—

—না দাদু, বারাণ্ডা থেকে দেখছি, রাধাকান্ত—

—কী বলচ?

—ঠোঁটকাটা ঝাঁকা মুটে এয়েচে?

—না পাওয়া গেল না।

—পুতুল এল না। আঃ জবাব দেয় না? এল না দাদাভাই। এই যে এগুলো কী?

—রোস্ ভেঙে যাবে।

—এই দাদাভাইয়ের টেবেলে রাখলেই হত

—এটা কে নেবে, এটা কে নেবে, এটি বাপু দুলালী নেবে, এটি বাদোশা নেবে, এটি আমি······

—হিহি দাদাভাই, দাদু কী করচেন দেখ, এমন হাসি পাচ্ছে আমার।

—আচ্ছা দেখা যাক পুতুলগুলোর দাম কত।

—রাধাকান্ত এদিকে আন এই টেবিলে, দেখো পড়ে না যায়। দাদাভাইকে ফর্দ্দটা দাও।

—'দাদাভাই চালভাজা খাই ময়না মাছের মুড়ো'—এ পুতুলটা কী দাদাভাই ?

—এ সেই খেংরাপটির বাড়িওউলী, দেখচ না ঝাঁটা হাতে ··

ঠোঁটকাটা এখানে নেই, তুই যাঃ আমাদের ঘর ঝাঁটাবার লোক আছে।

—ওটা তুই নিবিনে তো রাখ রাধুর কাছে।

—থাকনা, আগে কোন্‌টা কী বুঝে দেখি দাদু !

—কাবুলীদিদি, এটি যে দেখছি কর্তা বেগুন ভর্তা।

—ও আমি চাইনে রাধুর কাছে থাক্‌, দুলালী নেবে এলে।

—এযে দেখি জীব বার করে মেমাচ্চে কচি পাঁঠার মুড়ো—

—বুঝেচ দাদাভাই ও সেই গিন্নির, আমি নিচ্চিনে।

—রেঁধে খেয়ে ফেলাবে।

—আর মাগো দেখলে ঘেন্না করে ও আবার খাবে। একরকমের নাট্‌পুতুল দুটি আনলে কেন রাধাকান্ত ?

—ও জোড়া ছাড়া বিকোয় না নিতাইগৌর।

—ঠিক হয়েছে, এদুটি রাখতে হবে দাদাভাই, গোরাচাঁদ দয়াল নিতাই ভুলে গেলুম যে ছড়াটা।

—এটি কে নেবে কাগজে মোড়া ?

—ঐ দেখ দাদু একটা পুতুল লুকিয়ে রেখেছেন।

—বোধহয় মুড়ির ঠোঙা।

—না পুতুল, আঃ হাতে দাওনা একবার টিপে দেখি।

—তা হবে না, ঐ দুলালী মা বাবা সবাই এসে গেল···

—বাদোশাদাদা মামিমা রোসো দাদু একটু থির হয়ে বলছি, ভেবে নিই, ভেবে পাইনে যে দাদাভাই—

—আচ্ছা স্মরণ কর দেখি, সেই দোরে দোরে কেঁদে বেড়াচ্ছে—

—ঠোঁটকাটা নাকি ?

—না সেতো আসেনি রাধু বলে তবে ! মনে পড়ছে ?

—বুক ঠুকে বলে ফেল তার নাম।

—জগৎ ভিখিরী।

—কাগজ খুলে দেখ্না লা শিবঠাকুর।

—দাদাভাই তুমি ভেবেছিলে মুড়ি।

—তাইতো ষষ্টির দিনটাতে কেবল আমি-ই ঠকলেম না, বাদোশা-বাবুও ঠকলেন, গল্প শুনতে না পেয়ে এতেই খুসি।

সাত

বস্ দাদামশায়, একদম ডিসাপিয়ার।

—কী গজা না খাজা?

—তোমার রূপোর ঘটির ঢাকা!

—কী হবে এখন? একদম পুলিশ কেস্ দাদামশায়!

—তুমি ব্যস্ত হেয়ো না, বাদোশাবাবু! এতো সেকাল নেই যে পঁ্যাজ খেলে মুখে গন্ধ করবে না। চোর ধরা যাবেই, জিনিষটা একদম যখন ডিসাপিয়ার করলে তখন তুমি কোথায় ছিলে বাদোশাবাবু?

—দাঁত মাজছিলেম সকালে উঠে।

—তোমার সামনে থেকে ডিসাপিয়ার?

—একদম দাদামশায়!

একদম ডিসাপিয়ার নট্ হিয়ার নট্ দেয়ার নো
হোআ্যার!

হু ইট্ আগুন, মষ্ট ভমিট্ কয়লা
ফায়ার কখন ছাই চাপা রয়না
ঢাকা আছে হয় নিকটে
নয় দূরে মেল্টিং পটে
বাদোশাবাবু নো ফিয়ার
ঘটি বাটি টেব্লি চেয়ার নাইট্ মেয়ার
এই এ্যাপিয়ার এই ডিসাপিয়ার!

—বাদোশাবাবু, ঢাকনির ভাবনা ভেবে আর লাভ নেই। বলত ঘটিটা এখন দেখতে লাগছে কেমন?

—ভারত যুদ্ধে কাটা পড়া ঘটোৎকচ যেমন।

—হিয়ার হিয়ার, থ্রী চিয়ার, হেড্ ডিসাপিয়ার টেল এ্যাপিয়ার।

—চোখের সামনে থেকে ঢাকনাটা ডিসাপিয়ার দাদামশা!

—তা না হলে ঘটোৎকচ তো এ্যাপিয়ার হতে পারে না, বাদোশাবাবু—।

—আচ্ছা সচক্ষে ডিসাপিয়ার এ্যাপিয়ার হতে দেখেচ কিছু তুমি!

—কেন এ প্রশ্ন হল আগে বল।

—আমার তো মনে হয় দাদামশা, একবার ডিসাপিয়ার হলে আর এ্যাপিয়ার হয় না—

—হয় ভাই যদি না বগীচাসাই হয়ে যায় জিনিসটা।

—বলত শুনি কেমন?

—বলি শোন সচক্ষে দেখেছি সকর্ণে শুনেছি যা—।

পাল্‌কি গাড়িটি ছোট্টো, তার চেয়ে ছোট্টো ঘোড়াদুটি, গাড়ি ঘোড়ার চেয়ে ছোট্টো কোচমানটি, শনিবারে শনিবারে তাতে চড়ে ও বাড়িতে এসে নামতেন একটি ভদ্রলোক, নাম ভুলে গেছি—ঐ মিশিরের মতো লম্বাচওড়া শুধু রংটা কালো আর গোঁফ জোড়া পাকা ঠিক যেন কলা দুটো। দেখতে পাচ্ছ তো বাদোশাবাবু?

—পষ্ট দেখেছি ছোট্টো পাল্‌কিতে চারখানা চাকা, তাতে দুটি ছোটো ছোটো সাদা ঘোড়া জোতা, বাচ্ছা কোচমান কোচবাক্‌সে বসে—

—বলে যাও থামলে কেন?

—দাদামশায়, তার মধ্যে কী করে অতবড়ো মানুষটি ঢুকতেন বার হতেন তাতো বুঝলেম না!

—তুমি বুঝবে কী! আমি এখন বুঝলেম না।

—তুমি দেখেছিলে ঢুকতে বার হতে?

—সচক্ষে দেখা মানুষটি গাড়িতে ঢুকতেন যেন ডিসাপিয়ার হয়ে যেতেন, বার হতেন যেন এ্যাপিয়ার হতেন।

—এ তো ভারি মজার কথা!

—আরও মজা আছে শোন—বাড়ির উত্তর ধারে আস্তাবল, সেখানে থানজুড়ে বড়ো ঘোড়া বাঁধা থাকে। ছোট্টো গাড়ি ছোট্টো

কোচমান অশথতলায় ঘোড়া খুলে দেয়, গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে রোদে, ঘোড়া চরে খায় ঘাস পাতা যা পায়, ছোট্টো কোচমান ছুটি পেয়ে খাটিয়ায় পড়ে ঘুমোয় ; এমনি প্রতি শনিবার দেখি।

একদিন দেখি সোর গোল পড়ে গেছে। বাড়ির যত সহিস কোচমান দরোয়ান চেঁচাচ্ছে এ ক্যা তাজ্জব ঘোড়া কাঁহা গিয়া? ঘোড়া না পেয়ে কাঁদতে লেগেছে ছোট্টো গাড়ির ছোট্টো কোচমান।

দৌড়লেম দেখতে! রৈ রৈ পড়ে গেছে। এবাড়ি ওবাড়ি সবাই খুঁজছে ঘোড়া - ঘোড়া একদম ডিসাপিয়ার। কেউ বলে বাবা এ সাগর রাজার ঘোড়া ইন্দর রাজা চুরি করলে নাকি। কেউ বলে, আরে একী হয় দেখনা ছাগল হয়ে চরছে ; আরে না না দেখ্—ঐ বাগানের বাঁধা নহরে জল খেতে গিয়েছিল, পড়ে ভেসে গেছে গঙ্গামুখে। আর একজন বলে, ওরে দেখ চিলে খরগোস ভেবে তেঁতুল গাছে তুলে নেয়নি তো!

অনেক খোঁজাখুঁজি আকাশ পাতাল ভাবা চিন্তা করা চুকতে রোদ পড়ে এল—হঠাৎ সেই সময় ঘোড়ার লাথালাথি। চিঁহি চিহি শব্দ শুনে খেলা ছেড়ে গিয়ে দেখি বাগানের মধ্যে একটা ভাঙা ইষ্টিমারের বয়েলার, তার মধ্যে থেকে একটা ঘোড়ার ল্যেজ ধরে টেনে বার করলে ছোট্টো কোচমান— আর একটা ঘোড়া পিছু হেঁটে এ্যাপিয়ার হল ওইভাবে বয়েলার ছেড়ে।

ঘোড়া দুটো কত বড়ো ছিল দাদামশায়?

—বয়েলারের চোঁঙার ব্যাস্‌টা যত বড়ো তার চেয়ে কিছু ছোটো ছিল সেটা ঠিক!

—তাই একেবারে বগীচাসাই হয়ে গেল না, ডিসাপিয়ার হয়ে খানিক বাদে আবার এ্যাপিয়ার হল!

—বগীচাসাই কথার মানে কী বলতে পার দাদামশায়—

ঐতো বলেছি— যেমনি বগীচাসাই অমনি আর দেখা নাই, ইংরিজীতে ওর মানে হয় না, বাংলাতে উর্দ্দুতে সমস্কৃততে পালিতে উড়িয়াতে ওর জোড়া কথা আছে কি না!

—কথার মানে বার করবার জন্যে তোমার এত ঝোঁক কেন বলত, অনেক কথা আছে যার মানে ডিসাপিয়ার করেছে অথচ কথাটা চলছে।

—যেমন ?

—এই তো ভাই বাদোশাবাবু জবাবদিহিতে ফেললে—এই যেমন, এই যেমন—

—বুঝেছি দাদামশায়, বিদ্যেসাদ্দিও বগীচাসাই হয়ে গেছে তোমার।

—এই মনে পড়েছে—বোম্‌কালী কল্‌কাত্তালী—ওয়েব্‌ষ্টর শব্দকল্পদ্রুম বিশ্বকোষ বাংলা পরিভাষা চাপা পড়ে, দেখ ওর মানে কোথাও পাবে না খুঁজে !

—আচ্ছা ওকথা যাক্‌, তারপর দাদামশা ?

—এতক্ষণে তারপর কী চলে আর, আজ রাতে বাদোশাবাবু, বগীচাসাই হয়ে গেছে সাতের গল্পটা।

—দাদামশা, ও সব কোনো কাজের কথা নয়, সাতের গল্প তোমার সাত পাক নাক ফাঁসে পড়ে গেছে।

—কেন বলত বাদোশাবাবু ?

—ষষ্ঠির দিনে কাবুলীকে তুমি দুর্গা নাম শুনিয়েছ, এ তারি ফল।

—কেন শোনাব না। সে যে আমাকে এত আঙুর পেস্তা খিস্‌মিস্ বাদাম দিয়ে গেছে !

—সেগুলো কোথায় গেল, ডিসাপিয়ার হয়ে গেছে নাকি ?

—আরে ডিসাপিয়ার হলেতো এ্যাপিয়ারের আশা ছিল, বগীচাসাই হয়ে গেছে—

—আঙ্গুরের বিচিগুলো—

—বাগানে ফেলেছি তো—

—তাহলে গজাবে—এ্যাপিয়ারও হবে।

—যতন কর তো হবে !

—কেমন করে যতন করতে হবে আঙ্গুর গাছের, কে বলে দেয়।

—কেন ঈশ্বর গুপ্ত।

—তিনি আছেন না—

—নাই থাকুন, তাঁর উপদেশ আছে—ছাপার অক্ষরে ছাপা, বলি শোন—

'আঙুর গাছের কিছু করি বিবরণ, মাচা বিনা তরু-বর
বাড়ে না কখন
ফলফুল সুমধুর কিছুই ধরে না, অল্প দিনান্তে
বৃক্ষের প্রাণও রহে না,
কিন্তু এক মঞ্চ যদি পায় সে আশ্রয়, শাখাপল্লবে
প্রতিদিন উন্নত সে হয়।'

—কাল সকালেই একটা মঞ্চ বাঁধা চাই দাদামশা।

—'বিনাশ্রমে আঙুরলতা না পারে বাড়িতে, নিতান্তই মরে যায় পড়িয়া মাটিতে—'

—ফলবে তো দাদামশায়!

নিশ্চয়! 'ফলেই ফলাই ফল না হয় বিফল, তবেই সফল সব যদি হয় ফল।'

—মঞ্চ কে বাঁধবে?

—কেন, বাগোয়ান মালী তো আছে—।

আট

—দাদামশায় পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য কী ?

—সে গল্পটা আমি আজ সকালে উঠে লিখে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

—একেবারে ছিঁড়ে ফেলে দিলে ? রাখলে কাজ হত। মাসিকে বেচে ছোড়দাদা দুটো পয়সা আদায় করত।

—তারপর কী হত বাদোশাবাবু !

—আমি তার থেকে কিছু আদায় করে নিয়ে চট্‌পটি কিনতেম।

—চট্‌পটি দেখেছ দাদামশায় ?

—দেখিনী আবার ? চট-জলদির ছোটো ভাই।

—আশ্চর্য তুমি কি সব দেখেছ ?

—সব আশ্চর্য দেখে কী কেউ শেষ করতে পারে ? এখনও দেখার বাকি আছে অনেক।

—'শুধু-দাদা, বলে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য 'কিং কং'—নতুন একেবারে।

—হেঃ নতুন। কতকাল আগে কিং কং এর উপরে ছড়া তৈরি হয়ে গেছে আমার ছেঁড়া খাতায় তা জান ?

—বল তো শুনি ছড়াটা।

কে তুমি জীব মীন কে তোমার বহে ভার
কারে বা তুমি বও তাই কও।
কং স্বরূপের অংশরূপে ব্রহ্মকুণ্ডে অন্ধকূপে
বদ্ধ হয়ে করি কিং।
ডাঙায় উঠে ডিম পাড়ি, জলে নামি ধবি মীন,
কাদাজলে বোদাজলে কং ক বক অংশ
জগতে কং জানো সার
কং বিনা কিং আছে আর
কিং থাকে আর কং হলে ধ্বংস ভেবে লও।

—আচ্ছা পৃথিবীতে তাহলে অষ্টম আশ্চর্য নেই ?

—নেই, যদি না কষ্টম হাউসটাকে বলে অষ্টম আশ্চর্য।

—আর কী হবে ছেঁড়া গল্পটাকে সাড়ে-সাতের কোঠায় ফেলে নতুন করে অষ্টমে চড়ান যাক আটের গল্পটা।

—অষ্টম আশ্চর্য গল্পটা লিখে ছিঁড়লে কেন দাদামশায়—ভারি অন্যায় করেছ।

—কেন ছিঁড়লেম বলি যদি তো অষ্টম আশ্চর্যের চেয়ে আশ্চর্য লাগত তোমার।

—আচ্ছা বল শুনি কেন ছিঁড়লে।

—তাও বলবার যো নেই—তাহলে তো বলতুম।

—তবে কী হবে দাদামশায় ? অষ্টম চড়ানোর মানে কী দাদামশায় ?

—সে ভাই কষ্টমের একশেষ। চুলোতে চড়ালে একমুঠো ছাই পাঁশও পাওয়া যায় কিন্তু অষ্টমে চড়ালে — ধন দৌলত মান সম্ভ্রম ঘর বাড়ি খাট বিছানা গহনাগাটি জমি জমা জমিদারী কিছু আর থাকে না।

—কোথায় যায় ?

—পাঁচ ভূতের কবলে পড়ে উপে যায় বাষ্প হয়ে শূন্যে।

—দাদামশায় তোমার ভুল হল। বাষ্প হলে মেঘ হয়, মেঘ হলে বিষ্টি হয় পড়েছি ; তুমি চড়াও গল্প অষ্টমে নির্ভয়ে দাদামশায়।

—আচ্ছা তাই হোক—

শুনে ছেঁকছেঁকানি শব্দ কানে
তবু কতক বাঁচি প্রাণে
বকবকানি ঢের হয়েছে, বসি এবার কোমর এঁটে
অষ্টমীতে আসবে যারা
আমার হয়ে খাবে তারা
মনকে আমি প্রবোধ দেব
হাত বুলায়ে তাদের পেটে।

ছেলেবেলায় ঘোষাল-মাষ্টার ছিলেন আমাদের। তাঁর ভুঁড়ি এত শক্ত ছিল যে মেড়া তেড়ে ঢুঁসোলে মেড়ার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যেত বোধ হয়। বিদ্যেতে ঠাসা ভুঁড়ি সর্বদা তাতে আমি হাত বোলাতেম—ঠিক যেন একটা হলুদে চামড়ার বাবুণে ফুটবল।

—তোমাদের তখন ফুটবল খেলা হত ঐ মাঠে দাদামশায় ?

—আরে না ভাই, ও মাঠও ছিল না ফুটবলও ছিল না—মাঠের জায়গায় ছিল পুকুর, ফুটবল ওঠেনি তখন ; সেই পুকুরে চিৎ-সাঁতার দিতেন মাষ্টার, মনে হত যেন একটা সোনাব্যাঙ্ প্রকাণ্ড গামলা-পেট উঁচু করে ভেসে বেড়াচ্ছে পুকুরে। রোদ-জল তেলে চিক্‌চিক্ সেই ভুঁড়ি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের মতো ঠেকত আমার কাছে।

—তারপর ?

—তারপর একদিন ভাই সেই ভুঁড়ির জুড়িদার আর এক কালো চিনেমাটির মতো ভোজপুরী ভুঁড়িদার এসে উপস্থিত—যুদ্ধং দেহি বলে।

—কিসের যুদ্ধ ?

—শোননা বলি। আগে তো ফুটবল খেলার রেওয়াজ ছিল না, কার ভুঁড়িতে কত ধরে, এই নিয়ে লড়ালড়ি চলত টাকা বাজি রেখে।

—তারপর ?

—যুদ্ধং দেহি বলে তো এল ভোজপুরী, কিন্তু কে যুদ্ধ দেয় তার সঙ্গে ?

কুম্ভকর্ণের প্রায় তার খাওয়ার বাড়াবাড়ি
দেখে লাগে হৃদ্‌কম্প, কে করে আড়াআড়ি ?
পেটুক অনেক ছিল চাকর নফর
কেহ না—আগাতে চায় তার বরাবর।
ঘোষাল বলেন খেসোল হয়ে ভঙ্গ দিবি কী কারণ ?

বঙ্গের রাখিতে মান আমি দিব রণ।
ছাতুখোর ভোজপুরীর কিসের বড়াই
জানেনা ফলারে পুরী কত গণ্ডা খাই।
বজ্রসম ভুড়ি দেখ বিরাট কঠিন
হেসে খেলে তলাতে পারি মন দুই তিন।
কুড়ি তঙ্কা বাজি পড়ে তবে শর্মা লড়ে
নচেৎ লোটা কম্বল নিয়ে যাক বেটা ঘরে।
সহি বলে তিন হাঁড়া দহি করি পার
ভোজপুরী গোঁফ মুচড়ি হল আগুসার।
রামলাল বলে বুঝি টুটে এবার বাংলার অহঙ্কার
ঘোষাল বলে পাল্লা দেয় এত শক্তি কার ?

—তারপরে ?

—তারপর ভাই কুড়ি টাকা বাজি ফেলে লড়াই সুরু হল। দুই মুদি এল, একজন হিন্দুস্থানী, একজন বাঙালী। দুটো চুলো ধরান হল গাড়ি বারান্দার দুই মুখে। মধ্যে একদিকে যত বাঙালী চাকর বাকর সরকার গোমস্তা, আর একদিকে যত খোট্টা বেহারা আর দারোয়ান। মথুর দারোয়ানকে মধ্যস্থ করে বাজি খেলা আরম্ভ হল —কে কত রসগোল্লা খেতে পারে, যে প্রথমে এলবে তারই হার।

চুলোতে রস আর রসগোল্লা যেমন পাকছে অমনি দুজনের পাকযন্ত্রে চলে যাচ্ছে টপাটপ।

রসগোল্লা ওড়ে পর্বত প্রমাণ
সমান উভয়ে উভয়ে কেহ না পিছান
কস বেয়ে রস গড়ায়, দেখতে বিপরীত
কে জানে কেবা হারে কার হয় জিৎ।

ছুঁচটি পড়ে তো শোনা যায় এমন স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে, কি হয়, কি হয়। যে ওজন ফুকরে চলেছে সে হাঁকলে —রামলাল তেওয়ারি এক মনের পরে সাড়ে সাত —অমনি তেওয়ারি ‘বাপ’ বলে চিৎপাত।

ঘোষাল মাষ্টার একমণ আটসের উড়িয়ে ধীরে সুস্থে কড়াই ধরে রসগোল্লার রস সবটা গলায় ঢেলে কুড়ি টাকা টাকে গুঁজে দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে আচমন করতে উঠলেন।

—তারপর?

—তারপর আর কী? সব চুপচাপ সরে পড়ল যে-যার। বৈঠকখানার একতলায় চেঁচামেচি করবে, হুর্‌রো ওঠাবে এত সাহস তখন কারো ছিল না।

—তাহলে কী হত দাদামশায়?

—সে না খেলে বুঝবেনা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য কষ্টমের চূড়ান্ত।

—তুমি খেয়েছিলে?

—অনেকবার!

—এখনও খেতে ইচ্ছে হয়?

—এ বয়সে নয়, সে বয়স যদি ফিরে পাই তো রাজি আছি।

দাদামশায়, সাহিত্য-রস কী?

—সাহিত্য-রসের জন্য হঠাৎ তোমার ব্যাকুলতার কারণটা কী শুনি বাদোশাবাবু।

সবাই বলছে—তোমার ছবিতে যেমন শিল্প-রস নেই, তেমনি তোমার গল্পেও সাহিত্য-রস নেই।

তা হ'লে বাকি থাকে কি বাদশামশায়?

—কিছুই নয়।

যাক্, তা হ'লে আমার দুঃখ নেই।

'আমি রসের ব্যাপারি,
চরস বেচি না কিনা না কিনা ইচ্ছা তোমারি।
গরুর মধ্যে ছিল গব্যরস, আকের ছোবড়াতে একো-গুড়
এ সব আগে জানত না কেউ, জানিয়ে গেল এক—এক
রসের ঠাকুর—
বিশ্বাস না কর যদি, খাওনা নিজের ভাত বাড়ি।'

—ঠিক বলছ দাদামশায়, আমি বুঝেছি, তুমি বলে যাও তোমার গল্প।

—শোনা তবে বাদশামশায়।—

জগু মুন্‌সী ছিলেন জেতে হিঁদু, কিন্তু উর্দু ফারসী পড়ে মুন্‌সী হয়ে অবধি কাচা দিয়ে কাপড় পরতেন না। ইংরেজী পড়লে যেমন এখন সাহেব সাজে সবাই, আর রাগলেই মুখ দিয়ে ফর্‌ফর্ ইংলিস্ বুলির ফোয়ারা ছোটায়—সেই রকম। জগু মুন্‌সীর ছেলেকে একটা ছেক্‌রা গাড়ির ঘোড়া কান কামড়ে রক্তপাত করে দিয়েছিল, কেউ দিচ্ছে ছেলের মুখে জলের ঝাপ্‌টা, কেউ করছে পাখার বাতাস, স্ত্রী কাঁদছে 'কী হলোগো' বলে। মুন্‌সীর খেয়াল নেই;

কেবলি ফার্সিতে ধমক ঝাড়ছেন—এ্যায়সা কমবক্ত বেতমীজ্ হেহুঁসিয়ার, বেল্দা ঘোড়েসে কান কাটায়া! —ওগো ছেলেটা গেল যে চেয়ে দেখ।

—এ্যায়সা লড়কা কা মুখ্না না চাহিয়ে!

—ওগো নাকের দম হল ছেলেটা!

—জেরা বেদমুস্ক শুঙাও—বলে কলাই-করা তামার বদনাটা থেকে খানিক জল ছেলেটার গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যান।

ছেলের মা বলেন,—যাও কোথা?

—পুজো বাড়িতে নবমীর নাস্তা খেতে—বলেই প্রস্থান মুন্সী।

—ছেলেটার কী হল দাদামশাই?

—ছেলেও তেমনি, খানিক বাদে চেতন পেয়ে উঠে বল্লে,—মা ক্ষিদে পেয়েছে। মা তার কানে পটি বেঁধে বললে যাও বাবা পুজোবাড়ি, নবমীতে মায়ের ভোগ খেয়ে এসো গে; দেখো তোমার বাপ নাস্তা-মাস্তা খেতে দেয় তো খেও না।

—নাস্তা কারে বলে দাদামশায়?

—আমিও ঐ কথা মুন্সী মশায়কে শুধিয়েছিলেম।

—কী বললেন তিনি?

—মনে নেই!

—কার মনে নেই—তোমার না সেই মুন্সীমশার?

—আমার গো, আমারি মনে নেই। নানখাতাই বলে একটা পার্সি বই থেকে একটা গজল আউড়েছিলেন তা মনে আছে।

—তা থেকেই মানেটা বোঝো যাবে—বল তো শুনি?

আচ্ছা শোনো—

'খাস্তা নাস্তা পেট কি ওয়াস্তা না কুছ মজুদ্
হুয়ে গোমস্তা নাস্তা-নাবুঁদ।'

—বুঝলে কিছু বাদোশাবাবু?

—না, তবে ওটা শুনতে জাঁকালো; যেন কত্তাল বাজছে কাছে—'খাস্তা নাস্তা নাস্তা-নাবুদ'।

—দেখলে বাদোশাবাবু ফারসী পড়ার মজা! কানে শুনলেই কথার মানে আপনিই বোঝা যায়। বাড়িতে পুজো-টুজো হলে নাস্তা খেতে হয়, বাজনা-বাদ্যির সঙ্গে ধুমধাম করে।

—তারপর দাদামশায়!

দ্যালে নিজের ছাওয়া দেখলেই তার সঙ্গে সোরাব রোস্তমের লড়াই বাধাতেন মুন্‌সী সাহানামা আউড়ে। আর ছেলেদের দেখলেই ফার্সি পড়বার ঝোঁক চাপতো তাঁর ঘাড়ে,—বলে চল আ লে বে তালে-বেতালে বলেই তিনি নিজেও ছড়া আউড়ে চলতেন, আমাদের চলাতেন মার্চ করিয়ে।

—কী ছড়াটা বল না শুনি?

আ লে বে পেতে চল তালে বেতালে পা ফেলে
দেখ না উঠে জিস্তে—

—আর মনে নেই ভাই। মুন্‌সী একটা ছেলেদের নানখাতাই বই লিখেছিলেন, তাতেই ওটা বাংলা উর্দু হরপে ছাপা হয়েছিল।

—সে বইটাতে আর কী ছিল?

—তোতা আর জোতার গল্প, কবুতর আর বাজের লড়াই, হামাম্ বাগর্দের কাহিনী, কাছেম দর্জির কেচ্ছা—এমনি নানান্ জিনিস।

—সেইখানা আবার ছাপাও না দাদামশায়!

—পেলে তো ছাপাই। বড়ো রসের জিনিস সব ছিল তার মধ্যে। সব চেয়ে ভাল লাগত বখরা-বখরীর কথা।

—তারপর?

—বলি শোন—

জগু মুন্‌সীকে একদিন নিজের ছাওয়ার সঙ্গে সোরাব রোস্তমের লড়াই দিতে দেখে আমি বললেম —জী আপনি ঘোড়ায় চড়ে লড়েন না কেন? সোরাব রোস্তম তো ঘোড়ার সওয়ার হয়ে লড়েছিল। মুন্‌সী কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—তুম্ সচ্ বাত বোলা

—অব শুনো ইস্‌কা হদিস্।—বলেই তিনি দাওয়ায় বসে সুরু করলেন, —দেখ, তোমার দাদামশায় আমাকে ঠিক এই কথাই বলেছিলেন একদিন। আমি তাতে জবাব করলেম—দেখেন, রোস্তমের উপযুক্ত ঘোড়া যদি পাই তো দেখাই লড়াই। তখনি এক হাতিয়ার জামা জোড়া এক ইষ্টরব্রেড্ ঘোড়া বখ্‌শিশ। কথা রইল কাল উঠোনে সোরাব রোস্তমের লড়াই দিতে হবে! আমি কী করি—মনে মনে বললেম,—মুন্‌সী অব তো তেরা মৌত নজদীগ্, ইস্ আফ্‌তসে নিকলনেকা কৌন রাস্তা! মুখে হাঁ হুজুর বলে ঘোড়া জামা জোড়া হাতিয়ার বগেরা নিয়ে তো বাসার মুখে চলি। গিন্নি ঘোড়া আর সাজ-সরঞ্জাম দেখে ডরিয়ে গেল —কি গো এ সব কী! লড়ায়ে যাবে নাকি? আমি কিছু না ভেঙে হাঁ হাঁ করে দুটো ভাত মুখে গুঁজে, গেলেম খেতু খোট্টার ওখানে। তার পর দিনই বার হবে পরেশনাথ, আমি ঘোড়া নিয়ে হাজির দেখে বললেম—আরে মুন্‌সীজী আইয়ে রাম রাম।—আর রাম রাম ভাই, একটু গোপন কথা আছে—আড়ালে চল। ঘোড়াটা একজনের হাতে জিম্মে করে দিয়ে আড়ালে গিয়ে বললেম নিজের আসন্ন বিপদের কথা। তারপর আধাদরে ঘোড়া জামাজোড়া সব পরেশনাথের কৃপায় বেচে ঘরে এসে খালাস!—ইস্ত্রী বলে, ঘোড়া গেল কোথায়? তোমার সে খবরে কাজ কি?—বলে সে রাত্রি আরামে কাটালেম। তার পর দিন দেখি উঠানে আমাদের লোকারণ্য। আমি আসতেই ঘোড়া কোথায় ঘোড়া কোথায় রব উঠল। খেতু খোট্টাও দেখি তোমার দাদামশার কাছে বসে! —দেখতে হি তো মেরা দিল্ সিফাইকে ঘোড়া যে সে তড়পনে লাগা। তোমার দাদামশার গম্ভীর মুখ দেখেই বুঝলেম বিদ্যে ফাঁস হয়ে গেছে! তখন কী করি ফার্সি ছেড়ে বাংলা ধরলেম—মশায় ঘোড়া নিয়ে তো গেলেম বাসায়। ইস্ত্রী বলে ঘোড়া কী হবে গো?—আমি চাপব, তোকে ছেলেকোলে চাপাব ঘরকন্নার জিনিসপত্র পোঁটলা বেঁধে না পিঠের পরে চাপিয়ে সশরীরে ভেস্তে যাব।—ওমা আমি তা পারব না!—কেন মা দুগ্‌গা ঘোড়ায় চাপতে পারে তুই নাম

নিয়েছিস ঢুগ্‌গাবতী তুই পারবি না চাপতে ? তখন সে সিংহিনী মূর্তি ধরে এক গর্জ্জন ছাড়লে যে ঘোড়া ভড়কে জামা জোড়া হাতিয়ার শুদ্ধু দে দৌড় হাত ফস্কে —চক্ষের নিমেষে ঘোড়া গায়েব। সারাদিন খোঁজাখুঁজিতে গেল। এ সব জিনের কারখানা মশায় আমার তো মনে হচ্ছে। খেতু খোট্টা জৈন, পরেশনাথের এক নাম জিন, দেখুন ওনাদের ঘরে যদি ঘোড়া গিয়ে থাকে। বস্‌ জিনের দোহাই দিয়ে খালাস।

দাদামশায়ের বুঝি যত চাকরবাকর সহিস কোচম্যানের সঙ্গে আলাপ!

—আরে ভাই তারা কী তোমার আজকালের পিলে-গোবিন্দ না যেদো মেথর—হেঁজি-পেঁজি লোক ছিলনা তারা, সব তারা কেতাদোরস্ত মানুষ ছিল। সভ্যভব্য দুটো ভদ্রলোক এলে তাদের খাতির করে তুষ্ট করে দিতে পারত, তাইতো তাদের ঘরখানার নাম ছিল তোষাখানা। এখনকার বাবুদের বৈঠকখানাও তেমন ফিট্‌ফাট নয়! ছম্‌শের কোচম্যান যখন সেজেগুজে গোঁফ চুমড়ে, বৈকালে আস্তাবোলের ছাতে খাটিয়াতে বসে গড়গড়া টানত, তখন যেন বোধ হত টিপু সাহেব ছবি ছেড়ে বেরিয়েছে! আরবী ঘোড়াতে আর গাধাতে যতটা তফাৎ, তখনকার চাকরে এখনকার চাকরে ততটা তফাৎ। মোহনলালসিং জমাদার, কী চেহারা কী দাড়ি গোঁফই ছিল তার! শ্বেতচামর রন্‌জিৎসিংহ মিলিয়ে একটা ব্যাপার। দাড়ি মাজতো। রোজ সে একপোয়া দই আর কেশর ফুলের গুঁড়ো মিলিয়ে; দেউড়ির রাজা বললেও হয়! বুদ্ধু হরকরা, বিশ্বেশ্বর হুঁকোবরদার, মজলিসী চেহারা সাজ-গোজ এমন যে দেখলে ইচ্ছে হত হরকরা হই নয় তামাক খাই গের্দা ঠেসান দিয়ে।

বিশ্বেশ্বর কী তামাকই সাজত। গন্ধে তর হত বাড়ি। ভিণ্ডি খানার একটা লম্বা টেবিলে সকাল থেকে সারি সারি ধরা থাকত সট্‌কা—ছহাত নল ছাড়া যা টানাই যেত না, গুড়গুড়ি—সান্ত্রী খাড়া বন্দুকের নল উঁচিয়ে, গড়গড়া—যেন গদীয়ান মহাজন গতানে ভুঁড়ি, বাঁধাহুঁকো—পিলেরোগা লম্বা-গলা কালোকোলো পাড়াগেঁয়ে জমিদারটি। তার পরে কল্‌কি ধুনুচী! যে যেমন দরের মানুষ তার জন্যে তেমন দরের তামাক সাজতো বিশ্বেশ্বর।

আমি এক একদিন তামাকের লোভে যেতেম ; বিশ্বেশ্বর অমনি সট্ করে সট্‌কার উপর থেকে কল্‌কিটা তুলে নিয়ে বলত চট্ জল্‌দি টান দিয়ে সরো। মুখে খানিক গোলাপজল আর গুড়গুড় গন্ধ ভর্তি করে দে দৌড়, দোতলা থেকে বিশ্বেশ্বর বলে হাঁক কানে পৌঁছতে না পৌছতে।

—তারপর ?

…তারপর শোননা এক মজার কথা।—চায়ের দোকানে যেমন সকাল থেকে লোক ঢোকে আর বার হয়, তেমনি সস্তার তামাকখোররা বিশ্বেশ্বরের ভিণ্ডিখানায় আনগোনা করত। ওর মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের মনিখুড়ো, তিনি এই গল্পটা করতেন : বাবা, প্রথমটা তামাক ধরালে বিশ্বেশ্বর। তখন পয়সার নামগন্ধ করলেনা। হরদম তারা চালায় : যখন দেখলে নেশা বেশ জমেছে, তার দোরে তুবেলা তুছিলুমের জন্যে ধরণা দেওয়া ছাড়া আমি অনন্য গতি, তখন তুললে পয়সার কথা মহালয়ার ঠিক পূর্বদিন—

দেখ বাবু উপরি পাওনা থেকে এতকাল তোমার তামাক জুগিয়েছি এবার পার্বনী থেকে তোমার কিছু জমা না দিলে তো চলবে না।

আমি বলি,—দেখ বিশ্বেশ্বর, গরীব ব্রাহ্মণ আমাকে মেরে তোমার কী লাভালাভ ?

—সে কী, আমি হলেম আপনাদের চাকর, হুকুম করেন আমি কাল থেকে ভিণ্ডিখানার ফর্দতে আপনার নাম তুলে দিই। যোগেশ মামা দেখি তুছিলিম দশছিলিম যা বরাদ্দ করে দেন আমি দেব, আমার কী। তখন বেখরচায় যত পার সরকারি পয়সা পোড়াও মনের সাধে !

আমার মাথায় তো বাবা বজ্রাঘাত হল—যোগেশ মামার ফর্দধরা মানে কর্ণমর্দন, তদুপরি তামাকের আশা বিসর্জন। কী করি —টাল্‌মাটাল্ করে সেদিনটা তো গেল। তারপরদিন হুঁকো টেনে কেশে মরি, নিছক দা'কাটা ঝেড়েছেন বিশ্বেশ্বর।

বললেম—ও বিশ্বেশ্বর কাশ রোগ ধরবে নাকি !

কড়া হয়েছে ? তা বেশ বৈকালে কিছু ভেল্‌সা দেওয়া যাবে।

বৈকালে বিশ্বেশ্বর এমন ভেল্‌সা চালালে যে খালি কুয়াশা খাচ্ছি।

—ও বিশ্বেশ্বর এ যে বিষম নরম।

কি করি বলেন, তামাকের বাজার বড়ো গরম হয়েছে, আবগারি টেক্‌সো চেপেছে, বিশ্বাস না হয় ছোটেলালকে শুধতে পার, সে কাল তামাকের পাতা কিনেছে।

মহাকাল কাটল এইভাবে।

পুজোর বাজারে সেবার নতুন উঠেছে 'পম্পসু'। পার্বনীর টাকা-কটা তাতেই আটকে ফেললেম।

একখানা চিরকুট কাগজে গোল করে একটা খোলামকুচি জুড়ে ষষ্টির দিনে বিশ্বেশ্বরের হাতে গুঁজে দিয়ে বল্‌লেম, চট্‌পট্‌ দাও এক ছিলুম। খেয়ে পুজোবাড়ি ঘুরে আসি। বাবা। আঙ্গুলের টিপে চিনতো বিশ্বেশ্বর কোন তামাকের কি টিকের কত দর! কোনো কথা না বলে বাঁধা-হুঁকোয় কল্‌কি চাপিয়ে হাতে তুলে দিলে; টান দিই খালি হাওয়া আর একটু কাগজ-পোড়া গন্ধ। বৈঠকের পরে হুঁকোটি নামিয়ে রেখে নতুন পম্পসুজোড়া কোঁচায় বেশ করে মুছে উঠে পড়লেম, বিশ্বেশ্বর একবার আড় চক্ষে দেখে নিলে জুতোটার দিকে।

এই পর্যন্ত হয়ে রইল ষষ্টির দিনে।

কদিন এবাড়ি ওবাড়ি পান তামাক খেয়ে কাটালেম। বিজয়ার সন্ধেবেলা—বিশ্বেশ্বর তেগে আছে কখন যোগেশ মামাকে প্রণাম করতে যাই। ফাঁকতালে আমিও সট্‌ করে ঢুকেছি দেওয়ানখানায়। বুড়াকে প্রণাম করে কোলাকুলি সেরে মিষ্টিমুখ করে চুকেছি, কোথা ছিল বিশ্বেশ্বর, হুঁকো কল্‌কি আর ফর্দ হাতে হাজির। ফর্দখানা যোগেশ মামার দিকে আর হুঁকোটা আমার দিকে বাড়িয়ে দাঁড়াল। আমিতো অধোবদন। মামা ফর্দ দেখে বললেন, কি বাবাজী—ধরা হয়েছে দেখছি। ফর্দে কছিলুমের বরাদ্দ ধরব বলে ফেল, লজ্জা কী।

—যাই! দাদা ডাকছেন বলেই তো আমি চম্পট। হো হো হাসির মধ্যে সেদিনটাও চুকল—

পাঁচ দশ বাড়ি বিজয়ার কোলাকুলি ঠাকুর বিসর্জন দেখে ফিরতে রাত প্রায় কাবার! তাড়াতাড়িতে পম্পসুজোড়া ভিণ্ডিখানার আলমারির তলায় লুকিয়ে, সোজা চলে গেলেম চান ঘরে। বিশ্বেশ্বর দেখলেম বেঞ্চেতে পড়ে বেহুঁস নাক ডাকাচ্ছে। হাত মুখ ধুয়ে এসে দেখি, হুঁকো-কল্‌কি হাতে বিশ্বেশ্বর।

ফর্দে নাম উঠে গেছে খুড়োমশায়, নেন দেখেন ভাল তামাক সেজেছি কিনা।

কী বলব বাবা —ঢের ঢের বাড়িতে তামাক খেয়েছি, সে তামাকের সোয়াদ কোথাও পাইনি। পেটভরে টান দিয়ে কল্‌কিটাকে ফাটিয়ে তবে ছাড়লেম। জুতোজোড়াকে হাতড়াতে গিয়ে দেখি নেই। রগটা ঝনাৎ করে উঠল, গুম্‌খেয়ে গেলেম।

বিশ্বেশ্বর বললে, কী ভাল হয়নি তামাক? আর একছিলুম সাজবো?

নাঃ, বলে একবার তোষাখানার বারাণ্ডা ঘুরে জুতো খুঁজে এসে বললেম, জুতোজোড়া ছিল, দেখেচ বিশ্বেশ্বর!

আজ্ঞে না, কোথায় রেখেছিলেন? উপরে বাবুকে তামাক দিয়ে আসতে দেখলেম একপাটি জুতো চিৎহয়ে সিঁড়ির তলায়, আর এক পাটি উপুড় হয়ে পড়ে, দেখেন যদি কুকুরে টেনে ফেলে থাকে।

গিয়ে দেখলেম আমারি ছেঁড়া চটীপাটি অনেকদিনের হারান।

তখন উপরে নন্দ ফরাশ ঘর ঝাঁটাচ্ছে তারি শপ্‌শপ্‌ শব্দ ক্রমে সিঁড়ি বহে বারাণ্ডার দিকে চলে গেল। আমি সারা বাড়ি খুঁজে, হায়রাণ, বুঝলেম, এ বিশ্বেশ্বরেরই কাজ। ভালোমানুষি করে বললেম দেখ যা হবার হয়েছে বচ্ছরের দিনটা আর দুঃখু দিওনা, জুতোজোড়া নিয়ে থাকতো দাও।

মশায় আগুন খেয়েছে যে কয়লা, ওগরাবেই সে। আমরা গরীব, ফ্যেন্‌সী জুতো নিয়ে কী করব, —দিতেন পয়সা তো একটা নাগরা কিনে পরে বাঁচতুম; যাই বাবুর সটকায় জল ফিরিয়ে আনি বলেই বিশ্বেশ্বর নেপথ্যে গমন করলে।

আমিও সট্ করে সেই ফাঁকে সট্কার মুখনলটা ঘরের আর এক কোণে গুঁজে রেখে যেখানকার সেখানে গট হয়ে বসে ডাকলেম, ও বিশ্বেশ্বর আর একছিলুম দেবে না ?

আরে মশায় রসেন, বাবুর সট্কাটা দিয়ে আসি। এক মিনিট দেরী হলে কী হবে বোঝেন তো।

—তা আর বুঝিনে বিশ্বেশ্বর। যাও আমি বসে আছি।

—জল ফেরান হল, নলগাঁটা কল্কি সরপোষ আখরদান সব ফিটফাট, মুখনল আর পায়না ?

কী বিশ্বেশ্বর খুঁজ্চ কী ?

—আরে মশায় মুখনলটা !

দেখ তো বাবুর কাকাতুয়া পাখিটা এইখানে ঘুরছিল, নিয়ে যদি পালিয়ে থাকে।

—এই যে টেবিলে রেখে গেলেম এর মধ্যে কে গাপ্পাই করলে ?

—কে জানে বাপু যে প্যাঁজ খেয়েছে তার মুখ গন্ধ করবে, আমারো জুতোটা গেল এ ভাল কথা নয়। তুমি একবার দেখ দেখি খুঁজে জুতোজোড়াটা। আমি দেখি, মুখনলটা গেল কোথায়।

—তাই দেখা যাক বলে এখানে ওখানে হাতড়ে এই যে আপনার জুতোজোড়া দেখেন দেখি।

আমি দেখলেম সত্যিই পম্প আমার। ফিরে বললেম ঐ যে তোমার মুখনল চকচক্ করছে ঐ কোণে দেখত—

বস্ সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হয়ে চুকল—

বিশ্বেশ্বর গেল সট্কা দিতে, আমিও দশটার গাড়ি ধরে দেশে যেতে রওনা হলুম। আমি বুঝলুম বিশ্বেশ্বর সদাশিব নয়, বিশ্বেশ্বরও বুঝলেন মনিখুড়ো তোমাদের মুনীশ্বর নন।

চাঁদনি

কোনো গাঁয়ে এক ব্রাহ্মণ আর এক ব্রাহ্মণী ছিলেন। দিঘির ধারে তাঁদের বাড়ি ছিল। গোয়ালে দুধওয়ালা গরু ছিল, গোলায় ধান ছিল, পুকুরে মাছ ছিল। সবই ছিল। কিন্তু তবুও তাঁদের মনে সুখ ছিল না। কারণ তাঁদের একটিও ছেলে নেই। ব্রাহ্মণী অনেক রকম ব্রত করলেন—যেসব ব্রত করলে কার্তিক গণেশের মত ছেলে পায়, যাতে রাজার মা হয়, ছেলে হাতি ঘোড়া চড়ে, সোনার খাট পালঙ্কে বসে —কিন্তু ব্রাহ্মণীর সকল ব্রতই বিফল হল। শেষে এক সাধুর কথামত চান্দ্রায়ন করে পূর্ণিমা রাতে এক সোনার চাঁদ মেয়ে হল। তার নাম রাখলেন চাঁদনি, পাড়ার লোকে দেখে বললে —মেয়ে নয় তো, চাঁদের কণা ;—চাঁদনিকে কোলে পেয়ে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর আনন্দের সীমা রইল না। ব্রাহ্মণী চাঁদনিকে বড়ো আদরে, বড়ো যত্নে মানুষ করতে লাগলেন।

চাঁদনি যখন খুব ছোট, যখন সে ভাল করে চলতে শেখেনি, যখন সে ভাল করে বলতে শেখেনি, কচি মুখে মিষ্টি কথা আধ-আধ ফুটেছে, সেই সময় আকাশে চাঁদ উঠলেই চাঁদনি বড়োই চঞ্চল হয়ে উঠত, আর ছাতে যাবার জন্য বায়না করত—চাঁদনির মা তাকে কিছুতেই আর ঘরে রাখতে পারতেন না —চাঁদনিকে কোলে নিয়ে ছাদের উপর এসে চাঁদের আলোয় ঘুম পাড়াতেন। চাঁদনি চাঁদ দেখতে দেখতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ত আর ঘুমের ঘোরে বলত 'চাঁদ, চাঁদা।' মা বলতেন—

'চাঁদ কোথা পাব বাছা জাদুমণি।
মাটির চাঁদ নয় গড়ে দেব,
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব,
তুই চাঁদের শিরোমণি,
ঘুমো রে খুকুমণি॥'

চাঁদনি চাঁদামামার গান শুনতে শুনতে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ত। তার চাঁদমুখে চাঁদের আলো পড়ত, মনে হত যেন ঠিক ফুলের উপর চাঁদের আলো পড়েছে।

তারপর চাঁদনির যখন পা হল, যখন সে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াতে শিখলে, তখন প্রতিদিন চাঁদনি তার মায়ের হাত ধরে দিঘির ধারে যেত। মা তাঁর গা ধুতে জলে নামতেন, চাঁদনি ঘাটে বসে দেখত দিঘির কালো জলে চাঁদের ছায়া ভাসছে—যেন একখানা রূপার থাল—চাঁদনি বলত—'মা মা ঐ চাঁদ ধরে দে'—মা বলতেন—

'চাঁদ কোথা পাব বাছা জাদুমণি,
মাটির চাঁদ নয় গড়ে দেব,
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব,
তুই চাঁদের শিরোমণি।
ঘরে চ আমার খুকুমণি॥'

বলতে বলতে চাঁদনির হাত ধরে দিঘির ধার দিয়ে ঘরে ফিরতেন, চাঁদের আলো চাঁদনির চাঁদ মুখে পড়ত ঝাউবনের আড়াল দিয়ে, খেজুর পাতার ফাঁক দিয়ে।

ক্রমে চাঁদনির বয়স হল, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তার বিয়ের জন্য ভাবতে লাগলেন। মনের মতো বর—চাঁদনির উপযুক্ত—কোথাও পাওয়া গেল না। ব্রাহ্মণী কাঁদতে লাগলেন, ব্রাহ্মণ বরের সন্ধান করতে লাগলেন। শেষে এক বর জুটল, তার অনেক পয়সা কিন্তু দেখতে কালো।—ব্রাহ্মণ পয়সার লোভে সেই কালো বরের সঙ্গে চাঁদনির বিয়ে স্থির করলেন। চাঁদনির মা মেয়ের গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন, কাঁদতে কাঁদতে অনেক রাত্রে ঘুমুলেন। চাঁদনি সেই রাত্রে খানিক বাদে উঠে চুপি চুপি ঘর ছেড়ে বনে চলে গেল। সকালে আর তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী চতুর্দিকে চাঁদনিকে খুঁজে—কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে এলেন। রাতে ব্রাহ্মণী স্বপ্নে দেখলেন—যে এক জটাজুট-ধারি ঋষি এসে বলছেন, 'ব্রাহ্মণী তুই কাঁদিস নে। চাঁদনি চাঁদের

মেয়ে, আমার শাপে মানুষ হয়েছিল, এখন সে চন্দ্রলোকে গেছে, সেখানে এক রাজপুত্র তাকে বিয়ে করেছে, সে সুখে আছে।'

ব্রাহ্মণী হাত জোড় করে বললেন, 'ঠাকুর দয়া করে আমার মেয়েকে একবার দেখাও আমার বুকটা একটু ঠাণ্ডা হোক।' ঋষি বললেন, 'আজ থেকে এক বৎসর পরে ও প্রতি বৎসর কোজাগর পূর্ণিমায় দিঘির ধারে মেয়েকে দেখতে পাবে।' ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী সেই এক বৎসর শুদ্ধাচারে কাটালেন, পূর্ণিমা ফিরে এল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দিঘির ধারে গেলেন। দেখলেন পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে—আকাশে চাঁদ—দিঘির জলে চাঁদের ছায়া, ঘাসের উপর গাছের উপর মেঘের গায়ে চাঁদের আলো, আর সেই চাঁদের আলোয়, একটি পদ্মের উপরে চাঁদনি ভেসে আসছে, কোলে তার একটি মেয়ে, যেন ফুটন্ত গোলাপ। সেই মেয়ে আধো-আধো স্বরে কচি হাতটি নেড়ে ডাকছে—'আয় চাঁদ আয়'। চাঁদনি বলছে—

'চাঁদ কোথা পাব বাছা জাদুমণি।
মাটির চাঁদ নয় গড়ে দেব
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব,
তুই চাঁদের শিরোমণি,
ঘুমো রে আমার খুকুমণি ॥'

আদর করে বলতে বলতে পদ্মফুলটি কিনারায় এল। ব্রাহ্মণী আদর করে বুকে তুলে নিয়ে বুক জুড়োলেন। মায়েতে মেয়েতে মিলন হল। ব্রাহ্মণ চাঁদনির মেয়েকে আদর করলেন, হাসিতে কান্নাতে রাত ফুরিয়ে এল; তখন চাঁদ থেকে চাঁদপানা চাঁদনির বর এসে চাঁদনিকে নিয়ে চন্দ্রলোকে চলে গেল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী শূন্য মনে ঘরে ফিরে এলেন। তারপর অনেকদিন—এক বৎসর পরে চাঁদনি পদ্মফুলে ভাসতে ভাসতে এসে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে নিয়ে চন্দ্রলোকে চলে গেছে। দেশের লোক ভাবলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী মেয়ের শোকে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল। চাঁদনি এখন চন্দ্রলোকে নাতি নাতনি নিয়ে গল্প করে আর যখন কাছে কেউ না থাকে তখন আপন মনে চরকা কাটে। পূর্ণিমার চাঁদ উঠলে তোমরা দেখতে পাবে চাঁদনিবুড়ি চরকা কাটছে।

কানকাটা রাজার দেশ

এক ছিল রাজা আর তাঁর ছিল এক মস্ত বড়ো দেশ। তার নাম হল কানকাটার দেশ। সেই দেশের সকলেরই কান কাটা। হাতি, ঘোড়া, ছাগল, গরু, মেয়ে, পুরুষ, গরিব, বড়োমানুষ, সকলেরই কান কাটা। বড়োলোকদের এক কান, মেয়েদের এক কানের আধখানা, আর যত জীবজন্তু গরীব দুঃখীদের দুটি কানই কাটা থাকত। সে দেশে এমন কেউ ছিল না যার মাথায় দুটি আস্ত কান, কেবল সেই কানকাটা দেশের রাজার মাথায় একজোড়া আস্ত কান ছিল। আর সকলেই কেউ লম্বা চুল দিয়ে, কেউ চাঁপ দাড়ি দিয়ে, কেউ বা বিশ গজ মলমলের পাগড়ি দিয়ে কাটা কান ঢেকে রাখত, কিন্তু সেই রাজা মাথা একেবারে ন্যাড়া করে সেই ন্যাড়া মাথায় জরির তাজ চাপিয়ে গজমোতির বীরবৌলিতে দুখানা কান সাজিয়ে সোনার রাজ-সিংহাসনে বসে থাকতেন।

একদিন সেই রাজা এক-কান মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কানকাটা ঘোড়ায় চেপে শিকারে বার হলেন। শিকার আর কিছুই নয়, কেবল জন্তু-জানোয়ারের কান কাটা। রাজ্যের বাইরে এক বন ছিল, সেই বনে কানকাটা দেশের রাজা আর এক-কান মন্ত্রী কান শিকার করে বেড়াতে লাগলেন। এমনি শিকার করতে করতে বেলা যখন অনেক হল, সূর্যদেব মাথার উপর উঠলেন, তখন রাজা আর মন্ত্রী একটা প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় ঘোড়া বেঁধে শুকনো কাঠে আগুন করে যত জীব-জন্তুর শিকার-করা কান রাঁধতে লাগলেন। মন্ত্রী রাঁধতে লাগলেন আর রাজা খেতে লাগলেন, মন্ত্রীকেও দু-একটা দিতে থাকলেন। এমনি করে দুজনে খাওয়া শেষ করে সেই গাছের তলায় শুয়ে আরাম করছেন, রাজার চোখ বুজে এসেছে, মন্ত্রীর বেশ নাক ডাকছে এমন সময় একটা বীর হনুমান সেই গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে রাজাকে বললে —'রাজা তুই বড়ো দুষ্টু, সকলের কান কেটে বেড়াস, আজ

সকালে আমার কান কেটেছিস ; তার শাস্তি ভোগ কর্।' এই বলে রাজার ছুই গালে ছুটো চড় মেরে একটা কান ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল। রাজা যাতনায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পরে যখন জ্ঞান হল, তখন রাজা চারিদিকে চেয়ে দেখলেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, হনুমানটা কোথাও নেই, মন্ত্রীবর পড়ে-পড়ে নাক ডাকাচ্চেন। রাজার এমনি রাগ হল যে তখনি মন্ত্রীর বাকি কানটা এক টানে ছিঁড়ে দেন ; কিন্তু অমনি নিজের কানের কথা মনে পড়ল, রাজা দেখলেন ছেঁড়া কানটি ধূলায় পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি সেটিকে তুলে নিয়ে সযত্নে পাতায় মুড়ে পকেটে রেখে, তাজ টুপির সোনার জরির ঝালর-কাটা কানের উপর হেলিয়ে দিলেন যাতে কেউ কাটা কান দেখতে না পায়, তারপর মন্ত্রীর পেটে গুঁতো মেরে বললেন —'ঘোড়া আন।' এক গুঁতোয় মন্ত্রীর নাক ডাকা হঠাৎ বন্ধ হল, আর এক গুঁতোয় মন্ত্রী লাফিয়ে উঠে রাজার সামনে ঘোড়া হাজির করলেন। রাজা কোনো কথা না বলে একটি লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে একদম ঘোড়া ছুটিয়ে রাজবাড়িতে হাজির। সেখানে তাড়াতাড়ি সহিসের হাতে ঘোড়া দিয়েই একেবারে শয়ন-ঘরে খিল দিয়ে পালঙ্কে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

সকাল হয়ে গেল, রাজবাড়ির সকলের ঘুম ভাঙল, রাজা তখনও ঘুমিয়ে আছেন। রাজার নিয়ম ছিল রাজা ঘুমিয়ে থাকতেন আর নাপিত এসে দাড়ি কামিয়ে দিত, সেই নিয়ম মত সকাল বেলা নাপিত এসে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করলে। এক গাল কামিয়ে যেই আর এক গাল কামাতে যাবে এমন সময় রাজা 'ছুর্গা ছুর্গা' বলে জেগে উঠলেন। নজর পড়ল নাপিতের দিকে, দেখলেন নাপিত ক্ষুর হাতে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ কানে হাত দিয়ে দেখলেন কান নেই। রাজা আপসোসে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতে নাপিতের হাতে ধরে বললেন —'নাপিত ভায়া এ কথা প্রকাশ কর না। তোমাকে অনেক ধনরত্ন দেব।' নাপিত বললে—'কার মাথায় ছুটো কান যে এ কথা প্রকাশ করবে।' শুনে রাজা খুশি হলেন। নাপিতের কাছে

আর-আধখানা দাড়ি কামিয়ে তাকে দু-হাতে দু-মুঠো মোহর দিয়ে বিদায় করলেন। নাপিত মোহর নিয়ে বিদায় হল বটে কিন্তু তার মন সেই কাটা কানের দিকে পড়ে রইল। কাজে কর্মে, ঘুমিয়ে জেগে, কী লোকের দাড়ি কামাবার সময়, কী সকাল কী সন্ধ্যা মনে হতে লাগল—রাজার কান কাটা, রাজার কান কাটা ; কিন্তু কারুর কাছে এ কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না—মাথা কাটা যাবে। নাপিত জাত সহজেই একটু বেশী কথা কয়, কিন্তু পাছে অন্য কথার সঙ্গে কানের কথা বেরিয়ে পড়ে সেই ভয়ে তার মুখ একেবারে বন্ধ হল। কথা কইতে না পেয়ে পেট ফুলে তার প্রাণ যায় আর কি!

এমন সময় একদিন রাজা নাপিতের কাছে দাড়ি কামিয়ে সোনার কৌটো খুলে কাটা কানটি নেড়ে-চেড়ে দেখছেন, আর অমনি কোত্থেকে একটা কাক ফস্ করে এসে ছোঁ মেরে রাজার হাত থেকে কানটি নিয়ে উড়ে পালাল। রাজা বললেন —'হাঁ হাঁ হাঁ ধরো ধরো! কাক কান নিয়ে গেল!' তারপর রাজা মাথা ঘুরে সেইখানে বসে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন, প্রজাদের কাছে কী করে মুখ দেখাব।

এদিকে নাপিত ক্ষুর ভাঁড় ফেলে দৌড়। পড়ে-তো-মরে এমন দৌড়। শহরের লোক বলতে লাগল —'নাপিত ভায়া নাপিত ভায়া হল কী? পাগলের মতো ছুটছ কেন?'

নাপিত না রাম না গঙ্গা কাকের সঙ্গে ছুঠতে ছুটতে একেবারে অজগর বনে গিয়ে হাজির। কাকটা একটা অশথ গাছে বসে আবার উড়ে চলল, কিন্তু নাপিত আর এক পা চলতে পারলে না, সেই অশথ গাছের তলায় বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল, আর ভাবতে লাগল — 'এখন কী করি? রাজার কান কাটা ছিল, তখন অনেককষ্টে সে কথা চেপে রেখেছিলুম ; এখন সেই কান কাকে নিলে এ কথাও যদি আবার চাপতে হয় তাহলে আমার দফা একদম রফা! ফোলা পেট এবারে ফেঁসে যাবে এখন করি কী? নাপিত এই কথা ভাবছে এমন সময় গাছ বললে —'নাপিত ভায়া ভাবছ কী?'

নাপিত বলল—'রাজার কথা।'

গাছ বললে—'সে কেমন ?'

তখন নাপিত চারিদিকে চেয়ে চুপি চুপি বললে—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা॥'

এই কথা বলতেই নাপিতের ফোলা পেট একেবারে কমে আগেকার মতো হয়ে গেল, বেচারা বড়োই আরাম পেলে, এক আরামের নিশ্বাস ফেলে মনের ফুর্তিতে রাজবাড়িতে ফিরে চলল।

নাপিত চলে গেলে বিদেশী এক ঢুলি সেই গাছের তলায় এল। এসে দেখলে গাছটা যেন আস্তে দুলছে, তার সমস্ত পাতা থরথর করে কাঁপছে, সমস্ত ডাল মড়মড় করছে —আর মাঝে মাঝে বলছে —

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা॥'

ঢুলি ভাবলে এ তো বড়ো মজার গাছ! এরই কাঠ দিয়ে একটা ঢোল তৈরি করি। এই বলে একখানা কুড়ুল নিয়ে সেই গাছ কাটতে আরম্ভ করলে।'

গাছ বললে—'ঢুলি, ঢুলি আমায় কাটিসনে!'

—আর কাটিসনে! এক-দুই-তিন কোপে একটা ডাল কেটে নিয়ে, ঢোল তৈরি করে —'রাজার কান কাটা, রাজার কান কাটা' বাজাতে বাজাতে ঢুলি কানকাটা শহরের দিকে চলে গেল।

এদিকে কানকাটা শহরের রাজা কান হারিয়ে মলিন মুখে বসে আছেন আর নাপিতকে বলছেন—'নাপিত ভায়া এ কথা যেন প্রকাশ না হয়!' নাপিত বলছে—'মহারাজ কার মাথায় দুটো কান যে এ কথা প্রকাশ করবে!' এমন সময় রাস্তায় ঢোল বেজে উঠল—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা॥'

রাজা রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে নাপিতের চুলের মুঠি এক হাতে আর অন্য হাতে খাপ-খোলা তরোয়াল ধরে বললেন—'তবে রে পাজি! তুই নাকি এ কথা প্রকাশ করিসনি? শোন্ দেখি ঢোলে কী বাজছে!' নাপিত শুনলে ঢোলে বাজছে—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা॥'

নাপিত কাঁপতে কাঁপতে বললে—'দোহাই মহারাজ, এ কথা আমি কাউকে বলিনি, কেবল বনের ভিতর গাছকে বলেছি। তা নইলে হুজুর পেটটা ফেটে মরে যেতুম। আর আমি মরে গেলে আপনার দাড়ি কে কামিয়ে দিত বলুন!'

রাজা বললেন—'চল্ ব্যাটা গাছের কাছে!' বলে নাপিতকে নিয়ে রাজা মুড়ি-সুড়ি দিয়ে গাছের কাছে গেলেন। নাপিত বললে—'গাছ, আমি তোমায় কী বলেছি? সত্য কথা বলবে।'

গাছ বললে—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা॥'

রাজা বললেন—'আর কারো কাছে নাপিত বলেছে কি?'

গাছ বললে—'না।'

রাজা বললেন—'তবে ঢুলি জানলে কেমন করে?'

গাছ বললে—'আমার ডাল কেটে ঢুলি ঢোল করেছে, তাই ঢোল বাজছে—'রাজার কান কাটা'। আমি তাকে অনেকবার ডাল কাটতে বারণ করেছিলাম কিন্তু সে শোনেনি।'

রাজা বললেন—'গাছ, এ দোষ তোমার; আমি তোমায় কেটে উনুনে পোড়াব।'

গাছ বললে —'মহারাজ, এমন কাজ কর না। সেই ঢুলি আমার ডাল কেটেছে, আমি তাকে শাস্তি দেব। তুমি কাল সকালে তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এস।'

রাজা বললেন—'আমার কাটা কানের কথা প্রকাশ হল তার উপায়? প্রজারা যে আমার রাজত্ব কেড়ে নেবে!'

গাছ বললে —'সে ভয় নেই, আমি কাল তোমার কাটা কান জোড়া দেব।' শুনে রাজা খুশি হয়ে রাজ্যে ফিরলেন।

রাজা ফিরে আসতেই রাজার রানী, রাজার মন্ত্রী, রাজার যত প্রজা রাজাকে ঘিরে বললে —'রাজামশাই তোমার কান দেখি!' রাজা দেখালেন —এক কান কাটা। তখন কেউ বললে—'ছি ছি', কেউ বললে—'হায় হায়', কেউ বললে —'এমন রাজার প্রজা হব না।' তখন রাজা বললেন—'বাছারা, কাল আমার কাটা-কান জোড়া যাবে, তোমরা এখন সেই ঢুলিকে বন্দী কর। কাল সকালে তাকে নিয়ে বনে যে অশথ গাছ আছে তারই তলায় যেও।' রাজার কথা শুনে প্রজারা সেই ঢুলিকে বন্দী করবার জন্যে ছুটল।

তার পরদিন সকালে রাজা মন্ত্রী নাপিত, রাজ্যের যত প্রজা আর সেই ঢুলিকে নিয়ে ধুমধাম করে সেই অশথতলায় হাজির হলেন। রাজা বললেন 'অশথ ঠাকুর, ঢুলির বিচার কর।'

অশথ ঠাকুর নাপিতকে বললেন—'নাপিত, ঢুলির একটি কান কেটে রাজার কানে জুড়ে দাও।' নাপিত ঢুলির একটি কান কেটে রাজার কানে জুড়ে দিলে। চারিদিকে ঢাক-ঢোল বেজে উঠল, রাজার কান জোড়া লেগে গেল। এমন সময় যে হনুমান রাজার কান ছিঁড়েছিল সে এসে বললে—'অশথ ঠাকুর, বিচার কর —রাজামশায় আমার কান কেটেছে, আমার কান চাই।'

অশথ বললেন —'রাজা, ঢুলির অন্য কান কেটে হনুকে দাও। এক কান কাটা থাকলে বেচারির বড়ো অসুবিধা হত —দেশের বাইরে দিয়ে যেতে হত। এইবার ঢুলির দু-কান কাটা হল—সে এখন দেশের ভিতর দিয়ে যেতে পারবে।'

রাজা এক কোপে ঢুলির আর-এক কান কেটে হুমুর কানে জুড়ে দিলেন —আবার ঢাক-ঢোল বেজে উঠল। তখন অশথ ঠাকুর বললেন- 'ঢুলি এইবার ঢোল বাজা।' ঢুলি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে ঢোল বাজাতে লাগল—ঢোল বাজছে—

'ঢুলির কান কাটা।
ঢুলির কান কাটা॥'

রাজা ফুল-চন্দনে অশথ ঠাকুরের পুজো দিয়ে ঘরে ফিরলেন। রানী রাজার কান দেখে বললেন —'একটি কান কিন্তু কালো হল।'

রাজা বললেন —'তা হোক, কাটা কানের থেকে কালো কান ভালো। নেই মামার চেয়ে কানা-মামা ভালো।

যমুনা পারে গোকুলে নন্দঘোষ রাজা, যশোদা রানী। দেশের গোপ-গোয়ালা নন্দঘোষের প্রজা, তাদের গোপিনী-গোয়ালিনী নন্দরানীর সই।

গোকুলে রাজার গোয়ালে ক্ষীরবতী গাই, রানীর ভাণ্ডারে শিকেয় তোলা ননী। প্রজাদের ঘরে ক্ষীরের ভার দই-এর পসরা।

সেখানে রাখালের দল ধড়া পরে চুড়ো বেঁধে মাঠে-মাঠে গরু চরায়, বনে-বনে বাঁশী বাজায়। সেখানে গোপ-গোয়ালা মিষ্টি ত্বধে ক্ষীর কাটে। টক ত্বধে দই পাতে। সকালে সন্ধ্যায় রাজ্যের গোপিনী গোয়ালিনী পসরা মাথায় খেয়াঘাটে নীল যমুনা পার হয় —ও পারে পাড়ায়-পাড়ায় ঘরে ঘরে ক্ষীরের ভার দই-এর পসরা বেচে আসে।

যমুনার এ পারে ব্রজপুরী, ও পারে মথুরা। এ-পারে ব্রজপুরে কদমবনে রাখাল ছেলে বাঁশি বাজায়, কুঞ্জবনে ব্রজবালা ফুল গাঁথে, যমুনা জলে গোপিনীরা নাইতে আসে। আর ও পারে মথুরাপুরে কংসরাজার কারাগারে নন্দরাজার প্রাণের বন্ধু বসুদেব, নন্দরানীর প্রিয়সখী দেবকী পায়ে বেড়ি হাতে হাতকড়ি পড়ে-পড়ে কাঁদেন। কংসরাজা দেবকীর বড়ো ভাই, বড়ো নিষ্ঠুর বড়ো ত্বরন্ত। যেদিন বসুদেব-দেবকীর বিয়ে হল সেইদিন আকাশ থেকে দেবতারা ডেকে বললেন —দেবকীর সাত ছেলের পর আট ছেলে হবে, সেই ছেলে অসুর বংশ ধ্বংস করে কংসরাজার রাজ্য নেবে। সেই শুনে কংস রাগভরে বসুদেব দেবকীকে কারাগারে পায়ে শিকল, হাতে শিকল, ত্বয়ারে শিকল দিয়ে বন্দী করলে। ছোটো বোন বলে মায়া রাখলে না।

সেই অন্ধকার কারাগারে একটি-একটি করে দেবকীর ছ'টি ছেলে হল। কংশ রাজা সব কটিকে ধরে ধরে শানের উপর আছড়ে-আছড়ে মেরে ফেললে, তারপর সাত বছরে দেবকীর ঘরে শ্রীকৃষ্ণের ভাই বলরাম জন্ম নিলেন। দেবতারা অসুর কংসের ভয়ে চুপি চুপি দেবকীর বুকের কাছে থেকে ধবলা গিরির মতো ধপধপে সুন্দর ছেলেটি চুরি করে গোকুলে দেবকীর সতীন রোহিণীর কোলে রেখে এলেন। দেবতাদের মায়ায় কেউ কিছু টের পেলে না।

নন্দের ঘরে রোহিণী ভাবলেন আমারি ছেলে, কারাগারে দেবকী ভাবলেন, আঃ মরি। কী চাঁদ ছেলে স্বপনে দেখলুম। রাজপুরে কংশ ভাবলে, দেবতার দৈববাণী মিছে কথা। এমনি করে দশ মাস কেটে গেল। তারপর ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথীতে শুভদিনে শুভক্ষণে আঁধার কারাগার আলো করে দেবকীর কোলে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিলেন। আকাশে ঘন ঘোর মেঘ করে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি এল। গড় গড় মেঘ গর্জাতে লাগল। চকমক বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। কালো যমুনা কূলে কূলে ভরে উঠল।

সেদিন গোকুলে গোপিনীরা যমুনার ঢেউ দেখে পসরা মাথায় বাদলা হাওয়ায় গান গাইতে-গাইতে বনের ভিতর দিয়ে ঘরে গেল। আর রাখাল ছেলে গরুর পাল গোয়ালে বেঁধে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘরের কোণে ঘুমতে গেল। গোকুলে ঘরে-ঘরে খিল পড়ল।

আর মথুরাপুরে ঝড়ের বাতাস দেবকীর কারাগারে লোহার কপাট নাড়া দিয়ে নগর-বাসীদের ঘর দুয়োর ভেঙে চুরে, শিকল ছেঁড়া পাগলের মতো হু-হু করে হা-হা করে হেসে সারা শহর ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ভারতবর্ষের দুই দিকে দুটো খুব বড়ো বড়ো রাজ্য ছিল। তার একটার নাম ছিল নিষদপুর, আর একটার নাম ছিল বিদর্ভ। নিষদের রাজা ছিলেন যুবরাজ নল আর বিদর্ভের রাজা ছিলেন রাজা ভীমসেন।

নিষধপুরে প্রজাদের বড়ো সুখ ছিল। সেখানে চাষাদের সবুজ ক্ষেত সোনার ধানে ভরা ছিল। মহাজনের চালের গোলা ডালে চালে পোরা ছিল, সওদাগরের মালের জাহাজ মালে মালে ঠাসা ছিল। আর ছিল গয়লার গোয়ালে ক্ষীরবতী গাই। রাস্তার দুধারে মনিহারি দোকান, বাজার চকে বস্তাবন্দী কাপড়, হীরে মানিকের গহনা, বড়ো-বড়ো মহাজনের বড়ো-বড়ো বাড়ি।

দেশে একটি চোর ডাকাত ছিল না। সারারাত চৌকিদার হাঁক দিত, দুয়ারে দুয়ারে শহর কোটাল আলো হাতে ঘুরে যেত।

চাষা ধানের ক্ষেত নিয়ে, মহাজন চালের গোলা নিয়ে, সওদাগর মালের জাহাজ নিয়ে, দোকানদার দোকান পাট নিয়ে নির্ভয়ে ছিল। পুণ্যবান রাজা নলের রাজত্বে নিষদপুরে প্রজারা বড়ো সুখে ছিল।

বিদর্ভ দেশের রাজা ভীমসেনও একজন খুব বড়ো রাজা। ধনে, মানে, কুলে শীলে, রাজা নলের সমান। রাজার রাজ্যও অনেক, প্রজাও অনেক, দাস দাসী, হাতি ঘোড়া, টাকা কড়ি, কত যে তা বলা যায় না। কিন্তু হায়, রাজার এত সুখ সম্পদ, এত বড়ো রাজ্য, এমন সোনার রাজপুরী, একটি রাজপুত্র বিনা সব অন্ধকার। রাজা রানীর কত বয়স হল, তবু একটি রাজপুত্র হল না। রাজরানী কত ব্রত করলেন, মহারাজা কত যাগ-যজ্ঞ করলেন, তবু রাজরানীর

একটি রাজপুত্র হল না। বৃদ্ধ বয়সে রাজপুত্রের আশায় নিরাশ হয়ে রাজা-রানীর চক্ষের জলে বুক ভেসে যেতে লাগল।

এমন সময় একদিন মহর্ষি দমনক রাজ-সভায় দর্শন দিলেন। ঋষির মাথায় জটাভার, পরণে বাকল, গৌর বরণ, হাসি হাসি মুখ। দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যায়। মহা ভক্তি হয়। মহারাজ ভীমসেন ঋষিকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে, অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে বসালেন। মহারানী সোনার কলসে নির্মল জলে ঋষির পা ধুইয়ে, সোনার থালায় সোনার বাটিতে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন খেতে দিলেন। তারপর রাজা-রানীতে জোড় হাতে ঋষিকে কত স্তবস্তুতি করলেন। বর চাইলেন —হে ঠাকুর, একটি রাজপুত্র দাও। ঋষি প্রসন্ন হয়ে 'তথাস্তু' বলে রাজ-রানীকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

আঁধারপুরে রাজা রানীর মুখে এতদিনে হাসি ফুটল। মুনির বরে সেই বৃদ্ধ রাজা-রানীর পর-পর তিনটি রাজপুত্র হল। বড়োটির নাম হল দম, মেজটির নাম দান্ত, ছোটোটির নাম দমন। তারপর বর্ষশেষে সেই আঁধার পুরী আলো করে রাজরানীর শূন্য কোল পূর্ণ করে জগৎমোহিনী এক রাজকন্যে হল, তার নাম হল দময়ন্তী।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা পুরীর মন্দিরটা তো হাতে গড়েননি, তাই তাঁর নাম রয়ে গেল ইতিহাসে আর কালো পাথরের শিলে খুব গভীর করে কাটা। কিন্তু যারা মন্দিরটা এমনকি মন্দিরের দেবতাকেও গড়লে তাদের ইতিহাসে তো নাম রইলই না, মন্দিরের একখানা পাথরের গায়েও তাদের নাম লেখা নেই।

রাজা বিমলা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বসলেন—ব্রাহ্মণদের আর-একটা জমিদারী বাড়ল—তারা রাজাকে আশীর্বাদ করে ঘরে গেল, কিন্তু দেবী তো খুশি হলেন না। গভীর রাত্রে রাজাকে স্বপন হল—জগন্নাথের সামনে তাঁর গড়ুর হাতজোড় করে থাকবে, আর আমার শার্দূল কি কেউ নয় যে তুই তাকে একেবারেই মন্দিরে জায়গা দিলিনে! রাজার নিদ্রাভঙ্গ হল ঘাম আর কম্প দিয়ে। তখনই শিল্পীর ডাক পড়ল, সভাপণ্ডিত এসে তাকে শার্দূলের ধ্যানটা শুনিয়ে দিলেন—সিংহের মতো মাজা, বাঘের মতো মুখ, কুকুরের মতো থাবা, গরুর মতো ল্যাজ। শিল্পী মাথা চুলকে বাড়ি গেল। এই শিল্পীর নাম লোকে এখনও বলে—শিবাই সাঁতরা। শিবাই একটার-পর-একটা সিংহ গড়ে রাজাকে দেখাচ্ছে—কোনোটা হচ্ছে ঠিক সিংহ, কোনোটা বাঘ, বিড়াল, কুকুর—কিন্তু একটাও রাজার মনোমত হচ্ছে না, দেবীও ক্রমাগত শিবাইকে স্বপন দিচ্ছেন—'হল না, হল না' কিন্তু সিংহবাহিনী-রূপে একটিবারও দেখা দিচ্ছেন না—পাছে শিল্পী তাঁর শার্দূলকে চট্ করে ধরেই পাথরে কেটে ফেলে। ওদিকে দুঃস্বপ্নে আর রাজার তাড়ায় শিবাই দিন-দিন রোগা হচ্ছে এবং তার যেটুকু যা বিদ্যেবুদ্ধি এক শার্দূলের ভাবনায় শুকিয়ে উঠেছে; আঠারো নালার ধারেই শিবাই-এর ঘর। বর্ষার পরে তখন ভরপুর জল আয়নার মতো পরিষ্কার তক্‌তক্ করছে; সাঁতরার বৌ গেছে জল নিতে, ঠিক সেই সময় আকাশপথে চলেছেন দেবী সিংহবাহিনী, জলে পড়ল তাঁর ছায়া। নিমেষের মতো যেন নীল আকাশ দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল কিংবা যেন জলের তলা দিয়ে একটি সোনার পদ্ম ভেসে গেল।

সাঁতরার বৌ দেখেও দেখলে না ; তেলে হলুদে নালার জলে খানিক সোনালি রং গুলে দিয়ে হাত পা ধুয়ে বাড়ি এসে রাঁধতে বসল।

শিবাই আর সেদিন বাড়ি আসে না। বিমলার মন্দিরে হত্যা দিয়ে পড়েছে। কিন্তু খিদে তার জন্যে বসে রইল না। সাঁতরার বৌ অনেকক্ষণ বসে বসে উনুনের কয়লা নিয়ে হেঁসেল ঘরের দেওয়ালে খানিক নানা আঁচড়-পোছড় দিয়ে একটা অদ্ভুত জানোয়ার আঁকলে। তারপর ভাত বেড়ে নিজে খেতে বসবে এমন সময় শিবাই এসে সেই পাতেই বসে গেল, কোনো রকম দ্বিধা না করে। কিন্তু হাতের গ্রাস তাকে আর মুখে তুলতে হল না, সামনের দেওয়ালে কয়লার লেখা প্রকাণ্ড শার্দূল-মূর্তিটা চোখে পড়তেই শিবাই 'হয়েছে হয়েছে' —বলে দুই হাত তুলে নাচ আরম্ভ করলে।

বৌ তার অবাক হয়ে শুধোলে, 'ক্ষেপলে নাকি ?'

শিবাই তার দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে বললে, 'বাজে বকিসনে, চট করে হাতুড়ি আর বাটালি আর ছেনি আর খন্তা নিয়ে আয়, এখনি কাজে লাগব,—আর ভাখ্‌, বেশ শক্ত দেখে একখানা পাথরও আনবি, বুঝলি ?'

'বুঝেছি'—বলেই সাঁতরা-বৌ সাঁ করে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজায় শিকলটি টেনে পাড়ায় খবর দিতে ছুটল,—শিবাই ক্ষেপেছে।

বদ্যি ডাকতে, পাড়ার লোক জাগাতে প্রায় ভোর হল। সকালে সকলে দরজা খুলে দেখলে, শিবাই থালার সমস্ত ভাত খেয়ে, ঘর নিকোবার মাটি দিয়ে মস্ত এক শার্দূলের নমুনা গড়ে দেওয়ালের কয়লার আঁচড়টা জল দিয়ে মুছে ফেলতে চেষ্টা করছে—তার ভয়, পাছে কেউ বলে সে তার স্ত্রীর দেখে নকল করেছে।

সেই থেকে বিমলা দেবী রাজার উপর তুষ্ট হলেন ; আর রাজা খুশি হলেন শিল্পীর উপর। কিন্তু শিবাই তার বৌটার উপর খুশি হল কি না জানা যায় না, ইতিহাসেও তার প্রমাণ নেই।

উজোর ঘরের কান্না

খাসিয়াদের গাথা। ছেলে চলে গেছে, মা তাই, গান গেয়ে ছেলেকে পথের কথা বলে দেয়। সুদূর পথ। মা ভাবে, ছেলে তার এত পথ যাবে কেমন করে? বিচ্ছেদের আবেগ গান হয়ে বের হয় মায়ের বুক ফেটে। এমনি ধারা গান, যে-মায়ের ঘর উজোর হয়ে যায়, তারই কণ্ঠে কান্নার সুরে ফুটে ওঠে। মায়ের মায়া তাই মরণের পথটি ধরে এই গানের রূপে ছেলেকে পথের সন্ধান বলে দেয়।

চেনা ঠাকুরের থানটি খাসা
ভুগী পেরেতের ওই যে বাসা
ওখানে বাপা বৈসে খেও
কাজলা পাখি জিরিয়ে যেও।

চিকোমান পাহাড়ে ছৈ বাঁধিয়া
চলমান নদীজল তুইলা পিষা।
পেরেত ওখানে ভাত রেঁধে খায়,
ভূতের রাজা কলকি ধরায়।
আগুনী জ্বালায়ো চকমকি ঘষে,
বস ডাক গাছে ষাঁড় বেঁধে ক'ষে

ঘাটে নেওয়াং মানুষ-খোক,
তে মাথায় ফেরে তে-শিরে দেখ,
নোয়ার তাগা তাদের দিও,
ঝুঁটির পালক ফেলে পালিও,
মরুঝা দেখে করে দাপট,
নোয়া ফেললেই দেয় চম্পট ;
দাঁত খামাটি বন্‌ধ করে
মোরগ ঝুঁটি দেখলে পরে।

ত্রিকোণ শিরের ঝাপটা নেওয়াং
রিকচিবিনের বাপ্‌টা নেওয়াং
বাট আগলায় ভূতের দেওয়ান্‌
বুঝে চলে রে বাপ, ওরে আমার বাপ ;

বাপা ছিল রক্ষে কবজ,
বাপা ছিল মাথার ছাতি,
বাপ কি ব্যাটা ছাওয়াল আমার
ঠাকুর দাদার জোয়ান নাতি,
বোলন গাছের শক্ত ডালি। শাল গাছের কচা,
ছিলেন আমার বাছা !
শিলে না হেলেন ঝড়ে না এ্যালেন যে,
কোন্‌ দানা সে ভাঙ্‌ল তারে রে।
কে সে জানোয়ার ?

রুগনি কে সে ডাইনি বুড়ি কর্‌লে হাড্ডি সার।

পরাণ পাখি কে কাড়িল মুই দেখিলাম না,
নতুন পাতার বোঁট ভাঙিল মুই জানিলাম না !
কচি পাতার মঞ্জরীটি ধরল ডালের আগে
তার পানেতে শতেক শতে দানোয় দৃষ্টি লাগে,
মুস্‌ড়ে খোলা পাতা, মুচকে গেল ডাল
পরাণ পাখি উড়িয়ে দিল বিঁধল বুকে শাল।

কাটারি দিয়া কাট্‌ল না।
ছুরির ঘায়ে কাট্‌ল।
পরাণ লতা কাটল রে
উপড়ে ভুঁয়ে পড়্‌ল।

রোদে পোড়া মাঠের গাছ
ছাঁওয়া করেই ছিলে,
স্রোতের বুকে অচল পাথর
ছাওয়াল আমার ছিলে
বাছুনীরে ছিলে।

বাছুনী-হারা মা ফিরে চাই
আপন ছাঁওয়ায় ছাওয়াল না পাই,
মুখ ফেরাই ঘড়ি ঘড়ি
পাই না যে আদর করি।
মুই যে তোমার মা
ভুললে সে কথা।
তুই যে আমার ছা'
লাগছে না ব্যথা ;
কথা ক' উঠে বোস্,
অমন ক'রে কেন বোস্ ?

নিদ এল গি তাড়াতাড়ি
গা হল কি তাইতে ভারি ?
চোখের পাতা পড়ল ঢুলে
ঘুম পেল কি দিন দুপুরে ?
মৌনী শাকের শিকড় কেটে
কে খাওয়ালে শিলে বেটে,
ঘুম পাড়ানি ঘুম্‌চি-পাতা
তাই কি খেল, সকল গা'টা
ঘুমের ঘোরে এলিয়ে এল ;
গা তোল রে, গা তোল !

গইল ছাড়া বইল আমার,
বিদেশ বিভুঁই যেও না,
সেংবা নদীর বিজন পারে
একলা চরে খেও না,
চিকমাং পাহাড় ভেঙে গেলেন তোমার পিতা
বলমাং নদী পাড়ে গেলেন তোমার মিতা।
ওইপথ ধরিয়ো বাপা
দেখেশুনে চলিও।
হাসি মুখে যাইয়ো বাপা
মনোসুখে চলিও।

আমি হব দেশান্তরি, যাব হয়ে একেশ্বরী
মুখ আর তুল্‌ব না, চোখ আর তুল্‌ব না,
দেশান্তরী, একেশ্বরী।

একে তিন তিনে এক

ছিরিপদ ছিরিকণ্ঠ ছিরি অভিলাষ
একে তিন্ তিনে এক ভিন্ ভিন্ গাঁয়ে বাস
গিরি গিল্টি গায় কভু, কভু পিটায় তিন তাস
অভিলাষ বারোমাস যা'তা ফরমায়
ছিরিপদ পদে পদে বাধা জন্মায়
ছিরিকণ্ঠ ধীরি ধীরি ঘাড় চুলকায়।

দিনটা ভারি বিতিকিচ্ছিরি, ভারি উদাস।

করকরে টিনের ছাত; ঝুপঝুপ বৃষ্টিতে চড়বড় করে খৈ ফুটোতে লেগেছে, রেল আসার দেরী নেই, কয়লা পোড়া ধুঁয়া জলের ভয়ে তিন বন্ধুর সঙ্গ নিয়েছে ইস্‌টিশানের ছাতের তলে।

ছিরিকণ্ঠ বলে উঠল, আমরা যাচ্ছি কোলকেতায় যাত্রার সাজ কিনতে, লায়েব মশায় ভাড়া দিয়েছে; কাল এমনি সময় ফিরব গাঁয়ে, জানিস অভিলাষ। আমি বলি, আমাকেও নিয়ে চল কখনও শহর দেখিনি। ছিরিপদ বলে উঠল, বটে আমাদের আর অন্য কাজ নেই, তোমায় শহর দেখিয়ে বেড়াতে হবে, ওঁর চাকর বটে আমরা? এই বলেই সে গট্ গট্ করে এগিয়ে গেল টিকিট ঘরে। আমি ছিরিকণ্ঠের চাদরখানা চেপে বসে থাকি। ছিরিপদ এলেন, হাতে তিনখানা টিকিট। ছিরিকণ্ঠ বললে— অভিলাষ, দেখচিস্ কী, চলে আয়। ছিরিপদ বলে, বাঃ দুখানা টিকিটে দুজন মানুষ আর একখানা টিকিট নারদের দাড়ি-গোঁপ, রাজার পালকের টুপি, সখীদের পরচুলো, সাজ সরঞ্জামগুলোর জন্যে রাখতে হবে না? ছিরিকণ্ঠ আমার গা টিপে বলে —রেল

আসছে তৈরি থাক্, টপ করে উঠে পড়িস, আর কথা নয় গাড়ি এল বলে ; একবার বাজারের দিক থেকে খোল কর্তাল কের্তনের গোলমাল কানে এল তারপর আর দেখব কী ?—খানিক ধুঁয়া কয়লার গুঁড়ো আর শার্সি খড়খড়ি আর এক দাঁড়ি দু দাঁড়ি তিন দাঁড়ি সবুজ সাদা লালের ঝাড় নাকের উপর দিয়ে হুহু করে বেরিয়ে গেল নানা রকম শব্দ দিয়ে—

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটিলেসটার, হাব্বাই ভাণ্ডার হাণ্ডিউয়ার।
আফ্‌তে বাফ্‌তে আফ্‌তে বাফ্‌তে আফ্‌তে বাফ্‌তে।
বেরি ফাস্ট সোলো ডাউন বেরি ফাস্ট সোলো ডাউন।
নোস্টপ ইঞ্জিল নোস্টপ ইঞ্জিল ; খাস্ গেলাস খাস গেলাস ;
ইসক্রিম্ সোডা, ইসক্রিম্ সোডা ফুলস্কেপ্ ডাবল ক্রাউন,
ইউ ড্যাম ফুল থাঙ্কু, থাঙ্কু, গেটাউট্ গেটাউট্ গেটাউট্।

শব্দের আর বাতাসের চোটে গা যেন টলিয়ে দিয়ে গেল—কী গেল এটা ভাই ? ছিরিকণ্ঠ বললে—তুফান মেল। আমার তখন গা ঘুরতে লেগেছে—একটা খোঁটা ধরে বসে পড়লেম। একটা ঠেলা গাড়িতে কাচের বাক্‌সো, তাতে সোডা লেমনেড লাল জল, নীল জল, পুরী, মোহনভোগ, খাজা সবই আছে, সেটা ঝন ঝন করে এসে থামল কাটগড়ার কাছে। খানিক পরেই গাড়ির শব্দ—বড়দাড়ুলু চাড়লু নাইড়ু, বড়দাড়ুলু চরলু নাইড়ু, গুড়ুদারুলু গুড়ুদারুলু—ছিরিকণ্ঠ বললে মাদ্রাজী মেল ছাড়ল! তারপর অনেকক্ষণ গাড়ি আর আসে না! ছিরিপদ হঠাৎ আধখানা আলুরদম মুখে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—এবার স্বদেশী রেল কোম্পানীর গাড়ি এল—গাবগুবাগুব, গাবুর গুবুর গব্ গব্ গব্ আমতা জামতা, ঘুঘু-মেতি স্যুঃ—বলেই যেন ভিজে মাটিতে ছুঁচোবাড়ির মতো ফুস করেই নিভল।

ছিরিকণ্ঠ গা-ঝাড়া দিয়ে বললে—আমাদের গাড়ি আসছে, দেখিস তাড়াতাড়ি উঠতে যাসনে অনেকক্ষণ দাঁড়ায় গাড়ি, ভীড়

আসছে, দেখিস হারিয়ে যাসনে। আমি দুহাতে ছিরিকণ্ঠর চাদর মুঠিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছি--ইস্‌টিশন-মাস্টারবাবু আর টিকিট-বাবুতে চেঁচামেচি শুরু করলেন—

ও লাহরী মশায়, ছেহেন ঢাহা ইস্পেশাল আইচেন—মেরজা-ছাহেবের পর্দানসীন্ গারিখানা সাইডিং-এ ঠিক থাহে যেন —ভায়া পরেটাবাদ, রৌগনপুর, বাগুনঝুরি, কৈডিম্বা, মিছিলবারি, নাস্তা-বাগ, সকরিহাটা, খাসিরচর! ও কলকটর! প্যাসেঞ্জারদের ওহানে হাজির থাক, ওহে বরকতউল্লা! ও বাগে ঘ্যারান দ্যেও জলদী কৈয়্যা—ঘুন্তিবিবি ওৎরাবেন কনে? মাস্টর-মশয় মেরজা-ছাহেব তলব ফরমাইচেন,—এই আসি!

দেখতে দেখতে লোকে লোকে টুপিতে চাপকানে খাটো ইজারে আতরের গন্ধে দাড়িতে দাড়িতে ছয়লাপ চারিদিক—ইস্‌টেসন বোঝাই হয়ে গেল —আবদাড়ি, চাপদাড়ি, বুলবুল চস্‌মেদার দাড়ি —তরো বেতরো ইতরদাঁ চিনিকাবাব কালিমির্চ! এমন সময়—খানাজাদ্ কলাপাত করতে করতে গাড়ি এসে থামল, লোকের ঠেলা আর বকবকানি ও উইঠ্যে আসেন, পানবিরাটা তুইল্যা ধরেন। গুলগুলা চুলচুলায় দেহ, মুনসীছাহেব জলদী কুল্লি করেন, গারি আইচেন।—ও ছারল বলি! ল্যেন বদনা, ও মাস্টর সবুর করেন, মেরজা-ছাহেব খাতি বইচেন। মিরজাসাহেব ধীরে সুস্থে রুমালে মুখ মুছে গাড়িতে উঠলে গাড়ি ছাড়ল আমাদের নিয়ে সোজা দক্ষিণ-মুখো —নিস্‌পিস্ গদাই লস্কর বলে এক ধাক্কা দিয়ে নেচে চলল গাড়ি —গজল্ ফজল্ গজল্ ফজল্, তেরে কিটি তাক্, খাস্তা খাস্তা গোস্ত গোস্ত, বোরখা বোরখা, খেজাব, খেজাব শীরমল তম্বাখু —একবার সিটি মারলে তারপর আবার চলল —সিয়াকলম্ সিয়াকলম্ আবার পোঁ, আবার চলা —গুলেস্তাঁ গুলেস্তাঁ দপ্তরী দপ্তরী শেষে —বিবিজান বিবিজান বলতে বলতে সোজা দৌড় — শেয়ালদায় হাজির ভোর পাঁচটাতে।

তখন বেঞ্চের উপরে চাদর মুড়ি দিয়ে মড়ার মতো পড়ে আছি—

ঘুমিয়ে না জেগে কিছুই ঠিক নেই! গা তুলছে মন বলছে—ওই দেখা যায় বরানগর সামনে কাশীপুর —কলকেতা কদ্দুর।

একখান রাঙামুখ একটা আলো ছাতে ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি দিয়ে একদিকে চলে গেল, তারপরে শুনছি—ও মিশিরজি দেখ না খোঁচা দেকে ? —নেহি বাবু মুর্দা হ্যায় খুঁচাবে তো ফেসাদ হোবে, ভূত হইয়ে গর্দান মটকিয়ে লেবে! আরে না গো, বোধ হচ্ছে মাতোয়ালা, দেখই না খুঁচিয়ে! —নেহি বাবু, কোন্ জাতের মুর্দা, রাত রইয়েছে ছুঁলে গঙ্গা চান! —এ তো ভারি ফেসাদে ফেললে, সাহেব ব্যাটা বলে নামিয়ে নিতে, তুমি বোলতা নেহি বাবু, কী করি এখন? বাবুজী পুলিশ ডেকে ল্যেন, ঝোলাসে উৎরে লেবে —তারপর পুলিশঘর করি আর কি, চলে এস থাকগে পড়ে যেখানকার মড়া সেখানে, আমার কি, না হয় চাকরিই যাবে, বামুনের ছেলে ভাত রেঁধে খাব। এই সময় শুনলেম, অভিলাষ অভিলাষ —বলে ছিরিকণ্ঠ ডাক পাড়তে পাড়তে দৌড়ে আসছে।

স্বপন দেখছিস নাকি? বলে ছিরিকণ্ঠ আর ছিরিপদ দুজনে আমার দুহাত ধরে টেনে গাড়ি থেকে নামিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে চলল একধারে। আমি ঘাড় চুলকাতে গিয়ে দেখি আমার গলার মটর-মালা নেই। ছিরিকণ্ঠকে বললেম, আমার মটরমালা?

ছিরিপদ খেঁকিয়ে উঠল, নে ঐ দেখ সারি সারি মটরমালা। ভাল লোককে সাথে এনেছি। দেখিস, পায়ের দিকে চেয়ে চল। আমি তখন উপর দিক চেয়ে চলেছি। আকাশ নেই, কেবল টিনের ছাত, তা থেকে চন্দর-সুর্যির মতো সারি সারি আলো ঝুলছে। পায়ের দিকে চেয়ে দেখি শান বাঁধান। খানিক চলে আকাশ পেলেম। রাস্তায় পড়ে দেখি বোড়া সাপের মতো লম্বা লম্বা কী পড়ে আছে দুটো। ছিরিপদ বললে, এই দাগ ধরে চলো সোজা বাসায়। ছিরিকণ্ঠ বলে, সরে আয় ও দিকে যাস্নি। মটর-চাপা পড়বি, না জানি কত বড়ো মটরই হয় কলকাতায়! ভাবতে ভাবতে চলেছি, ছিরিপদ ডেকে বললে, এই বাস স্টপ।

অমনি একটা দোতলা ঘর এসে সামনে দাঁড়াতেই ছিরিপদ আমাকে বাড়িতে তুলে দিয়ে বললে। তোর বাসায় যা, আমি মার্কেট ঘুরে আসছি। বাড়িটা যেন উড়ে চলল ভোঁ ভোঁ শব্দ দিতে দিতে। তারপর এ মোড় সে মোড় ঘুরে খালধারে আমাদের দুজনকে নামিয়ে দিয়ে শোঁ শোঁ বেরিয়ে চলে গেল।

শহরটা তো দেখা বস্তু—এর আর কী বর্ণনা দেব। ছাঁদ বাঁদ খুব কিন্তু ছিরি নেই মোটেই। বাঁধা রোশনাই, বাঁধা দিঘি, বাঁধা রাস্তা, বাঁধা দস্তুর, ধুলো কাদা মশা মাছি সবই। বাড়িগুলো বেশীর ভাগই মেড়ো ফ্যাশান—এক এক ফালি আকাশে উঠেছে। দোকানে চা বাঁধা দর। জল—মিঠে সাদা—যেমন চাই বাঁধা দর।

বাঁধা বাঁধা বাঁধা
লাগে ভেলকি ধাঁধা

দেখি না ছেলেগুলো সমুদ্দুর পার হতে শিখবে, তাই মাস্টার বাঁধা পুকুরে তাদের ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু মেঘনা পদ্মা গঙ্গা থাকতে বাঁধা গোলদিঘিতে চরাতে এল কেন এরা ছেলেদের—ছিরিকণ্ঠ এই কথা একজনকে শুধতে সে চশমার মধ্যে দিয়ে কটমট করে তাকিয়ে বলে, একে বলে বিলাতি সুইমিঙ্ক্ আর তাকে বলে পাঁড়াগেঁয়ে সাঁতার। ছিরিকণ্ঠ ছিল তাই রক্ষে। ছিরিপদ থাকলে মাস্টারকে দেখিয়ে দিত সাঁতার কাকে বলে। ছিরিকণ্ঠ খালি গেয়ে উঠল—

দেখ ভাই আজব কারখানা—
যেন শোলার পুতুল জলে ভাসে
ডোবালেও মন ডোবে না।
হালকা ও সে এমনি ভাসে,
যেন ডোবায় ধরা টোপাখানা।
ও সে ভেসেই রল।

লোক জমা হয়ে গেল দেখে আমরা সরে পড়লুম। ছিরিকণ্ঠ বললে, চল্ পিকেটিং দেখে আসি।

—সে আবার কী ?

—এই যেমন সুইমিং তেমনি পিকেটিং।

এমন সময়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখি, যা পকেট মেরেছে। একেবারে বিড়িকটা পকেটিং করেছে রে। কাজ নেই আর পিকেটিং দেখে, চল, বাসায়।

বাসাতে ফিরে দেখি ছিরিপদ ফিরেছে বাজার করে। ছিরিপদর জিম্মেতে আমাকে রেখে ছিরিকণ্ঠ বেরিয়ে গেল। ছিরিপদ বললে, বোস ফর্দ মেলাই। খাতাঞ্চিমশাই পাঁজি ধরে ফর্দ টেনেছে, একটি জিনিস এ-দিক ও-দিক হলে ধুন্দুমার বাধিয়ে দেবে। আমি ফর্দ পড়ে চললেম। ছিরিপদ মেলাতে বলল।

যাত্রার ফর্দ

মেছুয়াদের মৎস্য ধরিবার জন্য।

বিলাতি হুইল এক নম্বর। ঐ আনা টমসনের বঁড়শি। সুইভেল ও ফৎনা ১০০।

বাবুদের জন্য।

বিলাতি কলার দুই বাক্স। বিলাতি আল হুক এক ডজন। অ্যাংকেল গাড্ মজবুদ বিলাতি চামড়ার ২ সেট। ঐ লি ক্যাপ আংকেলেট কটন সিল্কের ২ সেট।

খেলাধূলার জন্য।

কুকুর ডাকিবার জন্য রেফারি হুইসিল। বিলাতি ইনডোর গেম ১ বাক্স। পান মশলা। চেসমেন। ইণ্ডোডালসিস্। অম্বলিন।

শকের দলের রন্ধনের জন্য।

পিপার বা লঙ্কা। চিনি রাক্ষুসি। বিস্টের প্রকাণ্ড জয়েন্ট। ডিম্ব মূলা (মুরগির নয় হাঁসের)। অক্স হার্ট ক্যারট। কাউ হরন ছালাদ। গম আরবি। অর্জুন তৈল। অভয়া লবণ।

মধ্যম নারাণ তৈল ও অশ্বগন্ধ ঘৃত (বাজে লোকদের জন্য)। ব্রাহ্মী ঘৃত-মরিচাদি তৈল, নিম্বাদি রস ইচ্ছাভেদী বঁটি, চা, রুটি, ২ ডজন বড় টিন (বাবুদের আহারের জন্য)।

যাত্রার সাজগোজ।

মুখোছ্রী ২৫ কৌটা। ক্যানেডিয়ান স্বর্ণের ইস্পিরিং চুড়ি বা হাত কড়া ৪ জোড়া। গুলবাহার শাড়ি। তরল আলতা। হলো গ্রাউণ্ড ক্ষুর। জার্মান ক্রপ। আনা সেবিং ব্রাস। ভিনোলিয়া কলগেট। কেশরঞ্জন ইত্যাদি (সখীদের জন্য) ২ টর্চ লাইট, ফিটিং বাক্স ১ টা, বটকেষ্ট পালের তাম্ব ১টা, বাইশিকল ১ গাছা, সাজাহান ১ খানা, মোগলবংশ ৭ খানা, যাত্রা পাঁচালির বই খানকয়েক, রেকর্ডখাতা ছোটো বড়ো ৫ খানা। শৌখিন পাক দড়ি, ১৪ গজ। ঐ সিল্কের মায়ার বাঁধন ২০ গজ। ভূতনাথ খান্নার সচিত্র চিঠির খাম কাগজ ১০০। রাজহাঁস ১ জোড়া।

আমি বললেম, রাজহাঁস নিয়ে কী হবে ?

ছিরিপদ বললে, ওটা খাতাঞ্চিমশায়ের ফরমাশ। রোজ কলম কিনতে পয়সা লাগে; দুটো হাঁস হলে ডিমও খাওয়া যাবে, কলমও পাওয়া যাবে, মহারাজার টুপিতে গোঁজাও চলবে।

আমি বলি হাঁসকে খাওয়াতে বুঝি খরচ নেই।

ছিরিপদ বললে, চরে চরে খাবে কাদা গুগলি। যদি শেয়ালের পেটেই যায় পালকগুলো তো পাওয়া যাবে।

ফর্দ মেলানো হচ্ছে এমন সময় গাইতে গাইতে ছিরিকণ্ঠ প্রবেশ করল।

(গান)

কার হিসাব লিখছিস বসে মনের খোশে,
আপন কাজ মুলতুব রেখে ?
তোর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে,
পরের চোখে দেখছিস চোখে।

লিখছিস পরের বাকি যায়,
আপনার দিন যায় তোর ঠিকানা নাই সে দিকে।

—কিরে ছিরিপদ। থিয়েটারে গেছিলি নাকি?

—আরে না, অবনীবাবুর ওখান থেকে আসছি। খাতাঞ্চি-মহাশয়ের চিঠির জবাবে এই গানটা দিলে, তাই মুখস্থ করে নিচ্চি।

—বাবু বুঝি চিঠির জবাবটা লিখে দিতে পারলেন না?

—না, বললে মুখে মুখে জবাব নিয়ে যাও; এখন আমি ছবি লিখতে ব্যস্ত আছি।

—তুই গেছলি ঠাকুর বাড়িতে, কেউ রুখলে না?

—না সোজা চলে গেলাম।

—তারপর?

—তারপর শুনলেম ঠাকুর গেছলেন একটু আগে বোগদাদে, এখনই ফিরলেন।

—গেল আর ফিরল? বোগদাদ কী এখানে যে—

—আরে শোন না, ঐ কথাই আমি একজন ঠাকুরদাসকে শুধতে সে বললে আজ-কাল ঠাকুরমশাইকে হাজার দাস্তাঁর ছবির জন্যে রোজ রোজ দৌড়তে হয় ইরান, তুরান, বাসরা বোগদাদ। খালি ঘুমোতে আর খেতে আসেন বাড়ি দিনে দু-তিন বার।

—বলিস কি অ্যাঁ?

—বলি শোন না, আমাকে তো ঠাকুরদাস তার নিজের ঘরে বসিয়ে বললে, পান খান। বিড়ি কি সিগারেটের নামও করলে না। বসে আছি, দেখি একটা বর্মা এনে দিলে। চেয়ে দেখছিলেম বৈঠকখানা বাড়ি পুরোনো ঝরঝরে ভাঙা-চোরা। যেমন বর্মা ধরিয়ে একটান দিয়েছি টেক্কামার্কা জ্বেলে অমনি সব বদলে গেল। ছেঁড়া মাতুর হয়ে গেল মখমলের গালচে। ঘরটা একেবারে শিশমহল বাদশাই কেতার। আবু হোসেনের মতো হকচকিয়ে গেলুম। ঠাকুরদাস তখন আর দাস নেই, একেবারে

খাসমহলের বান্দা হয়ে গেছে, ঠিক যেন রঙের গোলামটা। হুবহু নবাবী কেতার। সেলাম করে বললে, চলিয়ে, হুজুর তলব ফরমাতে হেঁ। তাড়াতাড়ি চুরোট ফেলে উঠতেই দেখি যা ছিল আগে তাই।—সেই পুরোনো বাড়ি ঘর। দক্ষিণের বারান্দার একটা ছেঁড়া চেয়ারে বসে অবনী ঠাকুর —বুক খোলা জামা পরনে লুঙি, মাথায় টাক, চোখে হরিণের শিঙের চশমা। বোস —বলেই তিনি হাঁকলেন—রাধু তামাক দে। একটা পিতলের গড়গড়া, তাতে খানিক রবার, খানিক বাঁশ, খানিক দস্তা, খানিক সিলভারের নল। সেইটে টানতে টানতে তিনি বসলেন, আসছ কোত্থেকে? আমি বললুম, খাতাঞ্চিমশাই পত্তর দিয়েছেন। তিনি বললেন, খাতাঞ্চি-মশায়ের লোক তাই বল। পত্র রইল, জবাব পরে দেব, এখন বলত তিনি কেমন আছেন? সোনাতোনের সেই বোহিম কুকুরটা? আমি একটা কুকুর পেয়েছি হে নাম ভালু। রোসো, তা হলে কী কাজ আছে শুনি। আমি বললুম, আজ্ঞে যাত্রা হবে; তাই কেমন সিন কেমন সাজ হবে তারই একটু উপদেশ চাই। ওঃ বলেই তিনি খানিক তামাক টানতে থাকলেন, তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন —দেখ তোমার সিন কি ড্রেস কি কিচ্ছু দরকার নেই। বাপু, ছেলেরা যে খেলা করে তারা কি সিন চায় না ড্রেস? একটা কাঠকে করলে ঘোড়া, সওয়ার হয়ে চলল টগবগ। তুলে দাও সিন ফিন। সাদা কাগজে লিখলেম আরব কি বোগদাদ; বাদশা কি বেগম, অমনি তো তারা চোখের সামনে এল, মুখ্য যারা দেখতে শেখেনি তাদের জন্যেই সাজতে হয় এটা ওটা সেটা, আঁকতে হয় সিন—নদী পাহাড় পুকুর। আরে বাপু এই তো দেখছ বসে আছি ভাল মানুষটি। একটু বুক ফুলিয়ে জোরে কথা বলি, ভাববে ভীম এল —ভয়ে দৌড় মারবে। একটু সাজ চাই; রাজা হলে দিলেম একটা পালকগোঁজা টুপি মাথায় চাপিয়ে। কোতোয়াল হলে বেঁধে নিলে লাল সালুর পাগড়ি —ভয়ে থতমত হল লোক। কোতোয়ালের পাগড়ির নালটুকু ছেঁটে দাও, হয়ে যাবে যে মোটা-

পেট নিরীহ ভাল মানুষটি। ময়ূরের ল্যাজ কেটে নাও, রানী হল যেন মেথরানী। বুঝলে তো? এই বুঝে সাজ কিনো। কতকগুলো জবড়জং ব্যাপারে পয়সা নষ্ট কর না। কথাগুলো ভাল করে বলতে পারলেই যাত্রার আসর মাৎ। বুঝলে? যাও এখন—রোসো জবাব নিয়ে যাও—বলেই চিঠিখানায় চোখ বুলিয়েই গানটা আওড়ে দিলেন।—তারপরই হো হো করে হেসে বললেন, মুখে মুখেই মুখের মতো জবাব, দেখ ভুলে যেও না, নমস্কার।

নমস্কার করে উঠতে যাব, দাঁড়াও—বলে অবনীবাবু ডাকলেন রাধু! বাবুকে মস্কট্ থেকে যে খেজুর এনেছি আর বোগদাদ থেকে যে বেদানা পেয়েছি আর বসরার গোলাপ ফুলের তোড়া এনে দাও।

রাধু জিনিসগুলো আনতে ছুটল। অবনীবাবু বললেন—বোসো না, একটা মজার কথা শোন। আজ হঠাৎ ডাক পড়ল হারুন-অল-রসিদের ওখানে। কী হল, না বাদশার গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছে। দৌড়লেম, গিয়ে দেখি হাকিমে হাকিমে গিজ্, গিজ্ করছে ঘর। বাদশা শুয়ে আছেন। আমি বললেম, দেখি একবার হাঁ করেন তো। হাঁ করলেন, একটা বাঘ যেন মুখ ব্যাদান করলে। ছবি আঁকব দেখ। হাঁ দেখেই আমার কথামালার গল্প মনে এল—একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। আমি অমনি নিজেকে মনে করলেম বক। আর সোজা আঙুল চালিয়ে দিলেম শোন্নার মতো বাদশার গলায়। হাড় নির্গত। তরপর বখশিশ খেল্লাৎ। লম্বা আঙুলের কত গুণ দেখেছ? রাধু কিসমিস বাদাম পেস্তা সেই সঙ্গে মস্কটি হালুয়া ইত্যাদি নিয়ে হাজির হল—বিদায়, বিদায়।

আমি, অবিলাষ বলে উঠলেম, কই কই সে সব?

—আর সে কি আছে? কতক খেয়েছি আমি, কতক খেয়েছে রাধু, কতক বাড়ির ছেলে-পিলে, কতক বা রাস্তার লোক।

—ধ্যাৎ, বলে ছিরিপদ ছেঁড়া মাদুরে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎপাৎ হয়ে পড়ল। খানিক বাদে ধড়মড়িয়ে দাঁড়িয়ে বললে—চললুম।

—কোথায় রে ?

—কাজ আছে। বলেই ছিরিপদ দ্রুতপদে অন্তর্ধান।

ছিরিকণ্ঠ হেসে বললে—গেলেন অবনীবাবুর ওখানে।—এখন তাঁর ঘুমের সময়, কারু হুকুম নেই জাগাবার। চল আমরা ততক্ষণ বাজারে উড়েযাত্রা দেখে আসি।

খালধারে মাঠকোঠা—তারি দোতলায় বাক্‌স ভাঙা তক্তা, তারি চারি কোণে চার খোটার উপরে পুরোনো কানেস্ত্রার টিন দিয়ে ছাওয়া ছাদ। দেয়াল নেই, ছেঁড়া চটের পর্দা। আর ঘুণ ধরা বাঁশের চাটাই দরমা এই সবের বেড়া। দরজা এক পাল্লা ছিল এককালে, এখন কেবল কুলুপ দেবার শিকলটা ঝুলে আছে। আসতে-যেতে মাথায় ঠং করে লাগে। এই ঘরে নিয়েছি বাসা, তিন চারে বারো আনা রোজ লাগে। নীচে থাকে দোকানী। দুখান মুড়ির চাকতি আর কলঙ্কধরা পিতলের ঘটির আধ ঘটি জল এই দিয়ে তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে ভিজে গামছা মাথায় বেরিয়ে পড়লেম দুজনে বাজারের দিকে। সেটা বাগবাজার স'বাজার নতুনবাজার গোছের একটা বাজার। একটা কাটের খালি আড়ত। তারি মধ্যে বসেছে যাত্রা। ঢোল বাজছে না, একটা উড়ে একটা টিনের গামলা পেটাচ্ছে—টুক্‌রু টুক্‌রু। আর একট উড়ে গোঁসাই গোছের ফোঁটাকেটে গৌরচন্দ্রিকা শুরু করেছে—

আরে মধু মাসরে গুবাবু ফুঁকি,
তেরে কিটি ধাঁই কিরি বৈঠকি।
তরো বেতরো তাকিয়া হেলানে
মহা মজলিস বসিলা এহানে।
রসিক মিলিল গণ্ডা গণ্ডা,
রঙ্গে ঢঙ্গে বিবিধ পণ্ডা।
রসনা রোচক খণ্ডার বাণী
আসর জমক ঠণ্ডা পানী।

সরস কথা মনস হরা
পান বিরা আর ধূম পতরা।

সবাই অমনি ফস্ ফস্ বিড়ি ধড়িয়ে নিলে। দেখি এক ছোকরা মাথায় হাল ফ্যাশানে টেরিকাটা, যেন এক বাণ্ডিল হলো-গ্রাউণ্ড ক্ষুরকে সাজিয়ে রেখেছে পাশাপাশি খাড়া করে। দুই কানের উপর থেকে ঘাড় কামান। এক ঝুড়ি পান আর প্রোগ্রাম হাতে হাতে বিলি করে গেল।

প্রোগ্রামটা পড়ে নিলেম —

অবনীন্দ্রবাবুর স্বহস্তে ওঠান ১০১ রজনীব্যাপী সর্বজন-আদরিত ছিলিম।

হঠাৎ এই সময় হারমনি বাজা বাজিয়ে ভদ্রলোক স্বদেশী গান গাইতে গাইতে চাঁদা আদায় করতে এসে গেল। যেমন তার গান আরম্ভ করা অমনি যেন ভেড়ার গোয়ালে কে আগুন ধরিয়ে দিলে। চাঁদা দেবার ভয়ে আমরাও যে যার উঠে চম্পট কে বা কার গান শোনে।

বাসায় এসে ছিরিকণ্ঠ বললে —কেমন দেখলি ফিলিম ?

—আরে রাখ তোর ছিলিম। চোখ এখনও টনটন করছে। কান করছে ভোঁ ভোঁ, মাথা ঘুরছে বোঁ বোঁ।

ছিরিকণ্ঠ বললে—ছিলিম কিরে বল ফিলিম। নতুন বায়স্কোপ ভাল লাগল না ?

আমি বললুম —এই দেখ কাগজে লিখেছে সর্বজন আদরিত ছিলিম।

—ওরে ছাপার ভুল রে, এরা ভিতর ছাপাতে ছাপে ভেতর, উপর ছাপাতে ছাপে ওপর, নাথ কে ছাপে লাথ, প্রলয়কে ছাপে প্রণয়।

এই সময় ছিরিপদ রোদে ধুলোয় তেতে-পুড়ে হাজির। মুখে একটা মোটা চুরুট। ছিরিকণ্ঠ তাকে দেখেই বলে উঠল —দেখা হল অবনীবাবুর সঙ্গে।

—হাঁ।

— চুরুট পেলি কোথা ?

—কেন, রাধু দিলে।

—তারপর ?

—তারপর প্রথম মহলে দেখলেম মুনসী মীর বক্সী আর বড়ো বড়ো পীর মর্দা, পাইক, ঢালী, আরদালী, লস্কর, চোপদার আছাব সহছাব, জমাদ্দার পেশকার, উজির, নাজির, আর বীরবল, কোতোয়াল সব একেবারে খাড়া হাজির —আদবে হইয়া খাড়া রয়েছে সকলে। তারপর দ্বিতীয় মহলে দেখি —সব নজ্জুম তারা গণনা শুরু করেছে।

'মেরিক মস্তুরি কর অদারত তারা
কোমর জোহরা জোহেল এ সাত ছেতারা।'

তারপর তৃতীয় মহলে দেখি সব আপসরিগণ নৃত্যগীত করছে—

'ছেতারা বাজায় কেহ তম্বুরা মৃদঙ্গ
তবলা বেহালা বাজে মন্দিরা মোরচঙ্গ।
হারমনি বাজা কেহ বাজায় বসিয়া
তালে তালে নাচে গায় ঘাড় হেলাইয়া।'

চতুর্থ মহলে দেখলেম গোলবাগ জহরুত পাথরে বাঁধা রাস্তা, ফুল চানকা ফোহারা, তার মধ্যে তেলেছমাতের বাগান পাহাড় পর্বত কেল্লা। সেখানে ভাই জানিস—

'আন্ধা নামে বৃক্ষ এক বড়ো ছায়াদার
ঝোলে ডালে ডালে ফল যেমন আনার'

সে ফল খেলে কি হয় জানিস ?

—না বল না শুনি, তুই খেয়েছিস নাকি

—ভাই গিয়েছিলেম খেতে, মালি হাত চেপে ধরলে। তার মুখে জানলেম—

'যদি কোন রকমেতে সেই ফল খায়
ঘুরিবে আন্ধেলা হয়ে বাগানে সদাই।'

বাস রে কি বাগানই বানিয়েছে।

'নাহিক জমিনে বাগ নাহিক আছমানে
বানাইল গোলবাগ সেই তো কামিনে—
যাদুতে প্রাচীর চার নির্মাণ করিল।
নানা জাতি বৃক্ষ ফল যাদুতে গড়িল।'

বাবা বসন্ত বাহার ফুল, শহরে কেন ভারতবর্ষে কোথাও নেই সেখানে দেখলেম ফুটে আছে। সেই ফুল গাছের তলায়।

'মূর্তি এক দেখি সেথা অতি বদহাল
কুঁজা পিঠ মোটা নাক শুকনা কঙ্কাল।

পঞ্চম মহলে তোপখানা। সেখানে দেখি সব লোহাচুর আর বারুদ নিয়ে বাজিগরেরা তুবড়ি গড়ছে আরও কত কী বাজি। ষষ্ঠ মহলে দেখি যত পালোয়ান আর কুস্তিগির।

'পালোয়ান পীল নস্ত ছাহেব সর্দার
ধুতি এক পরিয়াছে আশি গজ
মস্তকে ধরিয়াছে দেড় মণি তাজ
তিরিশ মণের এক জিঞ্জির কোমরে বাঁধিয়া,
দু হাজার মণের গোর্জ কালে দাবিয়া
বিশ মণ ঢাল পিঠে আসেন বসিয়া,
উনিশ মণের এক তলোয়ার লইয়া—'

আমি কাছে যেতেই পালোয়ান গোলামকে বললে—হুক্কা লাও। যেন ভাই হাতি ডাকল। তারপর ভাই, এক হুক্কা এল তার ছিলুমে পাঁচ মণ তামাক ধরে, তিন মণ টিকে ধরাতে লাগে সে তামাক। তার নলচেতে একটা দু মণ নল লাগান। সে তামাকে টান দিলে শিব পড়ে ঢলে। সপ্তম মহলে দেখি হাবসিনীর পাহারা। কালো পাথরের ফটক আগলে বসে আছে। বলব কী ভাই দেখেই ভয় লাগে।

'গোঁফ তার শকুনির দন্ত শূকরের—
চুল তার ঘাড় ছাঁটা যেন কুকুরের।'

সাত মহলা পার হতেই সাত পহর কেটে গেল। সেখানে পেট ভরে খেয়ে নিলেম।

'শির বিরিঞ্জি ফালুদা আর গোলাপী সরবৎ,
কালিয়া কোর্মা কোফ্‌তা কাবাব দল্লকৎ।
আখরোটি মনাক্কা কিসমিস বাদাম,
খোরমা ও খেজুর কত ভাল ভাল আম।
শিরা ও মালাই ফিরণী চৌরসের দুধ,
চিনি মিছরি নেয়ামত খাইনু বহুৎ।
তারপর পানি খাইয়া পান মুখে দিয়া
শয়ন মহলে শেষে পৌঁছিনু যাইয়া।
সেখানে ভাই পশুপক্ষী নাহি পারে যাইতে উড়িয়া।'

সেখানে দেখি না কালপরী আর নিদ্রাপরী পাহারা দিচ্ছে দুজনে ফটকের দুইধারে বসে অষ্ট ধাউতের মতন যেমন পাষাণ। আমাকে দেখেই তারা ডেকে বললে—

'কালো পরী বলে দিদি হুর মুর নয়,
বুঝি কোনো সাহাজাদা মোর মনে কয়।'

আমি তাদের যেমন বলেছি দুয়ার খোল আর অমনি মোরগ ব্যঙ্গ দিয়েছে।

'নিশি পোহাইয়া গেল কোকিল কাড়ে রাও—
শয্যা হতে অবনীন্দ্র চৈতন করে গাও।
অজুনামার সারি লিয়া সরাগত হৈল,
ফুলটুঙির ঘরে গিয়া দেওয়ানে বসিল।'

সেখানে দেখি ভাই আর কেউ নেই, কেবল ছেলে আর মেয়ে। সেখানে তিনি ছেলেদের সাথে ছাওয়ালের বুক ধরে আছেন খেলিতে।

'কাঁধেতে লয়েছে ঝোলা হাতে খেলা আর
চিত্রকরা শাল অঙ্গে দিয়েছে বাহার।'

—তারপর ?

'—তারপর আর কি বসি একাসনে
হাস্য পরিহাস কথা কহি দুইজনে।'

—তারপর ?

তারপর গজস্কন্ধে মাহুত ডঙ্কা বাজাইল। আমি সেই হাতিতে চড়ে চলে এলেম।

—আসবার কালে কিছু বললে না ;

—হ্যাঁ বললে তুমি ছিরিপদ নহ দু-পুরিয়া ডাকাত। এর মানে কী ভাই ?

—ওর মানে তোর সবটাই মিথ্যে। দেখি চুরুটটা ? ছোঃ এ যে লারাণের দোকানের ছাপা! অবনীবাবু এ চুরুট ছোঁয়ই না, এ মার্কাই নয়।

—তবে সে কি মার্কা শুনি ?

ছিরিকণ্ঠ খানিক থেমে বললে —চিন্তা ফুং মার্কা। চিনের আফুং ক্ষেতের ঠিক গায়েই বর্মাদেশের তামাকের চাষ। সেইখান থেকে আসে তাঁর চুরুট, তার নাম চিন্তাফুং, বুঝেছিস। তুই ঠকেছিস্। যাঃ বাজে বকিসনে। আমি দেখিনি নাকি অবনীবাবুকে ?

ছিরিপদ কোনো উত্তর দিলে না, খালি বললে —বিশ্বাস না করিস্ তো ভাই—বলেই সে চুরুটটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে বললে —আর একটু মজা হয়েছিল সেখানে তা আর বলব না।

আমি অমনি বলে উঠলেম —বল না ভাই।

—আচ্ছা তবে শোন —বলে ছিরিপদ আরম্ভ করলে।

—মনে ছিল সেই সোনারুপোর ঝুলিমোড়া গজহস্তীর পিঠে একেবারে এখানে উপস্থিত হয়ে তোদের অবাক করে দেব, আর ছিরিকণ্ঠের মুখটা কেমন হয় তাও দেখে নেব। কিন্তু ভাই বলব কী গজ-স্কন্ধে পা দিয়েছি কি না অমনি সে গজহস্তীর মতো পালোয়ানটা হ্যাঁ—চা—ত্ করে এক হাঁচি। আমার সঙ্গে সেই ঠাকুরদাস আসছিল। সেও অমনি একটা টিকটিকির মতো ছোট্টো করে হেঁচে দিলে—গি—চি—গো বাস। তারপরে সারবন্দী অযাত্রা দেখা দিলে।

> 'মাকড়ের সুতে হৈল যাইবার পথ বন্ধ ;
> গোয়ালার মাথা হতে পড়ে দধি-ভাণ্ড।
> শুকনা ডালেতে বসি ডাকে দাঁড়-কাক,
> যুগিনী মাড়িয়া লয় কহ আর শাক।
> কাঠ লিয়া কাঠুরিয়া আগে আগে যায়
> গঙ্গা তীরে হিন্দুগণ মুর্দা জ্বালায়'

সবই অযাত্রা দেখলেম ; সুযাত্রার মধ্যে কী একটাও নেই।

> 'না দধি লেহ বলি ডাকে গোয়ালিনী
> না পুষ্পের পসার লইয়া ভেটেন মালিনী
> যাবার কালে ধেনুর বাচ্ছা সামনে না দাঁড়ায়'

খালি একটি মাত্র সুযাত্রা।

'গজস্কন্ধে মাহুত বসি ডঙ্কাটা বাজায়।'

কিন্তু একা মাহুত এক হাতি আর এক ডঙ্কা আর এই ছিরিপদ কত অযাত্রা ঠেকাবে? কেল্লার ফটকের কাছে এসে আট্‌কা পড়লেম। কিলেদার কিল খুললে না দরজার, ফটক বন্ধ, কী ব্যাপার? না বাবুসাহেবের ছেলে মাণিকের আংটি পাওয়া যাচ্ছে না। ফেরাও হাতি। চল হুজুরে। দেখি চারিদিকে খানাতল্লাশি পড়ে গেছে। সিন্দুক যার যত ছিল তো ভেঙেই ফেলেছে। ভাল ভাল সব তম্বুরা, তবলা, বেহালা, বাঁশী সেগুলো পর্যন্ত ফাটিয়ে দেখছে আংটি পায় কী না। বাবুর খানসামা অনাটন দুই পকেট আর দুই চোখ উলটে আকাশের দিকে চেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে। বৈঠকখানায় গালচেগুলো উল্টে ফেলেছে। বড়ো বড়ো কোচ কেদারা টেবেল চার পা তুলে মরা গুরু ছাগলগুলোর মতো পড়ে আছে। বড়ো বড়ো বিলিতি আরসি সেগুলো ফাটিয়ে দেখছে আংটি পায় কী না। হাঁড়িকুড়ি বাসন আলমারি সব ছতিচ্ছন্ন করে ছড়িয়ে ফেলে দেখছে আংটি পায় কী না। আমাকে বলে কোতোয়াল পকেট দেখাতে। আমি বলি, দেখ না-আছে কোট্‌ না-আছে কামিজ। 'হাঁ কর।' 'হ্যাঁ— নাও পানের পিচ্‌।' 'চুল ঝাড়ো' 'নাও উকুন।' 'কাপড় ঝাড়া দাও।' 'নাও ছেঁড়া কোপনি।' শহুরে হলে ভুগতে হত। খানাতল্লাশির চোটে হয়ত গায়ের মাংসও খানিক লোকসান হত। যাই হোক ভালয় ভালয় অনাটনের কাছে পৌঁছে বললেম কাণ্ডখানা কী, একেবারে যে কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছে। সে বললে, কে জানে, কোথায় নিজেই ফেলেছে, এখন লোকের উপর জুলুম। আমি কালই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশে চললেম। দরোয়ান বাবুর্চি ড্রাইভার সবাই পরামর্শ করছে—ভাই এসা মুনিবকা কাম ছোড় দেনা মুনাসিব। বাঁদীগুলো এক একটা যেন হিড়িম্বা শূর্পণখা পুতনা কত নাম করব। রেগে ঘোড়া গিটকিরী ছেড়েছে নানা সুরে। হায় হায় ছো ছো

ছো হিঁগা হিঁগা হিঁগা। এমন সময় বাবুর পোষা কুকুরটা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে তিনবার কেশেই আংটি উগরে দিলে। 'আরে এ ক্যা হ্যায়' বলে দরোয়ানজী সেটা তুলতে যেতেই অনাটন টপ করে সেটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে বললে —'বটে এর জন্য হাজার হাজার আশরফি বকশিশ আছে। তুমি ভালুকে গেরেফতার কর আমি এটা দিয়ে আসি পোঁছে।' ভালু সে বাবুর কুকুর —গ্রেপ্তার করে কে? সে অনাটনের সঙ্গে দৌড়োল উপরে। তার পরেই সাক্ষী তলব। আমরা সবাই কুকুরের হয়েই সাক্ষী দিলেম। দরোয়ানজী কেবল—'ক্যা জানে হুজুর কাঁহাসে অনাটনে আঙ্গুস্তারা নিকলা'—ভাবটা যে ওই নিয়েছিল।

যাই হোক ভালুকে পেট ভরে খেতে দেয় না বলে অনাটন আশরফির সঙ্গে ধমকও খেলে, আর ভালুর জন্যে এক বাটি করে ঘন ক্ষীর বরাদ্দ হয়ে গেল। হুকুম হল, খানসামাকে নিজের হাতে জ্বাল দিয়ে ক্ষীর তৈরি করতে হবে রোজ দেড় পোয়া করে; কুকুর মরে গেলেও। একেবারে নবাবি শাস্তি।

ফেরবার সময় দেখি ইট ভেঙে চুন খসে টালি খুলে খানাতল্লাশির চোটে অতবড়ো বাড়িটা যেন ফোগলা হয়ে গেছে। একটু তামাক পর্যন্ত খেতে পেলুম না। রাস্তায় পড়ে দেখি লারাণের দোকান। সে এক কাপ চায়ের সঙ্গে একটা চুরুট ফাও দিলে। সেইটে ফুঁকতে ফুঁকতে এসে দেখি তোরা —এখন বিশ্বাস করিস কী না করিস্। বলেই সে পাশ ফিরে ঘুম দিলে।

আমি পকেট থেকে এক ঠোঙা অবাকজলপান বার করে চিতপাত হয়ে চিবতে থাকলুম।

ছিরিকণ্ঠ একবার শুধোলে, অবাকজলপান পেলি কোত্থেকে?

আমি হাতে আমার সীসের আংটিটা দেখিয়ে ঘাড় চুলকে বললেম, এইটে ঘষতেই এসে গেল। তারপর দুজনের নাসিকা গর্জন আর আমার দাঁত কড়মড়।

খাতাঞ্চিখানার পুরোনো চাকর সোনাতন বদলি দিয়ে গেছে তো গেছেই। ঠাকুরবাড়ির পোষাপাখিকে কৃষ্ণনাম পড়াতে ভর্তি হয়েছে পিলে-গোবিন্দ, আর খাতাঞ্চিমশায়ের বালিশের খোল হুঁকো কল্‌কির খবরদারিতে এসে গেছে আর-একটা লাল গামছা কাঁধে উল্‌কি-পরা দামোদর পিতল গোঁসায়ের আখড়া থেকে গাঁজার কল্‌কি আর ছুঁচোর কেত্তনে ফার্স্টক্লাস পাস হয়ে। আমি আর অবিন ঘরে ঢুকতেই খাতাঞ্চিমশায় হাঁক দিলেন—'অনাটন অনাটন।' তারপর আমাদের বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, 'এই যে এসে গেছ, কাশী যাওয়াই ঠিক তো।'

অবিন চায় আমার মুখে, আমি চাই অবিনের দিকে। দুজনেই এক সঙ্গে ঘাড় নাড়লেম মাদ্রাজীতে—হ্যাঁ কি না বুঝতে দিলেম না।

খাতাঞ্চিমশায় কল্‌কি-শূন্য গড়গড়ায় তিনটান দিয়ে বললেন—'ফর্দখানা?'

বাক্‌স বালিশ উলটে ফর্দ মেলে না। এই ফাঁকে অবিন দেখি সরে পড়ল। তক্তপোশের তলায় পাটাতন-বন্ধ দেরাজ থেকে চালের কাছে মাটির লক্ষ্মী প্যাঁচার কুলুঙ্গিতে চড়াই পাখির বাসাটা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে যখন ফর্দ পাওয়া গেল না তখন খাতাঞ্চি-মশায় গুম্ হয়ে দুই ভুরু কুঁচকে হাতকাটা ফতুয়ার বন্ধক দিয়ে দড়ি-বাঁধা ভাঙা-ডাঁটি চশমার পরকলাদুটো জোরে জোরে ঘষতে থাকলেন। তারপর দুধার চোখ পিট-পিট করে—'ইচ্ছাময়ী তোমারই ইচ্ছে'—বলে একটা নিশ্বাস ছেড়ে গড়গড়া টেনেই চললেন—ধুঁয়া বার হয় না সে খেয়াল নেই।

সোনাতন থাকলে ফর্দ নিয়ে আজ ধুন্ধুমার বেধে যেত। কিন্তু আজকাল নতুন চাকর-বাকর আসা অবধি খাতাঞ্চিমশায় কেমন যেন দমে পড়েছেন। সর্বদা আনমন উদাস ভাব, যেন কোনো কিছুতে ইচ্ছে নেই। 'ফর্দটা গেল—যাকগে,' বলেই হাই তুললেন—যেন একটা বোড়া সাপ মুখ ব্যাদান করে একটা খাবি খেলে। সেই

সেদিনের খাতাঞ্চিমশায় বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া বনে আছেন দেখে ভাল লাগল না; বললেম—'খুব করে ধমক লাগান, ফর্দটা তবে বার হবে।'

—'না হে, বোঝ না, আজকাল দিনকাল বড়ো খারাপ পড়েছে। সে আমল গেছে। জাঁকজমক ধমক-ধামক করতেই ইচ্ছে হয় না। থাকত সোনাতন তো—হ্যাঁ।' বলেই খাতাঞ্চিমশাই হাঁক দিলেন—'অনাটন, অনাটন!'

নতুন কল্কিতে ফুঁ দিতে দিতে লাল গামছা কাঁধে অনাটন হাজির। খাতাঞ্চি বাঁ হাত বাড়াতেই অনাটন গাঁট থেকে ফর্দটা বার করে তাঁর মুঠোয় গুঁজে দিয়ে গুল ওসকাতে থাকল। হুঁকোর নল ভেবে ফর্দটা মুখে দিতে যান দেখে অনাটন জোরে কল্কিতে ফুঁ দিতে শুরু করলে। আমি বলে উঠলেম —'ওটা সেই ফর্দটা!'

—'তাই তো!' বলে ফর্দটা বাক্সে তুলতে যান দেখে আমি বললেম —'দেখি না!'

খাতাঞ্চিমশায় বললেন—'অনাটনের হস্তাক্ষর পড়েন আর পড়ে বোঝেন —তিনি এখনো, কী বলে ভাল —দেখ চেষ্টা করে!' বলেই খাতাঞ্চিমশায় ফর্দটা আমায় দিলেন।

ফর্দটা আগাগোড়া হিজিবিজি, যেন ফার্সিতে লেখা। কেবল কলমের খোঁচ, যেন মুরগির একরাশ ছেঁড়া পালক উড়ছে—তলাতে নাম সই—দামোদর ওরফে অনাটন।

আমি দেখে বললেম —'দামোদরের নাম অনাটন রাখলেন কেন? সনাতনের সঙ্গে ছন্দ মেলাতে নাকি?'

—'ফর্দ দেখে বুঝলে না, ভূস্বামী-বিত্তের কতখানি অনটন?'

—'কিন্তু ওর টেরি থেকে রেলির ধুতির চুলপাড়টি পর্যন্ত কোথাও তো কিছু অনটন দেখছি নে!'

খাতাঞ্চিমশায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন —'সেই কারণেই তো কাশী পালাবার মতলব করেছি। মেরে-ধরে ধমকে জবাব দিয়ে ফল হয় না। দেখি এ উপায়ে যদি ঝেড়ে ফেলতে পারি অনাটনকে। ব্যাটা যেন কী—'

বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে খাতাঞ্চিমশায় ঘড়ির দিকে চাইতেই অনাটন হাত বাড়িয়ে একটা রাংতা-মোড়া কৌটো খাতাঞ্চিমশায়ের হাতে দিয়ে বললে —'এই এককৌটো বই আর দোকানে নেই।'

খাতাঞ্চিমশায় অমূল্য জিনিসের মতো কৌটোটা নিয়ে নাড়চেন চাড়চেন দেখে বললেম —'কৌটোটা কিসের?'

— 'ইচ্ছাময়ী বটিকা হে, বড়ো ভাল জিনিস।' বলেই একটা বড়ি নিজের গালে দিলেন, একটা আমার হাতে দিয়ে বললেন — 'খেয়ে দেখ।'

গুলিটা খেয়ে নিলেম। মনে হল যেন খানিক বরফ আর জিনতান আর তাম্বুলিন, গোলাপজাম, লকেট, আনারস, কলার বড়া, তাল-ফুলুরি, খেজুর, কিসমিস, মোতিচুর, মিহিদানা, ভীমনাগ এক-সঙ্গে মুখের মধ্যে খানিক কিটিমিটি খেলে গলায় তলিয়ে গেল।

—'ইচ্ছাময়ী, তোমারি ইচ্ছে!' বলে খাতাঞ্চিমশায় নল টানলেন। সরু সুতোর পৈতের মতো একগোছা ধুমা বাতাসে উড়ল। দুজনে চুপচাপ, ঘরখানা থম্‌থম্‌ করছে। হঠাৎ খাতাঞ্চি-মশায়ের দাড়ি-গোঁফ ঠেলে একটা ঝড় যেন বেরিয়ে এল—'ব-স-স্‌।' আর সেইসঙ্গে পাকা গুল খামিরা তামাকের একরাশ ধুঁয়া সাদা যেন বাস্তুসাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠে চলল চালের কাছে সেই কুলুঙ্গিটার দিকে যেখানে রং-করা মাটির লক্ষ্মী-প্যাঁচা বসে আছে।

একটা শেষটান দিয়ে খাতাঞ্চিমশায় বললেন,—'অনাটন, পাঁজি ছ্যাখ্‌ তো শুভদিন কবে!'

—'আবার বিয়ে করবেন নাকি?'

—'না হে, যাত্রার দিনটা দেখা চাই। এটা হল কী মাস ভাল? চৈত্রমাস। তিথিটা? একাদশী। বার তারিখ শকাব্দ খ্রীস্টাব্দ সম্বৎ কিছু মনে পড়ছে না ছাই —ছ্যাখ না অনাটন।' অনাটন যে ঘাড় গুঁজে পাঁজির যত পাতা উলটেই চলল—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। খাতাঞ্চিমশায় হাত উঠিয়ে বললেন —'রোস মনে পড়েছে, সাঁইত্রিশ

শো তেরো সাল। ইয়ার কী হল তাহলে দেখ তো ভাই'! বলেই ফর্সির নলটা মুখে তুললেন।

আমার মনের মধ্যে যেন সেলেট আর পেনসিল নিয়ে ইংরিজি টুকটাক খেলে চলল—তের প্লস একশো ত্রিশ ইনটু সাঁইত্রিশ ডিভাইডেড বাই সাল ইনটু সোন ইনটু শক মাইনাস হিজরি ব্র্যাকেট শকাব্দ প্লস সম্বৎ অ্যাডেড টু খ্রীস্টাব্দ। খেলা কতক্ষণ চলে? একবাজি শেষ হয় আর খাতাঞ্চিমশায় কন—'হল?' অমনি তেজে শুরু হয় —প্লস মাইনাস ইনটু ড্যাশ। সেলেটে আর জায়গা হয় না, পেনসিল প্রায় ক্ষয়ে যায়, মাথা চুলকোয়, পেট ফোলে, অনাটন পাশ কাটায়। খাতাঞ্চিমশার রুপো-বাঁধা ফর্সি বলে চলে —'চলুক, চলুক, ফিস্-ফিস্, আশিবিষ, দশ-পঁচিশ, একচল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ।' বলতে বলতে হুঁকোটা যেমন বলেছে 'উনপঞ্চাশ, ফুরুৎ'—অমনি দেখি খাতাঞ্চি নেই, পিদ্রুম নেই কুলুঙ্গি নেই, তার মধ্যে মাটির লক্ষ্মী-প্যাঁচা নেই, দেয়ালের গায়ে টিকটিকি নেই। নেই ভেতর ওপর ইস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল টাইম টেবল, উত্তর-দক্ষিণ পুব-পশ্চিম কলকাতা চিৎপুর কাশীপুর ইত্যাদি এট্‌সেট্‌রা, এমনকি খাতাঞ্চিমশায়কেও কে যেন রবার দিয়ে ঘষে মুছে দিয়ে গেছে। আছে শুধু পড়ে একটুখানি তামাকের গন্ধ আর মস্ত সাদা জাজিমখানা যতদূর চোখ চলে ততদূর টানা যেন সাহারা মরুভূমি বা মাকুল ময়দান। তারই উপর দিয়ে একসার পিঁপড়ে না উটের কাফিলা চলেছে দেখি একটা যেন মিরাজের দিকে। থামগুলো দেখি যেন খেজুর গাছের গুঁড়ি। মাথার উপর ছাদ খুঁজে পাইনে। চোখ বুজলে দেখি সর্ষে ফুল, চোখ চাইলে দেখছি অনাছিষ্টি। এই সময় শুনি কে বলছে—'আকাশখানা দেখাচ্ছে যেন নীল পতাকাতে চন্দন নিকেচে।' গলার স্বরটা পিলে-গোবিন্দর গলার মতো। কানামাছির ভনভনানির মতো খানিক ঘুরে-ফিরে আবার কানের কাছে এসে বললে —'হায় হায় দিগ্‌ভিরমি লাগল দেখি।' তারপর স্বয়ং পিলেগোবিন্দ মূর্তিটা নিজের গজভুক্ত কপিত্থবৎ ন্যাড়া মাথা দুই হাতে ধরে থপাস করে

কোলাব্যাঙের মতো সামনে এসে বসল, আর কথা কয় না। নিঃসাড়া অন্ধকারে যেন ওৎ পেতেছে আমাকে শিকার করবে বলে এমনি মনে হল। মনের ভিতরটা পর্যন্ত যেন বোবা করে দিয়েছে সে। বুকটা ধড়ফড় করতে থাকল, যেন বাঁয়া-তবলা বেজে চলেছে—

ধর্ ধর্ মার্ মার্
ঘাড় ভাঙ্ যার-তার।

একশোর ছুটো শূন্যের মতো গোবিন্দর ছুটো চক্ষুকোটর থেকে বোল আর আখর একাদশ অক্ষৌহিণীর মতো ছুটে বার হল—

চটাপটি উলটি পালটি
ঝটাপটি মাথা ফাটাফাটি আর।

আমার তখন কথা সরছে না—এগোই কী পিছোই এই ভাব। 'গোবিন্দাই' বলে একেবারে দণ্ডবৎ মুখ থুবড়ে। দূর থেকে একটা আওয়াজ এল—'সুতরবান-ই-ই।' আমি শুনলেম কে যেন ডাকলে—'অবন-ই।' গলাটা যেন খাতাঞ্চিমশায়ের মতো গম্ভীর সুরিলা।

মাথা তুলে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি একটা যেন সাদা বালিশের ঢিবি থেকে এক মূর্তি নেমে এলেন।

পরনে হায়কল জোব্বা, হাতে ডাণ্ডা মাথায় টোপ।
পায়ে চটি চামড়া বান্ধা, সাদা কালো দাড়ি গোঁফ।

দেখেই আমি আদাব বাজিয়ে নাকে খৎ। নাকটা ছড়ে সুনছাল উঠে ফুল উঠল গোল মুলোবৎ।

শুধোলেম—'হুজুরকা উসমে সরিফ!'

ভারি গলায় উত্তর হল—'মুসফিতর মুসাফির।'

উর্দুবিদ্যে আমার হালে পানি পেলে না। সুরে বুঝলুম আরবিতে একটা আশীর্বাদ হয়ে গেল। আমি একেবারে দস্তাবস্তা সটান কদমবোসি বাজাতে উপুড় হয়ে পড়লেম। মুখ তুলতে আর সাহস হয় না—আশীর্বাদ চলেছে শুনি—

খুরমাদারে খুদ্‌বখারি ইদ্‌গথা
মস্তেজারে হামন্‌দোস্তি বিশ্‌খতা।

এতক্ষণে একটা বাংলা কথা পেয়ে যেন প্রাণ বাঁচল। খাতাঞ্চি-মশায় প্রায়ই জমিজমার হিসেব করতেন—বিশ্‌খতা ত্রিশ্‌খতা কথাটা কানে ছিল। কিন্তু, কে ইনি এলেন দেখি, বলে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই গেল পা টলে। যেন টোলের পড়ুয়াছুটো সমস্কৃত পড়তে লেগেছে—নৃত্যং বাদ্যং গীত-কলিতং বলিতং চলিতং উঠিতং পড়িতং। বিচলিতং হয়ে কোনো রকমে খাড়া হয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই — সুনসান ময়দান আধি রাত ইধর আধি রাত উধর হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছি একা প্রাণী ছাহারা বালির মধ্যে, ধড়টা সমসকৃতর ঝোঁক সামলে নিয়েছে তখন। গাজনের গাঁজলা ভাঙতে লেগেছে মুখ খিদের আর তেষ্টার চোটে।

গর্দবাদের ওর্দানশীল কোর্মা ক্ষেতের খোসবু
জিলদে ধরা বুলবুলির গান খুঞ্চে ঢাকা বস্তু।

মুন-মরিচি একটা জোর হাওয়াতে মরুভূমির মাঝে কোর্মা আর শিককাবাবের গন্ধ নাকে এসে লাগল। আমি একেবারে যেন আপাদ-মস্তক হঠাৎ উর্দু-বেশ বনে গিয়ে হাঁক দিলেম—'কোই হ্যায় ?'

দেখি না, অনাটন ছুটে আসছে—গায়ে গেঞ্জি মাথায় খদ্দরের টুপি। আমায় দেখে মুখ থেকে বিড়িটা ফেলে বললে—'কী চাই ?'

আমি বললেম—'আমি চললেম ; কিছুই বুঝছিনে কে বা আমি কে বা তুমি, কোথায় আছি, কী বা করি।'

হেলল না দুলল না, আকাট হয়ে রইল অনাটন। সরু কলমে টানা একটা বিস্ময় আর প্রশ্নের চিহ্ন যেন এক করে লেখা — একটা আঁকড়ি মাত্র।

আবার মুন মরিচি হাওয়া বইল, গজল গনগনিয়ে উঠল আমার গলা পর্যন্ত—

মুন মরিচ গলদা চিংড়ি
ঝোল কাবাবি দোলমা
কোর্মাবাগের মুর্গাদারি
শিক্‌কাবাবি খোরমা

সুর্মা কাজল রাতে রাতে

গরমাগরম টুক্‌রা

গুল মুর্গার খুনখারাবি

বখরেদারি বখরা !

অনাটনের গলা দিয়ে সুর বার হয় না, দেখি কেবল তার গলার টুঁটিটা ওঠে নামে, যেন নিঃশব্দে তালে তালে মোরগ ডাকছে — কোঁকর কোঁ !

গজলের ফাঁকে ফাঁকে নুন-মরিচি হাওয়া এক-একবার মুখে যেন একটুকরো কাবাব ফেলে দিয়ে যায়। গজল পিষে চলে দাঁত, এমনি দমে দমে যখন শিকের ডগাতে পৌঁচেছি তখন অবিন এসে হাজির 'কী হচ্ছে', বলে।

আমি বললেম —'গুল-মুর্গার মিল খুঁজছি, কথা পাচ্ছিনে।'

অবিন বলে উঠল—'কেন, বন-মুর্গা লাগালে কেমন হয় ?'

আমি বললেম —'মুর্গার লড়াই বাধাতে চাও নাকি ?'

—'ধান-দুর্বা হলে কেমন হয় ?'

—'তেলে-জলে হয় আর-কি। গুল-মুর্গার সঙ্গে একমাত্র মিলতে পারে কিঞ্চিৎ নুন-সুর্বা।'

অনাটন বলে উঠল —'আর কুল-কুট্টা।'

অবিন —'ব্যোম কালী কলকত্তাওয়ালী' —বলে এক থাবড়া বসিয়ে দিলে অনাটনের পিঠে। আমি লাফিয়ে উঠলেম।

অবিন বললে —'নাচবে নাকি ?'

—'নাচ নয় ভাই, পিঠে'র পর দিয়ে সড়াৎ করে কী যেন একটা চলে গেল।'

—'কাটেনি তো ?'

—'না।'

—'চল খিমার মধ্যে, বাইরে আর নয়।'

দেখলেম আগে অনাটন, পিছে পিলে-গোবিন্দ বালির উপর দিয়ে ছুটছে —ঢাকের কাঠিতে তাড়া করছে যেন ঢাক !

দূরে অন্ধকারে একটা হাতলণ্ঠন লাল হচ্ছে নীল হচ্ছে। অন্ধকার থেকে যেন ক্রমাগত বলছে —'ওধারে নয়, এধারে আয়!'

আমরা ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে শকুন্ত দুষ্মন্ত বলে গেলেম।

একে মরুভুঁই, তায় সুর্মা-কাজল রাত। অবিন বললে —'ভয় লাগছে নাকি?'

—'নাঃ।'

—'শীত লাগছে না?'

—'উঁহুঃ লাগছে ভাল হে।'

অবিনের মন তখন খিমা খুঁজছে। আমাকে নড়াবার জন্যে বললে —'হিমে মাঠে ঘোরা আমার সহে গেছে কিন্তু তোমার ধাতে সইবে না।'

আমি দুষ্টুমি শুরু করলেম কবিত্ব করে —'আহা কী শোভা দেখ দেখি —সামনে অপার প্রান্তর, গভীর নিদ্রার মতো নিথর আকাশ মাথার উপর নীল চাঁদোয়া টেনেছে। মনে হয় যেন সারা জীবন এইখানে অনন্ত এই পথের মুখে ঐ পেঁপেগাছটার মতো—'

অবিন একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিলে। আমি বলেই চললেম — 'আর এই উলুবনের চামর ঘাসের উপরে যদি মাথা তুলত একখানি কুটির—'

অবিনের গলা-খাঁকানি। আমি বলেই চলেছি—'আর সেই কুটির থেকে থেকে-থেকে কেউ যদি পাঠাত বাতাসে রাখালী বাঁশির সুরের মতো মিষ্টি গলায় একটিমাত্র ঘুমপাড়ানি গান!'

অবিনের চোখ ছল-ছল। আর তাকে ভোগাতে সাহস হল না, বললেম,—'চল এইবার কোথায় তোমার খিমা।'

গুম্‌ হয়ে অবিন আগে-আগে চলল, আমি পিছে-পিছে। দূরে দেখা গেল খিমা। ছেঁড়া সতরঞ্চি তিরপল বাঁশ দড়ি একের উপরে প্যাকবাক্‌স্‌ ঝুড়ি ইত্যাদির একটা স্তূপ, সামনে একটা বাঁশে বাঁধা হারিকেন লণ্ঠন, কালি-পড়া তার চিমনি; আলোটা যেন কাজলের মাঝে সিঁদুরের ফোঁটা, প্রজাপতির ছেঁড়া ডানা। সেই আলোতে

দেখা গেল পিলে-গোবিন্দকে —ছুই হাতে ছুই কান ঢেকে উবু হয়ে বসে। সামনে খাড়া বিস্ময়ের চিহ্ন অনাটন।

—'কি রে তোর আবার কী হল ?'

উত্তর নেই।

অনাটন বললে —'ওর কান খারাপ হয়ে গেছে, শুনতে পাচ্ছে না।'

—'সেকি, এই তো বেশ শুনছিল।'

গোবিন্দ আমার মুখের দিকে চেয়ে কুঁতিয়ে বললে —'মোহন-বাবুকে বলুন একটু বাউকমি ওষুধ।'

—'কোথায় মোহনবাবু, কোথায় ওষুধ বাউকমি।'

ঠিক এই সময়ে খিমার মধ্যে একটা সিংহগর্জন।

ছুহাত পিছিয়ে পড়ে বললুম —'কী ও ?'

অনাটন বললে —'খাতাঞ্চিমশায় ঘুমচ্ছেন।'

—'উনি এলেন কখন ?'

—'কিছুক্ষণ হল। এসেই গোবিন্দের কান মুচড়ে দিয়েছেন।'

গোবিন্দ অস্ফুটস্বরে —'ওষুধ' —বলেই ভুঁয়ে শুয়ে পড়ল। এমন সময় খিমার মধ্য থেকে ভারি গলায় উত্তর এল —'ওষুধ কী হবে। একবার তো হয়েছে !'

গোবিন্দ আর কথা কইলে না, ইশারায় জানাল—'কানে একটু বাউকমি।'

ওষুধ কোথায় পাই ? অনাটনকে বললেম —'চায়ের চিনি আছে ?'

সে জবাবে মান্দ্রাজীতে নয়, সাদা বাংলাতে ঘাড় নেড়ে জানালে — হ্যাঁ, আছে।

—'তাই একটু, আর পানে দেবার চুনের গুঁড়ো দাও একটু খাইয়ে। রাতটা তো কাটুক, সকালে চিকিৎসার চেষ্টা দেখা যাবে।'

খিমার মধ্যে তিনটে কম্বলের বিছানা —তার একটাতে চাদর-মুড়ি একটা ঘড়-ঘড় শব্দ। খালি ছুটো বিছানায় অবিন আর আমি শুয়ে পড়লেম।

অবিন একবার বললে —'গোবিন্দটার উপায় ?'

আমি সহজভাবেই বললেম —'এখানে তো ডাক্তার-বদ্যি মিলবে না, কাল হাকিম খুঁজে আনা যাবে কোনো বেদুইনের আড্ডা থেকে।'

'তাই ভাল।' বলে অবিন নাক ডাকালে।

আমি জেগে আছি। দূরে একটা ফেউ ডাক দিতে দিতে চলে গেল।

অবিনকে ঠেলা দিয়ে বললেম —'শুনচ? বাঘ আছে। হুঁ।'

তারপর ঠিক খিমার পিছন দিয়ে ছোটো-ছোটো একদল ঘোড়া কি, কী যেন ছুটে পালাল।

খট্ খট্ খট্ খট্ —প্রায় দশ মিনিট এইভাবে খটাখট্ শব্দ চলল। অবিন পাশ ফিরে বলে —'হরিণের পাল দৌড়চ্ছে।' এবারে যে-বাগে গোবিন্দ শুয়েছিল সেইদিক থেকে ডাক এল—'ফেউঃ!' আস্তে আস্তে খিমার কানাত একটু ফাঁক করে দেখলেম —দুটো লাল চোখ অন্ধকারে জ্বলছে।

অবিন চুপি চুপি ডাকলে —'সরে এস।'

আমি কানাত আরো একটু ফাঁক করে গলা বাড়াতেই ভক্ করে বিড়ির গন্ধ, আর অনাটন আর গোবিন্দর নাকের ডগাদুটি হল প্রকাশ। সেই সময় খিমার মধ্যে শব্দ হল —'ফেউঃ!'

আমার হাত পা হিম হয়ে গেল। কম্বল মুড়ি দিয়ে কাঁপছি ঠিক এই সময়—'ফেউ ইস্চাময়ী তোমারই ইস্চে'—বলে খাতাঞ্চিমশায় তিনটে তুড়ি দিয়ে ঘুমের ঝোঁকে—ডাকলেন —'সোনাতন!'

পিলে-গোবিন্দ একটা কান-ঢাকা টুপি মাথায় হাজির। খাতাঞ্চি-মশায় তাকে দেখেই চটে উঠে বললেন —'তোকে কে ডাকছে? সোনাতন কোথায়? এ টুপি কার —নিশ্চয় চুরি করেছে পাজি হতভাগা ইস্টুপিড —' ঝড় বহেই চলল।

ইতিমধ্যে অনাটন ইচ্ছাময়ী বড়ি আর জল ঘটি আর ফর্সি হাতে প্রবেশ করলে। খাতাঞ্চিমশায় একেবারে ঠাণ্ডা —একটা বড়ি মুখে ফেলে বললেন—'বাবুদের জাগাও।' বলেই তামাক টানতে থাকলেন।

চিৎপাত হয়ে নিদ্রা দিচ্ছি, অনাটন আমাদের কাছে এসে বললে —'বড়িভুটো খেয়ে নেন, সকাল হল।'

আমি চললেম —'চা ?'

—'আসছে।'

বলেই অনাটন অদৃশ্য। খাতাঞ্চিমশায়ের ডাক পৌঁছল —'ওহে উঠে পড়। —ইস্চাময়ী তোমারই কির্পা!'

সকালে উঠে দেখি খাতাঞ্চিমশায় বসে বসে তাঁর অ্যালার্ম ক্লকটায় দম দিচ্ছেন।

এই ঘড়িটার বয়স তখন ছ-মাস; সোনাতন বুড়ো ঘড়িটার অন্নপ্রাশন দেবার দরবার করতে আমাকে ধরে বললে —'ছোটোবাবু-মশায়, ঘড়িটার বয়স ছ-মাস পেরিয়ে যায়, ওর একটা নাম হল না? ও তো আমাদেরই একজন সাথী —ঘুম ভাঙায়, কটা বাজল বলে দেয়, কটা বেজে কত মিনিট হল হিসেব রাখছে। ওর অন্নপ্রাশন না হলে চলে কী? বলেন তো!'

আমি বললেম —'ঠিক তো, শুভদিন দেখে ওকে ভাত খাওয়ান যাবে।'

আণ্ডুটি পাণ্ডুটি, ছেলে বুড়ো সবাই আমরা এই আয়োজনে মেতে আছি, অভিধান খুঁজে নামও একটা বার করেছি, এমন সময় কে জানে কেমন করে বাতাসে বাতাসে খবর পেয়ে গেলেন খাতাঞ্চি-মশায়। সেই থেকে ঘড়িটা বন্ধ হল বাক্সে! কেবল দম নিতে পেত দিনে একবার করে বাইরের আলো হাওয়া বেচারা! খিমার মাঝে খাতাঞ্চিমশায়কে ঘড়িতে দম দিতে দেখে বললেম —'ভড়কাকে সঙ্গে এনেছেন দেখছি।'

খাতাঞ্চিমশায় বললেন —'ও এখন 'ভড়কা' নেই, ওর নতুন নাম দিয়ে গেছে সোনাতন —'তড়কাবতী'।' থেকে থেকে তড়কা রোগে ধরে ওটাকে। সেনগুপ্তর তেল মালিশ করতে হয় রোজ এক আউন্স —তবে ঠিক থাকে।'

আমি বললেম—'ওকে আপনি যে-প্রকার বদ্ধ-সন্ধের মধ্যে রাখেন, বাতাস রোদ আলো পায় না, কাজেই তড়কা-রোগে ধরেছে। বড়ো হয়ে ওর দাঁত পড়ল, তবু ওকে তুলো মুড়ে রাখা কেন? আমি শুনেছি কাল রাতেও ওর দুবার ফিট হবার যোগাড় হয়েছিল।'

—'নাকি?' বলেই রায় মশায় তড়কাকে বাক্‌সে বন্ধ করে বললেন—'ওর বন্ধ থাকাই অভ্যেস হয়ে গেছে। এই মেঠো হাওয়ায় বার করে রাখলে সর্দি, কাশি, হাঁপানি, নিউমোনিয়া এমনকি হার্ট-ফেলও হতে পারে। এ মরুভুঁয়ে কী ডাক্তার বদ্যি আছে যে ওকে সারিয়ে নেব?'

ডাক্তার বদ্যির কথায় গোবিন্দর কানের কথা মনে পড়ে গেল। বাইরে গিয়ে দেখি, চিনিকেমির গুণে সে চাঙা হয়ে গেছে—মুখে একগাল হাসি। শুধোলেম—'কানে বেদনা আছে?'

—'একটু একটু।'

—'ঠাণ্ডা লাগিও না।' বলে অবিন তার কান-ঢাকা টুপিটা গোবিন্দকে দিয়ে ফেললে।

আমি একটা সিকি দিয়ে বললেম—'আজ গরম গরম ফুলুরি আর—'

—ফুলই নেই এখানে, বলেন ফুলুরি!' বলে সিকিটা সে ট্যাঁকে গুঁজলে।

এই সময় খাতাঞ্চিমশায়—'ইস্‌চামই, তোমারই কির্‌পা'—বলে খিমার বাইরে এলেন।

—'বখশিশ হয়ে গেছে বুঝি?'

গোবিন্দ দে-চম্পট!

—'কী বলছিল হে পাজিটা? ফুল নেই, ফুলুরি নেই? ও জানে না হাত নিশপিশ করলে কান মলার জন্যেই ওকে রাখা—ফুলুরির খোঁজে আছেন! ওকে অধিক আদর দিও না, বিগড়ে যাবে। একটু শরীর চাঙা বোধ হচ্ছে, বেড়িয়ে আসি চল। এসে চা খাওয়া যাবে। —ইস্‌চামই—'

বলেই খাতাঞ্চিমশায় অগ্রসর হলেন।

ইচ্ছাবড়ির গুণেই হোক বা চায়ের খোমারিতেই হোক, তেজে চললেম আমরা বালির ঢেউ ঠেলে জাহাজের পিছনে দুটো জালি-বোট যেন।

প্রায় ক্রোশখানিক পাড়ি দেবার পর আমি আর অবিন বসে পড়লেম। খাতাঞ্চিমশায় হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলেন সোজা।

সকালে আকাশটায় তখন হালকা চা-পানির রং ধরেছে। মাথার উপর দিয়ে একটা চাতক পাখি চা চা করে ডেকে গেল। অবিন বললে —'ইচ্ছাবড়ি তো খেলেম, কিন্তু ইস্‌চাময়ীর কির্‌পা তো হল না। এক পেয়ালা করে চা যদি তিনি পাঠাতেন তো উপকার হত।'

বলতে-বলতেই এক মঙ্গোলিয়ান —'ইরেন্দে পাগলা, উরেন্দে পাগলা' —কষে বলে এক বাটি চা অবিনের হাতে দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল —টিকিও দেখার সময় দিলে না।

অবিন বাটি দেখে বললে —'এ যে দেখি সোনার হল-করা পোস্ট আপিসের ডুম! কিনারাতে আবার ফার্সিতে কী লেখা রয়েছে।' আমি তখন উর্দু পড়ি, আমার বিদ্যে পরীক্ষা করার জন্যে অবিন বললে —'এ যে হাফেজি গজল, তাজা বেতাজা মনে হচ্ছে লেখা।' বলেই বাটিটা এক চুমুকে শেষ করে আমার হাতে দিয়ে বললে — 'পড় তো কেমন পার!'

আমি বাটিতে চোখ বুলিয়েই বললেম —'এ আর বুঝলে না, একটা রুবাই। এর মানে হচ্ছে—

বাসি লুঙ্গি নাহি ছাড়ে, ধোয় হাত পা,
ভাঙা পিঁড়া ফাটা পাত্রে বসে খায় চা।
নাপিতের ঘরে গিয়া হাজামত করে,
থাকুক অন্যের কথা, ভাগনেও ভাত মারে।'

অবিন বলে উঠল —'এঃ, আমরা খাতাঞ্চিমশায়ের ভাগনে —এর সবগুলোই যে আমি করি!'

আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

—'যেন দশদিন দাড়ি কামাইনি এমনি বোধ হচ্ছে —' গালে হাত দিয়ে অবিনই বলে উঠল।

আমি পড়ে চললেম—

'পাঁও পরে পাঁও দিয়া বসে যেই জন
তার কাছে ভাগ্যদেবী না যান কখন।'

অবিন বলে উঠল —'বাজে কথা। এই তো পায়ের পরে পা দিয়ে এখানে বসে আছি, আগেও ছিলেম ; চা তো এসে গেল তবু। পিঁড়েতে পায়ের পরে পা রেখে বসে বিয়ে করে গৃহলক্ষ্মীলাভ হয়েছিল, এখনও আসন-পিঁড়ি হওয়ামাত্র পঞ্চাশ ব্যান্নন না এসে পারে না —সব গাঁজাখুরি!'

আমি বললেম —'সকাল হল, খেউরি হয়ে নিতে পারলে হত।'

ঠিক এই সময় এসে হাজির এক হাজাম কাস্তের মতো অস্তরা আর ইস্ত্রাপ নিয়ে ক্ষুরে শান দিতে দিতে, যেন আরব্য উপন্যাসের বক্‌বক্ অজাবক্ ইত্যাদি সাত ভাই নাপিতের একজন। সামনে এসেই সে অবিনের ও আমার আধখানা করে মাথার চুল চেঁচে নিয়ে তিনবর্ণের ছবিখানার মতো ঝড়ে উড়ে চলে গেল।

চায়ের বাটিটা নিজের মাথায় টুপি করে বসে আছি,অবিন মাথায় হাত বুলিয়ে বললে —'ভাই রে, এখন উপায় ?'

আমার বাকরোধ।

চায়ের রং ফিকে হয়ে ঠিক ন্যাড়া মাথার বর্ণ ধরলে আকাশ। ঠিক এই সময় দেখি খাতাঞ্চিমশায় দৌড়তে দৌড়তে আসছেন একটা ছিকলের আগায় কুকুরের বকলস টানতে টানতে —কুকুর নেই। গায়ে খিরকা, মাথার কলন্দরী টোপ চটের থলির মতো হাওয়াতে পিঠের পরে লটপট করছে।

আমাদের দেখেই থমকে বললেন —'এই যে তোমরা —এ কী বেশ ?'

আমি বললেম—'আপনার এ কী ?'

খাতাঞ্চিমশায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—'শোন, হোস্বাম জাতুগিরের পাল্লায় পড়েছিলেম। ব্যাটা পোষ-কুত্তো বানিয়েছিল আর কী! ভাগ্যে সঙ্গে ছিল ইচ্ছাবড়ি, গালে ফেলতেই প্রায় পূর্ববৎ—কেবল রইল বকলস আর ছিকলি। কোমরবন্ধ করব বলে নিয়ে এলেম।'

আমি বললেম—'আর এ খির্কা ও টুপি?'

—'এ তুটো ফেলে আসার সময় হয়নি। কাজেই দেখছ, আপাদমস্তক কলন্দর।'

অবিন বললে—'আর আমরা হাজামের হাতে পড়ে আধ-কপালে খণ্ড-ত বনে গেলাম, তার উপায়?'

—'হাজামের হাতে পুরো মাথাটা যে যায়নি সেজন্যে ধন্যবাদ দাও ইস্‌চামইকে। কিছু খেয়েচ?'

—'চা।'

—'পেলে কেমনে?'

—'মঙ্গোলিয়ান দিয়ে গেল।'

—'ওঃ বুঝেছি, চল চল। আর কথা নয়, দৌড় দাও!'

দৌড়তে যাই, পা ওঠে না। হৃৎপিণ্ড বুকের মধ্যে হাঁপিয়ে পড়ে। পাশ দিয়ে আকাশ মাঠ ময়দান দৌড়তে থাকে—আমি যেন ছিকল-বাঁধা।

হঠাৎ খিমার অন্ধকার ঘিরে নিলে আমায় কি রাত্রির অন্ধকার তা বুঝলেম না। নিশ্বাস ফেলে চারিদিকে দেখতে থাকলেম। কানে পৌঁছল একবার—'ইস্‌চামই, তোমারই কিরূপা—অনাটন!' তড়কা ঘড়ির খুট্‌খুট্ শব্দ পেতে থাকলেম। বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়ে শুনি, রাতটা যেন সদ্য-ফোটা মুরগির বাচ্চার মতো বলে চলেছে—'ইতি ইতি ইতি!'

বাদশার আগাগোড়া পাকা দাড়ির মাঝে একটি মাত্র কাঁচা ও বেগমের সব কাঁচা চুলের মধ্যে একটি পাকা চুল দেখা যায়। বেগমের কিছুতেই পছন্দ হয় না বাদশার দাড়ি—তা যতই কেন বাদশা আতর কস্তুরীতে দাড়ি মাজুন। ওদিকে বেগম সাহেবা—তিনিও মাথায় হীরে মুক্তোর ঝাপটা সিঁথি পরে মাথা ঘষা মেখেও সেই একগাছি পাকা চুল বাদশার চোখ থেকে ঢেকে রাখতে পারেন না। দুজনে দুজনকে দেখে মুখ ফেরান, দুজনেই মনের দুঃখে থাকেন, শেষে এমন হল, যে বাদশার দরবারে কাঁচা-দাড়ি ও বেগমের দরবারে পাকা চুল যাদের তাদের টেকাই দায় ছিল। কবি আসে, কালোয়াত আসে, ছবিওয়ালী আসে, চুড়ীওয়ালী আসে, কেউ খাতির পায় না, উল্‌টে বরং ধমক খায়, গর্দানি খায়, সরে পড়ে প্রাণ নিয়ে। উজির ভেবেই অস্থির—কী উপায় করা যায়। নাপিত নাপ্‌তিনীকে উজির ঢেকে বলেন—তোরা সাঁড়াশি দিয়ে চুল দুগাছা উপড়ে দে, আপদ চুকুক। হাজাম হাজামিন দুজনে ভয়ে শিউরে উঠে বলে—দোহাই উজির সাহেব, এমন কাজ আমাদের দ্বারা হবে না—সাঁড়াশি দিয়ে আমাদের দাঁত উপড়ে ফেলতে বলেন তো পারি, বাদশা বেগমের উপর অস্তর চালাই এমন নেমকহারাম আমরা নই। উজির নিশ্বাস ফেলে গালে হাত দিয়ে বসেন। কী উপায়।

মোল্লা দো-পেঁয়াজা পেঁয়াজ, রসুন খেতে বড়োই ভালবাসেন, কিন্তু হাতে পয়সা নেই মাষকলাই কেনবারও। ফতোয়া দেন মসজিদে দু-বেলা; কোনো ফল হয় না। তাঁর বিবি তাঁকে বলেন দেখ, এই সময় বাদশা বেগমকে খুশি করতে পার তো কিছু হতে পারে।

মোল্লা দো-পেঁয়াজা বললেন তা জানি, পেঁয়াজও হতে পারে পয়জারও হতে পারে।

বিবি বললেন দেখ না চেষ্টা করে। কিছু না-হওয়ার চেয়ে সে-ও ভাল।

মোল্লা সকালে কোমর বেঁধে মজলিসে হাজির! দেখেন সবাই যে যার দাড়ি মোচড়াচ্ছেন আর চুপ করে বসে আছেন। এমন কি যার দাড়ি গোঁফ কিছুই নেই সেও হাত বোলাচ্ছে শুধু গালের ওপর-টাতেই। নাচ গান আমোদ আহ্লাদ সব বন্ধ! বাদশা মোল্লার দিকে চাইতেই মোল্লা মস্ত এক সেলাম ঠুকলেন, কিন্তু বাদশার উচ্চবাচ্য নেই। তখন মোল্লা একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে যে ভাবে ফতোয়া দেয় লোকে সেইভাবে সুর করে গান শুরু করলেন দাড়ি নেড়ে, যথা,—

আব্ দাড়ি চাপ্ দাড়ি,
বুলবুল চস্‌মেদার দাড়ি,
কুলপাক্কা এক কাঁচ্চা
ওহি দাড়ি সব্‌সে আচ্ছা।

বাদশা খুশি হয়ে তালে-তালে ঘাড় নাড়ছেন দেখে দো-পেঁয়াজা আবার গাইলেন—

এক দাড়ি মান মনোহর,
এক দাড়ি ভব্বো।
এক দাড়ি খালিফ্ ফজিহৎ
এক দাড়ি ঠচ্‌ঢো।
সদর পাক্কা অন্দর কাঁচ্চা
ওহি ওহি সব্‌সে আচ্ছা।

শুনে বাদশা একগাল হেসে ফেললেন, সেই সময় অন্দরেও হাসির রোল উঠল পর্দার আড়ালে! এক সঙ্গে বাদশা বেগম আমির ওমরা এবং কাঁচা পাকা যে কেউ খুশি হয়ে গেল। মোল্লার আর

প্যাঁজ রসুন ধরে না ঘরে। শহরের বাড়ি বাড়ি দাড়ির গান উলটে-পাল্‌টে লোকে গাইতে থাকল, যার যেমন খুশি সুরে—

(দাড়ির গান)

'আব্‌ দাড়ি চাপ্‌ দাড়ি
বুলবুল চসমেদার দাড়ি—
কুল পাক্কা এক কাঁচ্চা
সব্‌সে দাড়ি ওহি আচ্ছা।
এক দাড়ি মান মনোহর,
এক দাড়ি ভব্বো।
এক দাড়ি খালিফ্‌ ফজিহৎ,
এক দাড়ি ঠচ্‌চো।—
সদর পাক্কা অন্দর কাঁচ্চা
ওহি ওহি সব্‌সে আচ্ছা।
লম্বে দাড়ি ওহি আচ্চা।
ছোটে ছোটে ওভি আচ্ছা।
দাড়িমে সভি সচ্চা।
পাকে কাচ্চে সভি আচ্ছা।
"আচ্ছা আচ্ছা" বোলি সাচ্চা।'

সোকার ঘটকালি

রাম কুণ্ডুর আদরের মেয়ে বুঁচী—
এক ছড়া মটরের মালা পুঁজি।
সে চায় তার পেতল গোপালের দিতে বিয়ে।
সোকাকে লাগিয়েছে ঘটকালীর লোভ দিয়ে।

পাকড়াশীদের কমলা—কী যে সুন্দরী তার মোমের পুতলা,
যায় না বলা—দেখেছে অমলা বিমলা।
বঁচীর ইচ্চে তাকেই বউ করতে।

সোকা বললে —হবার নয় সে—
একে তো মেয়ে পাস করা, তাতে জরজেট শাড়ি পরা
সত্যিকার রূপার বুরুচ দেখেছি তাকে পরতে।
বুঁচী বলে, আমার ছেলেই মন্দ কি ?
পুলিশে চাকরি করে, বাইশিকলি চড়ে
খেতাব পেয়েছে সি-আই-ই
সোকা দাদা, এ কাজ তোমায় হবেই করতে!
সোকা বলে পাকড়াশীরা জেতে যে বামুন।
শুনে হয় বুঁচীর মুখখানি চুন
চোখ থাকে ছল ছলাতে
—সোকা দাদা, তবে হবে না কি ?
—আজকালের মেয়ে, হতেও পারে—
বুঝে সুঝে করা চাই, বিলম্বে কার্যসিদ্ধি হয় যাতে।
এমনি করে বোকা, বুঁচীকে দিয়ে ধোঁকা
কিছুদিন ধরে বাগাচ্ছে খইয়ের মোয়া,
নারকেল নাড়ু, বাসি লুচি।
ইতিমধ্যে ভবিতব্যে মেয়ে-ইস্কুলে ভর্তি হ'ল বঁচী।

কমলা পড়তে পারে, পারে না তুলতে কাঁথার ফুল।
বুঁচীর সূচীকর্মে একটু হয় না ঘর ভুল।
পড়াতে নিরেশ, সেলাই করাতে সরেশ,
পড়াতে সরেশ, সেলাইয়ে নিরেশ,
দুজনকে সমান সমান নম্বর দেন হেডমিস্ট্রেস,
এই তো চলছে।
কমলা পাস হয়েছে, রিসাইট করে রবিবাবুর পদ্য।
বুঁচী পেয়েছে ফার্স্ট ক্লাস উলে বুনে শ্বেত বক আর পদ্ম।
পুতুলের বিয়ের কথাটা নিজেই পাড়বে বলতে বুঁচী,
সোকা হ্যাঁ না কিছু না বলে রইল স্তব্ধ।
পাকড়াশীদের ওখানে প্রীতিভোজন,
কমলার পরীক্ষা পাসের নিমন্ত্রণ,
এসেছে অমলা বিমলা সুজি কজন,
ফাঁক বুঝে মেয়ের বিয়ের কথাটা পাড়ল বুঁচী।
ভেবে বললে কমলা—এখনি যায় না তো বলা
বাপের মতটা তো বুঝি।
বসে অনেকক্ষণ পাকা কথার আশায়
এক সরা খাবার নিয়ে ফিরল বুঁচী বৈকাল বেলায়।

পাঠশালের ফেরতা সোকা হাজির,
নিতে সংবাদ, কী হল পাকড়াশী বাড়ি।
দেখলে আঁস্তাকুড়ে বুঁচী ফেলেছে
পাকড়াশীদের সিঙাড়া কচুরী লুচি তরকারি।
বুঁচীর মুখ দেখে সাহস দিয়ে বললে সোকা
আমি অন্য পাত্র দেখছি।
কাটলে শুধু বাতাসে একটা ভেংচি ছেলের মা বুঁচী

সিকস্তি পয়স্তি কথা

১

অস্তি পয়স্তি চরের একফালি সিকস্তি সরু
তদুপরি আছে খাড়া একটি গভস্তি তরু।
ফল তার নাস্তি —থাকলেও ছোঁয় না মানুষ কি গরু।
সেখানে একটি খুদ্দুর বস্তি
বেঁধেছে ক-ঘর গৃহস্তি।
রাস্তা সেখানে একটা অস্তি —দেখা যায় না এমন সরু।
বস্তির পশ্চিমে থানা পুকুর
ডোবা বললেও হবে না ভুল ঃ
পুবেতে বালুচর
নাই বাড়িঘর—ছাহারা মরু।
রাস্তার বাঁয়ে তাঁত-শাল,
ধ্বসে পড়ছে তার মেটে দেয়াল,
তাঁতির নেই খেয়াল —খড়ের চাল যদিও করছে উড়ু উড়ু।
সে ভাবছে কেবল, সুতো কাটতে পারছে না
হাতিপাড় বাঁধতে তার জরু।
ডাহিন হাতে কামার-শাল
লোহাকে পিটিয়ে সে করে লাল,
গড়ে শাবল, কোদাল, লাঙলের ফাল,
খোন্তা খুন্তি—অগুন্তি
শুধু নরুনটির ধার বসাতে ঘেমে অস্থির লোহারু।
সিকস্তি চরের কুমোর,
তার ছিল ভারি গুমোর —
ঘুরাতো চাক্‌টি
বাড়াতো কুঁজাটি, আসটি —পেট-মোটা, গলাটি সরু।

ভাবনা ঢুকেছে তার,
চিনেমাটির পেয়ালাটার
ফরমাশ দিয়ে গেছে বেলেস্তার বাবুর বেলাতি বারু।
সেদিন বসেছে মাত্র একখানি মুদির দোকান
পথিকে তেলেভাজা ফুলুরির দিতে যোগান
মহানন্দের 'আনন্দ ক্যাবিন'
সাইনে লেখা নাম —তেলরং দিয়ে বাঁকাচোরা মোটা সরু।
মুদি ছিল এককালে মাইনর ইস্কুলের পড়ু।
মুদির ঘরের কাছে
জাবর কাটতে আছে
অস্থিসার কার হারানো গরু

এখন এই চর তদারকে খুদিরাম বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে খাতাঞ্চিমশায় এই মুদির দোকানে বাসা নিয়েছেন। ব্রাহ্মমুহূর্তে খাতাঞ্চিমশায় মশার জ্বালায় ভোরে ফরাগৎ হয়ে মুদির দাওয়ায় বসে কুল্‌লি করছেন। লাল গামছা আর ভিঙ্গার নিয়ে খুদিরাম বিশ্বাস দাঁড়িয়ে। কিছু অন্তরে মুচির হাতা —সেখানে চিনিবাস মুচি খাতাঞ্চিমশায়ের দুপাটি জুতোর গোড়ালিতে দুখানা গরুর নাল আঁটছে —পিতলের গুঁজি ঠুকে ঠুকে। আকাশ তখনো ফর্শা হয়নি —আবছা দেখা যাচ্ছে। মুদির বাড়ির একধারে একটা মুরগি রাখবার ফুটো জালা, একঝাড় জল-বিচুটি। এমন সময়—

রামপাখি ডাকিল যেমন—ক্ক-কুত্র
অমনি উঠিল প্রভাত তপন, ধরে সেই সুরের সূত্র!
কুড়ুক কুক্কুটি
ডানা ঝাড়ি উঠি—
জল বিচুটির ঝাড়ে বাওয়া ডিম্বটি পাড়িল ক্ষুদ্র।

রামপাখি ডেকেই চলেছে—ধুপ্প্‌ টাহুঁ—ধুপ্প্‌ টাহুঁ—গলা ছেড়ে। খুদিরাম খাতাঞ্চিমশায়ের চিবোনো আধখানা গাব-ভেরেণ্ডার

দাঁতন-কাটি রামপাখিটার দিকে ছুঁড়ে বললে —'কুঁকড়োটার গলা দেখ, যেন বাঁদিদের ধমকাচ্ছেন নবাব খাঞ্জা খাঁ।'

—'ধমকাচ্ছে কি রাম নাম করছে, কেমন করে বুঝলে খুদিরাম?'

—'আজ্ঞে, মোচলমানের পাখি রাম নাম করে কখনো?'

কুঁকড়ো তখন দাঁতন-কাঠিটার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলছে—লাল ঝোঁট দুলিয়ে। খাতাঞ্চিমশায় শব্দের দিকে কান পেতে বললেন—'পাখিটা কৃষ্ট বলছে না খৃস্ট চলছে কিছু বোঝবার জো নেই।'

এমন সময় জোরে জোরে কুঁকড়ো ডাকল —'আ-লা-হু-য়া!'

—'পাখিটা হালুয়া খেতে চেঁচাচ্ছে হে বিশ্বেস!'

—'আজ্ঞে না', বলে খুদিরাম ঘাড় নাড়লে। 'কুঁকড়োটা প্রথমে বললে —ধুপ উঠাহুঁ, রোদ উঠেছে। দাঁতন-কাঠিটা পড়তে বাচ্চা-ক-টা সেদিকে ছুটল দেখে বলল —ইষ্টক তিষ্ট। এখন বললে আকাশের দিকে দেখে—আলা হুয়া, আলো হয়েছে।'

খাতাঞ্চিমশায় বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে খুদিরামের দিকে চেয়ে বললেন —'আমার বিশ্বাস ছিল তুমি একটি —' মুখে এল —গাধা গরু, কিন্তু সামলে বললেন —'বানর।' খুদিরাম কাছাটা একহাতে কোমরে জড়ায়। খাতাঞ্চিমশায় গামছায় মুখ মুছতে মুছতে বললেন —'এখন বুঝেছি তোমার পেটে শকুন-বিদ্যে আছে, সাধন করলে কালে স্ফুরণ পেতে পারে।'

ক্ষুদিরাম ভয়-স্তিমিত নেত্রে খাতাঞ্চিমশায়ের দিকে চেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে —'খাতাঞ্চিমশায়, সোনাতন দেশে গিয়ে অবধি সমানে খাটচি, খাতা ঝাড়চি, তল্পি বইচি, মুরগি রাঁধচি —আপনি শেষকালে এমন কথাটা বললেন — তোর পেটে শকুনি পড়েচে!'

—'কী আপদ! বলি খুদিরাম, তুমি কুঁকড়োর কথা বুঝলে আর আমার কথাটার বেলায় উল্‌টো-বুঝলি-রাম করে ফেললে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার পেটে পিলে-চাপা শকুন-বিদ্যে রয়েছে।

জগতে এ বিদ্যে অতি কম লোকেই পায়। কুস্তুন্তনিয়ার এক সদাগর পেয়েছিল—সে গরু, গাধা, কুঁকড়ো আর কুকুর এই চার জানোয়ারের কথা বুঝত এবং বুঝত বলেই তার প্রাণরক্ষে হয়েছিল—তার আপন জরুর হাত থেকে। আর-একজন ফরাসী পণ্ডিতের শকুন-বিদ্যে আছে, তার নামটি ভুলেছি। এদেশে এক অবনীবাবুতে আর তোমাতে এই বিদ্যে অর্শেছে দেখছি। খবরদার, তুমি জানলে, আমি জানলেম—এ বিদ্যের কথা আর কাউকে জানতে দিও না—তোমার বিয়ে হয়নি তো?'

—'আজ্ঞে হয়েছে, অল্পদিন হল।'

—'বৌকে বলোনি তো এ বিদ্যের কথা?'

—'আমি নিজেই জানতেম না তো তাকে বলব!'

—'চেপে যেও, চেপে যেও কথাটা, নচেৎ সেই কুস্তুন্তনিয়ার সদাগরের মতো ভোগ ভুগবে।'

—'আজ্ঞে আমার বৌ যে টিয়ে চন্ননা ময়নার কথা বোঝে আমারই মতো।'

—'আরে সে পড়া বুলি, শেখানো কথা সবাই বোঝে। এ হল স্বতন্ত্র, এক অদ্ভুত ক্ষমতার লক্ষণ! একালে এদেশে কোনো শর্মারই নেই এ বিদ্যে!'

খুদিরাম প্রশ্ন করলে—'রবিবাবুর?'

—'ওগো, রবিবাবু তো রবিবাবু, তাঁর ইস্কুল-মাস্টার জগদানন্দবাবু আমার ছিলেন বিশেষ পরিচিত—পোকা-মাকড়ের কথা পশুপক্ষীর কথা প্রভৃতি বইও ছাপিয়ে গেছেন, তাঁতেও বিদ্যের স্ফর্তি দেখিনি।'

—'মহাত্মা গান্ধী?' বলেই খুদিরাম খাতাঞ্চিমশায়কে হুঁকো এগিয়ে দিলে।

—'ধান ভানতে শিবের গীত!' বলেই খাতাঞ্চি হুঁকো মুখে করলেন!

খুদিরাম মুচিবাড়ির দিকে চেয়ে বললে—'সত্যিই কর্তার কথায় ভয়ে আমার পেট কামড়িয়ে এসেছিল, যেন শুকুনি ঠোকর দিচ্ছে!'

—'ওর ওষুধ হচ্ছে তেল ফুলুরি কম করে খাওয়া। এত তোমার বিদ্যের কতটা স্ফুরণ হয়েছে পরীক্ষা করি।—কী বলছে কুঁকড়ো এবারে?'

—'আজ্ঞে কুড়ুক মুরগিটাকে লাথি দিয়ে বলল—কোঁৎ!'

খাতাঞ্চিমশায় ধুঁয়ো ছেড়ে বললেন—'ও কোঁতের মানে কী বিশ্বেস?'

খুদিরাম বললে—'ওঠ্!'

—'উঠল মুরগি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, নিঃসাড়ে!'

—'তারপরে? বলে যাও।' বলেই খাতাঞ্চিমশায় আবার হুঁকো-মুখ হলেন।

খুদিরাম দেখে চলে আর বলে চলে—'একটা বেজি ঘাসবনে মুখ বাড়ালে। মুরগির ছানাগুলো—এ জী বেজী জীব জীব বলতেই মোরগ ধমকে উঠল—চোপ্পরহো! বেজি চট্ করে চম্পট দিলে।'

—'ভাল।' বলে খাতাঞ্চিমশায় ডান হাত থেকে হুঁকো বাঁ হাত ধরে বললেন—'থেমো না, বলে যাও।'

গুড়ুক চলেছে ভুড়ুক ভুড়ুক। খুদিরাম বলে চলেছে—'মোরগ বলছে—

কুড়ুক কুক্কুটি! রউদ উঠি উঠি,
পিঁয়াজ গুটি গুটি, মিরিচ বুটি।
লাবক ছুটিরে কী দিলি নাস্তা,
বাদাম না পেস্তা—না ফুটি।'

খাতাঞ্চিমশায় বললেন—'তারপরে বলে যাও।'

—'ফর্শা পাখিটা মশায় গান গাইছে যে!'

—'গেয়ে বল কী বলে।'

খুদিরাম গজল ধরল ভয়ে ভয়ে—

॥ গজল ॥

'শুন্। গুল্‌মুর্গা ফুল বনের বন মোরগ,
ফজিরে উঠি, খেলাই রুটি, পালক মুঠি চুজারে রোজ্-ব-রোজ,—
না খেয়ে এক বুঁদ কি বুটি—খোদ্ ॥'

বাচ্চাগুলো ডেকে বলছে —'মিচি মিচি।'
—'চোপ্!' হাঁকলো মোরগ।
এবার সুর্মা মুরগিটা ছড়া কাটছে মশায়—

॥ আর্‌জি ॥

'ঝুমকা লতার সুর্মা বান্দির আর্জি হুজুর
ফজিরে উঠি তদ্‌বিরে ছুটি
বিচুটি বন হতে অনেক দূর।
পোকা পাকাটি যা পাই খুঁটি
চুজারে খাওয়াই, চিংগানে খাওয়াই
গোবরের গাদায় চড়াই—
কাম কাজে বাঁদির নাই কসুর।
বেলাতক পড়ে না পেটে একবুদ্ চানাচুর ॥'

মোরগ ঝোঁট তুলে বলছে—
'চাঁটগাঁই চিংগান
নাস্তা না পেয়ে হয়রান
খুঁড়চেন রাস্তা।
গন্ধুম না পেয়ে ধুম লাগাচ্ছেন
গুচ্ছার ধুল্ উড়াচ্ছেন
গুস্‌সায় চিল্লাচ্ছেন
হয়ে বেব্‌ভুল অবস্থা ॥'

গুল্ মুরগি বলছে—

'হুজুর কইছেন না সাচ্ বাত

পেট মোচড়াচ্ছে পিলে কেঁপে একটা সুঠোম হাত ॥'

খাতাঞ্চিমশায়ের গলায় ধুঁয়ো গিয়ে কাশি শুরু হল —খক্ খক্। তিনিও যত কাশেন মোরগ মুরগিরা তত ডাকে —'কক্ কক্ কক্ ক—ক্ —তফাৎ, তফাৎ!'

বিষম লেগে হেঁচে কেসে খাতাঞ্চিমশায় মিনিটখানেক পরে ঠাণ্ডা হয়ে বললেন —'ব্যাপারটা কী হল হে বিশ্বেস?'

—'একটা লড়ালড়ি হয়ে গেল কুঁকড়ো কুঁকড়িতে।'

—'সে-কথায় কাজ নেই, কী বলাবলি করলে সকলে তাই বল।'

খুদিরাম বললে —'মোরগ নয় তো, দেখলাম যেন একটা রং-বেরং গোলাপ গ্যাঁদার ঝাঁকা নেচে বেড়াচ্ছে মশায়।'

—'আহে, কী বলছে তাই কও না!'

—'উদ্রু বলছে মশয় —মানে বুঝছিনে!'

—'মানে করে কাজ নেই, আউড়ে যাও যেমন শুনছ কানে।'

—'মোরগ বলছে—

নাস্তা খিলাও পান্তা পিলাও জলদি

তোড়েঙ্গে হাড্ডি ফাড়েঙ্গে ফরুগল্ ॥'

মুরগি কটা বলছে—

'জেরা রহম কীজিয়ে,

বাজারমে না মিলি তণ্ডুল না চাবল।

মোরগটা বাঁদিকটাকে লাথাচ্ছে আর ককাচ্ছে—

কিয়া সব বরবাদ —উয়ো ভলণ্ডু

—'মশায় বোঝা যাচ্ছে না, উদ্রুতে কী বলছে।'

—'আমি বুঝছি, তুমি আউড়ে চল না।'

—'ফরশা কুক্কুটি ভরসা ধরে মোরগের কাছে ঘেঁষে বলছে—

বাখুবি-কদম-বুসি, জেরা কান ধর্‌-কর্‌
শুনিয়ে বাৎ আফিল্‌ মন্দ্‌।
ফিরা ইস্তাবিল্‌ গোখানা, মিলি নেহি
একদানা দেল্‌ পছন্দ্‌॥
ঢুঁড় ঢুঁড় কর্‌ চৌরাস্তা, ফির আয়া ইহাঁপর খোদাবন্দ্‌
মোদিখানেকো আঁস্তাকুড় পর, মিল্‌ গেলে এক দানা—
আজবতর মোতি কে সে রং,
চাঁখ্‌ চাট্‌কার দেখা—না মটর কলাই, না ভুট্টা না গম।
নয়া চিজ্‌ একদম্‌।
লিজিয়ে সাহাব, দেখিয়ে ক্যা চিজ্‌, চাহে তো আপ খাইয়ে,
নেহি তো বাচ্চোঁকে খিলাইয়ে
হস্‌ লিয়ে মার ম্যয় খায়া বেদম্‌॥'

—'মোরগটা খেয়ে ফেললে নাকি দানাটা?'

—'কে জানে মশায়, দুচার বার ঠোঁট খুললে বন্ধ করলে। তারপর ছুট সবাই মিলে একদিকে —ককর কোঁ শব্দ দিয়ে।'

'আরে ওইটের মানে কী তাই বল না।'

—'আমি কি উদ্‌রু জানি যে বলব! শব্দটা হল যেন—কঁকর কোঁ, হয়ত ঘানিঘরে তিল খেতে যাবার ইশারা করলে।'

—'তোমার যেমন বিদ্যে।' বলেই খাতাঞ্চিমশায় যেখান মোরগ ছিল—খুদিরামের হাত ধরে খালি পায়ে সেইখানে সেই মুচিবাড়ির বিচুটি ঝাড়ের কাছে এসে উপস্থিত।

—'দ্যাখো তো কিছু হাতে ঠেকে কি না বিচুটিঝাড়ে হাত প্রবেশ করিয়ে!'

—'চুলকোবে যে হাত!'

—'ওহে ডান হাত চুলকোনো মানে লক্ষ্মীলাভ!'

খুদিরামকে বিচুটি হাতড়াতে দিয়ে খাতাঞ্চিমশায় শ্যেন দৃষ্টি নিয়ে রাস্তার ধুলোয় মোরগের পায়ের দাগগুলোর উপর নিজের পা বুলোতে থাকলেন।

হঠাৎ চোখে ঠেকল সাদা একটি দানা —টপ্ করে সেটি তুলে অমনি ট্যাঁকে গোঁজা।

—'পেলে কিছু হে বিশ্বেস ?'

খুদিরাম বিচুটি-বন থেকে একটা বাঁওয়া ডিম টেনে বার করলে।

খাতাঞ্চিমশায় বললেন —'খুদিরাম, দেখলে হে, বিদ্যের ফল হাতে-হাতে পেলে।'

—'আপনার নেজনজর আছে বলেই এটা পেলেম।—কিন্তু শেষ কথাটি কী বলে গেল মোরগটা তাই ভাবছি।'

—'ভাব দেখি খুদিরাম।'

—'আমার সহজ বুদ্ধিতে তো বোধ হয়, কঁকর কোঁ বলে মোরগটা বললে —দানটা কিছু নয়, কাঁকর ছোঃ।'

খাতাঞ্চিমশায় চমকে —'তা তো হতে পারে, কথাটা উর্দু ও নয়, বাংলাও নয়, সমস্কৃত কঙ্করের অপভ্রংশ মতো শোনাচ্ছে।'—বলে গোল পদার্থটা ট্যাঁক থেকে বার করে খুদিরামকে বললেন —'এটা কি কাঁকর ? গোল যেন গজমোতির মতো বোধ হচ্ছে না ?'

খুদিরাম পদার্থটা উল্‌টেপাল্‌টে দেখে বললে —'কাঁকর হলে তো করকর করত।'

—'মা জগদম্বা, তোমার ছিষ্টিতে কত দ্রব্যই আছে।' বলে খাতাঞ্চিমশায় পদার্থটা ট্যাঁকে গুঁজতে যান —খুদিরাম বললে— 'একবার মুচি মিঞাকে দেখালে হয় না ?'

—'দেখাও।' বলে খাতাঞ্চিমশায় পদার্থটা সাবধানে মুঠোছাড়া করলেন।

মুচির হাতে সেটা পড়তেই সে বললে—'গবস্তির কাঁচা ফল— প্রায় পাকে না, তেলে পাকে শুনেছি। ভারি দামি চিজ !'—

—'মা জগদম্বার কৃপা।' বলেই খাতাঞ্চিমশায় ফলটিকে নিয়ে চোঁচা মুদিখানা-মুখো। খুদিরাম বিচুটির জ্বালা সইতে সইতে পাছে-পাছে মুদিখানায় এসে দেখে, খাতাঞ্চিমশায় মুদির হিসেব চুকোচ্ছেন।

সামনে একশিশি তেল —তাতে গবস্তি ফলটি ডুবে আছে।

খুদ্দুর বস্তির পানা-পুকুরে কৌতুক ধোপা কাপড় ধুচ্ছে— খোদকস্তা খোদকস্তা খোদ খোদ পাইকস্তা। গমের বস্তাকে বালিশ করে খুদিরাম দিবানিদ্রা দিচ্ছে আর স্বপন দেখছে তার হাতের পাঁচ কেবলি হয়ে যাচ্ছে ভেস্তা। লঙ্কাকাণ্ড শেষ করে আন্দো মুদি বেলা আড়াই পহর গতে গজকচ্ছপের যুদ্ধুর কথায় খড়কি গুঁজে কস্তা হাতে ঝাঁটাচ্ছে দোকানপাট, এমন সময় গজের মুখে বোড়েটি ঠেলে সংক্রান্তি ঠাকুর হাঁকলেন—'মাৎ!' এমো তক্তার পাটাতনখানা শব্দ দিলে, মচাৎ!

খাতাঞ্চিমশায়—'উস্ গরম! তুমি বোধ করছ কেমন?' বলে তালপাতার পাখাখানা দিয়ে নিজের পিঠ চুলকোতে থাকলেন।

হুঁকোটি খাতাঞ্চিমশায়কে এগিয়ে দিয়ে ঠাকুর বললেন—'আর বোধাবোধ, দেনা-পাওনা জীবন দিয়ে শোধ করার রকম।'

খাতাঞ্চিমশায় খালি ধুমা ছেড়ে বাঘা গোঁফ নিয়ে গজের দিকে কট্মট্ করে চেয়ে একটা হুঙ্কার দিলেন—'হুম্!'

সংক্রান্তি ঠাকুর বললেন—'আর দাদা দেখ কী, মাৎ একদম!'

—'তোমার যদেব দেহ তদেব বচন', বলেই খাতাঞ্চিমশায় নৌকো চেলে ঠাকুরের বোড়েটি ছকের 'পর থেকে চেটে তুলে নিয়ে হাঁকলেন—'খুদিরাম—'

সংক্রান্তি ঠাকুর নিজের হুঁকোটার খালি বৈঠকে হাত বুলিয়ে বললেন—'একটা কাজের কথা কইতেছেলাম—উদ্ভুট্টি চরের পঞ্চম অংশের দুই অংশ—'

—'সে বিষয়ে তো মুন্সেফ কোর্টে যবনিকাপাত হয়ে গেছে চুকিয়ে দিয়ে পঞ্চম অঙ্ক।'

সংক্রান্তি ঠাকুর মরিয়া হয়ে বললেন—'তামাশা নয় খাতাঞ্চি-মশায়, আমি ব্রাহ্মণ পুরিৎ, পঞ্চম অংশের দুই অংশ ঠাকুরের প্রাপ্য আছে বেদের বিহিত।'

খাতাঞ্চিমশায় বললেন —'তা তো বুঝলেম। কী হিত বিহিত মামলা করার আগে ভাবা ছিল উচিত।'

সংক্রান্তি ঠাকুর নরম হয়ে বললেন —'দোহাই, অনুচিত না করেন এমন।'

—'এখন ঘরে যাও, পূর্বসুখ করগা স্মরণ।' বলেই খাতাঞ্চিমশায় ডাক দিলেন—'খুদিরাম এলে?'

খুদিরাম পাশের ঘর থেকে সাড়া দিলে —'আজ্ঞা এলেম।'

সংক্রান্তি ঠাকুর নিশ্বাস ফেলে মুদিখানা ছাড়লেন —'মাগো দীনতারিণী তোমারই ইস্‌চে' —এই কথাটা যেন আউড়ে, খুলেই বন্ধ হল দোকানের ঝাঁপখানা।

খুদিরাম বিশ্বাস দেখা দিলেন, একটা শালপাতার ঠোঙা, এক গেলাস জল হাতে, মাথার একদিকের চুল গমের ভুষিতে সাদা।

খাতাঞ্চিমশায় ঠোঙাটা আর গেলাসটা খুদিরামের হাত থেকে নিয়ে বললেন —'যাও মাথাটা ঝেড়ে হাতে মুখে একটু জল দিয়ে এস, কাজের কথা আছে।'

খুদিরাম মাথা ঝাড়তে যায়, খাতাঞ্চিমশায় বলে উঠলেন —'না না এখানে নয়, খাবারে ভুষি পড়বে।' খুদিরাম তফাতে আড়ালে গিয়ে ভিজে গামছায় হাতমুখ মুছে দুখান চিতি সুপুরি গালে ফেলে, ফিরে এসে দেখে খাতাঞ্চিমশায় জলখাবারগুলি শেষ করে চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছেন। খুদিরাম ঠোঙাটা গেলাসটা সরাতে যায় —খাতাঞ্চিমশায় বললেন —'গেলাসটা থাক, ঠোঙাটা ঐ গরুটাকে দিতে হবে রাখো, বোস। কথা আছে' —বলেই স্তব্ধ কিছুক্ষণ।

খুদিরাম দেখলে বাইরে বাঁশের খোঁটায় বাঁধা হারান গরু আর তারই পিঠে একটা ধোড়াকাকের দিকে চেয়ে আছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খাতাঞ্চিমশায়। সেই সময় কাকটা ভাঙা গলায় আওয়াজ দিলে — 'কা!' গরুটা গলা খাঁকানি দিয়ে তার জবাব দিলে।

খাতাঞ্চিমশায় বাঁ হাতে নিজের গোঁফজোড়ার জল মুছে বললেন

—'আচ্ছা খুদিরাম, ঐ ধোড়াকাকটাতে খোঁড়া গরুটাতে কী কথা বলাবলি করছিল এতক্ষণ শুনেচ ?'

—'আজ্ঞা হাঁ শুনেচি।'

—'আচ্ছা, বলে চল নির্ভয়ে।'

খুদিরাম বলে চলল —'কাকটা বললে —কা কা, গবস্তি বস্তিতে সুখটা কী ? গরু জবাব করলে —ক্যান এহ্যানে সবই সুখ ; নাস্তি কী ? এঁটো শালপাতা আছে, তাতে খেঁসারি ডালের সোয়াদ আছে, ভাতের ফেনটা আছে, আর আছে নাগালের কাছে খোড়ো চালে বিচিলি —নাই বা কী ?'

খাতাঞ্চিমশায় ঝপ্ করে শালপাতার ঠোঙাটা গরুর মুখের কাছে ফেলে দিয়ে, গেলাসের জলে আঙুলের ডগাপাঁচটি ধুয়ে বললেন— 'শোনো তো খুদিরাম এবারে কী বলাবলি হয়!'—বলেই অর্ধনিমীলিত-নেত্র খাতাঞ্চিমশায় তাকিয়া ঠেসান।

খুদিরাম বললে—'বলা-কওয়া নেই খালি ঠোঙাটা নিয়ে পালাবার চেষ্টা কাকটার। গরুটা সেটা টেনে নিয়ে চিবিয়ে বললে —'

—'বলে ফেল কী বললে—'

—'আজ্ঞে কথা তো কইচে না, মচর-মচর পাতা চিবোয় আর ন্যাজ দুলোয়—'

—'তারপর ?'

খুদিরাম বললে —'তারপরে "মা" বলে খোঁটার গায়ে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল গরুটা। কাকটা কানটাতে টান দিতে গরুটা মুখ ফিরিয়ে শিং নেড়ে পাল্টা শুলো পিঠের 'পরে ন্যাজটা ফেলে।'

—'কাকটা কী বললে খুদিরাম ?'

—'আজ্ঞা কাকটা গরুর ন্যাজটাতে টান দিয়ে —আকা আকা শব্দ করে উড়ান দিলে,—এখনো যাচ্ছে দেখেন।'

খাতাঞ্চিমশায় চাঙা হয়ে উঠে বললেন —'কই কই, কোন্ দিকে কবার ?'

খুদিরাম অবাক। খুদিরামকে ধমক দিয়ে খাতাঞ্চিমশায়

বললেন —'আহা, কোন্ দিকে কী বলে ডাকলে কাকটা কবার তাই বল না!'

—'আজ্ঞে গরুটার পাছের দিকে দুবার ডাকলে —আকা আকা, তারপরেই লম্বা —এখনো উড়ে চলেছে দেখেন।'

খাতাঞ্চিমশায় কাকের দিকে না দেখে, ঝাঁপের বাইরে আকাশে চোখ বুলিয়ে বললেন —'দ্বাবিংশতি দণ্ড হবে, গরুর ন্যাজটা কোন্ দিকে আছে দেখ তো বিশ্বেস।'

খুদিরাম মাথা চুলকে বলল —'আজ্ঞে ঠিক বলতে পারলাম না, এই আমি এদিকে আপনি ওদিকে এইভাবে ন্যাজটা আর কাকটা ছিল।'

—'অ্যাঃ তোমার দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হল না এখনো! নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট না হলে সর্বে আমিনি তো চলবে না তোমার দ্বারা।'

খুদিরাম মরিয়া হয়ে কপাল ঠুকে বললেন —'আজ্ঞে যাবার বেলা কাকটা বলেছিল —ইষ্ট ইষ্ট।'

—'তাই বল,' বলে খাতাঞ্চিমশায় আওড়ালেন —'দ্বাবিংশতি দণ্ডে পুবেতে কাক রটে আকা আকা —আপ্ত কলহে জয়লাভ বাপা।'

এই বলে খাতাঞ্চিমশায় কিছুকালের জন্য ধ্যানস্থ। খুদিরাম দেখছে, ঝাঁটা গোঁফ আর চওড়া ভুরুতে মিলে উপর-নিচে, এপাশ-ওপাশ যেন টাগোয়ার খেলছে। এমন সময় একটা চির্‌র্ শব্দ আকাশে।

—'ওটা কী পাখি ডাকলে খুদিরাম, চিল নাকি?'

—'আজ্ঞে না পাঠশালার ছেলেরা চেংঘুড়ি উড়িয়েছে।'

—'পাঠশালার গুরু কে হল?'

—'আজ্ঞে এখনো ডিস্টিক্‌বোর্ট, ছেঙ্‌সন্ করেনি, সংক্রান্তি ঠাকুরই পড়াচ্ছেন।'

খাতাঞ্চিমশায়ের চশমা ভ্রূকুটি বেয়ে নেমে বসল তাঁর নাকের দাঁড়ে—ডানা-মেলানো যেন একটা পতঙ্গ-বিশেষ। তারপর বাক্স খুলে একফর্দ সাদা কাগজ টেনে বার করে খুদিরামকে বললেন—

'খুদিরাম, তোমাকে ঐ পাঠশালার গুরুগিরির জন্যে দরখাস্ত লেখা চাই। নাও কাগজ কলম।'

খুদিরাম আপত্তি তুললে —'আজ্ঞে ব্রাহ্মণের অন্ন—'

—'বিদ্যে নিয়ে বিচার, জাত নিয়ে বিচার এখানে নয়। তোমার পেটে বিদ্যে আছে —নাও লেখ।' বলেই খাতাঞ্চিমশায় বলে চললেন ইংরিজিতে গড়গড় —'ডিরেকটার পাবলিক ইন্‌টক্‌সান ইত্যাদি বরাহবরেষু।' লেখাটা বার হতে থাকল খুদিরামের কলমে ঐ ভাবে বাংলাতে চর্চড়।

দরখাস্ত শেষ হলে খাতাঞ্চিমশায় সেটা বাক্‌সে বন্ধ করে খুদিরামকে বললেন —'একটা নৌকো ঠিক রাখা চাই, উদ্‌ভুট্টি চরে ভোরেই খোঁটাগাড়ি করতে যাব।' বলেই বৈকালিক নিদ্রার আবেশে চক্ষু বুজোলেন খাতাঞ্চিমশায়। খুদিরামও ছুটি পেলে সেদিনের মতো।

* * *

উদ্‌ভুট্টির চরটায় শিল আর বৃষ্টি, ঝিল্‌লি ফুকরায়—একী অনাসৃষ্টি! দাঁড়কাক ডানা ভারি, খাড়া ভেজে ভাঙা ডালে। বাঁশপাতার শীত পায় বস্তির একধারে। কাদাখোঁচা কাদা জলে চলে পা চিপ্‌টি চিপ্‌টি। খুদিরাম নৌকোর ছাতে চু-পুরু চটের ওয়াটারপ্রুফ মুড়ি দিয়ে—খাতাঞ্চিমশায় নৌকোর মধ্যে ছিটের বালাপোষে অদৃশ্যপ্রায়।

খাতাঞ্চিমশায় বলছেন ছইয়ের ভিতর থেকে, খুদিরাম জবাব, দিচ্ছে ছইখানার উপর থেকে।

—'খুদিরাম!'

—'আজ্ঞে!'

—'কোন্ দিকে হাওয়া বইছে?'

—'আজ্ঞে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।'

—'কিনারায় ধরাও নৌকো, দিকনির্ণয় করা আবশ্যক।'

—'আজ্ঞে চতুর্দিকে জল, থল তো দৃষ্টিগোচর হয় না, নৌকো ধরাই কোথা?'

ছইয়ের মধ্যে থেকে ভারি গলায় হুকুম এল —'থলে আবার লঙ্গর ফেলায় কে ? জলে ফেলাও।'

ছইয়ের উপরে গুজ-গুজ চলল খানিক—'ও চাচা মাঝ-দরিয়ায় লঙ্গর করতে বলে, কী উপায় ?'

—'আহে দড়া বাধি একখানা তক্তা তো জলে ফেলাও, বুঝি জলের গতি, ত্যাহাই যাক কী হয়।'

ঝপাং করে দড়া-বাঁধা তক্তা জলে পড়ে, তিনবার ঘুরপাক খেয়ে কাঁটা-গাঁথা কুমিরের মতো মারলে ডুব। দড়াতে কড়-কড় টান পড়ল, তারপর নৌকো দেড় পাক ঘুরে তিন হাত আগে একটা জলে-ডোবা বাবলা ঝাড়ে চড়ে বসল। খাতাঞ্চিমশায় পিঠের দিক থেকে একটা ধাক্কা খেয়ে আবার সোজা হয়ে বসে বললেন— 'ধরল কিসে ?'

এবারে মাঝি বললে—'আজ্ঞে ইসে !'

নৌকো স্থির হতে খাতাঞ্চিমশায় ছইয়ের মধ্যে থেকে কাছিমের মতো মুখ বার করে বললেন চারিদিক থেকে —'খুদিরাম, এ যে গাছে চড়িয়ে দিলে। তলার জল নেমে গেলে যে পপাত হব —ডানা তো নাই কাকপক্ষীর মতো।'

করিম মাঝি সাহস দিয়ে বললে —'ডালি বেয়ে নেমে পড়বেন কর্তা।'

খাতাঞ্চিমশায় করিমকে শুধোলেন —'এভাবে ঝুলে থাকতে হবে কতক্ষণ ?'

—'বড়োজোর আজ রাতটা। কাল খোঁটাগাড়ি করতে চরে উৎরোবেন।'

—'আর উৎরে কাজ নেই, সাঁৎরে না ঘরে যেতে হয়!' বলেই ডাকলেন —'খুদিরাম !'

খুদিরাম একটা লণ্ঠন হাতে ছইয়ের মধ্যে ঢুকতেই খাতাঞ্চিমশায় বললেন —'খুদিরাম, কপালটা যেন গরম গরম বোধ করছি — দেখ তো !'

—'তাই তো, এ যে স্পষ্ট জ্বর!'

—'দাও তো একটু গরম চা।'

খাতাঞ্চিমশায় চা খেয়ে একটু সুস্থ হলে খুদিরাম বললে —'এ স্থান ভাল নয়; এখানে গোর আছে শুনেছি। আর খোঁটাগাড়িতে কাজ নেই এ শ্মশানে! সংক্রান্তি ঠাকুর বলেছিলেন, এখানে তাঁর পূর্ব-পুরুষের কে দণ্ডি হয়েছিল —তারই সমাধি আছে।'

ভূতের ভয়ে খাতাঞ্চি টলে না। 'তোমার মতো বালক তো দেখিনি!' বলে খাতাঞ্চি বাইরে এসে মাঝিকে বললেন —'দাও একটা বাঁশ, দেখি কত জল?' বলেই একটা লগা নিয়ে জলের মধ্যে সাজোরে গেঁথে দিলেন। বাঁশ টেনে তোলে কার সাধ্য! খোঁচা পেয়ে একটা কাৎলা মাছ ডিগবাজি খেয়ে নৌকোয় পড়ল।

খুদিরাম মাছটা চেপে ধরলে।

করিম একগাল হেসে বললে —'কর্তা যা খোঁটাগাড়ি করেছেন নড়ায় কার সাধ্য, একটা ফেলাগ হলে হত।'

খাতাঞ্চিমশায় খুদিরামের লাল গামছা বেঁধে দিয়ে বললেন — 'খুদিরাম উদ্‌ভুট্টি চরে তোমাকে আমি নায়েব করলুম। কাল হুকুম লিখে দেব —'

কাল যখন এল তখন খুদিরাম —কালাজ্বরে অঘোর খাতাঞ্চি-মশায়কে নিয়ে তুপুলিয়ার কাছারিবাড়ির ঘাটে নৌকো লাগাল।

ভবের হাটে হেতি হোতি

প্রজাপতি সৃষ্টির গোঁসাই,
সৃজন করলেন দুটি ভাই।
হেতি হোতি গোল গাল,
একটি কালো একটি লাল॥

সৃষ্টির প্রথম দিনে পৃথিবীতে জীবের খাদ্য কিছু ছিল না। তারা পরস্পরকে ধরে খেতে শুরু করেছিল। হেতি হোতি দুই ভাইও যখন ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে 'কঃক্ষাম—কিংখাম—ক্ষুৎখাম' বলে চিৎকার করতে করতে এ-ওকে খেয়ে ফেলবার উপক্রম করেছে, সেই সময় জগৎ গোঁসাই এসে তাদের হুকুম দিলেন—'তোমরা ভবের হাটে ঘোল খেতে যাও।'

জগৎ গোঁসাইয়ের হুকুম-মতো হেতি হোতি ভবের হাটে ঘোল খেতে রামায়ণের তিনশো বত্রিশ পাতা ছেড়ে বার হল যেন দুটি গুটিপোকা!

ক্ষুধাতে আকুল তনু ঘন বহে শ্বাস।
চলেছে ভবের হাটে ঘোল খেতে আশ॥

তেপান্তরের মাঠে ওৎ পেতেছে রোদ। চলেছে তো চলেইছে দুটি রাখাল—হেতি হোতি অবোধ। রাতে শীত দিনে গ্রিষ্মি করায় বোধ অলজ্যাচরের খর বাতাস।

সেই অলজ্যাচরের কথা কিবা জানাই,
যোজনের পর যোজন চাই,
নীর-ক্ষীর দেখা নাই
বাড়ি নাই ঘর নাই তথা মানুষ-মুনিষ
সে চরের ফেরে পড়লে পরে হারাই হদিশ!

পুরব পশ্চিম কোথা বা যাই,
উত্তর দক্ষিণ চেনারও জো নাই!

চলছে তো চলেইছে হেতি হোতি দুই রাখাল পাঁচনি হাতে চরের পর দে—চলতে চলতে ভুলে গেছে তারা—কোথা থেকে এসেছে, কোথায় বা ছিল—তিনশো বত্রিশখানি পাতা চাপা লাল কালো দুটি জীব্-জীব্ পোকা যেন! শুধু মনে আছে ভবের হাটে ঘোল খেতে চলেছে।

তখন রোদ সরে-সরে, আবার দেখা যায় ওপার-চরে। এমন সময় ত্রিসত্য বাবাজী দেখা দিলেন। এক হাতে লাঠি, এক হাতে লণ্ঠন, আগে আগে ত্রেতাযুগের তে-রঙা একটি গাভী, তার ট্যারা-ব্যাঁকা শিং, ট্যারচা দুটো চোখ, চ্যাপটা কপালে আর-একটা চোখের মতো টিপ। গাভীটার তিনটে পা ভাল, একটা পা খোঁড়া; টঙস্ টঙস্ করে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আসছে, তিন পা চলছে আবার এক পা দাঁড়িয়ে হাঁপ নিচ্ছে।

ত্রিসত্য বাবাজী হেতি হোতিকে দেখে বললেন—'বাপধনেরা, ঘুরতে-ফিরতে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

হেতি হোতি বললে—'যেতেচি ঘোল খেতে ভবের হাটে, পথ তো দেখতেছি অফুর! ভবের হাটে কে জানে কদ্দুর!'

ত্রিসত্য বাবাজী বললেন—'ভবের হাট তো আর একটুখানি নয়, কত কাগার হাট, বগার হাট, বাগের হাট, মগরা হাট, মুরগি হাট, চিংড়ি হাট, মেছো হাট-এমনি হাট—বেহাট নিয়ে বিরাট একটি ব্যাপারকে কয়—ভবের হাট! শুধাও এই গাভীটারে যদি বিশ্বাস না হয়। আমার এই গরুটি তোমাদের দিলেম। এর সঙ্গে সঙ্গে চলে যাও চক্ষু বুজে। ভাবের হাটে কোন্ দিকে কী এই গরু সব চেনে।'

—'সইত্য—সইত্য—সইত্য, ভবের হাটে সইত্য পথ দেখাবার এই গরুই হলেন গুরু অদ্বৈত'—বলেই ত্রিসত্য বাবাজী গায়েব।

রোদটা এতক্ষণ মাঠে ওৎ পেতে বসে ছিল, চট্ করে বাবাজীকে

গিলে সট্ সরে গেল। ত্রিসত্য বাবাজী সত্য না অসত্য কিছুই বুঝতে দিলে না।

তিনবার হাম্বারব দিয়ে ত্রিসত্য বাবাজীর তে-রঙা গাভীটি মাঠে মাঠে ঘাস খেতে খেতে আগালে। পায় পায় যেদিক যায় গাভী, সেদিকে যায় হেতি হোতি ঘুঁটে কুড়ুতে কুড়ুতে। গরু তিন পা চলে এক পা দাঁড়ায়। হেতি হোতিও দাঁড়িয়ে দেখে, গরু মাটির কাছে মুখটি নামাচ্ছে আর মাটি ফুঁড়ে ঘাস উঠে আসছে তার মুখে। এই না দেখে হেতি বলে হোতিকে —'আয় না ভাই, আমরাও অমনি করে ঘাস খাই।'

কিন্তু মাটিতে মুখ ঠেকাতেই খুদি পিঁপড়ে দেয় নাকে কামড়। ঘাস খাওয়া আর হয় না দুজনার। নাকে আসে ভিজে মাটির ভুরভুরে গন্ধ, মুখে কিন্তু কিছুই আসে না। মাঠের পারে ছোটো নদীটি হেতি হোতির এই ঘাস খাওয়া দেখে খিল্ খিল্ করে হেসে গড়িয়ে পড়ে বললে —'তোরা কি গরু যে ঘাস খাবি? আয় আমার কাছে, জল খাবি আয়।'

গরু আগে নামে জলে। মুখ নামিয়ে জলের মধ্যে জল খায় চক্-চক্ করে। তারপর ঘাসে জলে একপেট ভর্তি হলে বলে —'বাঃ!'

হেতি হোতি গরুর দেখাদেখি তেমনি করে জলের ভিতর মুখ ডুবিয়ে জল খেতে যায়, নাকে মুখে ঢুকে পড়ে জল কলকল করে। হেঁচে কেসে উঠে পড়ে হেতি হোতি ডাঙায়। হেতি বলে হোতিকে —'দুত্তোর, আমরা কি গরু যে জল খাব?'

হোতি বলে —'ঐ দ্যাখো কাদাখোঁচা —কেমন মজা করে কাদা খুঁচে খাচ্ছে। ওরও দু-পা, আমাদেরও দু-পা।' এই বলে দু-জনে দু-থাবা কাদা তুলে নিয়ে মুখে ভরে দিলে। কাদার সঙ্গে দু-দশ কুড়ি ঘুসো চিংড়ি চলে গেল তাদের পেটে। গরু তেরচা চোখে হেতি হোতির দিকে চয়ে বললে —'এরে বলে চিংড়িহাটার ঘোল। রাতের মতো পেট ভরে খেয়ে নাও।' এই বলে চক্ষু বুঁজে ঘুমোয় আর ল্যাজ নাড়ে গরু।

হেতি হোতি পেট ভরে কাদা চিংড়ি খেয়ে গলা ছাড়লে রাখালী সুরে জলের ধারে বসে—

'জন্মালাম যদি হলাম না কেন গরু
আমরা দুটি ভাই হেতি হোতি
চব্-চব্ ঘাস খেতাম ঢক্-ঢক্ জল খেতাম চরতি-চরতি !
সুখে রইতাম ঘাসে জলে ভর্তি !
তা না ঝকমারির বেগার ধরতি—
হলাম রাখাল, পেটটি বড়ো, বুদ্ধি মোটা অতি,
হাত পা সরু সরু, ও ভাই গরু, আমরা হেতি হোতি।'

জগৎ গোঁসাইয়ের ছোটো ভাই জীবন গোঁসাই কুম্ভক করে বসে ছিলেন জলের মধ্যে। হেতি হোতির বিকট গলার গান শুনে জল ছেড়ে উঠে এলেন —ঠিক যেন বিরাট-কলেবর ডিমওয়ালা এক তপসি মাছ! সর্বাঙ্গ তেলে জলে পিছল। লালচে কটা রঙের একঝুড়ি দাড়ি গোঁফ। থেকে থেকে তিনি খাবি খান আর নাচেন গান—

'জীব-মীনের এবার জীবন গেল
বুঝি কাল বুঝে কাল ধীবর অ্যালো !
জীবনের জীবন নিতে
টানা জাল, কুঁড়ো জাল আর বেড়া জালে—
বুঝি প্রাণ রাঘব-বোয়ালে ঘেরে ফ্যালো !
গভীর জলের তপসি মাছ, খেয়ে বঁড়শি খ্যাচ্
জল ছেড়ে জমির 'পরে পট্‌কান খ্যালো !
আশা টোপ গিলে বাতাসে, তিনটা ডিগবাজি দ্যালো।
আর তিনটা খ্যাবি খ্যালো।'—

হঠাৎ হেতি হোতিকে জলের ধারে বসে থাকতে দেখে ধীবর মনে করে জীবন গোঁসাই আড়াই পাক ঘুরে ডিগবাজি খেয়ে কোমর জলে

লাফিয়ে পড়ে হেতি হোতির দিকে চেয়ে আবার গীত গাইতে শুরু করলেন—

'কত কুদ্‌রৎ জানোরে কর্তা কত কুদ্‌রৎ জানো
গভীর জলে ফেইল্যা জাল ডাঙায় বৈসে টানো।
তোমার ছিপের আগায় বঁড়শি, সুতায় বাঁধা ফত্তা
মাছের হাটটা কোথায় জানো—জীব-জগৎ কর্তা !'

গানের শেষে বললেন—'চতুরানন প্রজাপতিকে শত-শত প্রণিপাত। কে বাবা তোমরা দুটি, কোন্ কাজে জলের ধারে কাটাতে বসলে রাত ?'

—'আজ্ঞে আমরা হেতি হোতি, ভবের হাটে ঘোল খেতে চলেছি সম্প্রতি।'

জীবন গোঁসাই বললেন—'বেশ, নজর রেখো দেহের পুষ্টির প্রতি। জীব-জীবন রক্ষার তরেই জন্ম যখন, তখন নাও এই ঘোল খাবার খুদে ঘটিটি। বুঝেছি তোমরা ভবের হাটে যেতেছ, কিন্তু সে তো সহজে হচ্ছে না। এর জন্য জগমুনশির ছাড় পত্র চাই দুখানি।'

হেতি হোতি বললে—'তিনি কোন্‌দিকে থাকেন ?'

—'জগমোহনের কাছারিতে গেলেই তাঁকে পাবে। এই জলের ধার দিয়ে চলে যাও সিধে।' বলে জীবন গোঁসাই মাছের আঁশে লেখা একটুকরো চিঠি মুনশির নামে হেতি হোতিকে দিয়ে ঝম্পটি ঝপাং করে জলের মধ্যে হলেন অদৃশ্য।

তিন পহর রাতে জগমুনশির কাছারির খোঁজে চলল হেতি হোতি খোঁড়া গরুটি তাড়িয়ে। আকাশে দেখা যাচ্ছে—

আঁধার 'পরে চাঁদের কলা, কতক কালো কতক ধলা
উত্তরে উঁচা—দক্ষিণে কাত মেঘ দু-খানা বিরাট ;
তারা কোন্ দেশ হতে আসছে কোন্ দেশে বা যাচ্ছে
কিছুই যায় না বলা।

যেতে যেতে যখন—

পোহায়ও বটে, পোহায় না রাত
হয়ও বটে হয় না প্রভাত,

সেই সময় দেখা গেল জগমোহনের কাছারি—

পোড়া বাঙলাটা—ওড়া ছাত উত্তরে উঁচা—দক্ষিণে কাত ;
বাগানে খালি শেয়াল-কাঁটা আর দেদার মানকচু পাত।

জগমুনশি একটি তুষকাঠের তেপায়ার 'পরে বসে ওয়াস্তির কলম বাড়ছেন, আর আপন মনেই গাইছেন—

'সংসার কোষের কীট,
সঙ্কটে দেখবে সম্মুখে এবার—
বিষয়-তুঁতের পাতে রসাস্বাদে গোলাকার
বাঁধলে ঘর সোনার স্থতার
ও সেই ঘরের ছুতায় বাঁধবে তোমায় কালের দূত
সে এক ঘটবে ব্যাপার কী অদ্ভুত !
রেশমের ব্যবসাদার !
এখন আছ বন্ধ কোশে মনের খোশে
না ভাবিছ শেষের ব্যাপার !
হায়রে তুন্দুরে রেখে যেদিন ভাপ দেবে—
সেদিন কী কষ্টে প্রাণ যাবে তোমার !
তাই বলি তোমায়—
কাটি কোষের স্থতা বাড়াও ত্বরায়,
ভালো যদি চাও আপনার।
নতুবা বিপদ ভারি, দেখ বিচারি—
ঘরই শত্রু হইল তোমার।'

এই সময় হেতি হোতির খোঁড়া গরু কাছারির হাতার মধ্যে ঢুকে কচুপাতা চিবুতে থাকল। জগমুনশি হাঁকলেন —'ও পানি-পাঁড়ে, কাছারির কচুগাছ খায়, গরুটাকে বাঁধো।'

হেতি হোতি বুঝলে জগমুনশির কাছারিতে এসেছি। হেতি হোতিকে দেখে জগমুনশি কানে কলমটা গুঁজে চাকুখানা বাগিয়ে বললেন —'ক্যে ?'

—'আজ্ঞে আমরা হেতি হোতি।'

মুনশি বললেন —'হেতি হোতি বলে কাউকে তো চিনি না বাপু! চিঠি এনেছ কী কারুর ?'

হেতি হোতি জীবন গোঁসাই-এর দেওয়া মাছের আঁশখানি জগমুনশির হাতে দিতেই মুনশি সেটার 'পরে একবার চোখ বুলিয়েই বললেন —'ভবের হাটে ঘোল খেতে যাবা ? ও পানি-পাঁড়ে, একখানা ছাড়পত্র লিখে ফ্যালাও তো। বস বাবাত্বটি, একটু দেরি হবে। গরুটা বেঁধে আসুক জলধর পাঁড়ে। ছাড়পত্র দিলেই তো হল না! আগে বয়নামা, তারপর ছোলেনামা, বকলম দস্তখৎ, পাঞ্জা মোহর পড়ল, তবে হল পাকা আঁচড়-দোরস্ত ছাড়পত্র। তোমরা তো রাখাল, যাও দেখি গাইটা ছুয়ে একটু দুগ্ধ আন তো? দেখি কেমন চতুর দুই ভাই! সকালে দুগ্ধ না হলে চলে না। হাতের লেখা বিগড়ে যায়।'

হেতি হোতির দিকে চায়। হোতি হেতির দিকে চায়। আর দুজনকে দুজনেই বলে —'দুগ্ধ!' জগমুনশি ওদের ভাবগতিকে বুঝলেন, দুগ্ধ কারে বলে ওরা জানে না।

ধমকে বললেন —'দুগ্ধ চেন না, কেমন রাখাল তোমরা ? গাভী দোহন করলেই দুগ্ধ পাওয়া যায় তা তো জান, না তা-ও জান না? গাভী দোহন কেমন করে করতে হয় তা—'

এমন সময় পানি-পাঁড়ে এসে হাজির হতেই জগমুনশি বলেন —'ও জলধর! এরা যে গো-দোহন কারে বলে জানে না, দুগ্ধ চেনে না, কত দুধে কত জল তার জ্ঞান নেই, অথচ ভবের হাটে ঘোল

খেতে যাবার ছাড়পত্র চায়! হঠাৎ ভবের হাটে গেলে তো মুশকিলে পড়বে! ঠকে যাবে, ঠেকে যাবে একদম!'

জলধর পাঁড়ে বললে—'এদের এখন ছাড়পত্র দেওয়া চলে না। আস্তিবুড়ির ওখানে কিছুদিন বেগার খেটে আসুক তবে ছাড়পত্র দেওয়া যাবে।'

হেতি হোতি কাতরভাবে বললে—'গরুটি ছেড়ে দিন, আমরা চলে যাই।'

জগমুনশি বললে—'যাই বলতে নেই, বল—আসি, আবার দেখা হবে।' বলেই জগমুনশি গুন-গুন সুরে গান ধরলেন—

'বিদায়, বিদায়, বিদায়-বেলা দায় দোষ সব মাপ,
দায়ে-আদায়ে দেখা হয় ভাল না-হয় ভাল সাফ!
খুশি হালে বেহাল তবিয়তে, বিদায় চাই পেতে হাত—
সুখে যেন যায় দিনরাত।'

পানি-পাঁড়ে জলধর বললে—'গরু দুধের ভারে তেজে চলতে পারবে না। চল, দুধটুকু দুয়ে নিতে শিখিয়ে দিই। দুধের ভার হালকা করে গরু নিয়ে চলে যাও—হেই সে আস্তবুড়ির খোঁয়াড়ে।'

জলধর পাঁড়ের কাছে দুধ দোয়া শিখে কতখানি দুধে কতখানি জল জেনে হেতি হোতি খালি পেটে হালকা গাইগরুটি নিয়ে বিদায় হল—আস্তিকালের বস্তিবুড়ির খোঁয়াড়ের দিকে। পথে যেতে যেতে তারা ধরলে দুটিতে একটি গীত—

'ওরে গইল-ছাড়া বইল, বিদেশ বিভুঁই বিজন নদী পার
চলমান বেগানা তুই, দীঘমান দিন করলি কাবার!
রাতের তারার চিন্ চিনেও যে চিনছ না
এবে গোঠে চল রে খাইবা খইল!'

তেরঙা গাভী শিং আর ল্যাজ নেড়ে জানালে—এমনি গোঠে যাব? সাত ঘাটে জল খাব, তবে গোঠে যাব!

কী আর করে —চলল হেতি হোতি ধীরে ধীরে চাঁদপাল ঘাট, তেলকল ঘাট, তক্তা ঘাট, আরমনি ঘাট, কুলপি ঘাট, কয়লা ঘাট, শেষ বাবু ঘাটে না জল খেয়ে গরু দিলে ছুট— গোধূলিতে।

মাঠ ময়দানে চিত্র-বিচিত্র পদচিহ্ন গোষ্পদ আর শ্রীপদে পদাকীর্ণ করে গিয়ে ঢুকল হেতি হোতি দুই রাখাল আস্থিবুড়ির খোঁয়াড়ে খোঁড়া গরু খুঁজতে। সেখানে দেখছে কি হোতি হোতি—

গরু রয়েছে বাথানে, ষাঁড় রয়েছে উঠানে।
দাওয়ায় শুয়ে বাঘ।
মাচানে শুয়ে বানর, আড়াতে পড়া টিয়ে,
মুড়াকে দাঁড়কাক।

খিড়কিতে মুর্গি, হাঁস, খড়ের চালিতে শালিক, ঘুঘু চরে সুপুরি বাগানে। এই বাগানের চারি পার্শ্বে ভীষণ অটব্য, মধ্যে মধ্যে পর্বতমালা ও অত পুরকালের স্রোতস্বিনী নদী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার দেখা যায়। স্থানটির মধ্যে রয়েছে এক ব্যাসকুণ্ড। এই কুণ্ডের যেদিক দিয়ে হোক না কেন মানুষ ঢিল ছুঁড়ে পার করতে পারে না। কুণ্ডের মধ্যস্থানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তেজ বেশি। সেই কুণ্ডের তিন ধারে বসে আস্থিবুড়ি, মাধ্যিবুড়ি আর অন্তিবুড়ি সুপুরি ফেলা-ফেলি খেলছিলেন এমন সময় দূর থেকে হেতি হোতিকে আসতে দেখেই 'মহেঞ্জদাড়ো মহেঞ্জদাড়ো' বলে তিন বুড়ি চিৎকার করতেই বিকটাকার এক দেড়ে ছাগল হেতি হোতিকে ঢুঁসিয়ে বিদায় করবে এমনি ভাব দেখিয়ে প্যাঁচালো শিং বাগিয়ে পায়ে পায়ে এগুতে থাকল। হেতি হোতি যত পিছোয়, তত আগায় ছাগল। শেষে বোকা ছাগলটা দুই পায়ে খাড়া হয়ে যেমন তেড়ে মারবে ঢুঁ অমনি হেতি ধরেছে তার শিংদুটো চেপে, হোতি ধরেছে মুঠিয়ে তার দাড়ি। আর যায় কোথায়! শিং ধরে এক মোচড় আর দাড়ি ধরে এক ঝাঁকানি দিতেই ছাগল ম্যা ম্যা বলে কেঁদে ফেললে —ম্যা অ্যাঁ —অম্যাঁ! বাঘটা দাওয়ায়

ঘুমিয়ে ছিল, ছাগলের ম্যা৺ানি শুনে গাঁ গাঁ করে লাফিয়ে ছাগলের ঘাড়ে পড়ে আর কি। আস্তিবুড়ি এক ধমক —ছাগল ছাড়া পাওয়া, হেতি হোতি কাঁচুমাচু, বাঘ ন্যাজ গুটিয়ে মিউ মিউ করতে করতে চম্পট। আস্তিবুড়ি ব্যাসকুণ্ডুর পাড়ে খেলায় গিয়ে বসলেন, স্থপুরি ফেলা-ফেলি চলল যেমন চলছিল।

—টুপ্-টাপ্ টিপ্-টুপ্! এক স্থপুরি টুপ্ দুই স্থপুরি টাপ্ তিন স্থপুরি টিপ্ টাপ্ টুপ্! এক টিপ্ এক টুপ্ দুই টিপ্ এক টাপ্, তিন টিপ্ এক টুপ্! আস্তিবুড়ি বললেন —'কার হার, কার জিত?' মাধ্যিবুড়ি বললেন —'কার জিত কার হার?' অন্তিবুড়ি বলে উঠলেন —'জিত যার হার তার, হার যার জিত তার।'

এখন তিন বুড়ি তুড়ি দিয়ে নাচে আর গায়—

'তাক্-তুড়া-তুড়্-তুড়া
ভাঙল খাটের খুরা
ছিঁড়ল তুলোর তোশক।
তিন বুড়ির দেখতে নাচন জুটল দুটো লোক।
তাদের নামদুটি কী?
একটি কালো একটি লাল
দেখতে ভালো গোল গোল
কাঁচা স্থপুরি!'

তাক্-তুড়া-তুড়-তুড়া শুনে এককুড়ি ছাগলছানা সঙ্গে ছাগলীর মা বুড়ি খাটুর-খুটুর করে এল। হেতি হোতির মুখের দিকে চেয়ে বললে —'ক্যে? তোরা ক্যে র‍্যে?'

হেতি হোতি বললে—

'আমরা হেতি হোতি দুই রাখাল
দুইটি প্রাণী হাবা গোবা

মোদের নাইকো পুকুর নাইকো ডোবা
গরুর সনে কাঁটা বনে
ঘুরি ফিরি নিশি দিবা।
ভবের হাটে ঘোল খেতে যাই
জ্ঞান গোচর নাই
কোথায় খানা কোথায় ডোবা।'

আন্তিবুড়ি শুনে বললেন —'ও মাধ্যি! কী করা যায় হেতি হোতিকে নিয়ে?'

মাধ্যি বললেন —'ও অন্তি! কী করা যায়? এদের জ্ঞান গোচর কিছু নেই!'

অন্তি বললেন —'প্রসিদ্ধ সর্বজ্ঞ জ্ঞানকুণ্ডু আছেন, তাঁর কাছে এদের ছুটিকে পাঠিয়ে দাও।'

ছাগলীর মা বুড়ি এককুড়ি ছাগলছানার মধ্যে থেকে একটি তিনরঙা ছাগল বেছে নিয়ে বললে —'এইটি নিয়ে যাও, জ্ঞানকুণ্ডুর গুরুদক্ষিণে। দেখ যদি এর বদলে সে জ্ঞানবুদ্ধির হাঁড়া থেকে কিছু দেয় ছুজনকে।'

হনুমান-ঝোরার ধারে জ্ঞানকুণ্ডুর বাড়ি—সেখানে মশাল জ্বালিয়ে সানের বাইরে কী ভিতরে ধরলে দপ্ করে নিভে যায়। এ-হেন সেই সেঁতা ঘরের মধ্যে জ্ঞানের ঝুড়ি আগলে বসে থাকেন সর্বজ্ঞ জ্ঞানকুণ্ডু গর্দভের চামড়া মুড়ি দিয়ে।

ভুস্‌কুমড়ো ক্ষেতে ঢাকের মতো একটা গোলাঘর। তার না-আছে দোর না-আছে ঘুলঘুলি। আগাগাড়ো আড়ামোড়া ইঁছুর-মাটিতে নিকোনা, তার উপর তিনকোণা, চারকোণা আটকোণা আড়ি-দাঁড়ি-কসিতে টানা চৌষট্টি কলাবিদ্যের রশি; জাছবিদ্যের, চুরিবিদ্যের, জুয়াচুরিবিদ্যের নক্সা আর আলপনা।

গোলাঘরে ঢোকবার পথ না পেয়ে হেতি হোতি ডাকলে —'কুণ্ডুমশায় ঘরে আছেন?'

সাড়াশব্দ নেই, ছাগলটা ডাকল —'ব্যে-ব্যা, ব্যে-ব্যা, ব্যে এএএ!' তিন ডাকের পর গোলাঘরের মধ্যে থেকে শব্দ এল —'পাঁঠা না পাঁঠি?'

শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গোলাঘরটার তলা থেকে খানিক ইঁদুর-মাটি ঝরে গিয়ে ছোট্ট একটি ঘুলঘুলি প্রকাশ পেল। সেইটি দিয়ে কুণ্ডুমশায় মুণ্ডু বার করে হেতি হোতির দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন —'এখানে কেন?'

হেতি হোতি বললে —'এই পাঁঠাটি নিয়ে আমাদের দুজনকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিন!'

জ্ঞানকুণ্ডু বললেন —'আচ্ছা।'

যেমন দক্ষিণা দিলা তেমলি বিদ্যা দিব দান
হেতি হোতি দুইজনে শুন ধরি কান—
ক খ গ আদি চৌত্রিশ অক্ষর
ক কা অবধি বারো ফলা, সাঙ্গ অতঃপর—
গুরুকে প্রণাম!'

এইটুকখানি বিদ্যে দিয়ে জ্ঞানকুণ্ড হেতি হোতিকে বললেন—

'তোমরা সামান্য নহ দুই সহোদর
বিদ্যা চোরাতে এলে আমার গোচর।
মুর্খজন বুধজন আলাপ না করে
এইটুকু বুঝি এবে যাও স্থানান্তরে।'

এই বলেই কুণ্ড মশায় পাঁঠাটিকে ইঁদুরের গর্ত দিয়ে গোলাঘরের মধ্যে টেনে নিলেন। তার পরেই ঘুলঘুলি বন্ধ। আর কারুর সাড়া-শব্দ নেই।

হেতি বললে—'দাদা, পাঁঠাটা ঠকালে।'

হোতি বললে —'সেইটুকু বুঝলেম কেবল কুণ্ডুমশায়ের কৃপায়। পাঁঠার বদলে কিছু না হলে এটুকু তো বুঝতেম না!'

হেতি বললে —'তা বটে। চল স্থানান্তরে, কিছুর উপর বুদ্ধি তো খাটানো চাই!'

এই বলে গোলাঘর থেকে কিছু অন্তরে একটা তালবনে গিয়ে বসল দুই ভাই বুদ্ধি খাটাতে। তাল পেড়ে খাবে কোন্ বুদ্ধি করে এই ভাবছে তারা এমন সময়—

রজনী আগত হৈল ঘোর অন্ধকার
ভয় লাগিল অতি হেতি হোতি উভয় জনার।

ওদিকে গোলাঘরে জ্ঞানকুণ্ডু ভাবছেন —ছাগল, গরু, গাধার বদলে সবাই দেখি বুদ্ধি নিতে আসছে দলে দলে। একটু একটু দিতে দিতে সব বুদ্ধি ফুরিয়ে গেলে কী করব তখন? এই ভেবে কুণ্ডুমশায় তাঁর ঘটে যা কিছু বিদ্যা-বুদ্ধি ছিল একটা মাটির কলসিতে ভরে নিজের গলায় ঝুলিয়ে তালগাছের মাথায় লুকিয়ে রাখতে চললেন। যত বড়ো না মানুষ ততোধিক বড়ো কলসি গলায় ঝুলিয়ে কোমরে দড়া বেঁধে তালগাছে উঠা কী সহজ কর্ম! জ্ঞানকুণ্ড যতবার উঠতে যান গাছে, ততবার পা পিছলে নেমে পড়েন মাটিতে। হেতি হোতি তাঁর কাণ্ড দেখে বলাবলি করছে —'ভাই, লোকটা কী বোকা। গলায় কলসি বেঁধে জলেই ডোবে সবাই। গাছে ওঠে কে?'

কথাটা জ্ঞানকুণ্ডুর কানে পৌঁছতেই থমকে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে, গলা থেকে কলসি নামিয়ে ভাবতে বসলেন —কী করা যায়, কোথায় লুকোই বুদ্ধির ঘট? ঘট বয়ে গাছে ওঠার কী উপায়?

মনের দুঃখে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছেন কুণ্ডমশায়, এমন সময় হেতি হোতি এগিয়ে এসে বললে —'কী ভাবছেন মশায়?'

কুণ্ডু বললেন —'ভাবছি এই কলসিটারে গাছের আগায় কেমনে নেওয়া যায় ?'

হেতি হোতি বললে —'গলায় না ঝুলিয়ে কলসিটারে পিঠের 'পরে নেন। গাছের আগায় সহজে চড়ে যান।'

জ্ঞানকুণ্ডু খানিক হাঁ করে থেকে বললেন —'অ্যাঁ! সর্বজ্ঞ জ্ঞানকুণ্ডু আমার নাম, আমার ঘটে এইটুকু বুদ্ধি যোগাল না। ধিক্—' বলেই বুদ্ধির ঘট সেইখানেই ফেলে —'গলায় দড়ি, গলায় দড়ি' — বলতে বলতে দে-দৌড় জ্ঞানকুণ্ডু।

হেতি হোতি কলসিটা ভেঙে দেখলে তার মধ্যে মৌচাকের মতো একটা কী রয়েছে। তার খোপে-খোপে সুবুদ্ধি, কুবুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দুষ্টুবুদ্ধি, শিষ্টবুদ্ধি বিড়-বিড় করছে। দুই ভাই মৌচাকটি দু-ভাগ করে মুখে পুরে দিলে। একটু মিঠে, একটু তিতে, একটু ঝাল, একটু টক, একটু ঠাণ্ডা, একটু গরম লাগল। বুদ্ধির চাক চিবিয়ে খেতে-খেতেই দু-জনের বুদ্ধি বেড়ে বেড়ে তালগাছ।

কোমর বেঁধে চলল তখন হেতি হোতি দুই ভাই ভবের হাটে ঘোল খেতে।

বুদ্ধির চাক চিবিয়ে খেয়ে জগমুনশির বাড়ি ছাড়পত্র আনবার জন্য তালতলা দিয়ে চলতে চলতে হেতি বলছে হোতিকে —'ভাই মাথাটা কেমন ভারি বোধ হচ্ছে না ?'

হোতি বলছে হেতিকে —'বোধকরি বুদ্ধির ভারে ঘাড় ঝুঁকে পড়ছে। এই গাছতলে বসে নিই আয়। বুদ্ধি একটু পাকুক, তবে এগোনো যাবে জগমুনশির কাছারিতে।'

বোতলের মতো গোড়া মোটা গলা সরু একটা তালগাছ, তার গায়ে বুলু-বেলাক্ একটা ফেলাগ—তার তলায় লেখা—জ্ঞানকুণ্ডু কালিকুণ্ডু এণ্ড কোং। হেতি হোতি ঘুরে-ঘারে দেখলে বাড়িতে ঢোকবার রাস্তা কোনো দিকে নেই। কী করে, সেই গাছে ঠেস দিয়ে দু-জনে বুদ্ধি পাকাতে বসল—হেতি আকাশের দিকে চেয়ে, হোতি মাটির দিকে চেয়ে, এমন সময় শুনলে—

বোতলি-তালের গাছটার মধ্যে ঘটর ঘটর শব্দ। কালিকুণ্ডু কালি ঘুঁটছেন—

'কালি ঘোঁটন, কালি ঘোঁটন
নোটন কালি, ঘোঁটন কালি,
সবার দোতের ঘন কালি
আমার দোতে আয়—
কালি ঘোঁটন, কালি ঘোঁটন,
ঘট-ঘটেশ্বরের পায়।'

তারপরেই বুলু-বেলাক্ ফেলাগ্‌খানা পর্দার মতো গুড়িয়ে গেল; তার মধ্যে থেকে কালিকুণ্ডু দুহাতে ছোটো দু-বোতল লাল কালো কালি হেতি হোতির গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন —'ও কঞ্চি! ও তলতা! তালতলায় হুস্থুর মুস্থুর এসেছেন, ওদের খাতির করে বসাও।'
কঞ্চি আর তলতা কালিকুণ্ডুর দুই মেয়ে —একজন বুলু-বেলাক্, একজন টর্কি-রেড। গাছ বেয়ে নেমে এসে বললে নেচে গান গেয়ে—

'হুজুর হুজুর
তালপাতার হুস্থুর মস্থুর বাঁশপাতার খানা
কালকাসুন্দির বনে আছে বাদশাহী বিছানা!'

এই বলে দু-জনে তালপাতার পাখা আর বাঁশপাতার চামর দোলাতে দোলাতে আগে আগে চলল —পাছে পাছে হেতি হোতি গিয়ে ঢুকল কালকাসুন্দির বনে!
কালকাসুন্দির সবুজ মখমলের মতো পাতার বিছানায় হেতি হোতিকে বসিয়ে কঞ্চি আর তলতা বললে —'আমরা এখন পলতার ঘাটে চললেম। বাঁডায়। কুটবায়। আই উইস্ গো। কাম ব্যাক নো।'

হেতি হোতির বুদ্ধি তখন পেকেছে, তারাও বললে —'কম্ নো কম্ —উইস্ গুট্ !'

বলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। যেমন শোয়া অমনি ঘুম। যেমন ঘুম, অমনি নাক ডাকা। যেমন নাক ডাকা, অমনি কাসুন্দির সুন্দি ছাড়া 'কা' বুড়ির খবর পাওয়া।

তখন বাঁশতলায় কা বুড়ি বলছে —'কা'। তালগাছে কাউয়া বুড়ো বলছে —'ক' ! এই চলল খানিক কা-ক ক-কা ককানি ক-বুড়ি আর কাউয়া বুড়োর। তারপর যেমন একবার কাউয়া বুড়ো বলে ফেললে —'কা,' অমনি কা-বুড়ি বলে দিয়েছে —'রাত পোহাইয়া যাঃ!'

বাস্ ! আর কোথায় আছে, রাত পুইয়ে ফরশা !

অমনি হুক্কা শেয়াল ডাক দিয়েছে —'হুক্যা হুয়া —হুক্যা হুয়া।'

হেতি হোতি বাদশাহী বিছানায় আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসে বললে —'ক্যা হুয়া রে ক্যা হুয়া ?'

তখন শেয়াল বলছে—'হুজুর ফরশা হুয়া !' বলেই ফোগলা শেয়াল হোগলা বনে ঢুকতেই —'কোয়াক কুয়া, কেয়াক কুয়া' শব্দ দিলে কা-বুড়ির একজুড়ি পাতিহাঁস।

হেতি হোতি ঘুম থেকে উঠে ভেবে পায় না এ কোথায় এলেম। দু-জনে দু-জনকে চিনতে পারে না। এ ভাবে —ও লোকটা কে ! সে ভাবে —ও লোকটাই বা কে !

হেতির মেজাজটা যেন হুজুর হুজুর আর হোতির মেজাজটা যেন মজুর মজুর হয়ে পড়েছে। বাদশাহী বিছানাতে বসে একজন ভাবছে নিজেকে হুজুর-বাদশা, আর একজন ভাবছে আপনাকে মজুর-বাদশা !

কুড়ের বাদশাকে তাঁর উড়ে মালী গিয়ে খবর দিচ্ছে —'ইয়ে কোঁড় আইলা কড়তা। বাদশাহী বিছানা দখড় কড়ি নিলা।'

কুড়ের বাদশার থাকবার মধ্যে ছিল আড়াই হাত হোগলাপাতা ছাওয়া কুড়ে ঘর, কড়ির ছিকেয় বাঁধা গোটাকতক ফুটো ভাঁড় আর ঐ কালকাসুন্দি বনে বাদশাহী বিছানাটি! এই এস্টেট —কালিকুণ্ডুর কা-বুড়িকে বিয়ে করে —একটুখানি শয্যাদান পেয়েছিলেন তিনি।

রাতে গড়াতে ছিল তাঁর কুড়েখানি, দিনে গড়াতে ছিল কালকাসুন্দির বনে বাদশাহী ঐ বিছানাটি। উড়ে মালীর কথায় কুড়ের বাদশা জবাব করলে—'দখল হয়েছে হোক, বে-দখল হয়নি তো, তবু রক্ষে! যাও, চিতাবাড়ি আর ধাঁইকিড়ি তুই সর্দারকে নিয়ে ভাল মুখে তাঁদের গিয়ে বল —'দখল ছাড় ভাল, নয় তো যুদ্ধ অনিবার্য।'

উড়ে মালী কুড়ের বাদশার তুই সর্দারকে নিয়ে চলল বাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে—

'চিতাবাড়ি ধাঁইকিড়ি
আগবাড়ি সাঁইকিড়ি
ধাঁইকিড়ি আইকিড়ি
ডিঙামাটি ঝিঙাপাড়ি
ঝাঁইকিড়ি ঝনগিড়ি
গুঁসাই বাড়ি!'

ঝালিকুণ্ডুতে আর কালিকুণ্ডুতে চিরকালই ঝগড়া কালকাসুন্দির বনটি নিয়ে। ঝালিকুণ্ডুর সর্দার বেরিয়েছে দেখে কালিকুণ্ডর তালি-পাতের সেপাই তারাও বার হল বুলু-লোক্ কালি মেখে, তালপাতার ঢাল খাঁড়া ঘুরিয়ে রণ্ রণ্ শব্দে —

'ঝম্-ঝমা-ঝম্ ঝিমকিড়ি
দন্তে দিবা ফিটকিড়ি
খন্নি খাবা কিড়মিড়ি
চিকি সুপারি পানবিড়ি
ঢাল তলোয়ার তলপত্র চিড়ি।'

একদিকে তালপাতা —ওদিকে পাকাটি কাটি! যুদ্ধ বলে —'আমি আর কোথায় আছি!' যেন হঠাৎ প্রভাতে মেঘডম্বরে মহা আড়ম্বরে

কোটি পাতা উড়িয়ে একটা ঝড় বহে গেল। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া করেই হঠাৎ আবার লড়ালড়ি বন্ধ। কাউকে আর দেখা গেল না। কালকাসুন্দির বনে এক রাত্তিরের হুজুর-বাদশাহী মজুর-বাদশাহী শেষ করে তারা পুরাকালের মতো পাতাচাপা পড়ে রইল। কপালে কবে পাতা ওড়ে আবার তাদের —কে জানে!

কঞ্চি আর তলতা আশা করেছিল পলতা ঘাট থেকে ফিরে এসে হেতি হোতিকে বিয়ে করবে। সেইজন্যে গাঁদাল পাতা আর পলতা পাতার দু-গাছি মালাও গেঁথেছিল। এসে দেখলে —না হুজুর, না মজুর, দুজনের একজনও নাই। তখন ঘরে গিয়ে কালিকুণ্ডুর দুই কন্যে হেতি হোতির শোক-গাথা একটা লিখেছিল পাঁত-সাত পাতা নিশ্চয়। তার চিহ্ন ঘুণাক্ষরে বাঁশ আর তালপাতায় পাওয়া যায় এখনো, কিন্তু পড়া যায় না।

হেতি হোতির বৃত্তান্ত

'প্রজাপতি পুরাসৃষ্টা অপঃ সলিল সম্ভবঃ
তা সাং গোপায়নে সত্ত্বানজৎ পদ্মসম্ভবঃ'

স্বয়ংভু প্রজাপতি ঘুম ভেঙে উঠেই এক কোশা জল, এক খামচা মাটি নিয়ে অসৃজৎ করলেন—

'জল ও জাঙাল
ভূচর খেচরাদি পাখ পাখাল ;
আর, তাদের চরাতে —হেতি হোতি নামে দুটি রাখাল !'

তাদের দেখতে হলো কেমন ?
'হেতি হোতি গোল গাল,
একটি অতি কাল।
একটি অতি লাল !
হাত পা সরু সরু যেন পদ্ম-নাল।
ইঁচড়ে পাকা কাঁঠাল আর মাকাল যেমন,
দাম্বাল দুটি ছাবাল তেমন !'

জন্মাবামাত্র হেতির লাগল ক্ষিদে, হোতির জ্বলল পেট। দুটোতে আকাশ পাতাল মুখ ব্যাদান করে প্রজাপতিকেই বুঝি-বা গিলে ফেলায় এমনি ভাব জানায়, আর কাঁদে।

তাদের কান্না শুনে পুরাকালের জীবজন্তু সব কিংভূতকিমাকার,

তারাও ধরে উৎকট রব। ভয় জানায়, ক্ষুধা জানায়, পেট চাপড়ায়। আর হাঁ করে বিকট। প্রজাপতিকে ডেকে বলে—

'ক্ষুৎখাম-রক্ষাম-ভক্ষাম ক্ক-খাম কিং কুর্ম,
হুম্! প্রজাপতি-সম্প্রজায়তি কিংখাম-কংখাম?'

বৃহদ্‌াকার কদাকার সব পুরাকালের জীব-জন্তু, এক-একটা হাত-পা ওয়ালা বগ-যন্ত্র; গ্রামোফোনের চোঙা পরানো বড়ো বড়ো ঢাকাই জালা থেকে কারুর গলা বেরোচ্ছে চেঁ-চেঁ—এঁ-এঁ আওয়াজে। প্রজাপতির কর্ণ বধির। তিনি যত বলেন—'থাম' 'থাম', ওরা মোটা মোটা থামের মতো হাত পা নেড়ে বলে—'খাম-খাম! ক্ক-খাম, ক্ষুৎখাম। কিংখাম—কংখাম!'

কেউ গরাস গরাস কাদাই খাচ্ছে। কেউ ক্ষুধার জ্বালায় হাঁস-ফাঁস বাতাস খেয়ে দ্বিগুণ ফুলোচ্ছে পেট। ফুলো ফাঁপা রবারের বেলুনের মতো এমন পাতলা চামড়া তাদের গায়ে যে, পেটের মধ্যে পাকস্থলীতে যে আগুন জ্বলছে, পেটের হাঁড়ের তলায় তা' পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। কাউকে আর বলে বোঝাতে হয় না যে তাদের—

'জঠর জ্বলিছে অন্নাভাবে, চিন্তানলে পুড়িছে মাথার খুলি,
মুখে বার হচ্ছে বার বার 'রক্ষাম' আর 'ভক্ষাম' বুলি!'

খাবার ইচ্ছা—চরবার বাঞ্ছা যখন খুব জাগল জীবদের তখন ইচ্ছা-বাঞ্ছার' বীজ ছড়িয়ে দিয়ে প্রজাপতি হেতি হোতিকে বললেন—

'তোমা দোঁহাকারে, গোঁসাই দিলাম কার্যভার,
সবার প্রধান হ'য়ে পালহ সংসার।

জীবে রাখিবা প্রাণের শকতি
গোঁসায়ে রাখিবা অটুট ভকতি ॥'

এই বলে প্রজাপতি অদৃশ্য! তাঁর বদলে দৃশ্য হলেন —এক জগৎ গোঁসাই! 'খড়ম-পায়া জগৎ গোঁসাই কমণ্ডলু করে—খটম খটম চলে!'

বিভীতকী হরিতকীর যেন একটা গাছ এমনিতর মোটা এক ডাণ্ডা হাতে জগৎ-গোঁসাইকে অবতীর্ণ দেখেই ভয়ে আর সব জীব চুপ। সবার হয়ে হেতি হোতি বলছে —

"বাঞ্ছা তো পালি গোঁসায়ের সংসার
কিন্তু অন্ন বিনা চলা যে ভার!
—ইচ্ছা তো জীবজন্তু চরায়ে বেড়াই,
কিন্তু জলবিন্দু যে মুখে দিবার নাই!"

ভক্ষ্য বিনা জীবন রক্ষায় অশক্ষ্য,জীবে রাখি কেমনে করতার? দোহাই গোঁসাইজী কিছু খাতি পাই! এই বলে হেতি হোতি এ-ওর বুড়ো আঙুল ধরে চুষে খেয়ে ফেলে দিলে! দেখে 'জগৎ-গোঁসাই যত বলছেন—

'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষতে নাই
ক্ষয় হবে যে পরমাই —'

কে কার কথা শোনে? ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে হেতি হোতি তখন এ-ওর গালের মাংস কামড়ে খাবার চেষ্টা!

তখন রেগেছেন জগৎ গোঁসাই! বলছেন—

'অমান্য না করো ব্রহ্মবাক্য,
কোর না তোমরা খাই খাই;

রাখালী করগা তুই ভাই,
ভরা ভর্তি গোঁসায়ের সংসার
যে যা চা'বে পাবে তাই
নজর করে দেখা চাই!"

দুটো কোলা ব্যাঙের মতো ড্যাবা ড্যাবা চোখ ঘুরিয়ে হেতি হোতি চারিদিকে চায়, কোথাও কিছু নাই গোঁসাই পর্যন্ত অদৃশ্য! কেবল তাঁর বিভীতকী হরিতকী দণ্ড খাড়া আছে!

তখন ভয়াদ্রিত সব জীব জন্তু ঘেমে নেয়ে উঠেছে। হেতি হোতি আদ্যিকালের জীবদের মধ্যে বলাবলি করছে তু'জনে —

'ভাইরে, কারসাজি ভোজবাজি করতার বোঝে সাধ্য কার?
এ যে যাদু বিদ্যে বর্মার।
আমরা ছিলেম না, সে ছিলেম ভাল এক প্রকার,
চিন্তা ছিল নাক' বাঁচা কি মরার!
জীবন পেয়ে যে একে হতে হলো আর।
ভাবনা ক্ষুধার —ভাবনা তৃষ্ণার;
পালিতে জীবধর্ম গলদঘর্ম।
প্রাণ লয়ে প্রাণীর টেঁকা ভার!'

দেখতে দেখতে সৃষ্টির প্রাক্কাল মধ্যাহ্নকাল সায়ংকাল কেটে ঘোরতর অমানিশার চেয়ে তিন ডবল অন্ধকার রাত এসে পড়ল! প্রথম সৃষ্টিতে দিন হল খতম। যেমন অন্ধকার নামা, আর জীবজন্তু সব কাম্‌ড়া কাম্‌ড়ি শুরু করা! সৃষ্টিতে অনাসৃষ্টি বেধে গেল! বিরাট জীবজন্তুদের বিকট হাঁক ডাক। চচ্চড় ছিঁড়্‌ড়ে চাম্‌ যেন কলাপাতা ফাঁড়া হচ্ছে, শালপাতা হচ্ছে প্রীতি-ভোজের দিনে।

'ক্ষুৎরাম!' 'রক্ষাম!' 'ভক্ষাম!' শব্দে কান পাতা ভার। হেতি হোতি ভয়ে তুজনে হরিতকী বিভীতকী ভাণ্ডার আগায় বসে

লক্ষ্মীপেঁচা আর হুতুম পেঁচার মতো ক্ষুধায় ভয়ে কাঁপছে আর চেঁচাচ্ছে! এমন সময় সকাল হল সৃষ্টির দ্বিতীয় দিনের।

প্রজাপতি এসে দেখলেন পুরাকালের জীবজন্তুর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাড় পাঁজরাগুলো পড়ে আছে যেন যাদুঘরে সাজান। দ্বিতীয় দিনে আবার সৃষ্টির বীজ ছড়ালেন প্রজাপতি! কিছু এবার রইল, কিছু রইল না রাত্রিকালে। এমনি করে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম দিনে কিছু রইতে কিছু বইতে সৃষ্টির পত্তন হলো সুনিশ্চিত।

'তখন রাতে রাতে জোনাকি পিদুম জ্বালায়।
চার প্রহরে শৃগাল পাহারা হেঁকে যায়॥'

জগৎ-গোঁসাই আবার দেখা দিয়ে বললেন—

'হেতি হোতি চলে যাও, বসে থেকো না'

হেতি হোতি বললে—

'ক্ষুৎ খাম, —ক্ক খাম —কিংখাম —'

'ভবের হাটে ঘোল খাওগে!' বলে জগৎ গোঁসাই অদৃশ্য।

হেতি হোতি চললো ঘোল খেতে ভবের হাটে। সে একটা মস্ত ইতিহাস! তার হিসাব-নিকাশ পাবে সাতকাণ্ড রামায়ণের তিন শো বত্রিশ পাতে।

উদ্‌ভুট্টির চরে ঘোরতর বর্ষা। চারদিকে জল আর জল —কেবল দেখা যাচ্ছে খাতাঞ্চির দপ্তরখানাটি—

কিছু কিছু ইঁট, কিছু কিছু কাঠ
কিছু খোলার চাল, কিছু টিনের ছাত
পুব ধারে উঁচা —পশ্চিম ধারে কাত।

যেন আরারুট পর্বতের চূড়ায় ধরা নোয়ার কিস্তিখানা। জমা-জরিপের কাজ বন্ধ। সোঁতার ভয়ে গাম্ভার কাঠের তক্তার 'পরে খাতাঠাসা কপ্‌পুর কাঠের সিন্দুক চাপিয়ে, এক আঁটি বিচিলি চারপাট শতরঞ্চি বিছিয়ে, গদিয়ান হয়ে বসে খাতাঞ্চিমশায় গড়গড়া টানছেন আর এক-একবার তালামুদের বই ওল্‌টাচ্ছেন।

সোনাতন এসে রিপোর্ট করলে —'ও দিকে ব্রহ্মপুত্রের জল বেড়েছে, এ দিকে দামোদরের বাঁধ ভেঙেছে, বৃষ্টির কামাই দেখছিনে!'

—'তারেৎ ব্রহ্মঃ সনাতনঃ, গতিক ভাল বুঝছিনে। বুঝি-বা জল-প্লাবনে গোমাতা দোবারা তলান!' বলে খাতাঞ্চিমশায় একমুখ ধুমা ছেড়ে তালামুদের পাতা ওল্‌টালেন।

সোনাতন বললে —'কর্তা, এমন আজ্ঞা করবেন না; গরু আমি উঁচু জায়গায় বেঁধে থুয়েছি।'

—'আজ্ঞে আমি করবার কে.? সবই আল্‌ মাইতির ইস্‌চে। তিনি যদি রাগত হয়ে থাকেন, তবে কেউ বললে ঠেকাতে পারবে না। জরু-গরু সব ভেসে যাবে মায় উদ্‌ভুট্টির চর —ওর কী নাম, তোমার রিসিবরও ঠেকাতে পারবে না!'

—'আজ্ঞে কর্তা, আপনি থাকতে আমরা নির্ভয়। লাল মাইতির চিহ্নিত লোক আপনি ; আপনি বললেই—'

—'আ হে, আমি একা কতদিক ঠেকাব? পাঁচজনে যে আল্ মাইতিকে চটিয়ে রেখেছে—

বেদশাস্ত্র-বিবাদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্
ইতরেষাং তু মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেন বা।'

—'আজ্ঞে বুঝলাম না তো কর্তা, শোলোকটা ভেঙে কন।'

—'কী আর বলি, বুঝে দেখ গে—

বদ্যি আছেন লয়ে বেদের টীকে,
গরু খুঁজে মরছে গোবদ্যিকে।
গরু হল গুরু পাঠশালার
মরচে ধরল লাঙলে চাষার।
ভুঁইমালির ছেলে গেল বিলেতে,
শেয়াল-কাঁটা গজায় বেগুন-ক্ষেতে
আল্ মাইতির কত আর সয়?
রাগে বুঝি এবার করেন প্রলয়।'

—'তাহলে কর্তা ছুটি মঞ্জুর করেন, দেশে গিয়ে জরু-গরু কাচ্চা-বাচ্চাগুলোকে দেখে মরি!'

—'আ হে, এ কেমন কথা কও তুমি? দেশে গেলেই কী আল্ মাইতির রাগ পড়বে? তাঁর উদার হস্ত এড়াবার জো নেই। ইচ্ছে করলে তিনি তোমার গরু-জরু মায় দেশটারে এইখানেই টেনে এনে ফেলতে পারেন। আল্ মাইতির স্মরণ কর, তারাই এসে পড়বে তোমার খবর নিতে এখানে!'

—'আজ্ঞে, চারদিক যে জল—আসবে কেমন করে তারা?'

—'আর তুমিই বা যাবে কেমন করে তাদের কাছে, ছুটি দিলেও ?'

—'তাও তো বটে কর্তা।'

—'কর্তা আমি নই, কর্তা আল্ মাইতিকে ডাক।'

—'তাই যাই কর্তা, লাল মাইতির কাছেই যাই। লাল মাইতির বাসা কোন্ দিগে ?'

—'এ বড়ো শক্ত প্রশ্ন করলে সোনাতন!' বলে খাতাঞ্চিমশায় তালামুদখানা ঝপ্ করে বন্ধ করতেই চালের উপরে বাস্তুঘুঘু ডেকে উঠল —'বৌ বৌ ত্বঃখু পাওয়ার বৌ—'

খাতাঞ্চিমশায় বললেন —'সোনাতন, দেখ তো আকাশে রামধনু উঠেছে নিশ্চয়!'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ তো কর্তা।'

—'তবে আর আল্ মাইতিকে ডেকে বিরক্ত করবার আবশ্যকতা দেখি নে!'

ফার্স্ট টু লাস্ট

ফেক্‌টরির গায়েই ইস্কুল-বাড়িটা পাড়ার পাঁচ জনের চাঁদায় চলে এসেছে। দরোজায় সাইনবোর্ডে বড়ো বড়ো করে লেখা র‍্যোম্যান টাইপে —মামাসি ইন্‌সটিটিউট। রোদে জলে পুড়তে ভিজতে লেখাটুকু প্রায় ঝাপসা হয়ে এসেছে, যেন ন্যেতা-মোছা সেলেটের উপর পেনসিলের আঁচড়-কটা দেখা যায়।

সেইখানে লাস্ট বয় পড়ে, পড়ে বললে ঠিক হবে না, পড়ে আছে ভর্তি হয়ে অবধি লাস্ট বেঞ্চিতে।

হঠাৎ একদিন লাস্ট বয়ের ভাগ্য ফিরে গেল। বছর-কি-পরীক্ষা সামনে, দিন এগিয়ে আসছে, আর সে ভাবছে কোনো রকমে 'সিক' হয়ে পড়ে ফাঁড়া কাটাবার উপায়। এমন সময় কোনো খবর না দিয়ে স্বয়ং ইনিস্‌পেকটর এসে হাজির। চৌকি নিয়েই আর কথা না, পরীক্ষা শুরু। প্রশ্ন হ'ল—

ইজী-রিডার, মোক্তব-উল-নোক্তা, ঋজুপাঠ কেমন লাগে? তোমার —তোমার —তোমার?

উত্তর হয়ে চলল, বেশ লাগে স্যার, খুব ভাল। এমনই ধাপে ধাপে প্রশ্নটা এর-ওর-তার যেন কাঁধে ভর দিয়ে গড়গড়ি নেমে আসতেই লাস্ট বয়ের কাছে উত্তর হ'ল —গুরুভার স্যার।

গুরুমশায়ের মুখ ফসকে 'বেদড়া' কথাটা বেরিয়েই ফিরে তলিয়ে গেল।

ইনিস্‌পেকটর বললেন, বেশ, তোমার মতে শিশুশিক্ষা কেমন হওয়া চাই বল তো?

আজ্ঞে, যেমন বোঝার উপর শাকের আঁটি।

এখন কেমন আছে শুনি?

যেন ধোপার মোট উল্‌টে ফেলেছে পালং শাকের ক্ষেতে।

তুমি ছবি লিখতে পার ছোকরা, ভয় নেই দাও।

সেলেটে একটা বন্ধ ফটকের ছবি, নিচে লেখা—মামাসি ইন্‌সটিটিউট।

গুরু বললেন, ইস্কুল-বাড়ি তো দেখছি নে?

বন্ধ হয়ে গেছে, ফটকের ওপারে আছে মাস্টারমশায়।

ক্লেপ ক্লেপ ক্লেপ ক্লেপ শব্দের মধ্যে লাস্ট বেঞ্চি থেকে ফার্স্ট বেঞ্চিতে লাস্ট বয়কে প্রমোশন দিয়ে ইনিস্‌পেকটর তো যান।

তারপর থেকে লাস্ট বয় দেখে, নাকের ডগায় বেত হাতে মাস্টারমশায়, বই থেকে চোখ উঠাতে ভয় হয়, পাছে প্রোমোশন নাকচ হয় সে আর এক ভয়;—ছাদের উপর থেকে নিচে পড়লে যতটা ভয় তার চেয়ে বেশি ভয়।

ফার্স্ট বেঞ্চি আঁকড়ে ধরে, ভয়ের তাড়ায় সে উঁচু ডালের ফলের মতো গোল্ড মেডেলে হাত ঠেকালে, সেই তার দিদিমা তার স্কন্ধে একটা বউ চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ম'ল।

তারপর বউভাতের দিন থেকে দিদিমার শ্রাদ্ধের দিন, এর মধ্যেই সে বুঝলে, ফার্স্ট বেঞ্চে প্রমোশন—একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল, সূর্যের চেয়ে বেশি দূরে ছিল গোল্ড মেডেলটা।

তারপর থেকে পরপর মোটা রকম ফর্মার না-ছাপা নভেলেরও পাঁচ-পাঁচটা পরিচ্ছেদ পেরিয়ে দেখি একটা ছবি—

টিনের একটা চালাঘর, তার তলার কলে কাটছে গোল গোল চাকতি এক ব্যক্তি, তার নাকের উপরে চশমা চড়িয়ে চাক্‌তি-গুলোতে হরফ লিখে চলেছে আর এক ব্যক্তি—শেষের পাতায় হাফটোনে ছাপা।

হার জিত

(কথিকা)

ছবিওয়ালা কবিওয়ালা আর খবরওয়ালা পুজোর সময় সেবার এলো রাঁচিতে। উত্তরের বারাণ্ডায় তিনে মিলে কথাবার্ত্তা চলে — ছবিতে কবিতায় এবং পলিটিক্সের খবরে জড়াজড়ি। ছবি বলে — দেখ দেখ। ধান ক্ষেতে সবুজ লেগেছে, দূর পাহাড়ে নীল আভা, আকাশে আলোর খেলা —তার মাঝে ঐ কালো মেয়ে। কবি বলেন —তুমি দেখ, আমি শুনি —বাতাস বলে যাই যাই, মেঘ বলে আসি আসি। ছবি বলে, দেখ দেখ জল চলে, দুলে চলে, বেঁকে চলে। কবি বলে, শোনো শোনো —পাখি কি বলে, মাঠে ঘাটে বাঁশী বাজে। ছবি বলে —কী সুন্দর কালো ঐ মেয়েটি! কবি বলে নীল আকাশ কী মিঠে সুরই দিচ্ছে! খবরের কাগজ থেকে চোখ উঠিয়ে খব্‌রী বলে —ওহে পড়ে দেখ খবরটা! কবি আর ছবির চমক ভেঙে যায়। খব্‌রী পড়ে চলেন বিশ্বের খবর, তর্কের ঝড় ওঠে চায়ের পেয়ালার উপর। বাইরের রোদ বারাণ্ডায় কখন আসে, কাছে বসে তর্ক শুনে চলে যায় আপন কাজে। ছবি থেকে যায় আধ-লেখা, কবিতা থাকে অসমাপ্ত, তর্কও শেষ হয় না। বারোটা বাজে ভাত খেতে।

দুপুর বেলা একটি ঘরে বসে দেখি রোদে পোড়া মাঠে কালো মেয়ে ক্ষেতে ক্ষেতে কাজ করে চলেছে। ওঘরে শুনি কবি গুণ্ গুণ্ করে গাইছে। আর, আর খব্‌রী ? সে খাটিয়ায় পড়ে নাক ডাকাচ্ছে। খব্‌রী বিশ্বের খবর হজম করতে চায়, তাই তার ঘুমোন চাই। আর কবি ছবি এরা ঐ মাঠ ঘাটটুকুর মধ্যে যেটুকু খবর আসা যাওয়া করছে টুকরো টুকরো ভাবে, তাকেই ধরে রাখতে জেগে বসে আছে। আর ঐ কালো মেয়েটা —সে কী অর্জন করছে সব তুচ্ছ ক্ষণিকের জিনিস সারাদিন খেটে খেটে তাই ভাবছে ছবি আর কবি।

বৈকালে খব্‌রি চলে ইস্‌টিসানের দিকে রিডিংরুমে আসার খবর জানতে পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে — দেশের খবর দশের খবর, সহযোগী সাহিত্যের অসহযোগী মানুষদের সঠিক খবর। ছবি চলে, কবি চলে মাঠের পথে সন্ধ্যার হাওয়ায় উড়ুনী উড়িয়ে। কবি গায় চাঁদনী রাতের গান, ছবি চুপ করে শোনে আর চায় মাঠের পারে — বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে যেখানে চাঁদ উঠছে। সেই সময় বন-গাঁয়ের ধারে মাদল বাজে, ডাক দেয় গাঁয়ে গাঁয়ে কালো ছেলেমেয়েদের 'বাহা-পড়বে'। কবি বলে, ও কী শুনি! ছবি বলে, ও কী দেখি! দুজনে এগিয়ে যায় গাঁয়ের দিকে।

একদল কালো পুরুষ, একদল কালো মেয়ে সারাদিন মাঠে মাঠে রোদে পিঠ পুড়িয়ে এখন চাঁদনীতে উৎসব করতে বেরিয়েছে —কেউ সেজেছে ফুলে ফুলে, কেউ সেজেছে পাখির পালকে, খোঁপায় সরু ধানের ঝুরি, গলায় কারু পুঁতির মালা, পরনে নতুন শাড়ি, ধোয়া কাপড়। গাছের তলায় ছাওয়া, সেখানে দাঁড়িয়ে মেয়েরা। মাঠের মাঝে চাঁদের আলো, সেখানে দাঁড়িয়ে পুরুষেরা! কবি ছবি দুটিতে দূর থেকে দেখছে।

মাদল ডাকে। পরব শুরু। যেন বাদলের মেঘ ডেকে গেল বকের পাঁতিকে। মেয়েরা শুনেও যেন শোনে না, গল্পই করে ছাওয়ায় দাঁড়িয়ে। বল্লমের আগায় চামর দুলিয়ে দূত যায় এগিয়ে, জানায় সংবাদ — খবরের কাগজ তো নেই এদের। মাদল বাজে থৈয়া থৈয়া, হাতের নোয়া বাজে ঝিনি ঝিনি, মেয়েরা এগিয়ে আসে চাঁদনী জালা আসরে। নাচ শুরু হয়। কবি শোনেন, ছবি দেখেন, দেখে লিখে চলেন—

দিনকে দিনে
দিনেক দিনে
চান্নি রাতের
শামনি ছাওয়া
বাড়তে চলে।

দেখতে শোভা
মন লোভা
দিচ্ছে আভা
মেঘের পারে।

গান চলে, মাদল বাজে, রাত বাড়ে, আলোর বাহার ক্রমেই খোলে। আসর জমে ওঠে। দুই দলে গায়—

কও তো মিষ্টি কথা।
পাহাড়তলীর
এ কোন্ গাঁয়ের
মিষ্টি কথা কও।
জানিয়ে দিয়ে যাও
এমন কোথা পাও;
মিষ্টি বুলি
ও বুলবুলি
বলে দিয়ে যাও
কমনে তুমি রও?
মিষ্টি লতার—
বুলবুলিটি
একটি কথা কও!

কত কথা, কত ছবি, শুনতে মিঠে, দেখতে মিষ্টি! বাড়ি ফেরে কবি ছবি দুজনে রাত করে। এসে দেখে টেবিলে খাবার আছে ঢাকা দেওয়া। খব্‌রী খাওয়া সেরে বসে আছেন গোমসা মুখে আমাদের আসার অপেক্ষায়। কবি আর ছবি দুজনে ভয়ে ভয়ে নোট বই পকেটে লুকিয়ে বলেন —খবর কি আজ?

খব্‌রী কাষ্ঠ হাসি হেসে বলেন —তোমাদের খবর কি শুনি?

খাওয়া চলে, চলতে চলতে কথাও চলে। এইভাবে খব্‌রীর খবর রুটির গোছার সঙ্গে কমতে কমতে মিঠে পানে এবং মিঠে কড়া তামাকে যখন এসে ঠেকল, তখন কবি খাতা খুললেন, ছবিও পাতা উল্‌টে চললেন। কবি শোনান সাঁওতালি গান, ছবি দেখান কালো চেহারা। খব্‌রী দেখে শুনে বললেন—যাচ্ছেতাই। অতি তুচ্ছ গেঁয়ো জিনিস, একটুও ভাল লাগল না। আর্ট নেই ভল্‌গার!

ছবি আর কবি তুজনের দিকে তুজনে চায় আর ভাবে—মাঠের ধারে যে জিনিস লেগেছিল ভাল, শুনিয়েছিল ভাল, ঘরে এসে তার এ কী অদল বদল হয়ে গেল।

খব্‌রী অসহায় গ্রামবাসীদের দশা সম্বন্ধে অনেকখানি সেন্‌টিমেন্‌টালিটি ও গবেষণা ইত্যাদির ইটি-ওটি খুঁটি-নাটি দিয়ে মস্ত এক প্রবন্ধ পড়ে শোনালেন! কে জানে, সেইটাই লাগল ভাল সে রাত্তিরে। খব্‌রী জিতে গেল, কবি ছবি হার মেনে শুতে গেল।

বিজয় গর্বে খব্‌রীর নাক জোরে জোরে হুহুঙ্কার দিচ্ছে। কবির ঘুম নেই, ছবিরও ঘুম নেই। কবি আর ছবি তুজনে বার হল মাঠে—এক খিড়কী খুলে, অন্য সদর দিয়ে। ফিরেও এল ভোর হতে ঐ ভাবে চুপি চুপি।

কবি রাখলেন খাতা, ছবি রাখলেন পাতা লুকিয়ে। খবরের কাগজে তিন চার কলম জুড়ে খব্‌রী বন্ধুর লেখাটা ছাপান হয়ে চুম্বুক হয়ে বার হয়ে গেল ইংরেজী বাংলা উরতু কাগজে। সেই লেখার সমালোচনা চলল কত চায়ের টেবিলে, কত বৈঠকে, কত সভা-সমিতিতে। কবি ও ছবি ফিরে এল বেড়িয়ে রাঁচি থেকে রোদে পুড়ে, হিম খেয়ে, রাত জেগে, চোখে কালি পড়িয়ে রোগা হয়ে। আর খব্‌রী এলেন মোটা-সোটা গোলগাল ফুলের মতো লাল হয়ে।

টুকরি বুড়ি

জন্মেই শুরু করলে ছেলেটি কান্না—উঁ-আঁ ঙ—ঙ—ঙ, সে কান্না আর থামে না।

'ও ছেলের মা, দুধ দাও গো, ভুখ লেগেছে, ছেলে যে গেল।' দুধ টেনে খায় ছাওয়াল চোঁ চোঁ, পেট ভরে, তারপর আবার শুরু ঙ-ঙ। মা বলে, 'বুকে যে দুধ নেই বাবা, আর কি খাবা, বলি গাইদুধ কোথা পাব, বাঘের দুধ আনি খাওয়াব? ও ছাগলির মা, যা তো বনে, দেখ তো বাঘিনী বিয়াল কনে!'

মা ছড়া কাটে, ছেলে তো ভোলে না। ঙ-ঙ কেঁদেই চলে, ভুলে না। এ পহর ও পহর কাঁদছে তো কাঁদছেই।

ছেলের কান্নায় পাড়ার লোক অস্থির।—'বলি ও ছেলের মা, তোমার ছেলেকে হয় দানায় পেয়েছে, না তো কিছু রোগে ধরেছে বাপু! নজ্জুম ডাকাও, হকিম আনাও, ঝাড়-ফোঁক করুক, দাবাই পেলাক, ছেলে ঘুমাক, পাড়া জুড়াক।'

নজ্জুম ডাকাতে হকিম আনাতে হাতের খাড়ু বিকিয়ে যায়। হকিমের হিকমত হয় না, কাঁদুনি থামা দেয় না ছেলে।

নজ্জুম খড়ি পেতে গণনা করে বলে, 'ও ছেলের মা, চিন্তা কোরো না।

লিখছে উমর এঁর করহ খেয়াল
হাজার উপরে আরো চারিশত সাল
তার মধ্যে নয়শত পঞ্চাশ বছর
লইবেন ইনি সংসারের খবর।
তিনশত পঞ্চাশ সাল তুফান বাদেতে
রহিবেন জেন্দা জাঁহানে হায়াতে—

সে তুফানে কেউ বাঁচবে না গো, কেউ বাঁচবে না, কেবল ইনিই তখন ভেসে যাবেন।'

নজ্জুমের কথা শুনে ওদিকে ছেলের মা কাঁদে, 'কি হবে গো — ও মা!'

নজ্জুম বোঝায়, 'ভাবনার কারণ নেই! তুফানের আসার এখনো বহুত দেরি দেখছি!'

পাড়াপড়শিরা কাঁদে, বলে, 'ততদিন এ ছেলের কান্না সইতে হবে —ও মা গো, কী করি।'

ঙ-ঙ বলতে বলতে ছেলের বুলি ফুটল।

মা বলে, 'বাবা বড়ো হলে তবু এখনও কাঁদ কেন অমন করে? পাড়ার লোক যে রাগ করে।'

ছেলে বলে, 'কাঁদি কি সাধে! পাড়াপড়শির জন্যেই তো কাঁদি! এরা যে বুঝছে না —গজব পড়ল বলে, তুফান এল বলে। সাবধান হওয়া চাই, সময় থাকতে উপায় ঠাওরাবে রক্ষের, তা না হেসে খেলে বেড়াচ্ছে নির্ভাবনায় সবাই।'

'ওমা, ওগো ও পড়শিরা, ছেলে বলে কী শোন।'

'ও ছেলের মা, তুমি শোন। তুফানের কথা শুনে শুনে আমাদের কান পচে গেছে। এখন ভাল চাও তো ছেলেকে — কী আর বলি! হকিমও হয়েছে যেমন নজ্জুমও হয়েছে তেমন। তুফানের ভয় ঢুকিয়ে গেছে ছেলে এখন তুফানই তুলছে, আর থেকে থেকে চিল্‌লিয়ে পাড়া মাত করছে।'

ছেলে বড়ো হয়। এখন আর কাঁদে না —ক্রন্দন করে। আরো বড়ো হয়ে তখন বিলাপ করে। পড়শিরা বলে, 'ও ছেলের মা, ছেলের মা, আর দেখ কি, এইবার প্রলাপ শুরু হলেই হল। দিন থাকতে ছেলের বিয়েটি দিয়ে ওকে বউয়ের জিম্মে করে তুমি ভেক নিয়ে বেরিয়ে পড় —না হলে ভোগান্তি আছে কপালে!' তা করল কি? জুটিয়ে দিলে ছিঁচকাঁদুনে একটা মেয়ে পাড়ার

পাঁচজনে, হয়ে গেল বিয়ে। ছেলের মা একচোখে হাসে, এক-চোখে কাঁদে আর বলে, 'বউ তুমি রইলে, পাড়ার পাঁচজনা তোমরা রইলে, আমি চললুম টুকরি হাতে পাড়া ছেড়ে।

আমার ঘরও রইল দুয়ারও রইল
আমি চললেম খালি
হয়ে বরানগর কাশীপুর
হাওড়া শালকে বালি।'

বুড়ি ভেখ নিয়ে বেরোতে চায়, কচি বউ কাঁদে ঙ-ঙ, মনে পড়ে যায় কোলের ছেলের কান্না, যাওয়া হয় না ভেক নিয়ে বেরিয়ে।

'বলি ও ছেলের মা, বসে আছ যে, যাচ্ছ কবে শুনি!'

'আর যাওয়া! যে বউ করে দিয়েছ, তোমরা দুয়ারে চৌকাট পাড়াতে গেলেই কান্না ধরে।'

'আহা কাঁদুক গো কাঁদুক, কাঁদবে না। বল কি! কচি মেয়ে পরের ঘর করতে এসেছে —'

'তাই তো ভাবি গো, পড়শিরা, কোন্ চুলোয় যাব আর। বসে থাকি ঘরে বউ আগলে।'

'তোমার বেটা কী করছেন আজকাল!'

'সে গেছে ঐ জঙ্গলে কর্পূর গাছ কেটে আনতে।'

'কেন গো, কর্পূর কাঠের খোঁটা দিয়ে ঘর তুলবে, না তক্তা চেলে সিন্দুক গড়বে।'

'কী জানি ভাই, শুধোলে বলে কর্পূর কাঠে একটা কিস্তি বানাবে। তুফান যেদিন আসবে, সেদিন জরু গরু সবাইকে নিয়ে ভেসে পড়বে, গ্রামখানা ডোবার আগে।'

'তুফান রোগ এখনো ছাড়েনি তাহলে! বল তোমার ছেলেকে ডাঙায় কিস্তি চালাবার মতলব ছাড়ুক! এখন থেকে ঐ পাহাড়ের

চুঁটিতে একখানা বড়ো দেখে ঘর বাঁধুক —তুফান এলে আমরা সবাই সেখানে গিয়ে উঠব।'

'তাই বলে দেখব, যদি রাজি হয়।'

'যাই বল ছেলের মা, ঐ তুফানেই দেখবে শেষে তলাবে তোমরা সবাই।'

'তুফানের তো এখনো দেরি আছে—দেখি এর মধ্যে যদি ছেলের সুবুদ্ধি জোগায়।'

'জোগাবে গো জোগাবে, সময় কালে জোগাবে যেমন জুগিয়ে থাকে অনেকেরই।'

'যদি না জোগায় ভাই —তবে উপায় কী?'

'নিরুপায়ে উপায় রুপায় —রুপোর তাবিজটা বাঁধা দিয়ে নোয়ার বালা একটা কষে দাও ছেলের হাতে, —দেখবে কিস্তিমাতের বেলায় ফল পাবে।'

'আমাদের তেনারই মতো।'

এমনি তেনার মতো করতে করতে তাবিজ পঁইচি, হাঁসুলি, মাদুলি সব গেল ছিঁচকাঁদুনি বউটার। রইল ঘরের চারখানা ফুটো চাল, মেঝের ছেঁড়া মাদুর আর হেঁসেলের চুলোটা হাঁ করে —তার মধ্যে বেঁধেছে উইচিংড়িকটা বাসা! উঠানের কোণে মশলা বাটা শিল বুকে নোড়া চাপিয়ে, আর কুয়োতলায় ফুটো ঘটিটি গলায় ফাঁসি দেবার দড়ি আগলে।

সেইকালে অকাল পড়ল দেশে, আকাশ ছিল নীল, হয়ে উঠল ঘোর কালো। শুকতারা সন্ধ্যাতারা মিটি-মিটি করে যেন নিভতে চায় বাতাসে। হাওয়া সুর ফেরায়, ফুল ফোটাবার দিন আর আসে না। ঝড়ে কাত হয়ে পড়ে ফুলের গাছ, মচকে যায় ফুলের ডাল। ছচিমচি হয়ে যায় সারা মালঞ্চ। রাতের আকাশে চাঁদ উঠে না, বিদ্যুৎ খেলে। দিনের আকাশে পড়ে থেকে পড়ে বাজ। শুকনো কুয়ো ঘিরে ব্যাঙগুলো ডাকে গজব বড়ো —গড় বড়ো —জড় নাই —জড় নাই। মুশকিল আসান মুশকিল আসান রব তোলে পাড়া।

সুরে ডাকে দিনে দুপুরে শ্যালগুলো। সেইকালে কী হল —বুড়িকে ডাক দিলে স্বপনে এসে তার ছেলে, 'চলে এস, চলে এস।' শুনল সে কানে-কালা বুড়ি, ছানিপড়া দুচোখ মেলে দেখলে স্পষ্ট —কর্পূর কাঠের নৌকো বেয়ে আসছে তার ছেলে, প্রচণ্ড তুফানের উপর দিয়ে আসছে কিস্তি, সাদা পাল তুলে, দুধের ফেনা কেটে কেটে দুলতে দুলতে —

দুলতে দুলতে বান এসেছে
জলে কত চাঁদ ভেসেছে।

এই দেখতে দেখতে রাতের ঘোর কেটে যেতেই বুড়ি পেলে কর্পূর বাস হাওয়ার পরশ, শুনলে একটি কথা, 'মা'! শরীর বুড়ির শীতল হয়ে গেল —মন ঠাণ্ডা হল। আরামের নিশ্বাস ফেলে বুড়ি বলল, 'এলি বাপ আমার!'

শেষ হল বুড়ির দুঃখ ভাবনা সব। ভেসে গেল সেইকালে টুকরি গ্রাম —বানে।

ভাদ্রমাস কাবার করে চাঁইবুড়ো এসে পুঁথি পাঠ শুরু করলেন—

'শিবরাত্রির সল্‌তে জ্বলতে না জ্বলতে
কুম্ভকর্ণের ছুটো ছানা হয়ে লেগেছে
চলতে আর বলতে।'

ছেলের কান্নায় রাক্ষসপাড়ায় সবাই করছে নিশি জাগরণ। কুম্ভকর্ণ কেবল ঘুমে অচেতন —নাক-ডাকা চলছে যেন ঢোল আর ট্যাটরা পড়ছে।

বিরাশি বুড়ি বলছে —'ওলো কুম্ভকর্ণ, ওউ কুম্ভকর্ণের বউ, তোদের ছানা ছুটো চিল্‌লাচ্ছে যেন ফৌ—কর্ণ বধির করলে যে!'

পিলখানার আতুড়ঘরে গোমুণ্ডে জোড়া বাতি ধরে নিশিন্দিবুড়ি বলছে —'ওগো দেখগে তোমরা, জোড়াকাত্তিক মউরের লেগে কাঁদছে।'

রাবণ আর কালনিমি মামা আসতে নিকষি বুড়ি বলছে —'বাবা রাবণ, 'এদের বাপ তো ঘুমে অচেতন। একজোড়া কাত্তিকের মউর এনে তুমি এখন ওদের ভোলাও, নাহলে বাঁয়া তবলা চাপড়াতে চাপড়াতে আমার হাতে ফোস্কা পড়ল।'

রাবণ কালনিমি মামার দিকে চেয়ে বলছেন —'মউর কোথা পাই মামা?'

—'কাত্তিকের মউর, সে তো কাত্তিকের শেষাশেষি শরবনে উড়ে পালিয়েছে; একই জাত মোরগ আর মউর, অই ছুটো ধরে দাও — আপদ চুকে যাক।'

—'তা কেমন করে হয় মামা! মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘনে পাপ অর্শাবে। কাত্তিকের মউর আনা চাই রাত্রির মধ্যে।'

—'তবে আমি নিরুপায়! শরবন কী এখানে? সমুদ্র-পারে হল কৈলাস পর্বত, তেরাত্তিরের পথ সেখান থেকে কাত্তিকের জন্মস্থান শরবন—সেখানে হল মউরের আস্তানা। যেতে আসতেই আজকের রাত কাবার হয়ে যাবে।'

—'আমরা যে নিশাচর সেটা ভুললে নাকি মামা?'

—'এই তো বাবা ঝঞ্চাটে ফেললে!' বলে মামা ছড়া আওড়ান—

'কৈলাসে কি যেতে আছে শিবরাত্রিতে
ভূতের হাতে প্রাণ দিতে?
মউর ধরা সহজ না   এড়ায়ে ভূতপ্রেতের কড়াখানা
জলার পেত্নীরা সরা জ্বালিয়ে
শরবনের ঘাঁটিতে'

—'ফুঃ!' বলে রাবণ মামার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে গমনোদ্যত।

—'থাম বাবা থাম, মামার কথা মান—

তোমার মাতৃভক্তিতে ধন্যবাদ, রক্ষা কর বাবা রক্ষনাথ।
ফেসাদ বাধালে বিশ্বনাথ চটবে—
যেও না শিবের পাহাড়ে করতে লুটপাট!

বরং দুটো সিন্ধুঘোটক ধরে দাও—রাজার ছেলে চড়ে খুশি হয়ে যাবে।'

রাবণ কোনো কথা মানে না দেখে মামা আপত্তি তুললেন—'মাঝ-পথে যে সমুদ্দুর!'

রাবণ খানিক ভেবে বললে—'দুখানা তক্তাতে কলসি বাঁধা যাক দু-সার।'

—'বাবা, এ বুদ্ধি কে ঢুকালে মাথায় তোমার ?'

—'কেন মামা, ময়দানব আমার শ্বশুর !'

—'বুঝেছি, জামাতার প্রতি শ্বশুরের মমতা প্রচুর ।'

যেখানে যত তক্তা, ভাঁড় আর কলসি ছিল দড়াদড়ি দিয়ে বেঁধে রাবণ বললে —'মামা দেখ আর কী, উঠে পড়—একে বলে বহিত্র।'

—'তা বুঝেছি, চল উঠি ।'

কুড়ি হাতে জল কাটতে শুরু করলে রাবণ, তেজে চলল বহিত্র। মামা মাঝির জায়গায় বসে ভাটিয়ালি গীত ধরলেন —

'বাবা, বহে চল বহিত্র
কুড়ি হাতে
দেখ ফুটা না হয় কলস কটাতে
মাঝ-দরিয়াতে অত্র !'

—'সে কী মামা !' বলে রাবণ যত ঝাঁকি টান দেয় ততই গান বার হয় মামার —

'বাঃ বা কী বহিত্রই বানিয়েছে শ্বশুর অতি বিচিত্র
ছারপোকা একরত্তি,
চলল সাগর তরতি
তাউস শিকারে মউর তক্তি চিত্র সুচিত্র ॥'

রাবণ আহ্লাদে তিন ঝাঁকি দেওয়াও যেমন, মউর তক্তি অমনি সমুদ্রের ঢেউকে গোঁজা মেরে শরবনে ভীষ্মের শরশয্যায় কাত হয়ে পড়ল —মামা ভাগনেকে নিয়ে।

কালনিমি কাদায় লুটোপুটি, গা ছড়ে রক্তপাত ; রাবণকে ডেকে বললেন—'বাপ মাতৃভক্ত, এখন কী করা যায় ? তুমিও মরলে মারলে মামায়।'

রাবণ বললে—'ভয় কী মামা, কাত্তিকের জন্মস্থান—স্বর্ণ-শরবন।'

—'খোঁচা-খাঁচা খেয়ে তা বুঝেছি বাবা। এখন কাদা থেকে ধরে ওঠাও তো বাঁচি!'

—'কাদা কী মামা, এক খাবল তুলে দেখ, রজত পর্বতের গলিত রৌপ্য খাঁটি!'

—'রও বাবা, জলটা একটু দেখি —ঠিক হয়েছে —

সিদ্ধি-গোলা জল স্বর্ণ-শরবন,
রজত পর্বত – মউর জোড়া দিয়েই হয় ষড়ানন।'

—'বাবা, দাও তো ভেঙে কাটি একটি, দেখি সোনা না গিল্‌টি!'

—'যা খুঁজতে এসেছি, তাই খুঁজি চল।'

—'আর শরবনে ঢুকে কাজ কী বাবা, কাটিকুটি ফুটলে বিপদে পড়বে।—

আছ স্বপদে সম্পদে এখন,
পদে পদে ঠেকবে তখন।
আছ মদমত্ত হাতি, শরবিদ্ধ হয়ে হবে কানামাছির মতন।
বাবা বেম্মার কাছে পেয়েছ মুণ্ডকাটি বর,
প্রেকারান্তরে হয়েছ অমর,
চক্ষু গেলে নতুন চক্ষু পাবে —পাও নাই তো সে বর,
চক্ষু যাবে —লজ্জা ও দুঃখু রইবে তখন॥'

—'মামা, শরকাটির খোঁচায় হটে না রাবণ!'

—'বুঝিয়ে বলো বাবা, না হটবার কারণ!'

—'কেন? পুরোনো মাথা-কটা কেটে ফেলে নতুন মাথার সঙ্গে নতুন চোখ আদায় করে নেব।'

—'বাবা, তোমার বিশ্বাসকে ধন্য, বুদ্ধির তারিফ অগণ্য। আচ্ছা

বাবা, এইখানে দাঁড়িয়ে একবার মেঘগম্ভীর স্বরে গর্জন কর তো দেখি, মউর নাচতে নাচতে এসে যায় কী না !'

—'তুমি মামা দাত্বরীর বোল ছাড়।'

—'হা রে নীলার মউর, হীরার তোর হীরার চোখে নিশার ঘোর
খেলার মউর বর্ণ গউর —কাঠি কাঠি পা
ডেকে আয় না কোঁকড় কোঁক কোঁকড়—'

—'কই মামা, কারুর দেখা নেই যে ?'

—'বাবা, কাত্তিকের মউর কাত্তিকের সাড়া চেনে।'

—'মামা, আকাশে ওটা দেখা যায় কী ধুতরো ফুলের মতো ?'

—'কৈলাসের চুড়ো আর কি !'

—'চল না মামা, ওখানে উঠি।'

—'রও বাবা, ভাবতে দাও—না, আর যাবার প্রয়োজন নেই।'

—'কেন মামা ?'

—'বাবা, দ্রুতগমন নিষ্প্রয়োজন। মউরে চড়ে না ষড়ানন — চড়েন বর্হি।'

—'বর্হি কাকে বলে মামা ?'

—'জাতিচ্যুত ঘোড়ার ডিম—তাই ফুটে ছানা বার হয় কচিৎ যদি কোনোদিন, পক্ষিছানা তাকেই বলা হয় বর্হি। পণ্ডিতেরা কাজেই বলেছেন—

'তর্হি বর্হির বৃথা অন্বেষণ,
চোখ কান থাকতে কর আস্তে আস্তে গমন।
শিব শিব বলি শিবরাত্রিতে জোড়হাত
জোড়া কাত্তিকে না হয় রাত কাবার।
বল ছানাপোনা সদ্যোজাত অকস্মাৎ
না করে উৎপাত কেঁদেও করে চিৎকার।'

—'একথা বললেই হত তখন।'

—'বাবা, তোমার তাড়ায় হয়েছিলাম বিস্মরণ।'

—মামা ভাগনে দুজনে এ ওর কান মলে সে তার নাক মলে বহিত্র বেহে করুন পুনরাগমন।

এসে দেখে কুম্ভ নিকুম্ভ দুটোতে ঘুমে-গড়াগড়ি যাচ্ছে তক্তার নিচে —আর সাড়াশব্দ নেই।

এই বলে চাঁই-বুড়ো উঠে আস্তে আস্তে প্রস্থান —পা টিপে টিপে।

—'আরে এস এস অবুবাবু, গল্প শুনবে। কিছু এনেছ নাকি?'

—'না চাঁইদাদা, আজ কিছুই পাইনি,—লেবুর লজেঞ্জুস আছে।'

—'ও আমার চলে না, তুমি রাখ।—হাই উঠব-উঠব হলে একটা গালে ফেল। হাঁ, তারপর বলছিলেম কি, চার ভাই —উত্তর ডিহি, দক্ষিণ ডিহি, পূর্ব ডিহি, পশ্চিম ডিহি—চার ডিহির মালিক। রাজা বললেও হয়। সুখে বসবাস করচেন, আপ্তকুটুম, দাসদাসী, লোকলস্কর ঢের। কেয়াতলার কালীবাড়ি, তারই কাছে মস্ত বসতবাড়ি।—সদর-বাড়ি, অন্দরবাড়ি, রান্নাবাড়ি, পুজোবাড়ি, এমনি অনেকগুলো ছোটো-বড়ো বাড়িঘর নিয়ে একটা সাতমহলা ব্যাপার যাকে বলে—বুঝেছ?'

—'বুঝেছি, মাসিমার জয়নগরের বাড়ির মতো।'

—'আরে না গো জয়নগরের বাড়ি বড়ো বড়ো ইঁট দিয়ে গাঁথা, সাহেবমিস্ত্রির তোলা ইমারত; আর সে সাতমহলা বাড়ি পাঁচ ইঞ্চি ইঁটের আর কাদার গাঁথুনি—পুরু পুরু দেওয়াল, মারলে শাবল দুম্‌ড়ে যায়, একখানি ইঁট খসে না—বুঝলে?'

—'সে-বাড়ি এখনো আছে?'

—'তা কখনো থাকে? শাবল মারলে ভাঙে না সেবাড়ি! কালের কবলে পড়ে ভূমিসাৎ হয়ে ইষ্টকস্তূপে পরিণত হয়েছে, ঝুড়ি-ঝুড়ি সেই ইঁট কুড়িয়ে কত লোক নতুন দেওয়াল তুলে বসে গেছে ঘরবাড়ি ফেঁদে, বড়োমানুষি করছে—একেই বলে ভাই —যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই!'

'আচ্ছা—চাঁইদাদা, সেই চার ভাই—তাদের আপনার জন কী কেউ বেঁচে নেই এখন?'

—'কেন থাকবে না—এই আমি আছি বসে জলজ্যান্ত, আর সুন্দরবনের রায়-বাঘিনীর জুড়ি তোমার চাংড়াদিদি —তিনি হাঁক

পাড়ছেন শোন রান্নাঘরের পিছনে, খিড়কি-পুকুরের ঘাটের কাছে। —ছোটো দু-ভায়ের আমরা দুটি আছি।'

—'বড়ো দু-ভায়ের কেউ কোথাও কী আছে?'

—'আছে শুনেছি, একজন দুজন।—ইস্ফাহানে, ইস্তামবুলে, ইজিপ্টে, ইজিচেয়ারে বসে হাবোল-বাবোল টানতে আর ধুমা ছাড়তে আরবীপাসার উজির নাজির হয়ে, কেউ বা আছে কাবুলিওয়ালার বেশ ধরে, বোগদাদ বসোরাতে বেদানা আঙুর ফেরি করতে। ভোল ফিরে গেছে, তাদের চেনাই যায় না আমাদের কেউ বলে। বোলও তাদের অন্যরকম। তারা রবাব বাজিয়ে গান গেয়ে দিনে মেওয়া বেচে, রাতে সিন্ধবাদ জাহাজীর মজলিশে বসে আওড়ায় —"আলফ লয়লা ওয়া লয়লা"!'

—'তোমার সঙ্গে তাদের কারুর দেখা হয় না চাঁইদাদা!'

—'কেন হবে দাদা? যদি তাদের কাছে ধার করে গায়ের ধোসা কিনতেম তবেই দেখা হত।'

—'কেন?'

—'ওর মধ্যে কিন্তু নেই দাদা। ধারে শাল নিলেই এসে যায় তারা। লাঠি হাতে দুয়ারে এসে হাঁক দেবে—পেসোর সে আতা হুঁ —অমনি ঘরবাড়ি ফেলে দে-দৌড় করতে পারে তো বেঁচে গেল সে-বছরের মতো বেচারা।'

—'নাহলে?'

—'নাহলেই কলম্বানেবু শুঁড়িয়ে জাতটি খুইয়ে দিয়ে চলে যাবে সে। তাতেই তোমার চাংড়াদিদি কলম্বানেবুর উপর চটা।'

—'চাংড়াদিদির কথা ছেড়ে দাও, তারপর কী হল বল।'

—'বলি ভাই। এক শকুনের মামলায় ভুচুরের পিসি মাসি —এ হল চানাচুরওয়ালী ও বন্‌লা বোষ্টমী। আর এক কলম্বানেবুর মামলায় আর-এক উৎপাত বাধল ও তোমার চাংড়াদিদির দিদিমার দিদিমা তার দিদিমারও দিদিমার বিয়েতে।

—রায়দিঘির ছোটো রায়কে রায়গিন্নি ডেকে বললেন,—ওগো,

ছোট্-ঠাকুরঝির বিয়ে দেবার কী করছ ! বয়সটা যে পেরিয়ে যায়।

ছোটো রায় সুখ রায় নিজের টাক মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, —কী করি বল—নিরুপায়।

রতনমালার বিয়ে হওয়া দায় ! কলম্বানেবুর গন্ধের জ্বালায় দুই ভাই দেশছাড়া হয়েছে। রতনমালাটাও বুঝি যায় ! পীরের সিন্নি দিলে যদি রক্ষা পায় এ যাত্রা।

গিন্নিঠাকরুন বললেন— ওমা সে কী কথা গো !

—কেন, গোটাকতক সিকির ওয়াস্তা —এসে যাবে ছেলে, এত ভাব কেন।

—মলেও সে হবে না আমার দ্বারায় তাতে বিয়ে হোক আর নাই হোক।

—বুঝছ না গো, বুঝছ না ! তোমার মেয়েটাও যে বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠল।

—পরের কথা পরে ভাবা যাবে —বলে রায়গিন্নি পান গালে ফেলে চলে যান চানে। রায়মশায় পীরের মানত করেন মনে মনে।

এমনি চলছে। এমন সময় এক সন্ধেকালে কেয়াতলার কালী-বাড়ির আরতি চুকে নিশুতি হয়-হয়, ঠিক সেইকালে রায়মশায়ের দোরে এক ফুটফুটে ছোকরা এসে হাজির।

—কে হে বাপু তুমি ? কনে হতে আসা হচ্ছে ?

—আজ্ঞে আমি পড়ুয়া ব্রাহ্মণের ছেলে। ও-গাঁয়ে টোল আছে, পড়তে চলেছি। পথে আসতে হয়ে গেছে রাত। কোথা যাই এখন !

—ভাল কথা। আজ রাতটা এখানেই কাটাও, কাল তখন যাবা টোলে। এই বলে ছোটো রায় ছেলেটিকে বাসায় রেখে গিন্নিকে ডেকে বললেন—গিন্নি, পাথরে পাঁচ কিল, ছেলে এসে গেছে মনের মতো ! তারপর গুজ্ গুজ্ ফুস্ ফুস্ চলল কর্তাতে গিন্নিতে আধরাত পর্যন্ত। চাকরানীমহলে রটল কথাটা—ছেলে কেমন, উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখাও হল।'

—'তারপর কী হল চাঁইদাদা ?'

—'যা হয়ে থাকে ভাই। সে রাত তো কাটল, তার পরদিন সকালে উঠে ছেলে পড়তে যেতে চায় ভুগিলহাটে গুরুর টোলে—দোর খোলা পায় না, একটি কে এসে খিড়কিঘাটে বাসন মাজছে।

—হ্যাঁগা খিড়কি দোরটা খুলে দাও আমি যাই!

—তাও কী হয় গা, হাত মুখ ধোও, মিষ্টিমুখ কর। যেমন এলে তেমনি কি যেতে আছে!

মিষ্টিমুখ করতে রয়ে গেল ছেলেটি তো রয়েই গেল—আর যাওয়া হল না ভুগিলহাটে টোলের পড়া নিতে। ভুগিলহাটের গুরুমশাই গুনে দেখেন তাঁর সেই একটি ছাত্র খালি পড়ে রোজই। আর পোড়োদের গুরু শুধান —হ্যাঁরা, মুখুটির পোলা গেল কনে? দেখি না যে টোলে!

মুখুটির সন্ধান করে করে গুরুমশাই হয়রান। ওদিকে বেজে উঠেছে ঢাক-ঢোল —রতনমালার বিয়ে।

—বাস! —বলে গুরুমশাই মাথায় ফেটা বেঁধে হাঁপাতে হাঁপাতে উপস্থিত সুখ রায়ের বৈঠকে।

—আসুন, আসুন, প্রণাম! মুখ কিছু মলিন দেখছি যে?

—আর বলেন কেন, অমন ছাত্রটিকে রায়-বাঘে নিলে!

—কী পরিতাপ! রায়মশার বাঘা গোঁফ ঢাকা চাপা হাসি।

গুরুমশায়কে যেন অভয় দিয়ে থাবা বাড়িয়ে একটুকরো কাগজ তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে জানালেন যে গুরুদক্ষিণা এই পাঁচখাদ জমি। —পরিতাপ করবেন না বালকটির জন্যে।'

—'সে ছেলের মা-বাপ কী করলে?'

—'সে জানে তোমার চাংড়াদিদি, আমি ওদের কুলের খবর রাখি না। কাল একটা কলম্বা আন তো আর একটা গল্প বলব।'

—'উঃ কলম্বানেবুর গন্ধ পাচ্ছি যে অবুচন্দরবাবু !'

—'এনেছি, তোমার জন্যে এনেছি একটি, চাঁইদাদা।'

—'বিশ্বাস হয় না, এই নড়ায়ের বাজারে কাগজীনেবুই পাচ্ছেন না তোমার চাংড়াদিদি, আর তুমি কিনা পেলে সাত রাজার ধন একটি মানিক :—এ তো দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।'

—'যদি দেখাই আমি ?'

—'তবে বখ্‌শিশ্‌ দেবো।'

—'কী বখ্‌সিস্‌ আগে বল।'

—'কী বখ্‌শিশ পেলে তুমি খুশি হও ?'

—'একটি গল্প।'

—'ভাল তাই সই, নেবু জোগাও, গল্প কই।'

—'এই নাও।'

—'একী, এ যে অপূর্ব জিনিস —আঃ! কোথা হতে পেলে অবুচন্দর !'

—'মাসির দেশ থেকে মাস্‌চটক্‌মশায় এনেছেন।'

—'ও বুঝেচি, রাখ নেবুটি আমার এই গের্দার তলায় লুকিয়ে। তোমার চাংড়াদিদি দেখলে টেনে ফেলে দেবে !'

—'কেন বেশ তো খোসবো নেবুর !'

—'আরে দাদা, তোমার কাছেও বেশ, আমার কাছেও বেশ— চাংড়ার কাছে ভারি নোংরা।'

—'এ কেমন কথা ?'

—'আ হে অবুবাবু, সে যে কুলীনের মেয়ে।'

—'বুঝলেম না কিচ্ছু।'

—'বুঝবে বুঝবে, আর একটু বড়ো হও বুঝিয়ে দেব। এখন গল্প শুনবে তো তল্প নাও, জল্পনা রাখ, কল্পনা কর —অল্পসল্প!'

—'কল্পনা করতে তো আমি জানিনে চাঁইদাদা!'

—'তা ঠিক, তুমি যে আজকালকার ছেলে—হিস্টিরি পড়ে কখনো কেউ কল্পনা করতে পারে?'

—'তবে?'

—'তবে আবার! ছ্যাখো অবুবাবু এই আমি সেকালের বুড়ো—হিস্টিরি-পড়া মানুষ নয়, তাই কল্পনা করতে আমার ঠেকে না একেবারেই।'

—'চাঁইদাদা, তোমার কথা শুনতে শুনতে আমার ঘুম পেয়ে এল।'

—'ঘুম পায় ঘুমোবে; কিন্তু খবরদার হাই তুলো না —তাহলেই আমার কল্পনা আর চলবে না, রাস্তার মাঝে পা পিছলে একদম আলুর দম হয়ে যাবে। —তখন কী করবে অবুবাবু?'

—'মুখে ভরে দেব ছুট্ মাসির ঘরে।'

—'বটে বটে, তুমি আমারই একজন বটে —কল্পনা করার শক্তি আছে দেখছি তোমার কিছু-কিছু!'

—'শোনো তবে বলি।'

সেকালের পাণ্ডববর্জিত দেশের একটা বুড়ো শকুনি করেছে তাড়া এক বাজপাখিকে ধরবার মতলবে। বাজপাখি সড়াৎ করে সাদা কালো ডানায় ঝিলিক টেনে তো হোক অদৃশ্য; শকুনি শূন্যে শূন্যে তিন-চারটে মস্ত চক্কর খেয়ে উড়ে বসবি তো বোস, ভুচুর রাজার ঘরের মটকায়; বসেই তো বাছতে লেগেছে বুড়ো শকুন ডানার উকুন। এদিকে রাজবাড়িতে সোরগোল পড়ে গেছে।

—কী পোলোরে চালে, কী পোলো!

চিল পোলো না শিল পোলো না ইঁট পোলো!

রানীর চাকরানী পুকুরঘাটে বাসন মাজছিল। সে বলে উঠল — চিল পোলো গো চিল পোলো!

—দেখ দেখ শঙ্খচিল না তো!

—ওমা! চিল হতে যাবে কেন —ওটা যে শকুনি!

শকুনি বলে শকুনি? শকুনির মামা শকুনি! —ডানা মেলে পালক থেকে কাঁকড়ার মতো বড়ো বড়ো উকুন বেছে খাচ্ছে। তাড়ালে নড়ে না।

—কী হবে গো ও পিসিমা!

রাজার পিসি কাত্যায়নী গম্ভীর মুখে বললেন —যখন পড়েছে তখন ওরে নড়ান শক্ত, ও কিছু নিয়ে তবে উড়বে।

ছোটোপিসি দাক্ষায়ণী বললেন, এ তো বড়ো দোষের কথা হল—

আজ মটকাতে পড়ে শকুন—
ঠোঁটে বেছে খেলে উকুন।
কাল বাড়া ভাতে পড়বে মাছি,
তখন আর কোথায় আছি॥

এই সময় খবর আনলে ডুমনিপাড়ার কুসমি —'ওগো মাঠাকরুনেরা আপদ ঢুকেছে—শুক্‌নিটা যেখানেই পড়ল সেখানেই তিনটে খাবি খেয়ে মরল। রাজা আমাদের তেনাকে হুকুম করল মরা পাখিটারে ভেজে খেয়ে ফেলাতে।

ঐ শোনাও যা, কাত্যায়নী ঠাকরুন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে— অ্যাঁ, বলেই চিৎপাৎ কুপোকাৎ —আর সাড়াশব্দ নেই।

রাজার রানী আরামের নিশ্বাস ফেলে বললেন —যাক পিসির উপর দিয়েই শকুন-পড়ার ফাঁড়াটা কাটল বুঝি!

ঠিক সেইকালে কাত্যায়নী বুড়ি চোখ মেলে কট্‌মট্ করে চেয়ে ভাঙা কাঁসির মতো খনখনে আবাজে বলে উঠলেন —তিরদোষ তিরদোষ তিরদোষ, —তিনবারের বার চোখ উলটিয়ে পিসির হয়ে গেল।

সে মাসটা গেল ত্রিদোষ কাটাতে। পরের মাসে ঠিক সেই দিনে সেই সময়ে পড়ল জোড়া শকুনি রাজবাড়ির চালে—এমন জোরে যে মটকা কাত, শকুনি দুটোরও অপঘাত।

—এবার কার পালা—বলে রানী দাক্ষায়ণী পিসির দিকে চাইতেই রাজার ছোটো পিসি দাক্ষায়ণী বললেন—পালা যারই হোক, এক পলা তেল দ্যাও—পুকুরে তিনটে ডুব দিয়ে একবার শুদ্ধ হয়ে আসি! ছোটোপিসি কালিসায়ারে ডুব দিতে সেই যে গেলেন আর ফিরলেন না। কেউ বলে পিসি পেলিয়েছেন, কেউ বলে কুমিরের পেটে গেছেন। জাল টানা হল কালিসায়ারে। পিসি না উঠে উঠল জালে একটা রাঘব বোয়াল—মরে দাঁত্ ছিরকুটে আছে। খোঁজ খোঁজ—পিসি গেল কোথায়? সন্ধান মিলল গিয়ে পিসির বনগাঁয়ে। সেখানে বসে আছেন রাজার পিসি চানাচুর ভাজার ঠোঙা হাতে—পাশে তাঁর বোষ্টমী মাসি খঞ্জনী বাজিয়ে ধরেচেন গীত—

নিপট নিরদয় তোমার দয়াময়
বলাও বল কোন্ গুণে!
হয়ে রাজকন্যে বনবাসী,
দাসী হয় রাজমহিষী,
— সকলই তোমার কৃপায়!
যারে রাখ পায়, সে কী না পায়,
যারে না রাখ পায়,
বিপদ ঘটাও পায় পায়;
হাসি পায় হে পায়,
পায়ে ধরার দিন মনে হলে॥

— ওকী অবুবাবু, হাই তুললে যে?'

—'কী জানি চাঁইদাদা, তোমার গান শুনে হাসি চাপতে গিয়ে হাই তুলে ফেললুম।'

—'তাহলে আর গল্প চলল না, অবুবাবু। কল্পনার হিস্টিরিয়া হয়েছে —যা-তা আবোল তাবোল বকছে সারা রাত —তুমি আজ ঘরে যাও, কাল এস ঠিক এই সময়ে।'

—'কালও কী নেবু আনতে হবে?

—'জোর জুলুম করতে চাইনে। পাও যদি এনো —কিন্তু গোপনে —চাংড়া না টের পায়।'

—'আচ্ছা।'

কাষ্ঠ-বিড়ালের পুঁথি

রাবিশ বুড়ো আফিস্‌ যেতে খোঁচাদিয়ে রাবিশ গাদায়,
এক বাণ্ডিল লেখা কাগজ ঢিল দেখতে পায়।

যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই—বলেই বাণ্ডিলটা বুড়ো পকেট-জাত করে আফিসের পরে বাড়ি ফিরে পাঠোদ্ধার করে ফেললেন, যথা—

কাষ্ঠ বিড়ালের পুঁথির—না কর অযত্ন।
পঠনে যে ফল শ্রবণে সে ফল কয়েছে বিদ্যারত্ন॥

অকূল চিন্তাসাগরে রাম মগ্ন আছেন, এমন সময় পৃষ্ঠদেশের তূণ হতে সীতাদেবীর পালিত কাষ্ঠবিড়াল মুখ বার করে বলছেন—মা জানকীর সংবাদ কি পিতা?

সংবাদ ভাল, হনুমানের বাক্যে কিছু আশার সঞ্চার হয়েছে।

কাষ্ঠ-বিড়াল মিট্‌মিট্‌ করে বলেন, তবে আর কিসের চিন্তা?

এই অসাগর সাগর পার হই কিসে তার চিন্তা। এর একটা উপায় ঠাউরে বলতে পার?

—পারি প্রভু।

—বল তো বৎস।

কাষ্ঠ-বিড়াল তখন রামের সামনে কান চুলকে বলছেন—পঞ্চবটীতে থাকতে একদিন গোদাবরীর পার বনে গিয়ে চাটাই পাখী দেখতে কান্না ধরেছিলেম, আপনারা তখন কুটীরে অনুপস্থিত। মা জানকী বললেন, বাছা কেমন করে যাবে? ওপার বন আর আমাদের ঘরের মাঝে যে দুরন্ত গোদাবরী নদী! আজ থাক, কাল

তখন দেবর লক্ষ্মণের তূণে চড়ে যেও। আমি ছাড়ি না, তখন মা জানকী একটি বটপাতায় রামনাম লিখে সেই ভেলায় আমাকে চাপিয়ে জলে ভাসিয়ে দিলেন। ভেলা গোদাবরী পেরিয়ে ওপারে ঠেকল সহজে। প্রভু, আপনি বটপাতা কাঁঠালপাতা কলাপাতায় নিজের নাম লিখে ভাসিয়ে দেন সারি সারি —বানর সৈন্য সেই রামনামের ভেলায় পার হয়ে যাক লঙ্কায়!

নাম সই করার কথায় রামের হৃৎকম্প উপস্থিত। তিনি উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে কাষ্ঠ বিড়ালের পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন —বৎস, সে হয় না। আমার নামের জোরে আর সবাই যেন পার হলো, আমি তো আমার নামের গুণে তরতে পারব না, অন্য উপায় চিন্তা কর যাতে সবাই এক সাথে যেতে পারি সীতা উদ্ধারে।

কাষ্ঠ বিড়াল তূণের মধ্যে ঢুকে একটি বাদাম চিবোতে থাকুক। ও দিকে শতযোজন সাগর গোল-গম্ভীর আওয়াজে বলে চলুক — উদরম্ দুঃখ মন্দিরম্ বার বার তিনবার —এমন সময় লক্ষ্মণ ছুটে এসে বলছেন দাদা —'শিলা জলে ভেসেছে দেখ সে।'

—বল কি ভাই, দেখিলেও না হয় প্রত্যয়!

বলে রামচন্দ্রর দেখতে চললেন! লক্ষ্মণের তূণে সীতাদেবীর কাষ্ঠ-বিড়াল রামনাম জপতে জপতে চলল!

জয়ন্তী বাগের পুরোনো মালী নালিশ জানালে —'কলা বাগানে হনুমান পড়েছে।'

বাদশাবাবু হুকুম দিলেন —'গুলতি চালাও, তাতে যদি না হটে তো দোনলা বন্দুক —'

খাতাঞ্চিমশায় কানে হাত দিয়ে বললেন —'অমন কথা বলতে নাই বাদশাবাবু। একটি রামদাস হত্যার পাপ কোটি ব্রহ্ম হত্যার চেয়ে কোটি গুণ বেশী। তাছাড়া বন্দুক চালানোর লাইসেন্‌স্‌ কোম্পানি বাহাদুর এই লড়াইয়ের সময় দেবেই না —ভুঁই পটকার উপরে টেক্‌সো বসেনি, এখন তাই চালাতে হুকুম দাও।'

ভুঁই পটকার শব্দে বাগিচার ভুঁই কুমড়ো বাঁচে ইঁদুরের হাত থেকে চাল কুমড়োও কিছু বাঁচে —কলার কাঁদি রক্ষে পায় না।

বাদশাবাবু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন, —'সব কলা খেয়ে যাচ্ছে খাতাঞ্চিমশায় উপায় কর।'

খাতাঞ্চিমশায় বাঁধা পুকুরের ঘাটে বসে তামুক টানতে টানতে বললেন —'এক সল্লা আছে, লঙ্কা গাছের ডাল পুড়িয়ে সেই কাট-কয়লা দিয়ে বড়ো বড়ো করে দেয়ালের গায়ে রাম নাম লিখে ছাড় তো দেখি কী ফল হয়।'

সোনাতন বুড়ো খাতাঞ্চিমশায়ের পায়ে হাত ঘষছিল শুনে বললে,—'ওতে ফল হবে না কর্তা।'

'কেন ফল হবে না শুনি ?'

—'আজ্ঞে কিত্তিবাস লিখে গেছেন 'যেখানে রাম নাম সেখানে হনুমান' কলা বাগানে উৎপাত বাড়বে বই কমবে না।'

'হু' বলে খাতাঞ্চিমশায় পা দুখানা টেনে নিয়ে খড়মপায়ে ঘাট

ছেড়ে বাগান তদারকে চললেন। পাছে পাছে বাদশাবাবু বুড়ো মালী আর গোল পাতার ছাতা ধরে সোনাতন।

পুকুরের উত্তর পাড়ে কলা বাগান, তেঁতুল তলা থেকে আরম্ভ করে পাথরের চৌকি পাতা কয়েৎ বেল গাছটা পর্যন্ত। সেই বেলতলার পাথরের বেদীতে খাতাঞ্চিমশায় দ্বিতীয় আশুতোষ যেন ধ্যান মুদ্রা করে বসে বললেন —'দেখ বাদশাবাবু ঝড়ে হেলা বুড়ো বেলগাছ —এতে ফলও ধরে না পাতাও নেই দেখতে পাচ্ছ।'

—'ঐ যে ফুল ধরেছে খাতাঞ্চিমশায়।'

বুড়োর ধ্যান ভঙ্গ। উপরে চেয়ে দেখলেন শুকনো ডালে লাল কালো সাদা ডোরাটান একটি প্রজাপতি সবে গুটি ফেটে বেরিয়ে রোদে ফুলের পাপড়ির মতো দুখানা ডানা শুকিয়ে নিচ্ছে।

—'বাতাসটা যেন কেমন কেমন লাগছে —'বলে প্রজাপতির ডানার মতো ডোরাটান পুরোনো আমলের কাশ্মেরী শালখানা কাঁধ থেকে নামিয়ে বললেন, —'বাদশাবাবু ও পাথরের চাতালে লিখে রাখ —'

'রাম নামের টানে হনুমান আসে, চিটে গুড়ে যেন পড়ে মাছি।'

'এখন এই শোলোকের নিচে তিন শ' জয়রাম লিখে ছাড় — দেখবে কলা বাগান ছেড়ে সব হনুমান এই স্থানে জড় হবে, কলার আর নামও করবে না। বেলও পাবে না বুড়ো গাছে, খেয়ে বাঁচুক গুটি পোকা —বন্ধ থাক ক্ষেতে ঢোকা'—বলে খাতাঞ্চিমশায় ঘরমুখো হলেন।

খাতাঞ্চিমশায়কে ঘরে দিয়ে সোনাতন বেলতলার ঘাটে ফিরে এসে বললে —'বাদশাবাবু রাম লিখতে মিছে তখলিফ নিচ্ছো। কলির হনুমান প্রায় মানুষ হয়ে গেছে ও নামে ভুলবে না। আমার কথা শোনো চাঁই বুড়োকে ধরে পড় যদি কিছু হদিস বাৎলাতে পারেন তো কলা বাগান রক্ষে পায়।' বুড়ো মালীও এ কথায় সায় দিয়ে বসলো ঘাস নিড়োতে।

* * *

সদর অন্দর দুটোর মধ্যে আঙিনা তারি উত্তর ধারে জয়ন্তী ভবনের ঠাকুর বাড়ি। উঠোনের একধারে তুলসীমঞ্চ সেখানে চাংড়া বুড়ি বসে হরিনাম করছেন রাতের মুখে চেয়ে। বাদশাবাবুর পায়ের সাড়া পেয়ে বললেন —'এস বাদশা দাদা কী মনে করে।'

—'চাঁই বুড়োর সঙ্গে দেখা করব দিদিমণি?'

—'তিনি এখন পুঁথি নকল করছেন, একটু রোসো ডাক দিই — ওগো শুনছ, বাদশাবাবু তোমাকে চান।'

—'হুঁ যাই,' বলে চাঁই বুড়ো নামাবলি গায়ে বেরিয়ে এসে বললেন —'কী চাই দাদাভাই?'

—'হনুমানে সব কলা খেয়ে যাচ্ছে এর উপায় কি?'

—'উ-পা-য়' বলে চাঁই বুড়ো তিনবার তেলা মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, —'কলিকাল না হলে উপায় হত কলা বাগান বাঁচাবার।'

—'তবে?'

—'তবে আর কী বাদশাবাবু —কলার আশা ছাড়। চা খাও, টোস্ট খাও, হ্যাপি বয় খাও, টফি খাও, কফি খাও —'

চাংড়া বুড়ি শুনে বললেন —'ওগো তুমি যে কবাতে শুরু করল। বাদশাদাদার কি উপায় হবে তাই বল।'

—'হবে হবে, উপায় উনি করবেনই, সে ভাবনা নেই। ভাবনা আমার মতো লোকের যারা পুঁথি নকল করে আর থেকে থেকে কবায়।'

—'তুমি কিসের পুঁথি নকল করেছিলে চাঁইবুড়ো?'

—'ব্যবকলনের পুঁথি দাদা!'

—'সে পুঁথি কেমন দেখাও না।'

—'সে দেখতে হয় না বাবু শুনতে হয়। ব্রাহ্মণকে দুবেলা পাঁঠার ঝোল মেটিলীর চচ্চড়ি খাইয়ে।'

—'আমি সেই পুঁথি শুনবো চাঁইবুড়ো!'

—'খাতাঞ্চিমশায়ের হুকুম আনো। অমনি তো হয় না। উঠান জুড়ে ফরাশ বিছোতে হবে, চাঁদামালা সাজাতে হবে, সামনের

নবমী থেকে শুরু করি পাঠ কী বল বাদশাবাবু। পাঠা যেন ভুল না হয় দেখো তা হলে ফল হবে না।'

'ফলও হবে না' বলে মালী ঠাকুরকে প্রণাম করলে।

বাদশাবাবু বললেন —'আচ্ছা তাই হবে।'

*　　　*　　　*

বোমার ভয়ে সবাই পালিয়েছে বিদেশে কাজেই বাদশাবাবুর নিমন্ত্রণে বড়ো কেউ পুঁথি শুনতে আসতে পারলে না। নবমীর সন্ধ্যা উৎরে চাঁইবুড়ো বসলেন জয়ন্তী বাগের আঙিনাতে। ফরাশ আর বিছোতে হল না; ধোয়া জাজিমের প্রায় পরিষ্কার চাঁদের আলো উঠান জুড়ে বিছিয়ে পড়েছে, বাইরে সুপারি আর নারকেল তেঁতুল আর আম গাছগুলো গলা বাড়িয়ে স্থির হয়ে শুনছে যেন। সব উপরে নীল চাঁদোয়ার মতো নিথর আকাশ। শেয়ালগুলো হোয়া দিয়ে সাঁঝি ফুকরে চুপ করলে —পুঁথি পাঠ শুরু হোল। শ্রোতার মধ্যে সোনাতন, বুড়ো মালী, চাংড়া বুড়ি, ভূতি আর বেসি কুকুর আর দাসী চাকরগণ বাদশাবাবুর মাতুর ঘিরে।

চাঁই বুড়ো বললেন —শৃনু

বাদশাবাবু নামদার উপায় ভাবিল কলা রক্ষার
করিলে যে অনুমতি
পুঁথিপাঠে দিলাম মন হতেছে পণ্টক রন্ধন
কলা বনে না যান হনুমতি

শ্রীমত্যা রাম দাসায়ৈ ঐ ঐ চিরং জীবি তায়ৈ হনুমাতা অঞ্জনায়ৈ হুম্ ফট্ ত্রিং চট্—

অযোধ্যাপুরে বার্তাদাসী আর রামদাসী দুজনতে কথা হচ্ছে —

—'বলি ও বার্তা, খবর কি লো'

—'খবর আর কী ভাই রাম দাসী, মেজঠাকরুন ডেকেছেন তাই

রাজা ছুটেছেন মউর উদ্যানে, রামচন্দ্রকে অধিবাস করিয়ে মুনি-ঋষিরা ছালা বেঁধে বাসায় ঢুকছেন।

—তারপর?

তারপর আর কি। ঘড়ি পড়ল সায়নের। সারা দিনের খাটুনি, শুয়েছি না ঘুম বলে কোথায় আছি। তবু কান খাড়া রেখেছি—কে কী বলা কওয়া করে। এমন সময় শুনি রাজদোরে রথের ঘড়ঘড়ানি—বলি, বুঝি রাম অভিষেক দেখতে সামন্ত কি কেউ লক্ষ্মীমন্ত এল। কিন্তু মেজোরানীর অন্দর—সেদিকে তো কেউ আসে না। কে এল তবে? রথের গুরু গুরু শুনে মউর উদ্যানের মউরগুলো 'কে কৈ' 'কে কৈ' বলে ডাক দিয়ে চটকা ভাঙিয়ে দিতেই সজাগ হয়ে শুনলে যা তা আর বলবার নয়। রথ এক এল আর এক ফিরল, আবার এল আবার ফিরল—এমনি চলল কতক্ষণ।

—'তারপর?'

—তারপর আর কি—জেগেই দেখবি তো দেখ মন্থরার মুখ! যেমন দেখা অকস্মাৎ শিরে বজ্রাঘাত। মন্থরীর মুখে হাসি দেখলেম।

—দেখলে?

—হাঁগো রাম দাসী, তুমি যে অবাক হলে?

—হাসিটা কেমন দেখলে?

—রাহু যখন সূর্যের এক চোকলায় কামড় দিয়ে হাসে সে হাসি—দেখেছিস তো?

—না দিদি অন্দরে থাকি সূর্যের মুখ কালভদ্রে দেখতে পাই—ভাদ্র মাসে গরম কাপড় রোদে মেলাতে।

—আচ্ছা, ঘুঁটে যখন পোড়ে গোবরের হাসি তো দেখেছিস?

—ধুমায় চোখে জল আসে দেখব কী করে?

—তবে তো নারলেম তোকে বোঝাতে মন্থরীর হাসি কি প্রকার, ভাল, কত রকম হাসি দেখেছিস বল তো শুনি।

—অট্টহাসি, পষ্ট হাসি, কাষ্ঠ হাসি, চাপা হাসি, বাঁকা হাসি, ঢালা হাসি, মুচকি হাসি —কত দেখলাম দিদি এই বয়সে।

—ওলো, উটকে দাঁত ছিরকুটে মরতে দেখতিস তো বুঝতিস মন্থরীর হাসি কী প্রকারের। পিঠের কুঁজ পর্যন্ত টানা সে এক প্রকারের উল্‌টো হাসি। দেখলে ভয় করে, শুনলে কান্না পায়, মাথা ঘোরে পিত্তি জ্বলে যায়।

দিদি, মন্থরী যে দিন কাঁদবে সেদিন কী কাজ হবে বল তো?

কাঁদবে লো কাঁদবে মন্থরী কাঁদবে একদিন—সেদিন বেঁচে থাকি তো এসে বলব। এখন চলি।

—বসি ও বার্তা একবার এদিকে শুনে যেও।

—সর্বনাশ, সাপের মাথায় পা পড়েছে, কঞ্চুকী বুড়ো আড়াসী পেতে সব কথা শুনছে, এখন কী করি? দে ভাই রামদাসী, তোর গায়ের ধোসাখানি মুড়ি দিয়ে পড়ি, আমার ভাল্‌কো জ্বর এসে গেল। তোরা পালা, যে যার পথ দেখ।

—আসল খবরটা শুনতে রয়ে গেল যে মন্থরী অত হাসছে কেন?

—কাল প্রকাশ পাবে আজ আর শুধোসনে।

—বলি বার্তা, শুনে গেলে না।

—যেতে পারলে তো যাই, জ্বর এসে গেছে—তুই পায়ে বেদনা।

—আচ্ছা আমিই আসছি। আর কেউ নেই তো?

—ছিল দু-একজন পায়ে তেলটুকু ঘষে দিয়ে এই মাত্তর যে যার কাজে গেল।

—ঠিক বলছ?

—ঠিক নয় তবে কি বেঠিক। আমার নাম নয় বার্তাদাসী, যদি রাজবাড়িতে কথা প্রকাশ করে বলি যার তার কাছে। কেন ডাকলে শুনতে পাই কি?

চটকা ভেঙে তুমি সজাগ হয়ে মেজোরানীর অন্দরে কী কথাটি শুনলে সেইটি শুনলেই আমিও তোমায় ডাকলেম কেন বলে ফেলি।

তোমার কথা শোনার আমার সময় নেই —চললেম। বড়োরানীর মন্দিরে —বলেই চাঁইবুড়ো উঠতে যান আসন ছেড়ে।

বাদশাবাবু হেঁকে বললেন —'হয়ে গেল নাকি? এতেই হনুমান পালাবে।'

—'তা কি হয় বাদশাবাবু? হনুমান কি সহজে নড়বে —কত কলা সমূলে খেয়ে কদিন ধরে রামদাসীর পুঁথি শুনে যদি দেশে ফেরে।'

'হনুমানের দেশ কোথায়?'

'মলয় দ্বীপের এক পর্বতে।'

—'সেখানে তো লড়াই বেধেছে —বোমা পড়ছে।'

—'সেই তো ভাবনার কথা বাদশাবাবু। কলা বুঝি আর থাকে না মানুষের হাটে।'

চ্যাংড়া বুড়ি শুনে শুনে বলে উঠলেন —'সে ভয় নেই গো। যতদিন গণেশ আছেন। তাঁর কলা বৌও আছে, কলাও আছে —তোমারও যেমন কথা।'

—'এ এক কথা তো বুড়ি মা ঠিক বলিলা' বলে বুড়ো মালী উঠল।

'নমো গণেশায় ইতি প্রথম কলা' বলে চাঁই বুড়ো পাঠ বন্ধ করতেই 'লুচি ভাজ গো ও কালা ঠাকুর,' হাঁক দিলেন সোনাতন।

গজ-কচ্ছপের বৃত্তান্ত

কালনেমি মামা কহে শুনহ রাবণ
গজগীর পুকুরের কহি বিবরণ।

এই যে দেখছ গজগীর পুকুরটি, এটি ছিল এককালে একটি ডোবা; তারই ধারে ছিল একখানি কুটির সন্তাপণ ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণের দুই পুত্র, ভাগ আর বিভাগ।

'বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ' এই না ভেবে সন্তাপণ একদিন দুই পুত্রকে ঘরে রেখে সিংহল যাত্রা করলেন কাক-পক্ষী না জাগতে।

অগস্ত্য অগস্ত্য বলে মহাজন নৌকা খোলে
বাদাম তোলে পেয়ে সুপবন।
মহাজন সাথে বেপারির হাটে
বেপারে গেল বিপ্র সন্তাপণ।

ট্যাকে একটি চুনের খুটারি, গালে একটা সুপারি, গামছায় দুখানা গুড় পাটালি, এই অবস্থায় সন্তাপণ বাণিজ্যে গেলেন। ফিরলেন তা অপেক্ষা দুরবস্থায়। নুনের জাহাজ ডুবিয়ে, চুপি চুপি রাত থাকতে সেই ডোবার ধারে।

জীবদ্দশায় ধনভাগ্য ব্রাহ্মণের কপালে ছিল না। তাঁর অন্তকাল উপস্থিত হয়-হয়, এমন সময় সেটা প্রকাশ পেল। গ্রামে গ্রামে রটে গেল —

সন্তাপণ তিন ঘড়া ধন গাড়ি পুকুরের জলে
মাত্র দুই পুত্র রাখি স্বর্গবাসে চলে।

খবরটা কে রটাল তার ঠিক নেই, কিন্তু লোকের মুখে-মুখে বামুনে ডোবা হয়ে গেল বাঁধা-পুকুর, কুটির হয়ে গেল সাত মহলা বাড়ি। দুটি পুত্র ছাড়া ব্রাহ্মণের মুখে আগুন দিতে এত যে আত্মীয় কুটুম ছিল তা সেই তিন ঘড়া ধনের খবর রটাবার পর প্রথম প্রকাশ হল। বুড়োর অন্তকালে আপন জনের অভাব হল না।

অন্তকালে কেউ মুখে জল ঢালে,
কেউ দেয় পাখার বাতাস।
কেউ চাপড়ায় আপনার গালে।
ত্রিকোটি-পতি মলো বলে —
করে কেউ হা-হুতাশ।
অন্তর্জলির কালে
পড়শিরা শুধালে —
সন্তাপণ দাদা, ধনের ঘড়াকটা পুঁতে পালালে ?
বেলা অসকালে, চোখ তুলে কপালে
তিন আঙুলে কী দেখালে—
বোঝা গেল কি বোঝা গেল না।
রটনা হল, তেমাথা পথে পুতে গেল
তিন ঘোড়া সোনা
মানকচুর আড়ালে।
ত্রিকোটীশ্বর মলো, হল প্রচার।
হয়ে গেল চন্দন কাঠে রাজঘাটে সৎকার।
তারপর গড়াল শ্রাদ্ধ,
টাকার ভাগ নিয়ে দুই ভায়ে বাঁধল তকরার।
জ্যেষ্ঠে বলে কনিষ্ঠ ভাগ দেব সমুচিত,
জ্যেষ্ঠ বলে ধনটা কোথা খোঁজা তো উচিত।

তা কে শোনে ? ছোটোটা বলে, 'বাপ তোমার কাছে ধন রেখে গেছে,' বড়োটা বলে, 'ধনও জানি না, কড়িও জানি না —এই দড়ি কলসি আছে, গলায় বেঁধে চাস্ তো ঐ ডোবার তলায় নেমে গিয়ে দেখ্‌-গা তিন ঘড়া ধন পোঁতা আছে না কি !' এই তো কনিষ্ঠের কান্না শুনে পাড়ার লোক ছুটে এল। সবাই বলে —টাকা বার কর। কেউ ছোটে তেমাথায় গাঁতি হাতে, কেউ টানায় ডোবাটায় জাল —ইঁট পাটকিল কাদামাটি ছাড়া কিছু হাতে ঠেকে না। ঘড়ার সন্ধান করতে ঘরের মেঝে খুঁড়ে ডোবার চারপাশ খুঁড়ে গজগীর পুকুর কেটে ফেললে কোদাল পেড়ে। অরণ্যের মধ্যে কুড়েখানি ছিল্ল, তা গেল। যখন জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে বললে —

'ভাইরে, আপ্ত ভেদ করিয়া করিলা কিবা কর্ম
গুপ্তধন খুঁজে এমন মর সাতজন্ম।'

তখন ছোটোটা রাগত হয়ে বড়োকে বললে, 'কি বললি, আমি মরব ? তোরে মেরে তবে মরব —দে আমার তিন ভাগের পাঁচ ভাগ !'

'পাঁচ ভাগের তিন ভাগ বল, হস্তিমূর্খ। ভাগ জান না, ভাগ চাও ?'

যেমন এই কথা বলা, অমনি ছোটো ধরেছে বড়োটার নাক কামড়ে; বড়োটা ধরেছে চেপে তার টুঁটি। ধস্তাধস্তি করতে করতে দুটোতে ডোবায় গিয়ে পড়া আর ডুবে মরা। মানিক বাদে ভেসে উঠে ডাঙায় এসে লাগা আর শুকুনের পেটে যাওয়া। শ্যাল দুজনার হাড়গোড় নিয়ে কচুবনে টেনে ফেলালে।

হায় ধনাশা জীবননাশা কোথায় তার শেষ,
জীবনাশা পলায়, ধনাশা রহে যায় —
হাড়ে বেঁধে বাসা আঁকড়ি পাঁজর-দেশ।

ধনের তাপেতে জন্তু হল দুইজন
একজন হল গজ, কচ্ছপ অন্য জন।
ধনের আশা জেগে রইল উভয়ের প্রাণে,
গজ কচ্ছপের কথা শুন সাবধানে।

কালে যেখানে ডোবা ছিল সেখানে হল গভীর সরোবর। যেখানে ছিল বস্তি সেখানে হল হস্তীর জঙ্গল। এমনি —

কচ্ছপ হয় ছোটোটা, থাকে সরোবরে,
গজ হয় বড়োটা, বনমধ্যে চরে।
গজের গর্জনে বনে ফিরিতেছে গজ
তোলপাড় করি জল ফিরিছে কচ্ছপ।

কেউ কারু নাগাল পায় না। এদিকে—

বিনতানন্দন গড়ুর উড়ে অন্তরীক্ষে
গজ কচ্ছপে খাইবার করিছে প্রতীক্ষে।

বর্ছরের পর বছর যায়, গড়ুরের খাওয়া আর হয় না। লক্ষ্মী-পাঁচাকে মনের দুঃখে থেকে থেকে বলে —

'লক্ষ্মী দিদিরে —
গোলোকে টেঁকা ভার হল কল্পতরু নীড়ে।
কত বা কাটি তেলোক, পরি নোলোক
হরি বলি খেয়ে চাল, চিঁড়ে।
গোস্তাভাবে ঠোঁট ভোঁতা
পালক কটা কাটছে কীড়ে।

দিদি কি করি —
পেটের জ্বালায় যাচ্ছি মরি,
গলার নলি হল জিজ্জিরে।'

পেঁচা বলে, 'তাহা তাই তো দাদা, শুকুনির জাত, মাংস না পেলে হবে নিপাত গড়ুড়ের বংশ। লক্ষ্মীঘরে চল, ইঁদুর ধরে খাবে আম মাংস। ইঁদুরের নামে গড়ুর নাক সিঁটকায়। এইভাবে দিন যায় গড়ুরের আহারের সন্ধানে, এমন সময় —

জলেতে কচ্ছপ আছে যেই সরোবরে
দৈবযোগে গজ গেল জল খাইবারে।
প্রথম রৌদ্রেতে গজ তৃষ্ণায় বিকল
সরোবর দেখিয়ে শুণ্ডে তোলে জল।
গজ দেখে কচ্ছপের পড়ে গেল মনে
শুণ্ড কামড়িয়া ধরিল সেইক্ষণে।
গজ টানে বনেতে কচ্ছপ টানে পানি—
গজ আর কচ্ছপ উভয়ে টানাটানি।

গড়ুর শুনছে গজ কচ্ছপে ঝগড়া হচ্ছে—

'আরে পাঁক রে পাঁক, ছেড়ে দে নাগ।'
'বারকর কচ্ছপের দেড় কোটি এক লাখ।'
'ভাই তুণ্ডে নাই গজমোতি শুণ্ডে কাদা জল
ছেড়ে দে তৃষ্ণাতে আমি হয়েছি বিকল।'
'না ছাড়ে কাছিমের কামড়, মেঘ গড়গড় দিক তো ডাক'
'হারে পাঁক রে পাঁক ছেড়ে দে নাক।'
'বারাক আগে দেড় কোটি সাত লাখ।'
'রোস তো বসাই গজদাঁত —
গামলা পেট করি ফাঁক'

গড়ুর দেখছেন —

দুজনে টানাটানি উভয়ে সোসর
কে হারে কে জিতে বুঝে যুঝে একই বৎসর।
দুটারে কাতর দেখে গড়ুর নেমে পৈল
বাম পায়ের নখ দিয়া দুটারে তুলে লৈল।
গজ কূর্ম লয়ে পক্ষী উড়িল তখন
মনে করে কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ

জন্তুদুটোকে লুকিয়ে খাবার আশায় গড়ুর এদিক-ওদিক চেয়ে সমুদ্রের পারে এক বটবৃক্ষ দেখে সেইবাগে পক্ষবিস্তার করলেন। তখন গজ-কচ্ছপ দুটোতে ঝগড়া করছে —

আঁক, ছিঁড়বি নাক!'
'আয় মাখবি পাঁক।
'রোস তো পেটে দাঁত ঝাড়ি।'
'পরের ধনে পোদ্দারি।'

গড়ুর নখের একটু চাপ দিতেই দুটোতে চি চি করতে থাকল। নিকটে বটবৃক্ষ দেখা গেল।

শ্যাম বটবৃক্ষ
শত যোজন ডাল।
অশীতি যোজন মূল
নেমেছে পাতাল!
চারি গোটা ডাল তার
পর্বতের চূড়া

সত্তরি যোজন জুড়ি
মোটা তার গুঁড়া
সেই গাছতলে বসে
বালখিল্য মুনিকুল,
একশতটি যেন
গুড়িয়া পুতুল।
ক্ষীরোদ সাগর পার
বেলা দু-পহরে
ক্ষুধায় কাতর পক্ষী
বৈসে গাছের পরে।
গজ-কূর্ম লৈয়া বৈসে যেমন খগবর
সহিতে না পারে বৃক্ষ তিন জনার ভর।
ভর নাহি সহে ডাল করে মড়-মড়।

মড়-মড়-মড়াৎ শব্দ হতেই গড়ুর পক্ষী বিপদ গণলেন —ভাঙা ডাল পড়ে যদি মুনিগণ মরে —নিজেও ধরা পড়েন। তখন কী করেন গড়ুর, ডাহিন পায়ে ভাঙা ডাল ধরে বাম পায়ে গজ-কচ্ছপকে ধরে উড়ান দিয়ে সমুদ্র জলে পড়লেন। ডালপালা সুদ্ধ ভাসতে থাকল জলে তিন জন।

গড়ুর গজ-কচ্ছপকে ছাড়তে পারলেন না পাছে জলে পালায়। মহা ভাবিত হয়ে বসে আছেন আহার হাতে। এমনি-দিনের-পরদিন ক্ষীরোদ সমুদ্রের একটু করে জল খান আর ভেসে চলেন। এমনি জলে ভাসতে ভাসতে মুঠোর মধ্যে গজ-কচ্ছপ ক্ষীর জল খেয়ে ফুলে চতুর্গুণ ভারি হয়ে উঠল। ডাল-সুদ্ধু তলিয়ে যায় দেখে গড়ুর ডাল ছেড়ে আবার উড়ান দিয়ে এই গজগীর পুকুরের ধারে মহারণ্যে আবার ফিরে এসে যেমন মুঠো খোলা অমনি

কচ্ছপ সলিলে গেল, গজ গেল বন
যেথাকার সেথা রইল তিন ঘড়া ধন।

তাই বলি বাপা, লঙ্কার সব ঐশ্বর্য একা ভোগ করতে চেও না, আমাকে কিছু ভাগ দাও।

যতন করিয়া ধন যেই জন রাখে
নিজে না খায় ধন' যায় সে বিপাকে।
ধন পেয়ে যে জন না করে বিতরণ
যথাকার ধন তথা থেকে যায় অকারণ!
লঙ্কা ভাগ করি চল থাকিতে সময়
ধনেতে বিরোধ বাধলে কি জানি কী হয়।

উপরামায়ণ

॥ হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান ॥

‘অযোধ্যা নগরে রাজা আছিল মান্ধাতা,
সপ্তদ্বীপ অধিপতি পুণ্যশীল দাতা।
মান্ধাতার তনয় হইল মুচুকুন্দ,
সমর পাইলে তার বাড়িত আনন্দ।,
তাহার তনয় নাম পৃথু নরবর
যার রথচক্রে কাটে ছয়টা সাগর।
তার পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু নরপতি,
বশিষ্ঠ নারদে কৈল রথের সারথি।
শতাবর্ত নামে তার হইল কুমার
আর্যাবর্ত নাম হৈল নামেতে তাহার
ভরত তাহার পুত্র অতি বলবান
যাহা হৈতে উপজিল ভারতবর্ষ নাম ॥

মান্ধাতার আমল চলে গেল—হরিশচন্দ্রের আমল তখন। অঙ্গুষ্ঠা, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা—পাঁচটি দেবকন্যা ইন্দ্র-সভায় নাচ দেখাবার জন্যে নটাচার্য ভরত মুনিকে ধরে পড়ল—‘মশায়, উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, অলম্বুষা এঁরাই চিরকাল ইন্দ্রসভায় নেচে বাহাদুরি নেবেন, আর আমরা কোনো কালেই কল্কি পাব না—এ কেমন কথা? নাচ শিখে দেবসভায় যদি নাচতেই না পেলুম তবে এমন বিদ্যে শিখে লাভ?’

বাচ্চা বিদ্যাধরীদের দরখাস্ত শুনে ভরতমুনি বললেন—‘আহা তোমরা বুঝছ না ইন্দ্র বড়ো শক্ত সমঝদার। আরো কিছুকাল

নাচ গান শেখ, তাল মাপ দোরস্ত হোক। তবে নামটি কোর ইন্দ্রের সভায় নাচবার।'

নারদ ছিলেন বসে, তিনি বললেন—'বজ্রধর সহস্র-লোচনকে তুষ্ট করা দায়—তালটি কেটেছ কি গেছ পাঁচটিতে গোল্লায়।'

কে কার কথা শোনে—ইন্দ্রাণীকে ধরে পঞ্চকন্যা সুরসভায় নাচ দেখাবার হুকুম আদায় করলে।

কথাটা কানাঘুষায় শুনতে পেয়ে বুড়ি বুড়ি অপ্‌সরীদের মুখ শুখিয়ে চুন! সবাই মিলে গন্ধর্বলোকে উৎপাত বাধিয়ে ভোলানাথের পুজো মানতে ছুটল। এদিকে পঞ্চকন্যা তারা হাতের আঙুলে দশটা পায়ের আঙুলে দশটা আংটি,—ঘাঘরী, উড়ুনী, খাড়ু বাজু, সিঁতিপাটা বাউটিতে যেন 'তমাল-তালি-বনরাজি নীলা' সাজে ইন্দ্রনীলমটি কুট্টিমে এই-ওড়ে-তো ঐ-ওড়ে এই ভাবে হেলেদুলে পা ফেলে যখন হাজির হল—তখন জয়ন্ত কার্তিকের কানে কানে বললেন—'এইবার উঠল সাবেকি নর্তকীদের পাট।'

ভরতমুনি একদিকে ধরেছেন মৃদঙ্গ, নারদ ধরেছেন অন্য দিকে বীণার ঝঙ্কার—স্বরে ভরপুর সুরসভা।

'কিন্নর করিছে গান—মিলাইয়া তাল মান
—রাগ বসন্ত বাহারে।
ধির কুট ধির কুট্‌ তানানা তাদিম তা
—দিয়া না তানা ঝে ঝে ঝেন্না—বাজিছে সেতারে
বাজে মৃদঙ্গেতে,—ধ্রেকেটে ত্রেকেটে
চল নেচে তালে হেঁটে
নাদেরে তাদেরে দানি—তাল কাটে জানি!
ধেৎ ধেতেরে তেলেনা—হালে পানি পেলে না
না ঘট তালে ঘটকা লাগালে।'

ভরতমুনির হাতে খট্ তা'লে মৃদঙ্গ তেড়ে বেজে চলেছে—খট্ খট্ খটাং চটপট চটাং। নারদী বীণার তার ঝাঁপতালে বলে চলেছে—নেচে যান নেচে যান—ঘুরপাক, খান ঘুরপাক চটপটাং!

পঞ্চকন্যা—তারা এখন নাচছে—যে তাল কাটতে কাটতে সামলে যাচ্ছে—

নাচিতে নাচিতে বাড়ে নৃত্যের তরঙ্গ
সুর সভা তলে বেধে গেছে রঙ্গ
শেষে পঞ্চম সোয়ারীতে—সম না আসিতে
পঞ্চকন্যা করিল তালভঙ্গ।

ব্যস আর কি—ঠক করে ঠিকরে-পড়া অঙ্গুষ্ঠার হীরের আংটি—খসল তর্জনীর গুজরী পঞ্চম—ছিঁড়ল মধ্যমার মধ্যমণি হার—অনামিকার দামী শাড়ির পাড়—কনুই মটকে বাহুস্তম্ভ কনিষ্ঠার।

নারদ বলে উঠলেন—'ওহে ভরত আর দেখ কি? চল সরে পড়ি তুলে মৃদঙ্গ!'

সেই সময় ইন্দ্রসভার নীল ঝাড়গুলো হঠাৎ ঝড়ে দুলে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বজ্রগম্ভীরস্বরে ইন্দ্রের অভিশাপ—

'বড়োই গর্বিতা তোরা হলেছিলি মনে,
স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে থাক্‌গা গাধিনন্দনের তপোবনে,
মুক্ত হবে শাপ হরিশ্চন্দ্রের পরশনে।'

যেমন এই কথা অমনি—আকাশ থেকে পড়ল মাটির দিকে গোঁত্তা খেয়ে পঞ্চকন্যা, যেন কল-ছেঁড়া পাঁচ পাঁচটা চেং-ঘুড়ি, চিলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে।

ইন্দ্রের স্বর্গে তো শাপ-শাপান্ত চুকল —
এদিকে শোনো হরিশ্চন্দ্রের কেমন করে কপাল পুড়ল।

শাপভ্রষ্টা পাঁচ-পাঁচটা দেবকন্যা —পাঁচী, পাঞ্চি, পাংচী, পংচী, পেঁচী নাম নিয়ে পাঁচ-পাঁচি চেহারার পাঁচটি গাঁয়ের মেয়ে হয়ে গাধিনন্দন বিশ্বামিত্রের তপোবনের কাছেই ভুঁই-মালীদের পাড়ায় জন্ম নিয়ে দিনে দিনে খেলাধুলো করে বাড়ছে।

আসছে যাচ্ছে ফুল পাড়ছে পাতা ছিঁড়ছে
বিশ্বামিত্রের তপোবনে,
উৎপাত বাধাচ্ছে যখন তখন কারো বারণ কানে না শোনে
বিশ্বামিত্রের পাঁচ শিষ্য —
উদুম্বর, কমণ্ডল, গর্গরী, নিবার বল্কল
পাঁচ কন্যায় করে দৃশ্য
পাট শাট তুলে পদ্মপাত্রে পদ্য লিখছে
যজ্ঞ ডুমুর খেয়ে কয়জন একমনে।
গুম হয়ে লেখে উদুম্বর —গর্গরী লেখে ভাবে গর্ গর্
নিবার অনিবার লেখে গান বনপারে চেয়ে—
কমণ্ডল ফেলছে কেবল চোখের জল,
বল্কল লিখছে প্রাণের খবর --- গাছে ছাল আঁচড়িয়ে।
নিত্যতারা ফুল তোলে বিশ্বামিত্রের তপোবনে
ডাল ভাঙে পাতা ছেঁড়ে বারণ নাহি শোনে।
প্রভাতে আসে তারা চন্দ্র হলে ক্ষীণ
লুকায়ে আসে লুকায়ে যায় —ধরা না দেয় কোনোদিন
পাঁচটি বহিন —যেন বনের হরিণ ফেরে গহনে গহিন।
দিন না হতে আসে অত্র, —চিহ্ন রেখে যায় ছিন্নপত্র।
পলায় দ্রুত পায়, মন ভুলায় নূপুর সিঞ্জনে
হায়রে হায়, বনের সীমায়
—এই পড়ে এই পড়ে না নয়নে।

উড়ুম্বর যজ্ঞডুমুর গাছ হয়ে গা ঢাকা

মুহু মুহু গলা সাধে যেন কোকিলের ডাকা-কুহু !

শিষ ধরে আর এক শিষ্য দোয়েল পাখির চুহু চুহু

পদ্মপাতার গীত কথা আঁচড়ায় কেউ

কেউ উদাম হাওয়াময় মেশায় নিঃশ্বাস

আর কেউ বাঁধে ছড়া —

রেখে যাজ্ঞ-বল্ক পড়া —জ্যুহতি আর জুহু !

বিশ্বামিত্র বুড়ো গর্গমুনিকে তাপস বালকদের দেখা শোনার ভার দিয়েছেন। তিনি নিজের ধ্যান ধারণা নিয়েই ব্যস্ত। ছেলে পড়াবার সময় খুব কম। এক একদিন গর্গমুনি হঠাৎ এসে ছাত্রদের শুধান —'পড়াশুনা কেমন হচ্ছে ?'

উড়ুম্বর কমণ্ডল বলে ওঠে —'করছি !'

—'আচ্ছা শুনি তো একটু !'

—অমনি একযোগে সবাই আওড়াতে থাকে —'ত্বরাৎ নিকটাচ্চৈব উন্মুখাৎ সম্মুখাৎ বিমুখাচ্চৈব কটাক্ষাৎ !!'

গর্গমুনি বলেন —'ভাল ভাল !'

পঞ্চকন্যার আর গুরু শিষ্যে পাঁচজনায় এই তো চলেছে নাট, এমন সময় বিশ্বামিত্র আশ্রমে ফিরলেন, গর্গমুনিকে ডেকে শুধোলেন —'আশ্রমের মঙ্গল তো ?'

গর্গ বললেন —'না দাদা, উপদেবতার উৎপাত শুরু হয়েছে।'

—'সে কেমন ?'

গর্গ উত্তর করলেন—

'শোনো দাদা, বলি —

তপোবনে কোকিল ডাকে, যজ্ঞডুমুর গাছের আগে

কুহুস্বরে মুহু মুহু প্রাতঃ সন্ধ্যায় ধ্যান ভাঙ্গে !

চন্দ্র অস্তে যায় শুকতারা করে মিটি মিটি
কোয়েল থামে তো দোয়েল ধরে কানের কাছে শিটি
খিটিমিটিতে ধ্যানধারণা নিদিধ্যাসনে বালকগণের
মন না লাগে।'

বিশ্বামিত্র বলেন —'পৌষমাসে কোকিল ডাকে কে জানিত আগে!'

—'তাই তো বলছি দাদা, এসব উপদেবতার কাজ কি হয় কী জানি, এর উপরে যদি অপদেবতারা লাগে!'

—'পাগলের মতো বোকো না, চল আশ্রমটা পরিদর্শন করে আসি।' বলে গর্গকে সঙ্গে নিয়ে গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র ঘুরে দেখতে চললেন দাণ্ডা হাতে।

উডুম্বর সবে ডুমুর গাছে গা ঢাকা হয়ে কুহু দিতে যাবে — তাড়াতাড়ি কমণ্ডল ছুটে এসে বললে —'দাদা নেমে পড়। মহামুনি আসছেন।'

বলতে বলতে মহামুনি বিশ্বামিত্র গাছতলে এসে হাঁকলেন — 'উডুম্বর, হচ্ছে কী ও!'

আর সাড়াশব্দ নেই। ডুমুরের আগডাল ভেঙে টপ্ করে উডুম্বর পাকা ফলটির মতো মাটিতে পপাত! গর্গমুনি —'আহা লাগল নাকি' —বলে কাছে যেতেই দে দৌড় উডুম্বর! ডুমুরের ফলগুলো কুড়িয়ে গর্গ ঝুলির মধ্যে রেখে ধরলেন মহামুনির সঙ্গ।

গর্গমুনির পুত্র গর্গরী উডুম্বরের কাছে শুনলেন মহামুনি বেরিয়েছেন। সে পর্কটি গাছের তলায় কবিতা লেখা ফেলে পলায়ন। বিশ্বামিত্র পড়লেন —

কোকিলে সদা হুঙ্কারে
ভ্রমরে তথা গুঞ্জারে
অনিল এলে তীর মারে —

শালগাছের তলায় একটুকরো বল্কল, তাতে লেখা দেখালেন মুনি —

রে বল্কল, মনের কলকব্জা হল শিথিল,
অনিবার কত আর লাগাই খিল্ !

এমন সময় ঝিলের জলে টুপ করে একটি ঢিল পড়তেই চালসে-ধরা চোখ ফিরিয়ে গর্গমুনি দেখলেন পাঁচরঙা গোটাকতক প্রজাপতি যেন উড়ে পালাল।

বিশ্বামিত্র বললেন —'চল তো, ও পারটা দেখে আসি।'

ওপারে গিয়ে আশ্রমের অবস্থা দেখে বিশ্বামিত্রের নিঃশ্বাস রুদ্ধপ্রায়, গর্গের চক্ষুস্থির —

হতশ্রী আশ্রম দেখেন বিদ্যমান
ছিন্ন ভিন্ন পত্রাকীর্ণ সকল পুণ্যস্থান।

বিশ্বামিত্র রাজা ছিলেন। হলেন রাজর্ষি, তাতেও হল না — ব্রহ্মর্ষি হয়ে তবে ছেড়েছেন। কিন্তু রাগটুকু পুরোপুরি শরীরে এখনো বর্তমান। ক্রোধে কম্পমান হয়ে গর্গের দিকে চাইতেই তিনি বললেন —'বলেই ছিলেম তো, উপদেবতা !'

যে শিষ্যটি জলে ঢিল ফেলেছিল সে বলে উঠল —'আজ্ঞে, হরিশ্চন্দ্র রাজা ও দিকের বনে মৃগয়াতে এসেছেন। তাড়া খেয়ে যত হরিণ আর পাখিরা এসে ঢুকেছে ঠেলে এই বনে। ঢিল ফেলে কত তাড়াই —

বনের হরিণ রাতে রাতে আসে যায়,
ডাল ভাঙে পাতা ছেঁড়ে ফুলফল পেড়ে খায়
পাখি কটা পক্ষিণীদের করে ডাকাডাকি,
জাল দড়া নাই —কতবা ঠেকায়ে রাখি।'

বিশ্বামিত্র খানিক গুম হয়ে ধ্যানস্থ থেকে মাটিতে চেয়ে বললেন — 'এসব তো হরিণের খুরের দাগ বোধ হচ্ছে না। যেন পাঁচ আঙুলের ছাপ দেখা যায়!'

—'আজ্ঞে তা হলে বানর কি বানরী হবে।'

গর্গ বলে উঠলেন —'না গো না, এ সব অপদেবতা, অপ্সরী, কিন্নরী —তাঁরা কেউ মায়া মৃগী কেউ কাল বিহঙ্গী হয়ে আসা যাওয়া শুরু করেছেন। ইন্দ্রের আদেশে আমাদের তপোভঙ্গ করে আশ্রমটি নষ্ট করবেই করবে দেখে নিও!'

বিশ্বামিত্র শিষ্যদের ডেকে বললেন —'গাছে গাছে মন্ত্রঃপুত লতাবন্ধন লাগাও। দেখি কী করেন সহস্রলোচন!'

ডাল ভাঙে, পুষ্প পাড়ে করা চাই নিবারণ,
আইলে লাগিবে কালিলতার বন্ধন।

মন্ত্রঃপুত কালিলতার বন্ধন গাছে গাছে, আশে পাশে লাগিয়ে চলল ছাত্রেরা, বিশ্বামিত্র গর্গকে বললেন —'চল নিশ্চিন্তে এবারে জপে তপে দিবে মন।'

গুরুরা গেলেন; ছাত্রেরা বলাবলি করতে করতে গেল—

'গুরুই জানে পঞ্চকন্যা তারা থাকে বনে
পেল না সংবাদ, অস্ত না যেতে চাঁদ—
আসিবে পাঁচজনে
ফাঁসিতে পড়িবে অথবা মরিবে উদ্বন্ধনে
গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত এক্ষণে।'

সে রাত্রে কারো নেই ঘুম। কান পেতে শুনছে পায়ের নূপুর বাজছে কিনা ঝুম ঝুম। শেয়াল প্রথম প্রহর হেঁকে গেল, দ্বিতীয় প্রহর হেঁকে গেল —গর্গমুনির নাকডাকা থামল তৃতীয় প্রহরে।

চতুর্থ প্রহরে শেয়াল না হাঁকতেই বেরিয়ে পড়ল পাঁচ শিষ্য চুপি চুপি পুষ্পবনের দিকে। ভোরবেলা তখন—

—বৃক্ষগণ হেলিত সুশীতল সমীরণে,
—পুষ্প যত প্রস্ফুটিত পুষ্পময় কাননে।

পঞ্চশিষ্য তারা গিয়ে দেখে লতাবন্ধনও নেই, পঞ্চকন্যাও নেই। গর্গমুনি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ফুল বাগানে।

—'আজ্ঞে কী হল মশায়? হরিণ পাখি সব গেল ক'নে?'

—'আর ক'নে। শোন বলি, আশ্চর্য যা দেখলাম নয়নে।

প্রভাতে আইল পঞ্চকন্যা পুষ্প তুলিবারে,
ডালে ভর দিবামাত্র লতাবন্ধন পড়ে ঘাড়ে
ছাড়া না পাইয়া তারা ব্যাকুলিত মন
হরিশ্চন্দ্রের দোহাই পাড়ে করিয়া ক্রন্দন।
ক্ষণমাত্রে উপস্থিত হরিশ্চন্দ্র যশোধন,
স্পর্শ মাত্র মুক্ত কন্যা পাঁচজন।
শূন্যভরে মেঘের পরে করিল পলায়ন
অবাক কাণ্ড দেখিলে এমন
উপদেবতার উৎপাতে এবার সংশয় জীবন।'

উদুম্বর বললে —'মশায়, উৎপাত তো চুকে গেছে।'

গর্গ বললেন —'যাক্, চল আশ্রমে, দেখি কী বলেন গাধির নন্দন!'

হরিশ্চন্দ্র পঞ্চকন্যাকে মুক্ত করে মৃগয়া রেখে তো অযোধ্যায় যান। এদিকে বিশ্বামিত্র গর্গমুনির কাছে পঞ্চকন্যার সংবাদ শুনে ক্রোধে কম্পমান — দাণ্ডা হাতে দৌড়লেন অযোধ্যার মুখে। তাপস

বালকেরা চলে দেখে গর্গমুনি বললেন—'আরে র' র' আমিও যাব—কি জানি কী উৎপাত করে উপদেবতারা একা ঘরে বুড়োকে পেয়ে।'

ক্রোধে মহামুনি চলেছেন সত্বর
বাহাত্তরে গর্গমুনি নড়িতে দিয়া ভর!

উড়ি পড়ি চলে গর্গরী, নিবার বল্কল কমণ্ডুল উডুম্বর। এ দিকে—

নিশি না পোহাতে নগর অযোধ্যায়
শয্যা ছাড়ি গা তোলেন হরিশ্চন্দ্র রায়।
ফুলটুঙ্গির ঘরে দেয়ান বসিল
বিশ্বামিত্র উপস্থিত—খবর পৌঁছিল।
জ্বলন্ত অনল যেন দণ্ডহস্ত তপোধন,
ভয়ে ত্রস্ত হরিশ্চন্দ্র করেন অভ্যর্থন।
'আইসেন আইসেন বৈসেন বৈসেন
লয়েন কুশাসন।
সফল হইল গৃহ সফল জীবন
মম ঘরে আইলা মুনি গাধির নন্দন।'

বিশ্বামিত্র মহারাগত হয়ে বললেন—'কে বসে তোমার ঘরে—কে চায় কুশাসন।'

রাজা নিজের হাতে রূপার সিংহাসন আগিয়ে দিতে সেটা পায়ে ঠেলে মহামুনি বললেন—'আমি বান্ধিনু পঞ্চকন্যা—ছাড়িলে কী বলে?'

রাজা তখন বললেন,

'মৃগয়া করিতে আমি গিয়াছিনু বন,
মৃগ চাহি ফিরিতে শুনি করুণ ক্রন্দন।

দেখিলাম পঞ্চকন্যা বান্ধা তরুতলে
'হরিশ্চন্দ্র রক্ষা কর' বার বার বলে।
লতার বন্ধন তাদের করিতে স্পর্শন,
মুক্ত হয়ে স্বর্গপথে গেল পঞ্চজন —
আশ্চর্য দেখিয়া এলাম অযোধ্যা ভবন।'

গর্গমুনি বললেন —'ঠিক বলছো? না, পঞ্চকন্যাকে নিজের অন্তঃপুরে এনে বন্ধ করেছ?'

রাজা বললেন —

'দান পুণ্য করি আমি তুমি যে ব্রাহ্মণ
মিথ্যা না বলিব প্রভু, সত্য এ ঘটন।'

উডুম্বরের কানে কানে কমণ্ডল বললে —'তাহলে আর উপায় নেই দাদা, একেবারে হাতছাড়া হয়েছে।'

উডুম্বর শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

বিশ্বামিত্র অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পেয়ে যেন আরো জ্বলে উঠে রাজার দিকে দাণ্ডা তুলে বললেন —

'আমি যারে বান্ধি তারে মুক্ত করে কোন্ জন
রাজ্যনাশ অনিবার্য সংশয় জীবন!'

বশিষ্ঠ মুনি ছিলেন কাছে, বললেন —'আহা চট কেন? কন্যারা চেয়েছে মুক্তিদান —রাজধর্ম পালন করেছে রাজা পুণ্যবান।'

'দান পুণ্য করেছেন রাজা! দান পুণ্য করেছেন বটে! ভাল কথা —

কত বড়ো দাতা তুমি বুঝিব এখন,
আমারে কিঞ্চিৎ দান দেহ ত রাজন্।'

বশিষ্ঠ চোখ টিপ্‌ছেন —রাজা দেখেও দেখেন না, আনন্দের সঙ্গে বললেন —

'চাহ কি দান —এখনি তা দিব দান
ধন চাহ ধন দিব, জন চাহ জন দিব
নানা দানে গোঁসাই বাড়াব তব মান !'

বিশ্বামিত্র বললেন —'আমিও রাজা ছিলেম এককালে। রাজাদের মুখের কথায় আমার বিশ্বাস খুব কম —

দান দিবে যদি করিয়াছ মন,
অগ্রেতে করহ রাজা ত্রিসত্য বন্ধন।'

সরল প্রাণ রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্যবদ্ধ হলেন —

ভূপতি করিল সত্য না জানিয়া ছন্দ
না বুঝিয়া ফাঁদে যেন মৃগ হৈল বন্ধ

—'মুনি মহারাজ, বলেন কী চাই ?'
বিশ্বামিত্র বললেন —

'দেবতারা সাক্ষী মহারাজ
সত্যই যদি দিবে দান ভেবেছ অন্তরে
এইক্ষণে পৃথিবী দান করহ আমারে।'

রাজা ফুলটুঙ্গীর তিন খামচা কেঁচো মাটি, ইঁদুর মাটি আর সার মাটি মুনিরাজের হাতে তুলে দিতে বিশ্বামিত্র 'স্বস্তি স্বস্তি' বলে মাটি হাতে করে বললেন —

'তুমি দিলে দান, পাইলাম আমি
দানের দক্ষিণা সোনা দাও আনি !'

রাজা ভাণ্ডারীর দিকে চেয়ে বললেন —

'বিলম্বে নাহি প্রয়োজন।
দানের দক্ষিণা সপ্তকোটি সোনা কর সমর্পণ।'

বশিষ্ঠ একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলেন দেখে, বিশ্বামিত্র বাঘের মতো হাঁ-করে বললেন —

'তোমার কি অধিকার রাজার ভাণ্ডারে ?
সমস্ত পৃথিবী দান করিলে আমারে।
ভাণ্ডারী কাহার ধন দিবেক তোমারে ?'

রাজা কপালে করাঘাত করে মাটিতে বসে পড়লেন।

মুনিরাজা বললেন —'বস্‌ছ কোথায় ? ও আমার জমি !'

রাজা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ভাবেন কোন্-দিকে যান।

গর্গ এগিয়ে বললেন —'মাটি না হলে রাজা বসেন কোথায় ? —এ তোমার সাজা অন্যায় !'

—'হবে না' বলে বিশ্বামিত্র ঘাড় নাড়তে বশিষ্ঠ বললেন —'এত দূর ! আমি ব্যবস্থা করছি —

'পৃথিবীর বর্হিভাগে শিবের বারাণসী
যাও মহারাজ আনন্দে থাকগা বসি।'

রাজা করতে চললেন কাশীবাস —সঙ্গে শৈব্যা রানী, পুত্র রুহীদাস। সাত দিনের মধ্যে সাত কোটি সোনার কড়ার নিয়ে বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে ছেড়ে দিলেন।

সাতদিনের দিন দূরে বিশ্বনাথের ধ্বজা দেখা দিয়েছে। হাট বাজার খুলেছে। কাশীর পথে হেঁটে চলেছেন রাজা রানী রাজপুত্র ;

হঠাৎ বিশ্বামিত্র কচুরি গলি থেকে বেরিয়ে দুই হাতে পথ আগলে বললেন —'কই রাজা আমার দক্ষিণা ?'

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল পাণ্ডার আর গুণ্ডার। তখন রাজা বললেন —

'শৈব্যা কি দাও মন্ত্রণা ?
কি দিয়া শুধিব আমি বিশ্বামিত্রের সোনা ?'

'শৈব্যা বলেন,

প্রভু নিবেদি তোমারে
আমারে বিক্রয় কর হাটের মাঝারে।
ঋণশেষ অগ্নিশেষ কভু রাখা নয়।
দাসী হাটে লয়ে মোরে করহ বিক্রয় !'

রাজা বললেন —

'মুনিবর না করিব ঘৃণা
স্ত্রীপুত্র বেচিয়া তোমার শুধিব দক্ষিণা !'

রাজা হাটের মধ্যে চলে গেলেন। বিশ্বামিত্র ছাগল দাড়ি মোচড়াতে মোচড়াতে বিশ্বনাথের দর্শনে ভিড় ঠেলে আগালেন।

কাশীর কেদারঘাটে দাসীর হাট, সেখানে লোকে লোকারণ্য, দালাল হাঁকছে। এক দাসীকে দেখিয়ে —

'এ, দেখেন দেখেন, স্বল্পমূল্যের পণ্য
দাসীটি চিন্তাজ্বরে সদা থাকে রুগ্ন।'

কেউ কেনে না দেখে বদ্যিবুড়ো পাঁচপণে দাসীটা কিনে নিয়ে বললেন,

'ক্যা চিন্তা ! চিন্তাজ্বরে যখন রুগ্ন
তখন আমার চিন্তামণি বটিকা খাওয়ালেই
জ্বর হয়ে যাবে মগ্ন।'

কামার বুড়ো ছিল পাশে, সে বলে উঠল 'একটু খোঁড়াচ্ছে। বদ্যিমশাই, দোকানে নিয়ে যাবেন — পায়ের কব্জার দু-একটা খিল ঠুকে দেব।'

—'বেঁচে থাক আমার "বাতারি"?' বলে বদ্যি তো বাড়ি যান।

দালাল আর একটি দাসীকে কাঠগড়ায় টানতে টানতে এনে বললে —'দুর্জন, কিন্তু প্রিয়বাদী —কারু শত্রুও নয়, মিত্রও নয়!'

রাজবাড়ির নট তাকে পঞ্চাশ টাকা পণে কিনে নিলে।

এমনি একটির পর একটি দাসী বিকোতে বিকোতে—

স্ত্রী লইয়া এল রাজা হাটের ভিতরে,
'দাসী কিন দাসী কিন' ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।

তখন দাসী-হাট ভাঙে ভাঙে, কেউ খরিদ্দার আসে না, এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উপস্থিত

বৃদ্ধ বিপ্র পণ্ডিত সাধুজন
ছিল তার একটি দাসীর প্রয়োজন।

ব্রাহ্মণকে দেখতে যেন পাকা আমটি —ওল কামানো মাথায় একটি টিকি আছে টিকটিকির ল্যাজের মতো, তাতে একটি ফুল বাঁধা। গায়ে নামাবলি, পায়ে খড়ম, হাতে মাছের চুবড়ি।

রাজা রানী তাঁকে প্রণাম করলে ব্রাহ্মণ বললেন—

'দেখ বাপু, ব্রাহ্মণ সজ্জন,
এসব স্থানে করি না গমনাগমন —
কি করি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর একটি দাসীর প্রয়োজন।'

রাজা বললেন —

'বিশালকুলসম্ভবা এই আমার স্ত্রী
—এঁরে দাসীরূপে করেন গ্রহণ।

ব্রাহ্মণ বললেন —

'ভাল, ভাল,করি তো শ্রবণ,
দাসীর লাগি কত চাহ পণ ?'

রাজা বললেন —

'নাহি জানি মিথ্যা প্রবঞ্চনা
—এ দাসীর মূল্য চারি কোটি সোনা।'

পোদ্দারের দোকান থেকে ওজন করে সোনা দিয়ে রানী শৈব্যাকে কিনে নিয়ে দাসী হাট থেকে বাড়িমুখো যেতে চান ব্রাহ্মণ —রুহীদাস ধরল 'মা' বলে আঁচল ছাড়তে চায় না।

—'আরে কোথাকার বালক ! যা নে দুটো পয়সা মুড়ি খা গা।' রুহীদাস আঁচল ছাড়ে না।

অঞ্চল ধরিয়া পুত্র যায় গড়াগড়ি
ছাড় ছাড় বলি বুড়া ঠোকে নড়ি।
শৈব্যা বলে —গোঁসাই, করি নিবেদন
বিনা পণে কিনে লও আমার নন্দন।

ব্রাহ্মণ তখন চটেছে —

'আরে বাপু আমি তো নয় বাতুল,
ছেলেটা যে খাবে এতগুলি তণ্ডুল

তারপরে কাপড়টা আসটা মাছটা তরকারিটা আছে —ব্রাহ্মণী ছিঁড়বে আমার টিকির মূল।'

শৈবা গলবস্ত্র হয়ে বললেন —

'দুই বেলা যেই অন্ন দিবেন আমাকে
তাই ভাগ করে পালিব ইহাকে।'

'সে ভাল কথা —

দিন প্রতি এক সের পাইবে তণ্ডুল
দেখ বাছা কথার নড়চড় না হয় একচুল।'

এই বলে তো ব্রাহ্মণ মাছের ঝুড়ি রুহীদাসের হাতে দিয়ে দাসী সঙ্গে ঘরমুখো হল। হরিশ্চন্দ্র 'হা কষ্ট পরাধীনতা' বলতে বলতে বিশ্বামিত্রকে সোনা গনে দিতে যান।

বিশ্বামিত্র চটে উঠে বললেন —'মাত্র চার কোটি!

অল্পজ্ঞান মোরে কর হরিশ্চন্দ্র নরপতি
সপ্তকোটি আন —ঘাটি নয় এক রতি।'

হরিশ্চন্দ্র প্রমাদ গণে দাস-হাট মুখো হলেন।

মণিকর্ণিকার ঘাট, বারাণসীর দাস হাট তাহার গোচরে
রাজা হরিশ্চন্দ্র, ঘাসের দড়া কোমর বন্ধ
সন্ধাইল হাটের ভিতরে
'নফর কিনিবে নফর কিনিবে' ডাকে উচ্চৈস্বরে।

হৈ চৈ পড়ে গেল দাস হাটে। কিন্তু তিন কোটি সোনা দিয়ে নফর কে কেনে; এ বলে 'পাঁচ সিকে' —ও বলে 'দশ সিকে' —সে বলে 'আধ কুনকে চাল দু বেলা, বছরে দুখানা কাপড় —এই চলছে ডাকাডাকি, এমন সময়ে —

কালু নামে হাড়ি এক ছিল সে নগরে,
সে বলে আমার কর্ম আছে তো নফরে
মড়া জ্বালাবে, চড়াবে শূকরে।

তখন কালু হাড়িতে রাজাতে কথা হচ্ছে —

'কালুরে চাহিয়া রাজা বলিছে বচন,
তুমি যাহা বলিবে তা করিব পালন।
কালু বলে শুন ওহে পুরুষ রতন,
আপনার মূল্য লবে কতেক কাঞ্চন?
রাজা বলে নাহি জানি মিথ্যা ব্যবহার,
স্বর্ণ লব তিন কোটি মূল্য আপনার।'

কালু হাড়ি তিন হাঁড়িতে তিন কোটি সোনা দিয়ে রাজাকে কিনে নিলে —বেচাকেনা শেষ হয়ে গেল।

সাত কোটি সোনা পাঁচখানা গরুর গাড়িতে বোঝাই দিয়ে চলছেন বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় দিকে —পাঁচ শিষ্য সোনার তালের উপর বন মানুষের মতো বসে। কাশী ছাড়িয়ে সারঙ্গ বন, সেখানে গাড়ি পৌঁছল ভরসন্ধ্যাবেলা —দুদিকে সার সার সারুং গাছ ঘন ছায়া ফেলেছে সরু পথের উপরে —আকাশ দেখা যায় না —উপরে ডাকছে ঝিঁঝিঁ, নিচে ডাকছে ঝিঁঝিঁ —হঠাৎ রাত দুপুরে 'হে রে, রে,' হাঁক দিয়ে ডাকাত পড়ল —দেখতে দেখতে সাত কোটি সোনা লোপাট। পাঁচ জোড়া গরু পর্যন্ত! গর্গমুনি লম্বা পা ফেলে দৌড়ে

কচুবনের দিকে —বিশ্বামিত্র খালি হাঁড়ি মাথায় পচা পুকুরে গলা জলে গা-ঢাকা হলেন —পাঁচ শিষ্য খালি গাড়ির তলায় লাঠি খেয়ে চিৎপাত —

গহন বন গাছ-পালা
অমানিশার নীল-ঢালা
উপরে নিচে উড়কুড় নাই
চারিদিকে ঝাড় জঙ্গলি
হাওয়ায় নেই চলাচলি
পথ চলিতে বিপথে চলে যাই
গলা চিরে ডাকিতে সাড়া দিতে
কেহ কোথাও নাই।

এই অবস্থায় রাত কাটিয়ে কজনে সকালে ধুলো-কাদা মেখে অযোধ্যার পথে চলে যান।

এখানে কালু শুধালেন, রাজাকে 'ওহে তোমার নাম কি?'

রাজা বললেন —'বাপ মায়ে নাম দিয়েছে 'হরিশ্চন্দ্র।'

—'আরে বাস্ ও খটখটে নাম ধরে তো ডাকা চলবে না। কখনো বলব 'হরি' কখনো বলব 'হরে' কখনো বা আদর করে 'হরিদাস!' এখন কাজ বুঝে নাও, আর বিলম্ব না —

শুনরে হরে বলি তোরে।
শূকরের পাল রাখ যত আছে নগরে।
মণিকর্ণিকাতে শ্মশানঘাটে যত পুড়বে মড়া
মড়া পিছু পঞ্চাশ কাহন লবে ধরা।'

রাজা কাজ বুঝে নিয়ে কাজে লাগলেন —

ঊর্ধ্বঝুটি চুল বাঁন্ধে রাজা উচ্চ করি
কোমরে জড়ায় বিচুলির দড়ি।
রাজচিহ্ন রাজার সকল গেল দূরে,
পাটনীর বেশে রাজা বেড়ান ঘুরে ঘুরে।
এদিকে শৈব্যা রানী ব্রাহ্মণের ঘরে,
একসের তণ্ডুল পান আহারের তরে।
তিন পোয়া রুহিদাস খায় তিনবারে
এক পোয়া খান শৈব্যা সারা দিনান্তরে ॥

সুখের শরীর এক মুঠো খেয়ে দিন দিন শুকোয় দেখে ব্রাহ্মণ বললেন —'বাছা অমন করলে তো চলে না। পয়সা দিয়ে কিনেছি শক্ত সমর্থ হবে খেয়ে দেয়ে, কাজ দেবে, না, দিন দিন না খেয়ে শুকোচ্ছে পাকাটির মতো। বাপু রুইদাস, কাল থেকে দেবার্চনার ফুল তুলো আমি তোমার জন্যে তিন পোয়া তণ্ডুল না হয় বেশী দেব, মায়ের চালে আর ভাগ বসিও না।'

—'যে আজ্ঞে' বলে রুহিদাস আঁকসি সাজি হাতে, তুলতে গেল ফুল আর দুর্বাঘাস।

যতদূর দুঃখ হবার তা তো হল —

রাজা হৈল দাস, রানী হৈল দাসী,
রাজপুত্র রইল অর্ধ উপবাসী।
বিশ্বামিত্র রাজা হৈল অযোধ্যায় আসি।

এই ভেবে মুনিবর বশিষ্ঠ অযোধ্যায় রাজ-পুরোহিতের কাজ গর্গমুনির হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের আশ্রমে সরলেন। এই খবর পেয়ে মুনিরাজ বিশ্বামিত্র মুখে কিছু বললেন না, কিন্তু মনে মনে

বশিষ্ঠের উপর চটে রইলেন। শতপুত্র আর যত মূর্খ শিষ্য নিয়ে খুব কড়াহাতে বিশ্বামিত্র রাজ্য শাসন করতে থাকুন; এদিকে প্রজারা ঘরে ঘরে কাঁদতে থাকল —

হা হা! হরিশ্চন্দ্র মহীপাল,
চরায় শূকরের পাল।
রাজা রানী দাস দাসীর হাল
ক্ষুদ কণা খায় রাজপুত্র
বিশ্বামিত্র করে প্রভুত্ব
হায় কি কপাল।
এই বসুমতী, ধনধান্যবতী মুনিরে ভূপতি
করিয়া অর্পণ শুধিলেন পণ
সেই হতে শূন্য হল অযোধ্যা ভুবন।
কারো নাই হর্ষ, আছে বিমর্ষ প্রজাগণ।
নগর চত্বর অপরিষ্কার
বসে না হাট বসে না বাজার—
অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী নিদ্রায় মগন।

চাষীরা মাঠে ধান কাটে — রাজার নাম করে কাঁদে। বারুই পান বাছে —রানীর নাম ধরে কাঁদে। ভিখিরী দান সাধতে এসে রাজপুত্র রুহিদাসের জন্যে নিঃশ্বাস ফেলে শুধু হাতে ফিরে যায়। রাজবাড়ি হল দাস দাসী শূন্য —রাজপরিজন সকলে ক্ষুণ্ণ —হতশ্রী নগরী অনাথিনী বেশে কাঁদে।

—'যেন নক্ষত্রহীনা নিশা, পতিহীনা নারী
শ্রীহারা তেমনি সারা রাজরাজী।'

উদুম্বর কমণ্ডল এরা সব বলাবলি করে —

'ভাই রে, কোথা দুগ্ধ খেয়ে সুখ নিদ্রা
করিব সেবন
তা তো হল্ না —ভেবেছিলেম যেমন।
ভাই, ছিল সাধ অন্তরে,
ফলার খাব প্রজার ঘরে ঘরে
খালি উদরে হাত বুলাই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ করি লেহন।
হা দগ্ধ অদৃষ্ট
পুরায় না অভীষ্ট
দিয়ে পাঁচ রকম মিষ্ট।
—বিফলে করেছি বসে অনশন।
কন্যান্তঃপুরে দু-পাঁচটা কন্যাও নাই।
কে রাঁধবে পাঁচ তরকারি —পাত পাড়ি পাড়ি
পাঁচ ভায়ে খাই।
চল ফিরে যাই তপোবন,
রাজভোগ লাগাতে এসে সুবিধা হল না তেমন।'

গর্গরী বললে —

'চোপ্ চোপ্ —গুরু শুনলে করবে কোপ
যাবে একূল ও কূল তখন'

—'যা করেন বিশ্বামিত্র তপোধন' বলে সবাই চুপ করে থাকে।

ঋষিই হোন আর রাজাই হোন সাত সাত কোটি সোনার শোক ভোলা শক্ত। এদিকে রাজভাণ্ডার শূন্যপ্রায়। —কী করা যায়। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে লিখলেন —'তোমার আশ্রমের কাছে ডাকাতরা

আমার সাত কোটি সোনা লুটেছে তার ক্ষতিপূরণ তোমাকে করতে হবে। নয় তো যুদ্ধং দেহি!'

বশিষ্ঠ লিখলেন —

'কোথাকার চোর কে ধরে
খোলা কেটে বামুন মরে!'

বিশ্বামিত্র তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন —'কী আমি খোলাকাটা বামুন। রাজা নই।'

সাজরে সাজ রব পড়ে গেল অযোধ্যায়। চতুরঙ্গে বসে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সঙ্গে লড়াই দিতে চলে। সঙ্গে তাঁর শতপুত্র উদুম্বর কমণ্ডল প্রভৃতি —তুলোভরা জামাজোড়া পরে, মস্ত মস্ত শিরস্ত্রাণ, উষ্ণীষ মাথায় জড়িয়ে ঘোড়ায় চড়ে বীরদর্পে মেদিনী কম্পমান করে।

বরুণার তীরে বশিষ্ঠ মুনির শবলা গাই চরছিল। বিশ্বামিত্র আশ্রম ঘেরাও করতে সে ভয় পেয়ে বশিষ্ঠের গোহালে ঢুকে কাঁপতে থাকল। বশিষ্ঠ তার কপালে হাত বুলিয়ে বললেন —'ভয় নেই শবলে, কোন্ রাজা এসেছেন, কেন, দেখা যাক!'

দেখলেন 'রণং দেহি রণং দেহি' করে বিশ্বামিত্র হাঁকছেন। বশিষ্ঠ দাণ্ডাহাতে এগিয়ে বললেন —'ওহে রণং দেহি কি? আমি গরীব ব্রাহ্মণ রণকৌশল তো জানি না। যদি ক্ষুধা পেয়ে থাকে তো বল, এই শবলার কৃপায় তোমাদের সকলকে চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজন করিয়ে ছেড়ে দিই।'

বিশ্বামিত্র বললে —'সাত কোটি সোনা আগে বার কর। নয় তো এই আশ্রম সুদ্ধ তোমাকে নদী জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাব। আমি দুধের ছেলে নই —দুধ খেতে আসিনি তোমার শবলার।'

ছেলেতে ছেলেতে কথা কথায় কথায় হাসি
বুড়োতে বুড়োতে কথা, কথায় কথায় কাশি।

দুই ঋষিতে বিবাদ বাধল শবলার গোহালের কাছে। বশিষ্ঠ কোমরে পৈতে জড়িয়ে বললেন —'তবে রে! বড় দর্প হয়েছে। আশ্রমে এসে উৎপাত। দেখাচ্ছি, শবলে, এদের দূর করে দাও তো মা!' বলতেই শবলা হাম্বারব করতেই লক্ষ লক্ষ তালপাতার সেপাই ঢাল-তলোয়ার খেলতে খেলতে বেরিয়ে এল। আর একবার হাম্বারব—সোলার ঘোড়ার পাকাটির লাঠি হাতে কোটি অশ্বারোহী বিশ্বামিত্রের পথ আগলালো। যুদ্ধ লাগলো —ঝমা ঝম্

ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝে পায় পায়
পদাতিকে পদাতিকে
তালপাতার সেফাই ঢাল-তরবার চালায়
পাকাটির হুড়ায় কে কোথা পালায়
ফিরে চায় না কোনো দিকে।

বিশ্বামিত্রের শিষ্যেরা আগেই ঘোড়া থেকে গড়িয়ে খানাখন্দ ভেঙে দৌড় মেরেছিল। বিশ্বামিত্র 'ফিরে আয় ফিরে আয়' বলতে বলতে নিমেষে অন্তর্ধান, ফৌজ অযোধ্যার দিকে। বশিষ্ঠ দাণ্ডা উঁচিয়ে বললেন —'বলং বলং ব্রহ্ম বলং।'

বিশ্বামিত্র আর কথা নয় —'ধিক বলং ক্ষত্র বলং' বলতে বলতে গর্গমুনির হাত ধরে প্রস্থান শিবের কাশীর দিকে।

আকাশে দুন্দুভি বেজে চলল —'ধিক বলং ক্ষত্র বলং, বলং বলং ব্রহ্ম বলং।'

বেণীঘাটে অযোধ্যার রাজাদের মঠবাড়ি —ফুল বাগান ঘেরা। অনেক রাতে বিশ্বামিত্র সেখানে এসে ঢুকলেন। গর্গমুনি আছেন, সঙ্গে শিষ্যরা তল্‌পি-তল্‌পা বহে। বিশ্বামিত্র স্থির হয়ে বসে গর্গকে বললেন —

'মূর্খ যত শিষ্যের পরে দিয়া, রাজ্যভার
অর্থনাশ মনস্তাপ হইল আমার।'

গর্গমুনি বললেন —

'কি আর বলব দাদা —
রাজধর্ম রাজার, যতিধর্ম মুনির
দুই নৌকায় পা দিয়ে ডুবেছো জেনো স্থির।'

শিষ্যের বলে একে-ওকে —

—'এ তো বড় দায়
রাজ কার্যে অযোধ্যায় —
জপ তপ সব হৈল নষ্ট !
ছাড়ি তো রাজ্য
কই ছাড়ে কার্য
নিরুপায়, ঢুকে কর্ম খাঁচায়, ইন্দুরের প্রায়
ইতো নষ্ট ততো ভ্রষ্ট।'

গর্গ বললেন —

'আমি তো বলি —
বশিষ্ঠে বলি পাঠাও সম্প্রতি
হরিশ্চন্দ্রে আপন রাজ্যে বসান শীঘ্রগতি।'

বিশ্বামিত্র বললেন —'কোথা আছেন হরিশ্চন্দ্র, যাও সেটা কর নিরুপণ।'

গর্গমুনি শিষ্যদের নিয়ে কাশীর অলি-গলি সন্ধান করেন হরিশ্চন্দ্রের দেখা নেই।

এদিকে রানী শৈব্যা কুস্বপ্ন দেখলেন

বিপ্র ঘরে জননী হাড়ির ঘরে বাপ্
ফুল তুলিতে রাজকুমারে কাটিল কালসাপ্।

রানী হঠাৎ ভয়ে জেগে উঠে দেখলেন —

প্রাতঃকালে প্রকাশিত সূর্যের কিরণ,
কুসুম তুলিতে চলে রাজার নন্দন।
স্বর্ণ সাজি লৈয়া হাতে সুবর্ণ আঁকড়ি।
শৈব্যা তারে বলে গিয়া উঠে রড়ারড়ি।
'না যাইও না যাইও বাপা কুসুম তুলিতে।
যে স্বপন দেখেছি রাতে পারি না ভুলিতে।
ঘরে থাকরে বাপা ঘরে থাক আজ,
কি জানি অভাগীর বুকে পড়ে কিবা বাজ
মায়ের বচন রাখ ওরে বাছাধন
ফুল তুলিতে আজ কোথা না কর গমন।'

রুহিদাস বলে —

'মাতা যদি ঘরে থাকি।
ব্রাহ্মণ দেবে না অন্ন তাও জান নাকি?'

মা বলে —'ওরে আমি অন্ন দিব তোরে নিজে থাকি উপবাসী।'

না রাখিল রুহিদাস মায়ের বচন,
কুসুম তুলিতে যায় রাজার নন্দন।
রাজ ঘাটের কাছে অযোধ্যা রাজের মঠবাড়ি,
তারি বাগানে রুহিদাস ফুল তুলছে লয়ে কারি।
নানাজাতি ফুল জাঁথি যুথি মল্লিকা রঙ্গন,
পারিজাত শেফালিকা করবী কাঞ্চন।
অশোক কিংশুক অতসী কেশব
তোলে চম্পক আকন্দ বকুল টগর
—যত লয় মন।

অবশেষে শ্রীফলে আঁকড়ি ভেজাইল,
ডালেতে আছিল সর্প বুকেতে খাইল।
সর্ব অঙ্গ শিশুর বেড়িল বিষ জাল
ভুঁয়েতে পড়িল শিশু মুখে ভাঙে লাল।

এদিকে পূজার বেলা বহে যায়, রুহিদাস আসে না, ঠাকুরের ভোগ হয় না, ক্ষুধায় পেট জ্বলছে ব্রাহ্মণের।

বিলম্ব দেখিয়া তবে কহিছে ব্রাহ্মণ
'এখন না আইল কবে হবে দেবার্চন —রন্ধন ভোজন।

'যাও বাছা দেখে এস কোথা গেল ছেলেটা —এমন অকেজো দেখিনি তার মতো।'

শৈব্যার তখন বুক কাঁপছে। এ গলি, সে গলি এ বাগানে সে বাগানে খুঁজে রাজঘাটের কাছে বেলতলায় দেখেন যেয়ে —

বৃক্ষতলে পড়ে পুত্র,
আর কেহ নাই কুত্র।
পুত্রকে দেখিয়া শৈব্যা পড়িল ভূতলে,
যেমন কলার গাছ ভাঙে ডালে মূলে।

মাও ফেরে না, ছেলেও ফেরে না। ব্রাহ্মণীকে বলেন —'কি করি?'

ব্রাহ্মণী বলেন —'আর করব কি?, মায়ে পোয়ে পালিয়েছে। এই বেলা ঘুরে-ঘারে দেখ যদি ধরতে পার।'

—'এঃ আজ ঢের দুঃখ দিল নারায়ণ' বলে ব্রাহ্মণ লাঠি হাতে বেরলেন সন্ধানে।

এখানে সম্বিৎ পেয়ে —

পুত্র কোলে লয়ে শৈব্যা করিছে ক্রন্দন
কোথা গেলা পুত্র মোর রোহিত নন্দন।
কোথা গেলে ওহে হরিশ্চন্দ্র যশোধন,
আসিয়া দেখহ তব মরিল নন্দন।

কান্নার রোল শুনে গর্গমুনি ছুটে বাগানে বেরোলেন। সঙ্গে শিষ্যেরা 'চল চল দেখি কী হল' বলে দ্রুতবেগে উপস্থিত। সবাই স্তম্ভিত, ভীড় করে দাঁড়িয়ে —এমন সময় ব্রাহ্মণ —'এই যে পেয়েছি' বলে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এসে বললেন —'আরে মশায়, দাসীটা পালিয়ে এসেছে। এখন মায়া কান্না কাঁদছে ঘাটে বসে। উঠে আয়—।'

পুত্র কোলে শৈব্যা ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
কান্দিতে কান্দিতে কহে ব্রাহ্মণের পাশ
সর্পাঘাতে আজ মরিল নন্দন,
রেখে গেছে পূজার পুষ্প করিয়া চয়ন।

ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি সোনার ঝারি আর আঁকশিটা তুলে নিয়ে — 'এ ফুলে আর কি কাজ হবে' —বলে ফুলগুলো মাটিতে ফেলে ঝারিটা আর আঁকশিটা জলে ধুতে ঘাটে নামলেন।

শৈব্যা আকাশে চেয়ে রইলেন —হায় এমন কে আছে দেয় প্রবোধ বচন।

ব্রাহ্মণ স্নান করে ঝারি আঁকশি ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে এসে বললেন —

'আরে মড়া কোলে করি কেন করিছ ক্রন্দন
মরিলে অবশ্য জন্ম, জন্মিলে মরণ।

মণিকর্ণিকায় যাও পোড়াবার তরে
আমি এখন চলিলাম —দাহান্তে এসো ঘরে।'

কোথায় মণিকর্ণিকা, কোথায় শ্মশান —কিছুই জানেন না শৈব্যা। গর্গ বললেন —'চল বাছা, আমরা তোমাকে শ্মশানঘাট দেখিয়ে দিই।'

শৈব্যা কাতর হয়ে বলে —'ঠাকুর, দেখ একবার যদি বেঁচে থাকে।'

—'সর্পের দংশনে ছাড়িল যে প্রাণ,
শিবেরও সাধ্য নাই তাহাকে বাঁচান ॥'

এই বলে গর্গ আগালেন শিষ্যদের নিয়ে, সঙ্গে চললেন শৈব্যা বুকের আঁচলে ছেলেরে ঝাঁপিয়ে।

মড়া লৈয়া যেতে মণিকর্ণিকার পাশ
হস্তেতে মুগ্‌গর করি রোখে হরিদাস।
হরিদাস বলে আমি মড়া দাহ করি
মড়া প্রতি লই পঞ্চাশ কাহন কড়ি।
শৈব্যা বলে আমি যে কড়ার ভিখারী
দয়া করি কাষ্ঠ দাও চিতানল জ্বালি
বিরক্ত করিল মোরে ব্রাহ্মণের দাসী
এক কাহন চাহিতে তারে আমি ভয় বাসি।

হরিশ্চন্দ্র বললেন —
অন্য ঘাটেতে নিয়া পোড়াই কুমার
বিধাতা করিল মোরে হাড়ির আচার।
তখন—
শৈব্যা বলে দয়া কর ঘাটের পাটনী
দিব আমি চিরিয়া অর্ধ বস্ত্রখানি।

এতেক শুনিয়া শৈব্যার বচন,
হস্তের মুদ্গর ত্যজি আইসে রাজন।
পুত্র লইয়া শৈব্যা পড়ে অথন্তরে,
কোথা হরিশ্চন্দ্র বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
প্রভু হরিশ্চন্দ্র রাজা গেলে কোথাকারে
আসিয়া দেখহ মৃত আপন কুমারে।
হরিশ্চন্দ্র বলি শৈব্যা কান্দে বিছমান,
তখন ফিরিল যে রাজার পূর্বজ্ঞান।
হরিশ্চন্দ্র বলেন —'রানী এও ছিল কপালে
সর্পাঘাতে পুত্র মরিল অকালে।'
শৈব্যা বলেন 'হায়রে একী হল আজ
রানী বলে ঘাটে পাটনী করে উপহাস!'

রানী খেদে লজ্জায় উঠে যেতে চান, সেই সময় রুহিদাস কোলের মধ্যে নড়ে উঠল। গর্গমুনি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন —'যাক বেঁচে গেছে ছেলেটা।' বলে শিষ্যদের নিয়ে মঠে ফিরলেন। দেখতে দেখতে নগরময় গুজব রটল, বাজারে ঘাটে বলাবলি চলল —

দুঃখের পরে দুঃখ বিশ্বামিত্র দিল,
পুষ্প তুলিতে রাজপুত্র সর্পেতে কাটিল।
কাঁদে রাজা হরিশ্চন্দ্র কান্দে শৈব্যা মাতা,
হেনকালে ধর্মরাজে পাঠালো বিধাতা।
পদ্মহস্ত বুলাইতে বালকের গায়,
বিষজাল দূর হয়ে বালক হেসে চায়।
অদ্ভুত দেখিয়া কালু কহিল রাজায়
তুমি প্রভু আমি ভৃত্য ঘুচালাম দায়।
ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ আসি বলিল শৈব্যারে
রানী হয়ে দাসীপনা সাজে কি তোমার।

রাজা বলে ব্রাহ্মণ করি নিবেদন।
শৈবা তোমার কেনা দাসী লব কি কারণ।

ব্রাহ্মণ চটেই লাল —'আরে তোমার নারী তুমি নেবে না আমি কি চিরকাল ভাত-কাপড়ে রানীর হালে ওঁকে সোনার থালে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন খাইয়ে ফতুর হব ?'

রাজা বললেন —'বাপরে! ব্রাহ্মণের কেনা বলতে ব্রহ্মাস্ত্র। রাজা হয়ে তা নিয়ে শেষে কি নরকে যাব ?'

শৈব্যা চান রাজার দিকে, ব্রাহ্মণ চান ব্রাহ্মণীর দিকে —'বলি ও ব্রাহ্মণী, এ তো ভাল বিপদ হল —এ যে ফিরে নিতে চায় না।'

—'ফিরে না নিতে চায় হাটে নিয়ে বিক্রি করে ফেল। তুমিও বাঁচ আমিও বাঁচি —সেই টাকায় পাঁচখানা গহনা পাব।' এই বলে ব্রাহ্মণী রুহিদাসের দিকে ফিরে ফিরে চায় —সাত রাজার ধন মানিকে গড়া দুখানি কঙ্কণ তাই নিয়ে খেলছে ছেলে।

শৈব্যা বললেন —'বাছা এরা আমাকে হাটে বেচতে চায়।'

ব্রাহ্মণী তাড়াতাড়ি বলেন —'তোমার মাকে তুমি কিনে নিতে পার তো আমাদের আর হাটে যেতে হয় না।'

—'কী দিয়ে কিনব ? আমার তো পয়সা নেই। এই দুটো পিতলের বালা আছে, এই নিয়ে আমার মাকে ছেড়ে দাও।'

—'লক্ষ্মি ছেলে, চাঁদ আমার, সোনা আমার' বলে বালা দুগাছি খুঁটে বেঁধে ব্রাহ্মণী বললে —'যাও বাছা এখন বাপ মায়ের সঙ্গে ঘরে যাও —আমরা চললেম আপন ঘরে।'

রাজা বললেন —'আমাদের তো ঘর নেই —যাব কোথা ?'

ব্রাহ্মণ বললেন —'সে কী হয়, এখানে অযোধ্যার রাজাদের ধর্মশালা মঠবাড়ি রয়েছে, তার অধ্যক্ষ হচ্ছি আমি। রাজভোগে থাকবে সেখানে একটি পয়সা খরচ লাগবে না —চল আমি ছাড়চিনে।'

রাজা বললেন —'সে হয় না, আজ আগে আমার মনিব-বাড়ি যাব, তার পরে দরকার হয় তো মঠ-বাড়িতে উঠব।'

'বলি তোমার মনিবটা কে শুনি?'

রাজা কালু হাড়িকে দেখিয়ে দিলেন।

—'এঃ!' বলে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী তিন আঙুল জিভ কেটে দ্রুতপদে প্রস্থান।

স্ত্রীপুত্র লইয়া রাজা করেন গমন
প্রসন্ন মানস অতি প্রফুল্ল বদন।
হেনকালে বিশ্বামিত্র দিল দরশন।
মুনি বলে জপতপ সব নষ্ট হৈল,
মিথ্যা রাজ্য করিয়া জন্ম গোঙাইল।
আপনার রাজ্যে তুমি যাও শীঘ্রগতি,
আমি তপোবনে গিয়া পাই অব্যাহতি।

রাজা বলেন —'দত্তহারি হতে হবে, কী মতে পালি আদেশ প্রভুর?'

রানী বলেন —'দিয়ে নিলে হতে হয় তীর্থের কুকুর?'

গর্গ বলেন —

'এযে দেখছি ল্যাঠা প্রচুর,
তুমি তো তরলে আপন দায়
এখন আমাদের একটা কর উপায়।
মাছি পড়েছে কলসীতে আটক
—খেতে এসে চিটে গুড়।'

উদ্ধারকর্তা বশিষ্ঠ এই সময় উপস্থিত। —'কি হে কেমন চলছে রাজ্যশাসন?'

—'যার রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দিতে চাই, নেবে না। বড়ো

বিপদেই পড়া গেছে দাদা, তুমি একটা ব্যবস্থা কর —হাঁপ ছেড়ে বাঁচি !' বলে গর্গমুনি বিশ্বামিত্রের কাছে বশিষ্ঠকে নিয়ে ব্যাপারটা খুলে শোনালেন।

বশিষ্ঠ বললেন, —'হরিশ্চন্দ্রের পুত্রকে রাজ্যভার দাও, বিশ্বামিত্রের নামে উনি, রাজ্য চালান। মাঝে মাঝে বিশ্বামিত্র—'

—'না না, আমি আর না।' বলে চটপট প্রস্থান বিশ্বামিত্রের।'

অযোধ্যার রাজা আসি দিল দরশন,
রাজ্যভার পুত্রকে করিল সমর্পণ।

এদিকে এই পর্যন্ত তো হয়ে চুকল। বিশ্বামিত্রের যত রাগ পড়লো ইন্দ্রের উপর। পঞ্চকন্যাকে তপোবনে না পাঠালে তো এ ঘটনা হয় না। এই সময় নারদের সঙ্গে দেখা —একে মনসা তার ধুনোর গন্ধ।

বিশ্বামিত্র বলেন —'আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়ে হরিশ্চন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব দিয়ে সকুটুম্ব স্বশরীরে স্বর্গের সিংহাসনে না বসাই তো কী বলেছি।'

নারদ সংবাদ দিতে ছুটলেন ইন্দ্রকে।

গর্গমুনি চুপি চুপি শিষ্যদের বললে —'ওহে ভাল বুঝছি না। হরিশ্চন্দ্রকে নিয়ে কী আবার ল্যাঠা বাধে দেখ। ইন্দ্রের সঙ্গে কলহ — কোন্‌দিন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত না পড়ে।'

ছাত্রেরা পাঁচজনে বলাবলি করে —'দেখ রাজা তো আর হেঁটে যাবে না স্বর্গে। রথ একখানা দুখানা আসবেই। তাতে চড়ে আমরাও একেবারে নন্দনকাননে পঞ্চকন্যাতে —বুঝলে।'

উড়ুম্বর বললে —'তারা যদি শাপভ্রষ্ট হয়ে আবার কোথাও জন্মে থাকে ?'

কমণ্ডল বললে —'না না, ও কথাই নয়। তা হলে ধ্যানে আমি জানতে পারতুম। রাজসূয় যজ্ঞটা হলে হয় একবার।'

গর্গরী বললে —'তা হলে এই পরামর্শ ই পাকা রইল।'

আর দুজন বললে —'পাঁচজনের যা মত, আমাদেরও তাই।'

সকলে বললে —

'তাহলে চল সকলে অযোধ্যায় যাই
স্বশরীরে স্বর্গে যেতে রথটা ধরা চাই
তল্‌পি-তল্‌পা বেঁধে সেঁধে নাও
ছেঁড়া কুশাসন কমণ্ডুলটাও
ফুটো গাগরীটা, ফাটা বল্কল
নীবার ধান ডুমুর ঝাঁকা
সবই নাও গুছাই সুচাই
—দেখ গুণ ছুঁচ সুতা —কিছু তো পড়ে নাই।'

'কিছু না, কিছু না,' বলতে বলতে পঞ্চশিষ্য স্বর্গে যাবার রথ ধরতে অযোধ্যামুখো দৌড়লেন।

গর্গ বললেন —'ওহে সবাই আস্তে চল, নয় তো তোমাদের সঙ্গে দৌড়তে পথের মধ্যেই আমার প্রাণান্ত হবে।'

পাঁচ শিষ্য তখন কী করে —বুড়োকে একখানা ছেঁড়া মাদুরে জড়িয়ে কাঁধে ফেলে চলল তেজে অযোধ্যার মুখে। পথে দেখলে কালু হাড়িও চলেছে। তার কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে —শুয়োরের পাল। কুকুর বেড়াল নিয়ে দলে দলে হাড়ি হাড়িনী কুটুম্ব সব।

গর্গ বললেন ডেকে —'ওহে তোমরাও স্বশরীরে স্বর্গযাত্রা করতে চলেছ নাকি?'

কালু বললে —'আজ্ঞা হ্যাঁ'

গর্গ বললেন —'যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ইতিমধ্যে যদি মরি তো পোড়াবার লোকের অভাব হবে না।'

'হরি বল হরি বল
দায় মুক্ত হরিশ্চন্দ্রের জয় বল।'

বলতে বলতে চলে গেল সবাই অযোধ্যার মুখে স্বশরীরে স্বর্গ যাত্রার লোভে।

॥ অথ হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গযাত্রা ॥

বিশ্বামিত্র সহায় হরিশ্চন্দ্র রায়
পুত্রে রাজ্য দিয়া
আগান আকামা যানে স্বর্গলোক পানে
স্বশরীরে স্বকুটুম্ব নিয়া।

কালু হাড়ি চলে সাথে, চলে শূকরের পাল ঝুড়ি মাথে হাড়িনী চলে —

লয়ে কুক্কুর কুক্কুট পোষা বিড়াল।
শ্মশানে শৃগাল পালে পাল চলে
শুচি অশুচি ইতর ভদ্র মিশালে
চলেছে বিশাল স্বর্গপথ জুড়িয়া।
কৃপণ চলেছে বেঁধে গুপ্তধন কোর্তার ভাঁজে সিয়াইয়া
দাতাও চলেছে, ফতুর যেন হাঁটে
—ছিন্ন কন্থা কাঁধে।
চলেছে চোর, চলেছে ছ্যাঁচোড়
ভাল মানুষ, তাঁদোড় গুণ্ডা পাণ্ডা
গোঁজেল মাতাল
এক জোটে বিশাল কোলাহলে
দিক ভরিয়া।
স্বর্গে আসছে ছত্রিশ জাত
ভেবে অস্থির ত্রিদশনাথ
দেবলোকের জাতঃপাত স্মরিয়ে।

নাশ হয় বুঝি স্বর্গের শুদ্ধি
ভেবে হতবুদ্ধি বুধ বৃহস্পতি
গ্রহপতিগণ
কেবলি ডাকেন —'বিপদে মধুসূদন' বলিয়া —
'হে গোবিন্দ বিশ্বকাবৃন্দের শুনিয়ে কুক্কু নিশ্বন,
বিশ্বগন্ধার গন্ধ নাসারন্ধ্র করে যে আক্রমণ।
ঘ্রাণ দোষে দূষিত হতেছেন পবন —
কত আর থাকা যায় না নাসাপথ করে আচ্ছাদন ?
বায়ু না হলে আয়ু ফুরায় —
নিকট শমন —আমাদের প্রাণ যায়
স্বর্গের জাত যায়
নন্দন বনে হাড়িগণ বুঝি বা শূকর চড়ায়।
মেষ পাত্রে মুখ বুঝি দেয় বিশ্বের কদ্রু
দেবালয়ে ঢুকে বুঝিবা।

পালিত কুক্কুট খেয়ে শক্তু
স্বর্গ নষ্ট করে বুঝি হরিশ্চন্দ্রের গণ
ত্বরিতে আসি রক্ষা কর বিপত্তে মধুসূদন।
দেবগণের বিপদ বুঝিয়া অন্তরে
দেব গদাধর কহেন নারদ মুনিবরে।
স্বর্গ নষ্ট করে হরিশ্চন্দ্রের গণ,
দেবলোক রক্ষা কর গিয়া তপোধন।
এত শুনি ঢেঁকি বাহন চলেছে সত্বর
দূর হতে দেখে বলে কমণ্ডলু উদুম্বর —
ভাই দেখ উড়ে আসছে অপ্সর না কিন্নর।
এইবারে পঞ্চকন্যা পড়িবে নজর
দেখ তো হে ভাল করে বল্কল গর্গর

বল্কল বলে —

'ঢেঁকি একটা আসছে চলে অশ্বের মতো তড়বড়।'
গর্গ কন —'উপরে ওটা কে বসে বিড়ালের মতন।'

নিবার বলে —'ভুল নাই আর, আগে বাড়িয়ে নিতে আসছেন ঢেঁকি বাহন।'

গর্গ বলেন —'বুঝলে না, ইন্দ্রপুরের ঢেঁকিশাল এটা কর দর্শন।'

তখন কি হল —

'রথ রাখ রথ রাখ' বলিতে নারদ
মধ্য পথে থামিল হরিশ্চন্দ্রের রথ।
মুনি বলে 'সকুটুম্ব কোথাকে গমন?'
রাজা বলে —'ইন্দ্রলোকে করি আরোহণ।'
মুনি বলে —'সেথা যাবা কোন্ পুণ্য বলে!'
'দানপুণ্য বলে যাই', হরিশ্চন্দ্র বলে।
সুবুদ্ধি রাজার তবে কুবুদ্ধি ঘটিল
আপনার পুণ্য সব কহিতে লাগিল।
গ্রামে গ্রামে পুকুর দিলাম, কুপ দিলাম
বাঁধ দিলাম জাঙ্গাল বাঁধিয়া।
পথিক জনে ছায়া দিলাম —সারি সারি বৃক্ষ দিয়া।
মোর দান লইলেন বিশ্বামিত্র তপোধন
স্ত্রীপুত্র বেচিয়া দিলাম দক্ষিণার কাঞ্চন।
সুবুদ্ধি রাজাকে কুবুদ্ধি ধরিল,
নিজমুখে নিজপুণ্য কহিতে লাগিল।
কহিতে কহিতে রথ নামিয়া পড়িল
নারদ পাতিল ছল রাজা না বুঝিল
উডুম্বরে বলে কমণ্ডল 'এ কেমন হইল?

এই ছিল রথ ইন্দ্রপুরে
এই পড়ল নেমে আস্তাকুঁড়ে
করতে ছিলুম রথে স্বশরীরে স্বর্গারোহণ
এখন দেখি যে ঘুরে ঘুরে রথের হচ্ছে অবরোহণ।
লাগছে যেন আপাদমস্তক শিরো ঘূর্ণন
—কাঁচাগুয়া মুখে পুরে,
কর্ণে পশিছে ঘর্ঘর রব
যাঁতা ঘুরায় যেন রথচক্র সব
ঘুরুনির চোটে প্রাণ অস্থির
কক্কড় শব্দে কর্ণ বধির
দেখা নাই অপ্সরীর কিন্নরীর
চিল শকুনী উড়ছে দূরে
ব্যোম হল আবরণ —একেবারে পড়লেম ঘুরে'।
—'নচ দৈবাৎ পরম বলম্' নারদ মুনি বলেন নাকি সুরে।
তখন কালু হাড়ি বললেন লাঠি তুলে —
'অলপেয়ে নারদে কোথা যাও এঁকে বেঁকে ?
কেড়ে নেব এখনি ঢেঁকি
লেলিয়ে দেব কুকুর খেঁকি
আসল স্বর্গের বদলে চালাবে মেকী!'
ভালমন্দ না বলেন রাজা হইয়া কাতর
মাঝপথে আটকা পড়ে সকলে ফাঁপর
—'রথ নামালে যেমন, রথ ওঠাও এখন
ছেলের হাতের মোওয়া পেয়েছ একি ?'
—কালুর ভয়ে আলুথালু নারদ তপোধন
হরিশ্চন্দ্র রাজার দোহাই পাড়েন ঘন ঘন
রাজা বলেন 'বোঝা গেল, ছল পাতলেন মধুসূদন
কাজ নেই স্বর্গে, কাজ নেই মর্তে
মাঝ পথেই রই লইয়া স্বগণ।

শুধাও গিয়ে মধুসূদনে
থাকি স্বর্গ মর্তের মাঝখানে
মেঘ রাজ্যে কী উপায়ে করি জীবন ধারণ?'

নারদ বলেন ---

'এ নিয়ম করিলেন দেবগণ—
যে শষ্য সঞ্চয় করি নাহি করে ব্যয়
ক্ষেত্র হৈতে যে বা শষ্য আনিতে ফেলায়
হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহা খায়।
নূতন বসন রাখে করিয়া যত্ন
আপনি না পরে না পরায় অন্যে
রহিল যে বস্ত্র হরিশ্চন্দ্রের স্বগণের জন্যে সমুদয়।'

বাঁচিল স্বর্গের জাৎ
নারদের প্রসাদাৎ
না হলে কী যে হোতো —কী বলা যায়।
যায় গো বলা যায়।
যত জাতে ঠেলার কর্তারা
এ পাড়া সে পাড়া, বেকার হয়ে যেত মারা
তীর্থের কাকের প্রায়,
স্বর্গের না হলে জাত বজায়!

তখন মাসি-পিসি বার হবার বয়েস গেছে। মাথার তেলোয় চুল গজান বন্ধ মাড়ি ফুঁড়ে আক্কেল দাঁতও ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে। কেবল পাকা দাড়ি-গোঁফ হাত-পায়ের নখ ক'টার উৎকর্ষের উৎসাহ-বশে বেরিয়ে পড়ার উৎকণ্ঠার উৎপাত ক্ষুর নরুণ কাঁচি কাস্তে উখো খররা চালিয়েও দাবান গেল না। তাদের এক কথা —'আমরা চলব বাহিরে। তুমি চলতে না-চাও তো কার কি ?'

দাড়ি যে গোনা যায় না এতগুলো আকুঞ্চিৎ আঙুল দিয়ে দুই পায়ের বুড়ো আঙুলে আমায় সুড়সুড়ি দিয়ে বলে —দেখ তোমার পায়ের আগা চুলকোচ্ছে। এবার নিশ্চয় দেশ পর্যটন আছে তোমার কপালে।

আমার বুড়ো আঙুল জোড়া খঞ্জনের কাটা লেজের গোড়ার মতো চমকে দু-বার নেড়েই ঠাণ্ডা। ঠিক যেন চিৎপুরের লুঙ্গি বাবার বুড়ো-আংলা দুটো চেলা এক ঠেঙে দাঁড়িয়ে সুয্যির দিকে চেয়ে ঘোরতর তপিস্যে করছিল। হঠাৎ পায়ে পিঁপড়ে কামড়াতে একটু সজাগ হয়ে আবার ধ্যানস্থ হল।

গোঁফদুটো দুষ্ট ছেলের মতো সলতে পাকিয়ে কানে সুড়সুড়ি দেয় থেকে থেকে ঘুম ভাঙাতে চেয়ে ; বলে —জাগ না, শোন না!

গোঁফ আর দাড়ির শিয়রে বসে আছে, থাবা গেড়ে কথামালার ঘুমন্ত সিংহ মস্ত দুটো নাকের ছেঁদা ফুলিয়ে। ছোটো একটা গোঁফ রংটা তার নেংটি ইঁদুরের মতো শিলাট-কালো। সে থেকে থেকে সরু লেজটা সিংহের নাকের মধ্যে চালিয়ে দেয়, অমনি সিংহ গর্জন করে এক খুৎকার ছেড়ে থাবাকে ডাকে, থাবা ঘুমের ঘোরে উঠে এসে দাড়ির টুঁটি চেপে ধরে উকুন বাছতে বসে যায়।

ভূতপত্রীর দেশ থেকে মন-মনুয়ার পাখিটি আমার হারুন-অল-

রসিদ বাদশার দেওয়া—বাঁখারী নয় শাঁখারির সরু সরু কাটি দিয়ে গড়া পুরোনো কালের একটা খাঁচায় বসে বসে সারা দিন দরজার কাঠিতে চোঁচ ঘষে আর বলে—

ওগো ভাই
দ্বার খোলো বারে যাই।
বহুত দিন না দেখি ছুনিয়া
ছুনিয়ার হাওয়া নিয়া
ঠাণ্ডা করি মম হিয়া গো!

পাখি নিশ্চয় ছিল মধুমালার দেশের বাসিন্দা—সেই যেখানে ছিল সঙ্গ-মর্মর পাথরের খন্দকে বন্ধ রাজপুত্তুরের মা আর ধাই মা। এক এক দিন ভোরে উঠে তখন পাখিটাকে দুয়োরের খিল খুলে বলি—বেরিয়ে যা এইবেলা, কেউ কোথাও নেই।

পাখি খোলা দুয়োরের চৌকাঠে বসে দু'বার ডানা মেলায় উড়ি উড়ি করে যেদিক থেকে মালতী ফুলের লতায় ঘিরে মৌমাছির দল—ঠিক সেই সময় কাক ডাকে—না না না! আমি ভয় পাই, ঝপ্ করে বন্ধ করি দরজা।

এই অবস্থায় তখন কাটছে দিন-রাত—বন্ধ খাঁচায় বন্ধ ঘরে অঝোরে ঝরে নয়ন জল—নিজের দেশে যাওয়া ফুরিয়ে গেছে, পরের দেশের টিকিট কাটাবার ইচ্ছেও নেই, পয়সাও নেই। পদ্ম পুরাণ মনসার পাঁচালী গাইছেন কেবলি বসে-বসে শুয়ে-শুয়ে জবুথবু তোমাদের অবুবাবু ভাঙা গলায়—বেলা যায় না, বেলা যায় না যায় না কেন দারুণ বেলা!

হঠাৎ এসে হাজির কহবতী কথামালার, সঙ্গে ছেলাম বাবা। কোন্ কালে কোন্ দেশে তাদের দুজনার সঙ্গে দেখা তা মনেই নেই। তারাও চেষ্টা করে ঠিক করতে পারলে না যে পদ্মপুকুর ইটালিতে, না পুরন্দায়, না মগধে, না মগরায়, না এই জোড়াসাঁকোর গলির

মোড়ে আলাপ হয় প্রথমে আমাদের। খালি সময়টুকু মনে পড়ল। এক রোজ চার ঘড়ি বাকি সাম হইতে সেই সময় কজনে দেখা-দেখি চেনা-পরিচয় হয়েছিল। আমি তখন ঠোঙায় করে জিবেগজা এনে দুজনকে খেতে দিয়ে বললেম —তবে এবার আগমন কোথা থেকে ?

ছেলাম বাবা বললেন —আমি ঘরেই ছেলাম।

কহবতী বললেন —আমি সরস্বতীতে ডুব দিয়ে কথামালার দেশটা একবার ঘুরে এলাম।

আমি বললেম—আমি খালি বসে-বসে ভাবছেলাম কোথাকে যাইমু, কাহারে কইমু, কে মোর জানিবে ব্যাদন।

কহবতী বলে উঠল —ময়নামতীর যাত্রার গান, তারি এক ছত্তর, এ পেলে কোথায় ?

আমি গম্ভীর হয়ে বললেম —ময়মনসিংহ।

কহবতী তল্‌পি কাঁধে দাঁড়িয়ে বললে —চললেম।

—আরে যাও কোথায়, বসো।

কহবতী বললে —বাকি ক' ছত্তর কথা সংগ্রহ করতে। বলেই সে গেয়ে উঠল —

সময় তো থাকবে না থাকবে না
কথা রবে শুধু কথাই রবে
ভাল কিম্বা মন্দ বলি জগতে ঘোষণা রবে
মুখের কথা মনের কথায়
সুখ দুখের মিনি সুতে।
এতে ওতে গাঁথাই রবে।

কথামালাটা ফেলে চলে গেল কহবতী। ছেলাম বাবা জীবে-গজার শাল-পাতের ঠোঙাটা টুপি করে মাথায় দিয়ে সেলাম ঠুকে চম্পট দিলে। আমি কথামালাটা নেড়েচেড়ে দেখতে থাকলেম।

বিদ্যাসাগরের কথামালার মতো প্রেসে ছাপা বই নয়। হাতের

লেখা কথকতার পুঁথি। পৃথিবীতে যা কিছু হাল্‌কি জিনিস আছে তালপাতা, শালপাতা, তুলোট খাতা, হরিণ ছালের ছিলকে, মাছের পেটের পটকা তিমি মাছের আঁশ —তাদের চেয়ে পাতলা ছিষ্টিছাড়া কী একরকম কাগজে লেখা খানিকটা যেন, এক এক পর্‌দা আবের উপরে এ-পিঠ ও-পিঠ করে লেখা নরুণ দিয়ে আঁচড়ে —একেবারে যাকে বলে অতি অপূর্ব পুরাতন কথামালা পুস্তিকা —সাহিত্য পরিষদে নেই, গুরুদাস লাইব্রেরিতেও নেই, স্বয়ং বিদ্যাসাগরের ঘরেও নেই, যা এমন জিনিস সেটি। আর সবচেয়ে মজার কথা — বই পড়তে চশমা নিতে হয় না —বইখানি চোখের উপর ধরলেই হল— একটি একটি কথা মূর্তিমান হয়ে এসে সামনে হাজির হয়, কথা বলে, গান গায়, নাচে আবার নেপথ্যে চলেও যায়। ঘণ্টা বাজিয়ে প্রবেশ করে, ঘণ্টা দিয়ে চলে যায়।

সেকালে বিলেত থেকে যখন ভাল ভাল খেলনা আমদানি হত, তখন এই রকমের সব বই আসত। এক একটা ছবির পাতা ওল্‌টাও আর সঙ্গে সঙ্গে 'আরর্গিন বাজছে, ঘোড়া নাচছে, ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ডিগবাজী খাচ্ছে, কুকুর হুপ করে তেড়ে যাচ্ছে বেড়ালকে, বেড়াল লাপিয়ে উঠেছে গাছে, সঙ্গে বাজছে আর্গিন। কহবতী কোথা থেকে পেলে এ জিনিস শহরে তাই ভাবছি। বইখানা পেলে একবার নেড়ে-চেড়ে দেখার ইচ্ছে হচ্ছে, কেমন ঠিক নয়? সেটি হবার যো নেই, সে আমার লোহার সিন্দুকের মধ্যে। একটা গান ছাপিয়ে দিলেম, পড়ে দেখ কতকটা বুঝবে কী জিনিস লুকোন আছে আমার মরচে-ধরা লোহার সিন্দুকে।

—তারা বুড়ির একতারা নৃত্যগীত—

যথা—

বাজে এক সুরে একতারা প্রিং প্রিং প্রিং
ফোটে তিন রঙে তিন তারা এক দুই তিন
বাঁশ পাতায় ঝিঁঝির ডানা শব্দ দেয়

ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্
টিম্ টিম্ টিম্
চিন্ চিন্ চিন্ রোদ পড়ে
তাল পাতার সেফাই খেলে
ঢাল তলোয়ার ত্রিং ত্রিং ত্রিং !

বাজনার সঙ্গে সঙ্গেই কহবতী প্রবেশ করেই কথারম্ভ করে দিলে —সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি !

অমনি তার যুগ ভীষণ মূর্তিতে এসে খাড়া। কী বলব সত্য যুগ সে এক ঠিক সত্যমূর্তি। হাতে হোমকুণ্ড জ্বালাবার হাপর, ঘি ঢালবার হাতা, গলায় কুশের পৈতে, পিঠে হরিণের ছানার গা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া নরম-নরম ছাল, কোমর থেকে ঝুলছে ছোট্টো একটা আস্ত চামড়ার মোশোক —তাতে খাবার জল ভরা, দাড়ি গোঁফ জটাজুট।

ত্রেতা যুগে এলেন সপ্তকাল এক সবুজ মানুষ হরধনুতে টঙ্কার দিতে-দিতে।

দ্বাপরে এলেন ধিনিকেষ্ট তিনি তাক করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বাজনা বাজিয়ে ঘটোৎকচ মূর্তি।

কলি এলেন একেবারে ভীষণ একখানা কাল —কিচ্ছু দেখবার যো নেই। খালি শোনা যাচ্ছে গালাগালি, মারামারি, কোলাহল, মাঝে মাঝে হরিবোল রাম-রাম সত্য, রাইট লেফ্‌ট্ আর উড়ো জাহাজের ভুরুর ভোঁ, মটরের ফোঁ ফোঁ।

এরা দেখা দিয়ে মিলিয়ে যেতেই দেখা গেল একটা মস্ত পোল, তার মুখেই একটা ইসটিশান-ঘর, দেয়ালে লেখা —'কথামালা,' প্লাটফরম নং ওয়ান। একটা সিগনাল-কুলি পাহারালার লণ্ঠনে তেল জ্বালাচ্ছে আর গাইছে।

বলব কি অবাক কাণ্ড —এই কুলিটার কাছে আমি নিজেকে দেখলেম, লাঠি হাতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে উপস্থিত। চেহারা ঠিক এই, কেবল চশমা নেই চোখে আর বয়েস হয়ে গেছে একষট্টি উল্‌টে

'১৬'। দাড়ি নেই, গোঁফ একটু একটু শুঁয়োপোকার মতো দেখতে। হাতে মন-মনুয়ার খাঁচা, মাথায় বগের পালক দেওয়া জরির তাজ, পরনে মখমলের কোট-পেন্টুলেন, বুকে চার পাঁচটা মেডেল—ঠিক যাত্রার দলের যুবরাজটি।

একী কাণ্ড ভাবছি, এমন সময় দেখি কহবতী আর ছেলাম-বাবা দুইজনে প্রবেশ করলে, একজন হুবহু যাত্রার মন্ত্রিবর, আর একজন গালপাট্টাধারী কোটাল! ছবিটা দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে টুং-টাং করে আর্গিন বাজতে চলল, সুরে গেয়ে যেন কে বলছে—

(গীত)

পার কি না পার চিনিতে
ওহে চিনিতে
চেনা জনে চিন্তে হায়
এ কি বিপরীত এ
মুগ্ধ রইলে দুগ্ধ চিনিতে—

—যেন স্বপ্নের মতো মনে পড়ে গেল নিজের কোনো কালের চেহারাখানা, কিন্তু কোন্ রাজত্বের যে যুবরাজ ছিলেম কিছুতে মনে এল না থিয়েটারেও তো সাজিনি কোনোদিন যুবরাজ? ভাঁড় সেজেই ভাঁড়ামো করে এসেছি চিরকাল, বড়ো সমিস্যেয় পড়ে ভাবছি, এমন সময় তারা-বুড়ি আবার দেখা দিয়ে গেয়ে উঠল—

(গীত)

ও হে ও প্রবাসী কোন্ আকাশে
তারার দেশে করবে প্রবাস
দূরে ভ্রমিবার কিবা প্রয়োজন
আছে দু-নয়ন তারা আপনার পাশ।

তারা-বুড়ি চলে যেতেই দেখি রাত পুইয়ে গেছে।

গ্রন্থ-পরিচয়

আলোর ফুলকি

গল্পসল্প গ্রন্থমালা ৪। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা। বৈশাখ ১৩৫৪।

প্রচ্ছদ ও মুখপাতের চিত্র নন্দলাল বসু; অনুচ্ছেদ শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের বহু পূর্বে 'আলোর ফুলকি' বৈশাখ ১৩২৬—অগ্রহায়ণ ১৩২৬ সংখ্যার 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়।

ফরাসী লেখক Edmond-Eugene Rostand (১৮৬৮-১৯১৮) Chantecler নামে একটি রূপক কাব্যনাট্য রচনা করেন; চার অঙ্কের এই নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯১০-এ এবং ঐ সময়েই মঞ্চস্থ হয়। তার কাহিনী-আকারে অনুবাদ করেন ফ্লোরেন্স ইয়েটস হান 'The story of Chanticleer' নামে। 'আলোর ফুলকি' সেই কাহিনীর ভাব-অবলম্বনে রচিত।

অবনীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা অথবা বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে একবার 'আলোর ফুলকি'র কিয়দংশ পাঠ করেছিলেন। দৌহিত্র শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, 'মনে আছে একবার জোড়াসাঁকো বিচিত্রা সভায় সদ্য লেখা 'আলোর ফুলকি'-র একটা অংশ পড়ে শুনিয়েছিলেন। এখনও তাঁর পড়বার বিশেষ ধরনটি কানে বাজছে—চিনিদিদির পার্টিতে নানা জাতের মোরগরা আসছে··· দাদামশায়ের পড়ার কায়দায় গলার স্বরে নানা জাতের মোরগদের সাজ পোশাক চাল চলন হাবভাব যেন চোখের সামনে ভেসে উঠত।'

এই লেখার প্রায় সমসাময়িক একটি ভাষণে একই ছাঁদের বর্ণনাভঙ্গী লক্ষ করা যায়: 'পাতার ঘরের এতটুকু পাখি, সকাল সন্ধ্যা আলোর দিকে চেয়ে সেও বললে—আলো পেলেম তোমার, সুর নাও আমার—নতুন নতুন আলোর ফুলকি দিকে দিকে সকলে যুগ-যুগান্তর আগে থেকে এই কথা বলে চলল,···।' (শিল্পে অধিকার, ১৩২৮)।

'আলোর ফুলকি' সম্পর্কে স্বতন্ত্র বিশদ আলোচনা করেছেন শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক); প্রবন্ধটি তাঁর 'শিল্পিত স্বভাব' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে।

খাতাঞ্চির খাতা

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা। [১৯২১]। প্রচ্ছদ কাগজের পুতুল ও মাটির পুতুল অনুকরণে অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত। সুকুমার রায় চিত্রিত।

সুকুমার রায় সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকার বৈশাখ ১৩২৭—মাঘ ১৩২৭ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক গল্পের চিত্রাঙ্কন করেন।

'খাতাঞ্চির খাতা' James Matthew Barrie (১৮৬০-১৯০৭)-র 'Peter Pan' গল্পের ভাবানুবাদ। মূল গল্পটির প্রকাশকাল ১৯০৪।

একাধিক কাহিনীর মত অবনীন্দ্রনাথের এই কাহিনীতেও বাংলা ছড়ার গদ্যান্বয় লক্ষণীয়। এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথ এই ছড়া ও বচন বিপুল উদ্যমে সংগ্রহ করছিলেন ; কাছাকাছি সময়ের একটি সংবাদ থেকে জানা যায়, 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী—অদ্য বৃহস্পতিবার ১২ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬॥ টার সময় রামমোহন লাইব্রেরিতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ছেলে ভুলানো ছড়া' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।…' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ চৈত্র ১৩২৯)। 'খাতাঞ্চির খাতা' রচনার প্রায় দুবছর আগেই প্রকাশিত হয়েছে 'বাংলার ব্রত' (১৩২৫)।

উত্তরজীবনে অবনীন্দ্রনাথ যাত্রাপালা রচনাতে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা সম্পূর্ণ-রূপে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর প্রথম নাটক 'শিব সদাগর' প্রকাশিত হয় ১৩২৫-এ। তৎপূর্বে প্রচলিত যাত্রার পৌরাণিক চরিত্র নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রে কিছুকাল ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন। 'খাতাঞ্চির খাতা' কাহিনীতে 'উড়ে যাত্রা' শীর্ষক দুই পরিচ্ছেদব্যাপী সেই যাত্রাপালার প্রথম বিশদ বর্ণনা দেখা গেল ; এর দশবছর পরে অবনীন্দ্রনাথ প্রথম যাত্রাপালা রচনা করেন, 'এসপার ওসপার পালা' (১৩৩৭)।

'খাতাঞ্চির খাতা' পরবর্তীকালে 'অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন' গ্রন্থভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয় (এপ্রিল ১৯৬০) ; 'সন্দেশ' পত্রিকা থেকে মূল রচনাটির অনুকরণে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন সিগনেট প্রেস (১৯৭৪)। সেই কারণে বইটির প্রথম সংস্করণের সঙ্গে সিগনেট সংস্করণের কিছু পাঠভেদ লক্ষ্য করা যায়।

বুড়ো আংলা

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড, কলকাতা। শ্রাবণ ১৩৪৮।

প্রচ্ছদ অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত। অন্যান্য চিত্র নন্দলাল বসু অঙ্কিত। 'মৌচাক' পত্রিকায় ১৩২৭-২৮ সালে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত। 'প্রকাশকের নিবেদন'-এ দেখা যায়, 'সুইডেনে বড়দিনের উৎসবের সময় একরকম খড়ের পুতুল দোকানে দোকানে পাওয়া যায়।...Nils ও তার হাঁস খড়ের পুতুল হয়ে এক বড় দিনে সুইডেনে যখন বিক্রি হচ্ছিল, অবনীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর এক ফরাসী বান্ধবী শ্রীমতী আঁদ্রে কার্পেলে, পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই পুতুল দেখে এই সুন্দর প্রচ্ছদপট অঙ্কিত হয়েছে।'

Selma Lagerlof (১৮৪৮-১৯৪৯)-এর 'The Wonderful Adventures of Nils' (প্রকাশ ১৯০৭) কাহিনী 'বুড়ো আংলা' রচনার প্রেরণা।

সমসময়ে অবনীন্দ্রনাথ পুনর্বার কার্শিয়ং ও দার্জিলিং ভ্রমণে যান। ১৯১৯-২০ সালে তিনি দার্জিলিঙের বহু দৃশ্যচিত্র এঁকেছেন; সাহিত্য রচনায় সেই পাহাড়-প্রবাসের স্মৃতি 'বুড়ো আংলা' গ্রন্থের 'টুং-সোনাদা-ঘুম' পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়।

কয়েক বছর পরে অবনীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রে নতুন গদ্যছন্দ রচনা করেছিলেন; সেই 'পাহাড়িয়া' কবিতাবলীতে যে দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে—'বুড়ো আংলা' গ্রন্থে ও তার সমসাময়িক চিত্রাবলীতে তার উৎস খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

'বুড়ো আংলা' পরবর্তী সিগনেট সংস্করণের প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০। প্রচ্ছদ শ্রীসত্যজিৎ রায়।

হানাবাড়ির কারখানা

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড, কলিকাতা। কার্তিক ১৩৭০। প্রচ্ছদ ও চিত্র শ্রীঅজিত গুপ্ত।

'মৌচাক' পত্রে বৈশাখ ১৩৬১—কার্তিক ১৩৬১ সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়।

Thomas Ingoldsby ছদ্মনামে Richard Harris Barham (১৭৮৮-১৮৪৫)-এর লেখা 'The Ingoldsby Legends of Mirth and Marvels' কাহিনীর ছায়াবলম্বী 'হানাবাড়ির কারখানা'। ভূমিকায় 'খাতাঞ্চির খাতা'র চরিত্রগুলির পুনরুল্লেখ লক্ষণীয়।

রচনা সম্পর্কে শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় রয়েছে, 'অনেকদিন পরে দাদামশায় Ingoldsby Legend বলে একটি বই থেকে কতকগুলি গল্প নিজের ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। লেখাটি আগাগোড়া গদ্যের ছাঁচে লেখা হলেও বাক্যের শেষে প্রায়ই একটা মিল আছে। দাদামশায় বলতেন, এগুলো পড়তে হলে শুধু গল্পের মতো একটানা পড়ে গেলে হবে না। এগুলো আসলে কবিতা—ঠিক ছন্দ রেখে ঠিক সুরে এগুলো পড়লে তবেই এর রস পাওয়া যাবে। দাদামশায় পড়ে শোনাচ্ছেন ·· আমরা শুনছি আর দেখছি বাঁ-হাতে লেখার খাতাটা ধরা—ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে লম্বা লম্বা আঙুলগুলো বাতাসে নেড়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন ঝড়ের ঝাপটায় সমস্ত কিছু দুলছে এপাশ ওপাশ।'

বাদশাহী গল্প

প্রকাশ ভবন, কলিকাতা। বৈশাখ ১৩৭৮। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা শ্রীঅজিত গুপ্ত।

'বাদশাহী গল্প ও চটজলদী কবিতা' যুক্তভাবে মুদ্রণ করেন প্রকাশ ভবন। গ্রন্থাবলীর এই খণ্ডে শুধু বাদশাহী গল্পর কাহিনীগুলি প্রকাশিত হল। চটজলদী কবিতা গ্রন্থাবলীর পরবর্তী কোনো খণ্ডে অন্যান্য কবিতা ও ছড়ার সঙ্গে প্রকাশিত হবে।

'বাদশাহী গল্প'র গল্পগুলি 'রংমশাল' পত্রের বৈশাখ ১৩৪৫ সংখ্যা থেকে আষাঢ় ১৩৪৬ সংখ্যা পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়।

বাদশাহী গল্পকে ভূতপত্রীর গল্পের ক্রমানুবৃত্তি বলা যায়। গল্পগুলিতে অবনীন্দ্রনাথের শৈশবস্মৃতির সঙ্গে জড়িত একাধিক চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে।

সংযোজন

বিভিন্ন সাময়িকপত্র ও পুস্তক থেকে এই বিভাগের রচনাগুলি আহৃত হয়েছে। রচনাগুলি কালানুক্রমে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। নামের পাশে প্রকাশকাল দেওয়া হল।

চাঁদনী	ছেলে ও ছবি, ১৩০৬
কানকাটা রাজার দেশ	ছেলে ও ছবি, ১৩০৬
শাকুন্ত কথা	টুকরো কথা, শ্রাবণ ১৩৬৩
নল-দময়ন্তী	টুকরো কথা, শ্রাবণ, ১৩৬৩
দেবীর বাহন	ইতিহাস ও আলোচনা, ভাদ্র ১৩২৮। রং বেরং
উজোর ঘরের কান্না (খাসিয়া গাথা)	কল্লোল, আশ্বিন, ১৩৩০
একে তিন তিনে এক	মৌচাক, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৪১। একে তিন তিনে এক
ইচ্ছাময়ী বটিকা	রং-বেরং, জন্মাষ্টমী, ১৩৬৫
কাঁচায় পাকায়	মৌচাক, শ্রাবণ ১৩৪৪। একে তিন তিনে এক
সোকার ঘটকালী	বঙ্গলক্ষ্মী, মাঘ ১৩৪৩
সিকস্তি পয়স্তি কথা	রংমশাল, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র ১৩৪৪। রং বেরং
ভবের হাটে হেতি হোতি	পাঠশালা, আশ্বিন-পৌষ ১৩৪৪। রং বেরং
হেতি হোতির বৃত্তান্ত	সোনার কাঠি, ১৩৪৫
রেনি ডে	মধুমেলা, ১৩৪৯। রং বেরং
ফার্স্ট টু লাস্ট	শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৪৯
হারজিৎ	পাঠশালা, পৌষ ১৩৪৯
টুকরি বুড়ি	শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫০
বহিত্র	দেশের মাটি, আশ্বিন ১৩৫১। রং বেরং
রতনমালার বিয়ে	শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫২
চাঁইদাদার গল্প	শারদীয় দেশ, ১৩৫২
কাষ্ঠবেড়ালের পুঁথি	মৌচাক, কার্তিক ১৩৫২
কলাবনের কলা	শারদীয় দেশ, ১৩৫৪
গজ কচ্ছপের বৃত্তান্ত	দেবালয়, ১৩৫২
উপরামায়ণ	শারদীয় দেশ ১৩৭০
কথামালার দেশে	শারদীয় অমৃত ১৩৭১

'উজোড় ঘরের কান্না' লেখাটি খাসিয়াদের গল্পের একটি ইংরেজি অনুবাদের ছায়াবলম্বনে লিখিত।